প্রাচীন কবিওয়ালার গান

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন কবিওয়ালার গান
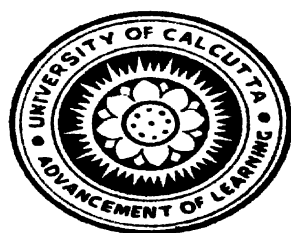
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম. এ.
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য—পনর টাকা

উৎসর্গ

সাহিত্য-সমালোচনের নব দৃষ্টিভঙ্গির
যুগপ্রবর্তনকারী
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচীপত্র

ভূমিকা

বৈদিক যুগ হইতে উপনিষদের যুগ পর্যন্ত কবি[১] শব্দের অর্থ ছিল সত্যদ্রষ্টা, যিনি মন্ত্র বা কবিতা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানী অর্থেও কবি[২] শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[৩]।

কবি-আখ্যা

বেদোত্তর পৌরাণিক যুগে মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকিকে নারদ-কর্তৃক "কবি" সম্বোধন করিতে দেখা যায়। এই স্থলে "কবি" শব্দের অর্থ-বিস্তার লক্ষণীয়। ইহার আরও পরে দেখা যায় যে নাটক ও খণ্ডকাব্যের রচয়িতা কালিদাসও কবি, রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কহ্লণও কবি, শ্লিষ্ট কাব্য রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দীও কবি, আবার গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীও কবি আখ্যার দ্বারা অভিহিত হইতেছেন।

মঙ্গলকাব্যের যুগে চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "কবিকঙ্কণ" উপাধি ও কালিকামঙ্গল রচয়িতা বলরামের "কবিশেখর" উপাধি দেখা যায়।

পদাবলীর রচয়িতা-গণ যে কারণে "কবি" আখ্যা পাইতেন, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী ও দাঁড়া-কবিগানের রচয়িতা-গণ সেই একই কারণে "কবি" আখ্যা পাইতে পারেন।

বিশেষতঃ দাঁড়াকবিগানের রচয়িতাদের কৃতিত্বের পরিমাণ পাঁচালীগান রচয়িতাদের অপেক্ষা অধিক ও বহুমুখী বলিয়া "কবি" আখ্যা তাঁহাদের সর্বাংশে উপযোগী। এই-সকল কবির একাধারে সুর-লয়-তান-জ্ঞান, ছন্দ ও অলঙ্কারের জ্ঞান, রসজ্ঞান ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করিতে হইত বলিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে কবিত্বের সম্পূর্ণ রূপ খুঁজিয়া পাই।

কবি দুই জাতীয় হইত। এক পাঁচালীগানের কবি আর অন্যটি দাঁড়াকবি[৪]। পাঁচালীর কবি পঞ্চাবলীর সুর অনুযায়ী গান করিত এবং তাহাদের বিষয়বস্তু

---

১ কবয়তে ইতি কবিঃ

২ কবির্মনীষী পরিভূঃ—ঈশ ॥ ৮ ॥

৩ দুর্গম্‌পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—কঠ—২য় বল্লী।

৪ "দাঁড়া" শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা পদ্ধতি। দাঁড়াইয়া গাওয়া হইত বলিয়াই "দাঁড়া কবি" নাম হইয়াছে—এইরূপ উদ্ভট ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে পাঁচালী-তরজা-কবি ইত্যাদি সবই দাঁড়াইয়া গাওয়া হইত, বসিয়া কিংবা শুইয়া নয়।—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন

শাক্ত ও বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের যুগের শেষ ভাগে কথক ও পাঁচালী-কবিদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। দাঁড়াকবিরা অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালীন। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের বিষয় বিস্তৃততর ছিল ও গানের রীতি বা দাঁড়া বিষমধ্রুবা হইলেও সম্পূর্ণ পঞ্চাবলীর অনুসরণে নহে বরং বিমিশ্র। শ্রোতৃবর্গ পাঁচালীকবিকে "পায়ে চালি" কবিতে পরিবর্তিত করিয়াছিল। ইহা লোক-ব্যুৎপত্তির একটি উদাহরণ মাত্র। তাই দাঁড়াকবি বলিতে তাহারা অর্থ করিত "একস্থানে দাঁড়াইয়া যে কবি-গান গায়"। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তুইটি আখ্যার শব্দের ও অর্থের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়া যাওয়ায় দাঁড়াকবি বলিতে কেহ কেহ "কবিওয়ালা" শব্দের সৃষ্টি করিলেন। বলা বাহুল্য যে "কবিয়াল" শব্দ শুদ্ধ, যেহেতু তাহা সংস্কৃত "কবিপাল" বা "কবিপালক" হইতে উদ্ভূত। কিন্তু কবিওয়ালা এইরূপ কোনও শব্দ সৃষ্ট হইতে পারে না। "কবি" শব্দ সংস্কৃত বটে, "ওয়ালা" কিন্তু ফার্সী প্রত্যয়। সুতরাং তাহার পূর্বে শুধু কবি না থাকিয়া যদি "কবিগান" থাকিত অর্থাৎ "কবিগানওয়ালা" হইত, তবেই তাহা একটি শুদ্ধ মিশ্র শব্দ হিসাবে স্বীকৃত হইতে পারিত। আমি এই সঙ্কলনে যে "কবিওয়ালা" পদ প্রয়োগ করিয়াছি তাহার কারণ আমার পূর্ব্বগামিগণ এই পদটি ব্যবহার করিয়া—ইহাকে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় "কবিয়াল" পদ অপেক্ষা "কবিওয়ালা" পদটি সমধিক প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয়। তাই, যথার্থ ব্যুৎপত্তির কথা জানা থাকিলেও আমাকে এখানে প্রসিদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত লোকপ্রিয় পদটি ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

কবি-গানের আবির্ভাবকাল

প্রাচীন কবি-সংগীত বলিতে যাহা আমরা এই সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি তাহা বহুলাংশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লেখেন "১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল, গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন। *** লালুনন্দলাল, রঘু ও রামজী এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই-এর সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন।" গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে গুপ্ত কবি মহাশয় যে মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; ইহার কারণ প্রাচীনতম কবিয়াল গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাবকাল ১৪০ বা ১৫০ বৎসর

পূর্বেকার ধরিলে গোঁজলা গুঁইকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিয়াল বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ইহা একপ্রকার অসম্ভব—কারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি-গানের কোনওরূপ অস্তিত্বই ছিল না। উপরন্তু আমরা জানি যে রঘুনাথের শিষ্য রাসুর জন্মকাল, ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, নৃসিংহের ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং লালু-নন্দলালের শিষ্য নিতাই বৈরাগীর জন্মকাল ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা হইতে অনুমান করা যায় রঘু, লালু-নন্দলাল—এই তিনজন গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নিশ্চয় জীবিত ছিলেন। গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্যদ্বয় যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত থাকেন তবে তিনি সপ্তদশ শতাব্দী-যুগের লোক—ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? গোঁজলা গুঁই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন—ইহাই আমাদের ধারণা, এবং অনুমান এই যে কবিসঙ্গীতের প্রারম্ভকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই হইবে।[১]

প্রাচীনতম কবিয়াল গোঁজলা গুঁইয়ের তারিখ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হয়, তবে তখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে কবিগানের প্রবর্তন হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের বিশৃঙ্খলার যুগে কবিগানের উৎপত্তি মানিয়া লওয়া যায় না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র কলিকাতা শহরে ধনী ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গের গৃহপ্রাঙ্গণে কবিগান সীমাবদ্ধ ছিল এমন কথাও মানা যায় না।[২] কলিকাতার বাহিরে ফরাসডাঙ্গা বা চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, সপ্তগ্রাম ও বীরভূম-সিউড়ীতে যে কবিদের আখড়া ছিল ও কবিগান গাওয়া হইত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কবিগান যে ধনী, বিলাসী বাবুদের পশুবৃত্তির চরিতার্থতার উপাদানস্বরূপ একপ্রকার লঘু ও উত্তেজক সাহিত্য হিসাবে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাও কোন প্রকৃত তথ্য নহে।

কবিগানের উৎপত্তির পটভূমিকা

কলিকাতা শহরে ও শহরের বাহিরে ধনিমানী ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহে এই লোকসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন যেমন চিরকাল রাজা, মহারাজা ও সামন্তগণ কবি ও সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন।

---

১ History of Bengali Literature in the Nineteenth Century —p. 302—Dr. S. K. De

২ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি সংগীত ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত কবিগান বলিতে অশ্লীল সাহিত্যই যে বুঝায় এমন নহে ; ইহা ষড়ঙ্গ, অশ্লীল অংশ বা খেঁউড় ইহার অন্যতম অঙ্গ। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, দোল, দুর্গোৎসব, রাস-বারোয়ারি-উপলক্ষে কলিকাতা কেন, বাংলার সর্বত্র কবি-গাহনা হইত। লোকসাহিত্যের অন্যতম সংস্করণ বলিয়াই লোকোৎসবে, লোকসংস্কৃতিতে ও লোকপ্রমোদানুষ্ঠানে ইহার স্থান হইয়াছিল। আবার ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধির কারণ ইহার অন্তর্ভুক্ত তরজা ও খেঁউড় গান। লোক-সাহিত্য হইলেও ইহা কোন লঘু সাহিত্যের নিদর্শন নহে, বরং ইহার মধ্যে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারানুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ইহার ভাব ও বিষয়ের বিস্তার ও রসের গূঢ়তাও পরিলক্ষিত হয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, কবিগানের উৎপত্তি যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে হইয়াছিল, সে সময় সাহিত্য-রচনার পক্ষে যেমন খুব অনুকূল ছিল না তেমনি খুব প্রতিকূলও ছিল না। এ দেশে তখন পশ্চিম মহাদেশের বণিক্-জাতিগণ আসিয়া থাকিলেও মুসলমান নবাব-বাদশাহদিগের রাজত্বকাল চলিতেছিল কিন্তু অন্তর্বিপ্লবের শেষ ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া ছিল। তথাপি গ্রামের জনজীবন স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও শান্ত ছিল। শহরে লোকোৎসবগুলি বেশ জাঁকজমকেই সম্পন্ন হইত। দোল, দুর্গোৎসব, রাস-বারোয়ারি প্রভৃতি লোকপ্রমোদানুষ্ঠান-গুলি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইত। পূজার্চনাদি গৌণ হইয়া গিয়া আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানই মুখ্য স্থান লাভ করিত। পুতুলনাচ, সং, ভাঁড়নাচ, কবিগান, কৃষ্ণযাত্রাদি পাঁচ-ছয় দিন যাবৎ চলিত। ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে ইহার প্রসার ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে-স্থানে গঙ্গার দুই কূলে কাশিমবাজার, হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম ও সিউড়ীতে কবিদের আখড়া গজাইয়া উঠে। কবিগান দানা বাঁধিয়া উঠিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দেশে ঘোর বিপ্লব ও অরাজকতা দেখা দেয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজের কলিকাতা শহর আক্রমণ করেন ; ফলে নগরের শান্তি ব্যাহত হইল, চকিত পরাভূত ইংরাজ আলিনগরে নবাবের সহিত সন্ধি করিল। ইহার অত্যল্পকাল মধ্যে সন্ধি-ভঙ্গ করিয়া ইংরাজ নবাবের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া (১৭৫৭, জুন) পলাশির মাঠে সমবেত হইল। একদিনের যুদ্ধে নবাবের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল। শুধু নবাবের কেন সারা বাংলাদেশের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল।

ইহার পর কলিকাতা শহরের অভ্যুত্থান এবং ইহার কিছু আগে শ্রীরামপুর,

চন্দরনগরের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। চন্দরনগরের প্রসিদ্ধ জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একাধারে ভারতচন্দ্রের মত সাহিত্যিকের ও লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইংরাজের প্রভুত্ব-লাভের পর কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য জাঁকাইয়া উঠিতে যে নবীন অভিজাত-সম্প্রদায় শহরের উপর গড়িয়া উঠিল—যেমন, সভাবাজারের রাজবাটী, রামদুলাল সরকারের উত্তরাধিকারিগণ, কলুটোলার শীলেরা, বাগবাজারের বসুরা, হাটখোলার দত্তেরা, দর্জিপাড়ার মিত্রেরা—এই সময় হইতে তাহাদের আমোদপ্রমোদের অঙ্গস্বরূপ দোল-দুর্গোৎসব-রাস অনুষ্ঠানে কবি-গান গাহনার ব্যবস্থা করিয়া তদানীন্তন কবিদের প্রকাশ্যভাবে পোষকতা করিতে থাকেন। পাইকপাড়া ও কাশিম-বাজারের ভূস্বামিগণ কবিদিগকে সযত্নে পোষণ ও পালন করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্বে পড়ে বর্গীর হাঙ্গামার কাল (১৭৪০খ্রীঃ—১৭৫০খ্রীঃ)। বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বাঙ্গালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কি শহরে কি গ্রামে প্রায় দশ বৎসরের মত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে নবাব ও ইংরাজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রভাব বাঙ্গালীর জনজীবনের অন্তস্তল পর্যন্ত পৌছায় নাই। কিন্তু পোর্তুগীজ ও বর্গীদের অত্যাচারে বাংলার গ্রাম্য জীবন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দেশের সর্বত্র কি শিল্পে, কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, প্রাণবন্যায় ভাঁটা পড়িয়াছিল। এই সময়ে কবিগানেও সাময়িক ভাঁটা পড়ে। তখন প্রাচীন কবিয়াল রঘুনাথ দাস হইতে আরম্ভ করিয়া রামজীদাস পর্যন্ত অস্ত গিয়াছেন বা অস্তোন্মুখ। আসরে তখন নূতন নূতন কবি, রাসু-নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, ভবানী বণিক প্রভৃতির নাম শুনা যাইতেছে। ইহাদের পরবর্তী কালে রাম বসু, নীলু, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, এণ্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে পূর্ববঙ্গে কবিগান শুরু হয় কয়েকজন বিশিষ্ট কবির দ্বারা। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহের আমতলার লোচন কর্মকার, চাইরগতিয়ার হারাইল বিশ্বাস, তারাচাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ, ঘাটাইলের হরেকৃষ্ণ নাথ, কাশীপুরের লোকনাথ চক্রবর্তী ও শক্তিরাম কাপালী প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কি শহরে, কি গ্রামে উৎসব-অনুষ্ঠানে ও পালা-পার্বণে নানারকম আমোদপ্রমোদের রূপ বিকাশ পাইত। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন পর্যায়ের পালা-গান ও পটুয়া-সঙ্গীত অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের ঘটনা-

বিশেষ পয়ার ছন্দে সাধারণতঃ কবিতাকারে গাওয়া হইত। পটুয়ারা দৃশ্যের পর দৃশ্য তূলিকা ও বর্ণের সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া পটের পর পট উন্মুক্ত করিয়া লোককে দেখাইতে-দেখাইতে একপদী, দ্বিপদী বা ত্রিপদী পয়ারের ছন্দে গ্রথিত কবিতা সুর করিয়া গাহিয়া দর্শকদের মনোরঞ্জন করিত। এই-সকল পালার মধ্যে চণ্ডীর ছলনা, বেহুলার বাসর, সীতাহরণ, মায়ামৃগ-হত্যা, দাতা কর্ণ, সুভদ্রা-হরণ, কালীয়-দমন প্রভৃতি পালা থাকিত। পটুয়া-সঙ্গীত ও পালা-গানের আরও একটি রূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইহাই "সঙ্ গান" নামে পরিচিত। ইহা ঠিক পাঞ্জাবী "স্বঙ্" গানের অনুকরণ নয় বটে তথাপি অনুসরণ বলা চলে। পালা-পার্বণ বা উৎসব-উপলক্ষে পটুয়ারা নানারূপ পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া কোন উন্মুক্ত, প্রশস্ত স্থানে সাজাইয়া রাখিত। তাহার পর সেই-সকল পুত্তলিকার সম্মুখে হাত-পা নাড়িয়া ছড়া কাটা হইত বা গান গাওয়া হইত। অনেক সময়ে এই-সকল পুত্তলিকার অঙ্গ-সংস্থাপন, বেশভূষা হাস্য-উদ্রেকের কারণ হইত। আবার উহা ব্যঙ্গের মিশ্রণে অম্লমধুর হইয়া উঠিত। ইহার পাশাপাশি পর্ব বা পার্বণ-বিশেষে ঝুমুর-নাচ ও গান হইত যাহা হইতে পরবর্তী কালে ভাঁড় নাচের রূপ বিকাশ লাভ করে। একটি ছোট গান বা একটি গানের দুই কলি বাদ্যসহকারে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া গাহিত। ধর্মঠাকুরের গাজন ও চৈত্রের চড়ক উপলক্ষ্য করিয়া যে তর্জার চর্চা হইত তাহা খুব জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। দুর্গাপূজা, রাসযাত্রা-উপলক্ষে তখনকার সঙ্গীতজ্ঞরা প্রাচীন পাঁচালীগান গাহিতেন, সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকে কোনও আসরে বহু শ্রোতার সম্মুখে সামান্য বাদ্যধ্বনির সহিত সুরতানলয়-সহকারে এই পাঁচালীগান গাওয়া হইত। বৈষ্ণব-সাহিত্য, বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্য এবং পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচুর ভাববস্তু ইহার বিষয়বস্তু ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বিষমধ্রুবা পাঁচালীই কবিগানের প্রাক্তন রূপ। কালীয়-দমন, বিদ্যাসুন্দর, মনসার ভাসান প্রভৃতি যাত্রাগান বা নাটপালা তখনকার শ্রোতাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রমোদবস্তু ছিল। এ ছাড়া একাকী স্ত্রীলোকের গানকে খেমটা বা ঢপসঙ্গীত বলা হইত, তাহাও ইতর জনের কুরুচির পুষ্টি কম করিত না। কীর্তন বলিতে নামকীর্তন, রসকীর্তন লীলাকীর্তন-এর প্রচুর প্রচলন ছিল। বালক, স্ত্রীলোক ও ইতরদিগের সন্তোষ উৎপাদনার্থে পাঞ্চালিকা বা পুতুলনাচের পর্ব বা পার্বণ-উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা

সমসাময়িক বাংলা লোক-প্রমোদ

হইত। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, সপ্তশতী চণ্ডীর বিষয়বস্তু এই পুতুলনাচের পালা হইত। কলিকাতা, চন্দননগর, হুগলী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি শহরে ধনী, মানী ও অভিজাত ব্যক্তিগণ পর্ব-পার্বণ ও উৎসব-সময়ে পায়রা, বুলবুলি, ঘুড়ির প্রতিযোগিতা দেখিতে ভালবাসিতেন।

বাঙলা মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি হয়। ইহার উৎস বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-পদাবলী ও মালসী গান। তাই ইহার রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট দিক্ বা ধারা দেখিতে পাই—যেমন (১) সখীসংবাদ-গোষ্ঠ-গৌরচন্দ্রী, (২) মালসী-ডাকমালসী-লহরমালসী, আগমনী-বিজয়া, (৩) তরজা, (৪) খেঁউড়, (৫) আখড়াই ও (৬) বিচিত্র প্রসঙ্গ। কবিগান এই কয়েকটি বিভিন্ন ধারার সম্মিলিত লোকসাহিত্য বলিয়া ইহাকে ষড়ঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সখীসংবাদ ইত্যাদি হইতে আখড়াই পর্যন্ত ইহার প্রাচীন ঐতিহ্যের দিক্। সুতরাং এই পঞ্চাঙ্গকে প্রাচীন ধারা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, আর ইহার ষষ্ঠ অঙ্গ, যাহাকে বিচিত্র প্রসঙ্গ বা বিবিধ বিষয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে, তাহাই ইহার আধুনিক ধারা।

কবিগানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তন ও মায়ূর-মালসী গান মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তন যদি সহজিয়া পদাবলী কীর্তনের পরিবর্ত বা উত্তরসাধন হয় তবে তাহার প্রচলন শুরু হওয়ার কাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়। শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যগুলি হইতে মহাপ্রভু যেমন "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি" শুনিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায় তেমনি তিনি যে দলবল-সহ মর্দল-মন্দিরা-শিঙ্গা-সহযোগে নামকীর্তনও করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক। সুতরাং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকই হরিনাম-সঙ্কীর্তনের প্রথম প্রচলন কাল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর পদাবলী কীর্তনের যে বিভাগ, উপবিভাগ দাঁড়ায় তাহার রূপগুলি মোট (১) নাম-সঙ্কীর্তন, (২) লীলা-কীর্তন ও (৩) রস-কীর্তনে সীমাবদ্ধ। তিনি একাধারে "নিজ কান্তা-কান্তি-কলেবর" অথবা, রাধাদ্যুতি-সুবলিতকৃষ্ণস্বরূপ[১] বলিয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পদাবলী রচনা যেমন শুরু হয় তেমনি কীর্তনের পূর্বে তাঁহার নাম

১ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্—রূপগোস্বামী।

স্মরণ ও বন্দনা করা একটি রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই গৌরাঙ্গ-বন্দনাকে "গৌরচন্দ্রিকা" (ক্ষুদ্রার্থে ইকা প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে) বলা হয়। পরবর্তী কালে লীলাকীর্তনের মধ্যে 'ঝুমুর' অংশ সংযোজিত হয়।

পদাবলী-সাহিত্যে যে দূতী-সংবাদ, অক্রূর-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদের উদ্দেশ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বতন সাহিত্যের দূতী-সংবাদের বিস্তার মাত্র।

সখীসংবাদ-গোষ্ঠ-গৌরচন্দ্রী

নায়িকার দিক্ হইতে এক দূতী-সংবাদ হইতে সখী-সংবাদকে বিস্তার-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কেননা, দূতী যেমন সখীর নামান্তর, সখী তেমনি দূতীরও নামান্তর। অপরপক্ষে, নায়কের দিক্ হইতে অক্রূর-সংবাদ কি উদ্ধব-সংবাদ সমান সমর্থনযোগ্যই। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনতর সাহিত্যে উদ্ধব-সংবাদ ও নারদ-সংবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং নায়ক ও নায়িকার মিলন ও বিরহের ব্যাপার যত প্রাচীন এককথায় 'সংবাদ'-ও তত প্রাচীন। বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় এই সংবাদ-সাহিত্য-রূপ পদাবলী সাহিত্যে বা কবিগানে পদাকার গ্রহণ করিলেও ইহার ভঙ্গি নাটকীয়। ইহার অন্তর্নিহিত প্রশ্নোত্তর ও পরামর্শদানরূপ কথোপকথন নাট্যকাব্যের বা নাটকেরই অঙ্গ। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এ দূতী-সংবাদ বা সখীসংবাদ রহিয়াছে এবং সেখানে ইহার উপযোগিতা এইরূপই। উহার দ্বাদশটি সর্গের অন্তর্নিহিত চতুর্বিংশতিটি গান বা পদ বাদ দিলে যে অবশিষ্টটুকু থাকে তাহা সখীতে-সখীতে বা শ্রীরাধায় ও সখীতে কথোপকথন।* ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহ ও আসন্ন মিলন তাহার বিষয়বস্তু। সুতরাং ইহাকে দূতী-সংবাদ বা সখী-

* দেখিতে গেলে গীতগোবিন্দের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ। প্রথম সর্গে মূল গ্রন্থারম্ভ সখীসম্বাদে "রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী" ইহাতে জয়দেবের প্রসিদ্ধ সরস-বসন্ত-সময়-বর্ণন। প্রথম সর্গের দ্বিতীয় কল্পেও সখ্যুক্তিঃ "সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্।" ইহাতে শ্রীহরির রাস-বিলাস-বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গে, সখীর প্রতি রাধিকার উক্তি। ইহাকে সখীসম্বাদ বলা যায়। তৃতীয় সর্গে শ্রীহরির স্বগত বিলাপ। আবার চতুর্থ সর্গে শ্রীহরি সমীপে সখীসম্বাদ। পঞ্চমে, রাধিকার নিকট সখীসম্বাদ। ষষ্ঠে আবার শ্রীহরির নিকটে সখীসম্বাদ। এই তিনটিতে নায়ক-নায়িকার বিরহ বর্ণন। সপ্তমে রাধিকা স্বগতা, সপ্তমের দ্বিতীয় কল্পে সখীর প্রতি রাধিকা। শেষের শ্লোক কয়টি আবার স্বগত। অষ্টমে রাধাকৃষ্ণসম্বাদ। নবমে, সখীসম্বাদে রাধিকাকে প্রবোধ দান। দশমে শ্রীহরি কর্তৃক রাধিকার মান-ভঞ্জন। একাদশের প্রথম কল্পে, সখীসম্বাদে উপদেশ। একাদশের দ্বিতীয় কল্প হইতে দ্বাদশের শেষ পর্যন্ত মিলন। তাহাতেই বলিতেছিলাম জয়দেবের বার-আনা ভাগ সখীসম্বাদ। জয়দেব—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

সংবাদ ব্যতীত অন্য কি বলিব? আবার এই দূতী-সংবাদও কবি জয়দেবের নিজের উদ্ভাবন নহে; ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে গৃহীত। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি অধ্যায় মাত্রকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে তাঁহার প্রেম-কাব্যের বা খণ্ড-কাব্যের প্রথমে হেতুস্বরূপ রাখিয়া যে পদাবলী তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা এক মিলনান্ত নাট্যকাব্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। গীতগোবিন্দম্-এর উপসংহার অনুধাবন করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে ও প্রকাশ করিতে পারি যে কবিবন্ধু পরাশরও সঙ্গীতাভিজ্ঞ হওয়ায় এই নাট্য-কাব্যের রূপায়ণে যোগদান করিতেন।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন দূতকাব্যগুলিই বা কি? সংবাদরূপী নাট্য-কাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসরণে সৃষ্ট সেগুলি শ্রব্য-কাব্য নহে কি? পবনদূত, হংসদূত, মেঘদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি কাব্যের গঠনপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেই একই ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহ ও আসন্ন মিলনের জন্য পবন, হংস, কি মেঘকে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্যে নিযুক্ত করা হইতেছে মাত্র। তাহার পূর্ববর্তী মহাভারতে আমরা আখ্যানরূপে পাই কচ-দেবযানী-সংবাদ, দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-সংবাদ, শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি-সংবাদ, গজ-কচ্ছপ-গরুড়-সংবাদ, হরিবংশে পাই উষা-অনিরুদ্ধ-সংবাদ, শ্রীমদ্ভাগবতে পাই গজোদ্ধারণ-সংবাদ। কিন্তু ঋগ্বেদে এই সংবাদ-সাহিত্যের যথার্থ নাটকীয় রূপের উদ্দেশ পাই যম-যামী-সংবাদ-এ ও পুরুরবা-উর্বশী-সংবাদে। সেখানে কথোপকথনের ধারা ও পরিণতি সুস্পষ্ট নাট্যরূপের লক্ষণ-যুক্ত।

সখীসংবাদ, নারদ-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ, দূতী-সংবাদ প্রভৃতি যাহা আধুনিক কালের দাঁড়া-কবিগানে পাওয়া যাইতেছে তাহা কিন্তু আদৌ অর্বাচীন নহে। কবি-গানের অনেক কিছুই কীর্তনযোগ্য পদাবলী-সাহিত্য হইতে আসিয়াছে কিংবা সজ্ঞানে লওয়া হইয়াছে। পদাবলীর মধ্যে দূতী-সংবাদ বা সখীসংবাদ, অক্রূর-সংবাদ প্রভৃতির সহিত সকলেরই কমবেশী পরিচয় আছে। বিষয়বস্তুর দিক্ হইতে দূতী-সংবাদ ও সখীসংবাদ ভূত-বিরহ, ভবন-বিরহ, ভাবী-বিরহ ও আসন্ন-মিলন বিষয়ক আর অক্রূর-সংবাদ, আসন্ন বিরহ বা বিচ্ছেদ বিষয়ক। সুতরাং এই "সংবাদ" নামধারী নাট্যকাব্যের বা গীতিনাট্যের নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা ও প্রতিনায়িকা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্টসখী। সখীসংবাদ প্রকৃতপক্ষে সখীতে-সখীতে বা শ্রীরাধা ও সখীতে কথোপকথন। তাহার মধ্যে প্রশ্নোত্তর, পরামর্শ ও সংবাদ প্রদানই

থাকিত। আর দূতী-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীতে কথোপকথন ও তাহার মধ্যে প্রশ্নোত্তর, পরামর্শদান ও সংবাদ-প্রদান থাকিত। দাঁড়া-কবিগান লোকসাহিত্য হইলেও ইহার বিশিষ্ট একটি দিক্ বা অংশস্বরূপ সখী-সংবাদ পদাবলীরূপ লিখিত সাহিত্যের মূল ভাবধারার উত্তরাধিকারী মাত্র।

দাঁড়া-কবিগানে সংস্কৃত পদাবলীর দূতীসংবাদ ও ব্রজবুলী তথা বাংলা পদাবলীর সখীসংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ ও অক্রূর-সংবাদ এক সখীসংবাদ পর্যায়ে পড়িয়া দীর্ঘায়তন লাভ করিল এবং তাহা গাহিবার রীতি বা দাঁড়া ভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়ায় মহড়া বা মুখ, চিতান, পরচিতান, খাদ, ফুকা, ধুয়া, পড়তা, মেলতা প্রভৃতিতে বিভক্ত হইল।

আর পদাবলীর বিভিন্ন বিষয় যথা পূর্বরাগ, অনুরাগ (রূপানুরাগ), নৌকা-বিলাস, প্রভাতী (বা ভোর) বা খণ্ডিতা, বসন্ত, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা, আক্ষেপানুরাগ, মানভঞ্জন, কলঙ্ক, কলঙ্কভঞ্জন, কৃষ্ণ-কালী-সংবাদ, বিরহ, মাথুর, প্রভাস, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি এক সখীসংবাদ আখ্যার অধীন হইল।* ফলে দাঁড়া-কবিগানের সখীসংবাদ পর্যায় প্রাক্তন বাংলা ও ব্রজবুলী পদাবলী-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলন-ভাবের প্রীতি-বিষাদ-ঈর্ষা-বিস্ময়ের উত্তরাধিকারী প্রতিনিধিস্থানীয় লোকসাহিত্যিক রূপ লাভ করিল।

দাঁড়া-কবিগানের সখীসংবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে, সুতরাং ইহার কারণ আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। সখীসংবাদ পর্যায়ে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, বিরহ ও মাথুর-বিষয়ক গানই সর্বাধিক। ইহার আভ্যন্তরীণ কারণ ইহা করুণ-রসাশ্রিত ও বাকোবাক্যের ভাব মিশ্রিত। আর, ইহার বাহ্য কারণ তখনকার দিনে কবি-গানের শ্রোতারা সখীসংবাদই এবং সখীসংবাদ বলিতে মাথুর ও বিরহ-বিষয়ক

*পূর্বরাগ—রাম বসু। আজু সখি এ কি রূপ
নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির
সৌদামিনী প্রায়।
ঢেউ দিও না কেউ
এ জলে বলে কিশোরী
নয়নে দাগা দিলে
হইবে সই পাতকী॥ পৃঃ ১৮০

গানগুলি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। বিষয়-হিসাবে মাথুর ও বিরহ ঠিক এক নহে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, মথুরায় রাজা হওয়া, কুব্জার সহিত মিলিত হওয়া, অক্রূরের গমনাগমন, বৃন্দার গমনাগমন ও সংবাদ আদানপ্রদান লইয়াই মাথুর বিষয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অক্রূর-রূপ দুর্নিমিত্তকে দেখিয়া বৃন্দাবনে গোপীগণের দুশ্চিন্তা, অক্রূরকে ফিরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা, তাহার সহিত এই বিষয় লইয়া কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় যাইতে গোপীগণের নিষেধ ও বাধাপ্রদান আবার মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দার গমন, রাধার বিরহের কথা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস ও সেই আশ্বাস লইয়া বৃন্দার রাধার সমীপে গমন ও সংবাদ প্রদান প্রভৃতির মধ্যে বাকোবাক্যের ভাব থাকিয়া যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাথুর-গান মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-বিষয়ক। অথচ বিরহ-বিষয়ক গান

পূর্বরাগ—হরু ঠাকুর— কদম্বতলে কে গো বাঁশী বাজায়
এতদিনো আসি যমুনা জলে
আমি এমনো মোহনো মুরতি কখনো
দেখিনি এসে হেথায়॥ পৃঃ ৮০

নৌকাবিলাস— „ অকূলো পাথারেতে
ডোবে নৌকা রাখ ওহে রাধানাথ, পৃঃ ৮৪

প্রভাতী—রাসু-নৃসিংহ— প্রাণনাথ মোরো সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপ দরশনো আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে। পৃঃ ৭১

বসন্ত—রাম বসু— এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে পৃঃ ২৫০

অভিসার—লালু— ও কি অপরূপ দেখি শুনি
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী পৃঃ ৪৮

বাসরসজ্জা—রামকানাই— শ্যাম আসার আশা পেয়ে
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী পৃঃ ৩৮৭

মান—রাম বসু— মান কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে
আমি যে দিকে ফিরে চাই
সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই
সজল আঁখি জলধর বরণে॥ পৃঃ ১৮৪

ঠিক এরূপ নহে। তাহা শ্রীরাধার সাধারণ-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে থাকিতে শ্রীমতী বহুবার এই বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন সকল ঋতুতেই এই বিরহ ঘটা সম্ভবপর হইত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে শ্রীমতী যখনই বেদনা অনুভব করিতেছেন, তখনই বিরহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে না আসিলে শ্রীরাধার বিরহ-ভাব। তাহার শরীরে ও মনে নানা বিকার দেখা যাইতেছে। শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া মিলাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেছেন ও শ্রীরাধার সমীপে সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছেন। মোটা-

মানভিক্ষা—গদাধর— রাধার মানানল দগ্ধ করে জীবনে
সাধে সাধি ধারে, সখি! সকাতরে রাধার পায়
রাধার মানরূপ দাবানল
দহিল হৃদ্-কমল
বাক্য জল পেলে জীবন জুড়ায়। পৃঃ ৩৩৫

আক্ষেপানুরাগ—হরু ঠাকুর—আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম্
শ্যামেরো পীরিতো, গরল মিশ্রিতো
কার মুখে যদি শুনিতেম্ ॥
কুলবতী বালা হৈয়া সরলা পৃঃ ৮৯

" ঈশ্বর— কাল ভালবেসে হ'ল এই যাতনা
আগে মানি নাই কালা
কালে জানি নাই কালা
আর কালবরণ, নাহি হেরিব চোখে
মাথায় কাল কেশ ধরব না ;
কুঞ্জে কালসখী রাখব না
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না। বাঃ গাঃ পৃঃ ২৭৫

কলঙ্কভঞ্জন—পরাণ সিংহ— দেখ দেখ হে শ্যাম
রাখ রাখ হে দাসীর সম্মান
এ গোকুলে—
নারীর মধ্যে যে সতী আমি
সকলি জান তুমি
দীননাথ হে, কেন কর বঞ্চনা হে
ছিদ্র কুম্ভেতে বারি
যদি না নিতে পারি
তবু যমুনায় মরিব হরি হরি বলে॥ পৃঃ ৩৬৭

মূটিভাবে ইহা বিরহের মূল কথা। তাই দাঁড়া-কবিগণের হিসাবে মান, কলঙ্ক, কলহান্তরিতা, কলঙ্কভঞ্জন, খণ্ডিতা প্রভৃতি বিষয় অনুসঙ্গ-প্রসঙ্গরূপে এক সখীসংবাদের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

দাঁড়া-কবিগানের সখীসংবাদ-পর্যায় ছাড়া পদাবলী-সাহিত্যের ভাবধারা আরও দুইটি পর্যায়ে পড়ে, যথা—গোষ্ঠ ও গৌরচন্দ্রী। গোষ্ঠলীলা বা বাল্যলীলা পর্যায়ে পড়ে দাঁড়া-কবিগানের গোষ্ঠলীলা বা গোষ্ঠবিহার। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, অক্রূর-দর্শনে যশোদার খেদ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।

গোষ্ঠ

বাৎসল্য-রসকে কেন্দ্র করিয়া গোষ্ঠের দুইটি বিভাগ দাঁড়াইয়াছিল। একটি পূর্ব-গোষ্ঠ ও অপরটি উত্তর-গোষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা শ্রীকৃষ্ণকে ধড়া-চূড়া বাঁধিয়া হাতে বাঁশী দিয়া ও বলরামকে সঙ্গে দিয়া যমুনার তীরে গোচারণে পাঠাইতেন। বিপদ্ প্রায়ই ঘটিত; অঘাসুর, বকাসুর, ধেনুকাসুর প্রভৃতির সহিত তাহার প্রায়ই যুদ্ধ হইত। তাই একমাত্র পুত্রের মাতা যশোদার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত সংবাদ। দুশ্চিন্তার বশবর্তিনী হইয়াই মাতা যশোদা যে নানারূপ খেদ করিতেন এবং তাহার পক্ষে যেরূপ আক্ষেপ করা স্বাভাবিক বোধ হইত তাহাই কবিগানের গোষ্ঠবিভাগের পূর্ব পর্যায়। বেলার শেষে গরু চরান শেষ করিয়া শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে

কৃষ্ণকালীসংবাদ—লালু— কি আশ্চর্য্য কি মাধুর্য্য হেরিলাম কাননের মাঝে
ঐ নীরদবরণী ধনী কে গো নীলশতদল বিরাজে। পৃঃ ৪২

" " কই গো কুটীলে বলে দেখাও আজ সেই বনমালী
আর সেই কালী করে ধরে বাঁশী
মুখেতে হাসি, ঝরে কত সুধারাশি পৃঃ ৪৩

বিরহ—কৈলাস— বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান
কাজ নাই বেশভূষণে কৃষ্ণ বিনে এখনি ত্যজিব প্রাণ। পৃঃ ৪১৬

মাথুর—গদাধর— এসে মাধবের মধুধাম
কৃষ্ণপদে প্রণাম করিয়ে দূতী কয়। পৃঃ ৩৪৫

প্রভাস—আনন্দ সরকার— নারদ মুখে পেয়ে বার্ত্তা করলেন যাত্রা।
গোপ-গোপীগণ। পৃঃ ৪১০

প্রেমবৈচিত্ত্য—বলহরি দাস—'রাই' বলে রাই করিছে রোদন
ঐ বসে কৃষ্ণের বামেতে। পৃঃ ১২৫

নিরাপদে ফিরিতেছেন এইরূপ দেখার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন যে উৎকণ্ঠিতা যশোদা মাতা, তিনি উত্তর-গোষ্ঠের গোপালকে কাছে লইয়া আদর, সোহাগ, চুম্বন ইত্যাদির সঙ্গে যে আক্ষেপ-মিশ্রিত আনন্দ-বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিতেন, স্নেহের পুত্তলীর ধড়াচূড়া খুলিয়া দিয়া ক্ষুধার কথা ভাবিয়া যে খাদ্যের আয়োজন করিতেন, দৈব দুর্বিপাক স্মরণে মনে যে সঙ্কল্প-বিকল্পের উদয় হইত—সেই সকল ভাব লইয়াই কবিগণের গোষ্ঠ-বিভাগের উত্তর-গোষ্ঠ-পর্যায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত একই গোষ্ঠ-বিভাগে শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, দৈবকীর খেদ, যশোদার সহিত অক্রূরের বাক্যালাপ প্রভৃতিও পড়ে।

গৌরচন্দ্রী

আর গৌরচন্দ্রী-পর্যায়ে কীর্তনের গৌরাঙ্গ-বন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকাই দেখা যায়। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তিনি একাধারে নিজ "কান্তা-কান্তি-কলেবর," "রাধা-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" ও "সঙ্কীর্তনৈক পিতা" বলিয়া খেতুরের মহাসম্মেলন হইতেই কীর্তনের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ-আবাহন ও বন্দনা রীতি হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীচৈতন্যজীবনী-সাহিত্যে এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়, যাহা এই রীতির পোষকতা করে; তাহা এই যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন "যাঁহা নাম তাঁহা কৃষ্ণ" এবং যেখানে যখনই নাম-সঙ্কীর্তন হইবে সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিবেন। তাই পরবর্তী কালে কীর্তনীয়ারা সর্বত্র যে গৌরবন্দনা সঙ্কীর্তনের পূর্বে করিয়া থাকেন, তাহা "গৌরচন্দ্রিকা" নামে আখ্যাত হয়। পরবর্তী কালে ইহার অর্থ সাধারণের নিকট ভূমিকাস্বরূপ প্রতীয়মান হয় বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর কথাবার্তায় "গৌরচন্দ্রিকা" শব্দটি অন্য অর্থে ভূমিকা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। দাঁড়া-কবিগানে কিন্তু স্পষ্টতঃ কীর্তনের ও কীর্তনীয়াদের অনুসরণ-রূপ ব্যাপার গৌরচন্দ্রীতে দেখা যায়। গৌরচন্দ্রী বলিতে শ্রীচৈতন্য-বন্দনা বা গৌরাঙ্গ-বন্দনাই আমরা দেখিতে পাই। গানে সাফল্য লাভের আশায় কোন-কোন কবি কখনও কখনও "গৌরচন্দ্রী" গাহিয়া কবিগান আরম্ভ করেন।

মালসী-ডাকমালসী-লহরমালসী-আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত

চণ্ডীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি আখ্যায়িকামূলক মঙ্গলকাব্যের রচনার ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে খণ্ডগীতি-কাব্য রচনার মধ্যে লীন হয় এবং এই খণ্ডগীতিগুলি "মালসী" নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। এই মালসী গান পরবর্তী যুগে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতে। কন্যার প্রতি মাতার স্নেহ যেমন

উমাসঙ্গীতের প্রকৃতি, তেমনি মাতার জন্য পুত্রের আকুতি, দর্শনাকাঙ্ক্ষা, খেদ প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীতের প্রকৃতি।

মালসী-জাতীয় গানের অন্তর্ভুক্ত উমাবিষয়ক শাক্ত-পদাবলীর মূল বাৎসল্য-রস হইলেও তাহা রূপায়িত হইয়াছে আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের সঙ্গীতে। মাতা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে ধরিয়া কন্যাকে আনিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছেন, অথবা আগতা উমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, হরের উদ্দেশে মেনকা আক্ষেপ ও উষ্মা প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা উমাকে দেখিয়া উল্লাস করিতেছেন, আবার কখনও লোকমুখে শোনা উমার দুর্দশার কাহিনী স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন অথবা উমার অঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্নস্বরূপ মলিনতা দেখিয়া বিলাপ করিতেছেন, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে কন্যার বর্ষান্তে পিতৃগৃহে অবস্থিতি দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া নিশ্চিন্ত ও কতকটা সুস্থির হইয়া দেবীর জননী আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, আবার নবমী ও বিজয়া-দশমীর দিনে কন্যার কৈলাস-গমন আসন্ন বুঝিয়া মাতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত হইতেছেন ও কন্যার বিদায়-লগ্নটিতে তিনি বিষণ্ণ প্রতিমায় পরিণত হইয়া শোক ও আক্ষেপ করিতেছেন। এই ধরণের সঙ্গীতগুলির চারিটী বিভাগই কবিগানে পাওয়া যায়, যথা—(১) আগমনী, (২) সপ্তমী, (৩) নবমী ও (৪) দশমী বা বিজয়া।

বৎসরান্তে উমা পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, মা মেনকার আনন্দের সীমা নাই। আগমনী-সঙ্গীতে উমার আগমন-উপলক্ষে মেনকার এই আনন্দোচ্ছ্বাসই ব্যক্ত দেখা যায়।

রামপ্রসাদের আগমনী গানের তুলনায় দেখা যায় অল্পকাল ব্যবধানে কবি-গানের ভাবধারা সমান থাকিলেও গাহিবার ধরণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। গানগুলিও আকারে কিছুটা দীর্ঘতা লাভ করিয়াছে, যেমন—

রামবসু—(১) গত নিশিযোগে আমি হে দেখিছি সুস্বপন
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই
মা কই আমার দাও দেখা দুখিনীরে। ইত্যাদি

(২) গিরি হে তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী
যাও হে একবার কৈলাসপুরে। ইত্যাদি

(৩) একবার আয় উমা, তোমারে মা করি গো কোলে।
বিধুমুখি ওগো জননি ডাকো জননী ব'লে

তুমি ত ভাব না মা ব'লে
তোমা বিনে যে দুখ গেছে
সে সব কথা কব উমা তোমারই কাছে।
বর্ষাবধি পরে যদি অঙ্গনে দেখা দিলে ॥

দ্বিতীয় স্তর বা পর্বের গানগুলি সপ্তমীর। এই গানগুলিতে গিরিরাণী মেনকার কতকটা নিশ্চিন্ত ভাব এবং গৃহে উমার আগমন ও অবস্থিতির দরুন স্বাভাবিক প্রফুল্লতা সূচিত হইয়াছে, যেমন—

(১) শুভ সপ্তমীতে শুভযোগেতে উমা এলেন হিমালয়।
করে নিরীক্ষণ চক্ষে হেরে চাঁদবদন,
অভয়ায় গিরিরাণী কয়—
আয় মা পূর্ণশশী স্বর্ণশশী বিধি আমায় দিয়েছে।
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা ব'লে
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে। ইত্যাদি (হরু ঠাকুর)

(২) উমা গো যদি দয়া করে হিমপুরে এলি
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে
শোকের পাষাণ বক্ষে ধরে
আছি শূন্য ঘরে। (উদয়চাঁদ)

তৃতীয় স্তর বা পর্বের গান নবমীকে কেন্দ্র করিয়া। তাহাতে আসন্ন বিদায়-বেদনার ও উৎকণ্ঠার ভাব পরিব্যক্ত। কন্যাস্নেহান্ধ মাতৃচিত্তের চঞ্চলতা ও দ্বিধা বিমিশ্ররূপে পরিস্ফুট, যেমন—

(১) মেনকা কয় হে শুন ওহে গিরিরাজন,
এই রজনী গেলে প্রভাতকালে
কাল সকালে আসবেন ত্রিলোচন।
তবে লয়ে যাবে উমাধনে
সেই কৈলাস ভবনে। (সারদা ভাণ্ডারী)

(২) হেরে নবমীর রজনী কহিছেন রাণী
শুনরে সুখের শর্বরি,
হৃদি বিদীর্ণ জীবন হয় শূন্য
ওরে রজনী মিনতি করি ॥ (সারদা ভাণ্ডারী)

চতুর্থ স্তর বা পর্বের গান বিজয়া-দশমীকে কেন্দ্র করিয়া স্বাভাবিক বিদায়ের বেদনার মূর্ছনা-জড়িত। কন্যা উমা বা গৌরীর বিদায়-লগ্ন আসন্ন, তাই মাতা মেনকার আক্ষেপের আর অন্ত নাই। বর্ষান্তে দিন কয়েকের জন্য মাত্র পিত্রালয়ে উমা আসিয়াছিলেন, এখন চলিয়া যাইবেন, ফলে আর এক বৎসর তাঁহার আসার পথ চাহিয়া থাকিতে হইবে। স্বয়ং জামাতা মহাদেব আসিয়া গণেশজননীকে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়াও যায় না। তাই হতাশা বা নিরাশার ঝড় মাতৃবক্ষপঞ্জরের মধ্যে যে বিষম আলোড়ন তুলিয়াছে তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই—

(১) হোল নবমী যামিনী গত দশমী উদয়
গিরিবর হয়ে সকাতর অভয়ারে কয়—
আমার মা তুমি গো ত্রিপুরেশ্বরী
তব পিতা আমি গৌরী
কৃপা করি ডাক পিতা বলে। ইত্যাদি (বলহরি)

(২) আমার প্রাণ উমা
আজ কি তুই যাবি গো মা
কৈলাসপুরে? ইত্যাদি (কৃষ্ণলাল)

কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে প্রাক্তন লিখিত সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে আগমনী-বিজয়া-পর্যায়ের গান একমাত্র মালসী আখ্যাতেই অভিহিত হইত। দাঁড়া-কবিগানের মধ্যে যে পরিবর্তনটুকু ঘটিয়াছে তাহা এই যে, আগমনী-বিজয়া-পর্যায়ের গানগুলি "আগমনী", "সপ্তমী", "নবমী", "বিজয়া" আখ্যা দ্বারা সূচিত হইতেছে, তাহাদের গাহিবার রীতি বা দাঁড়া অন্যান্য দাঁড়া-কবিগানের মতই মহড়া, চিতান, পরচিতান, খাদ, ফুঁকা, ধুয়া, মেলতা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত এবং মূল ভাবের দিক্ দিয়া মালসীর উত্তরাধিকারিত্ব বজায় থাকিলেও তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে, যেন কিছুটা ঘন ও জটিল হইয়াছে। আর "মালসী" নামে আখ্যাত দাঁড়া-কবিগানগুলি "মালসী" আখ্যা ছাড়াও "লহর-মালসী" ও "ডাক-মালসী" বলিয়া দুটি উপবিভাগে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। কবিদের মালসীর মধ্যে তারা বা দুর্গা-নামের উল্লেখ ও মঙ্গলকাব্য ও পুরাণোক্ত দেবী-লীলার, বিবিধ প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া দেওয়া ও অবশেষে মাহাত্ম্য বর্ণনা-ই মোটামুটি লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আকারে বা আয়তনে মালসী-গান

দীর্ঘ বা দীর্ঘতর এবং দাঁড়াকবিগানের সঙ্গীত-রীতি দেবীকে ডাকিয়া তাঁহাকে তাঁহার মাহাত্ম্য গাহিয়া শোনানই লক্ষ্য ছিল। দাঁড়া-কবিগানের গাহিবার রীতির বা ধারার সব কয়টি বিভাগে উহা বিভক্ত নয়। লহর-মালসী ডাক-মালসীরই রূপান্তর, আকারে সংক্ষিপ্ত বা নাতিদীর্ঘ, ফলে সব কয়টি সঙ্গীত-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়। লহর অর্থাৎ লড়াইএর প্রয়োগ বা উপযোগের জন্যই সম্ভবতঃ ইহার এইরূপ নামকরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে ডাক-মালসী, লহর-মালসী ও মালসীর রূপ উদ্ধৃত করিলাম—

(১) ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনি
কাতর কিঙ্করে হের হরমনোমোহিনি।
কঙ্কালী, করুণাময়ী
কুলকুণ্ডলিনী অয়ি
গিরিজা গণেশজননী (মাগো) (দর্পনারায়ণ, পৃঃ ৩৭৯)

(২) তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা
বেদে শুনতে পাই (কানাই, পৃঃ ৩৬১)

(৩) রসনাতে দুর্গা নাম বলো আমার মন রে
বৃথা কাজে দিন গত হলো।
ডুবু ডুবু হলো ভরা ঘোর তরঙ্গ দেখে ত্বরা
হাঁফ ছেড়ে কাণ্ডারী যারা ভয়ে পালালো
চেয়ে দেখ দেখি রে ওরে ভোলা মন
নিকটে শমন দাঁড়ালো॥

অবশ্য, ভালভাবে লক্ষ্য করিলে ভাবসংমিশ্রণও লক্ষিত হয়। ফলে আগমনীর গানে মালসীর প্রকৃতি, ডাক-মালসীতে মালসীর ভাব, মালসীতে ডাক-মালসীর ভাব, ডাক-মালসীর আয়তন-বৃদ্ধি প্রভৃতি বৈচিত্র্যও চক্ষে পড়ে। কিন্তু মোটামুটি বিভাগ গানগুলির লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী উপরি-উক্ত মত বটেই।

আরবী ভাষায় "তর্জ", "লফ্জ্" প্রভৃতি শব্দ ফারসী ভাষাতেও প্রচলিত থাকায়, তথা "তরজমা", "তরজীহ" প্রভৃতি যৌগিক শব্দ পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রমোদের অঙ্গস্বরূপ তরজা

মূলতঃ আরবী শব্দ। একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এই অনুমানকে সত্য বলিয়া ধারণা করা দুষ্কর হয়। প্রাচীন বাংলায় চড়ক ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে যে "আর্যা ও তরজা" ও "তর্জন-গর্জন"-রূপ প্রমোদানুশীলন হইত তাহা শ্লেষ ও রসগানেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজিও এদেশে চড়কের সময়ে ও ধর্মঠাকুরের উৎসবে তরজার অনুশীলন হয় এবং "গাজন" বলিতে "মায়ুর গান" গাওয়া হয়। এখানে কিন্তু "তরজা" শব্দের প্রয়োগ এখনও প্রশ্নোত্তরে হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা অর্থে, তর্কচ্ছলে শ্লেষ এমন অর্থও হয়। আরবীতে কিন্তু "তরজমা" শব্দ অনুবাদ অর্থে ও "তরাজুমানা" শব্দ দোভাষী অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং মূল "তরজ্" শব্দের অর্থ—রীতি বা নিয়ম। মোট কথা আরবী "তরজ্" শব্দ অন্য শব্দের দ্বারা গঠিত অন্যান্য যৌগিক শব্দগুলির কোন একটিও তর্ক বা বাকোবাক্য বুঝায় না। হিন্দীতে "তরজ্না" শব্দ শ্লেষ বা অভিযোগ অর্থে প্রযুক্ত হয়। উপরন্তু কবিগানে প্রায়শঃ ব্যবহৃত তরজাবাচক "কবির লহর"-এর "লহর" শব্দও হিন্দী "লহ্রাই" হইতে আসিয়াছে বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। উহা সংস্কৃত "লহর" শব্দ নয়, কেননা, সংস্কৃত "লহর" শব্দ হইলে "কবিগানের লহর" আখ্যা দাঁড়াইত। হিন্দী "লহ্রাই" হইতে বাংলায়, পূর্বোক্ত "লহর" ছাড়াও, "লড়াই" শব্দ রহিয়া গিয়াছে। ফলে "কবির লহর" আখ্যার দ্বারা কবিতে কবিতে লড়াই বা বাগ্‌যুদ্ধ স্পষ্ট এই অর্থ বুঝা যায়। সেই হিসাবে হিন্দী "তরজ্না" কি বাংলা "তরজা" শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ধারণা করিতে আমরা বাধ্য। তদনুসারে তরজা শব্দের উৎপত্তি-মূল খুঁজিতে গেলে আমরা পাই "তরজা-ই" (=হিন্দী "তরজ্না") বা তর্কায়িত। তর্কায়িত শব্দের অর্থ হয় তর্কের বীজ বা তর্কের ভাবযুক্ত প্রসঙ্গ, অর্থাৎ বাকোবাক্য। সুতরাং সংস্কৃত "তর্জন"-এর কলেবরে কালক্রমে হিন্দী আ-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া "তরজ্না" শব্দ গঠিত হইলেও বাংলা "তরজা" শব্দের মূল হয় "তর্কায়িত" সংস্কৃত শব্দ, নয়ত, আর্যার প্রভাবে পড়িয়া তর্জ+আ="তর্জা" বা "তরজা" শব্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কবির লড়াই —তরজা

একটি প্রাচীন তরজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে :—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

ইহা কিন্তু তরজার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ রূপ নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি সমস্যা বা প্রহেলিকা যাহাকে লোকে সাধারণতঃ হেঁয়ালি বলিয়া থাকে। কবিগানের আসরে এইরূপ জিনিস প্রযুক্ত হইলে তাহাকে চাপান অংশ বলিয়া গণ্য করা হইত। তথাপি কাটান বা উতোর অংশ বাকী থাকিয়া যায়। আমাদের বক্তব্য এই যে চাপান ও উতোর দুইদিক্ হইতে এই দুই অংশ মিলিয়া তরজা সম্পূর্ণ হয়।

তরজার পূর্বরূপ ছিল প্রকৃতপক্ষে বাকোবাক্য। বাকোবাক্য বলিতে বাগ্‌যুদ্ধ বুঝায়। কবিতে কবিতে কিংবা পণ্ডিতে পণ্ডিতে সেকালে রাজসভায় অথবা পঞ্চজনের উপস্থিতিতে চাপান ও উতোর রূপে বাগ্‌যুদ্ধ চলিত। এই বাগযুদ্ধে প্রচুর শ্লেষ থাকিত। একপক্ষ শ্লেষ প্রয়োগ করিলে অপরপক্ষকে তাহার অর্থ-নিষ্কর্ষ করিয়া দিতে হইত এবং স্থলবিশেষে সেও শ্লেষ প্রয়োগ করিত। তাহার উত্তর আবার প্রথম পক্ষকে দিতে হইত। এইভাবে যে বাগ্‌যুদ্ধের ধারা গড়াইয়া চলিতে থাকিত তাহার মধ্যে বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই পরিচয় থাকিত। এই কারণেই সেকালের বাকোবাক্য বুদ্ধিজীবী ও রসজ্ঞ সহৃদয়গণের বিশেষ উপভোগ্য বস্তু ছিল। আবার পণ্ডিতগণের তুলনায় কবিগণ কিছুটা বাক্‌চতুর ও রসজ্ঞ হইতেন, এ ছাড়া তাঁহারা ছন্দোগ্রন্থনেও নিপুণ হইতেন। তাই কবির লহর বা কবির লড়াই আরও উপভোগ্য হইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এতদ্দেশে কবির লড়াই চলিয়া আসিতেছে। গল্পে পাই—মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাস ও দণ্ডীর কবিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন সম্মুখস্থিত একটি কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া কবি দণ্ডীকে প্রশ্ন করিলেন, উহা কি? দণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"। তখন তিনি কালিদাসকে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিতে কালিদাস তাহার উত্তর দিলেন—"নীরসঃ তরুবরঃ পুরতো ভাতি"। ফলে কালিদাসের কবি-হিসাবে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়া গেল। আরও একটি গল্প পাওয়া যায়—একবার বিক্রমাদিত্যের সভায় রাক্ষস-নামে এক কবি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যে ভাষায় প্রশ্ন করিবেন যথাযথ সেই ভাষায় উত্তর দিতে পারিবেন এমন কোন কবি মহারাজের সভায় আছেন কিনা। বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে দেখাইয়া দিলেন। কালিদাস রাক্ষস-কবির প্রস্তাব মানিয়া লইয়া উত্তর দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন রাক্ষস-কবি প্রশ্ন করিলেন—

"কম্ বলবন্তং ন বাধতে শীতঃ"। কালিদাস উত্তর দিলেন—"কম্বলবন্তং ন বাধতে শীতঃ"। রাক্ষস-কবি আবার প্রশ্ন করিলেন "কা শীতলা প্রবাহিণী গঙ্গা"। কালিদাস উত্তর দিলেন"—"কাশীতলা-প্রবাহিণী গঙ্গা"। রাক্ষস-কবি প্রশ্ন করিলেন—"কা মধুরা"। কালিদাস উত্তর দিলেন—"কামধুরা"। শোনা যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেব গোস্বামী, কবি ধোয়ী, শরণদেব, উমাপতি ধর ও গোবর্ধনাচার্যের মধ্যে পরস্পর বাগযুদ্ধ চলিত। এমনকি, কবিগানের প্রথম প্রবর্তনের যুগে বা প্রবর্তনের অল্প পূর্বযুগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পরিপোষিত হালিশহর-নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোঁসাই-এর মধ্যে যে বাগ্‌যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলে কবির লড়াই বা তরজার কথাই মনে পড়িয়া যায় ; যেমন—

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥"

আজু গোঁসাই ইহার উত্তরে গাহিলেন—

"ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি
দম্ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥"

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"এ সংসার ধোকার টাটি"—

আজু গোঁসাই উত্তর দিলেন—

"এ সংসার রসের কুটি
হেথা খাই-দাই আর মজা লুটি।"

রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥"

আজু গোঁসাই উত্তর দিলেন—

"কেন মন বেড়াতে যাবি ?
কারও কথায় যাসনে কোথায়ও
মাঠের মাঝে মারা যাবি।"

রামপ্রসাদ শেষে বাগ্‌যুদ্ধের সমাধান করিলেন এই বলিয়া—

মন কোরোনা দ্বেষাদ্বেষি
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণেতে করলাম কত খোঁজতল্লাসী
ওরে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সবই আমার এলোকেশী॥

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পর্বকাল পযন্ত বাকোবাক্যের যে রূপ বা ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের পথ হইতে যেমন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই তেমনি তাহার মানের উন্নতিও কিছুমাত্র ঘটে নাই। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর বাকোবাক্যের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে উহা ভণিতাচ্ছলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের কথা-কাটাকাটি মাত্র। ইহাতে শ্লেষ-গন্ধ থাকিলেও তখনও পর্যন্ত অশ্লীলতার আভাস মাত্র ছিল না। কবিগানের প্রাচীন অবস্থায়, অর্থাৎ পাঁচালী কবিগান যখন পর্যন্ত দাঁড়া-কবিগান হইতে পৃথক্ হইয়া যায় নাই, বাকোবাক্য বা তরজা বোধ হয় এইরূপ কথা-কাটাকাটি-পূর্ণ ছড়ায় ও গানেই নিবদ্ধ ছিল। চৈত্রের চড়কে কি ধর্মঠাকুরের গাজনে তরজার এই ছড়া ও গানের রূপটিই বজায় ছিল বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া শোনা যাইতেছে। কিন্তু ছন্দের বিভিন্নতার জন্যই হউক, অথবা অঙ্গ-বিস্তারের জন্যই হউক, পাঁচালী কবিগান যখন তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কিছুটা সরিয়া দাঁড়াইল এবং দাঁড়া-কবিগান যখন সীমাহীন, উন্মুক্ত আকাশে আপনার পক্ষ বিস্তার করিয়া স্বাধীনভাবে উড়িতে উদ্যত হইল, সেই সময়ে সম্ভবতঃ রঘুনাথ দাসের প্রভাবান্বিত পর্বে তরজার জীর্ণ রূপের যে সংস্কার হইল তাহা লোকরুচির অনুসরণে শ্লেষ ও অশ্লীলতার উপাদানে মিশ্রিত হইল।

এই সময় হইতে তরজার নবরূপের বিকাশ ও ব্যঞ্জনা কিরূপে অগ্রসর হইতে লাগিল তাহাই প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য করিবার যোগ্য বিষয়বস্তু।

বিবাহ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ধনী ব্যক্তিগণ কবি-গাহনা দিতে মনস্থ করিলে দুইটি করিয়া কবির দলকে নিমন্ত্রণ জানাইতে বাধ্য হইতেন। ইহাদের মধ্যে একদল প্রশ্ন বা চাপান দিত ও অপর দল তাহার উত্তর বা খণ্ডন করিত। আবার এই উত্তরেরও প্রত্যুত্তর চলিত। এই চাপান ও খণ্ডনের মধ্য দিয়া দুই কবি-দলের মধ্যে কোন্ দলটির জয় বা পরাজয় হইল—তাহা সর্বশেষে স্থির হইত। এই চাপান ও খণ্ডনই কবিওয়ালার লড়াই।

কোনও পক্ষের কবিওয়ালা যদি বৃন্দা সাজিয়া অপর পক্ষকে কৃষ্ণ ধরিয়া বিনা কারণে রাধাকে পরিত্যাগ-পূর্বক মথুরায় রাজা হইয়া বসার জন্য দোষারোপ করিতেন, তাহা হইলে তখন অপর পক্ষের কবিওয়ালাকে কৃষ্ণ সাজিয়া আপন দোষ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতে হইত এবং কৃষ্ণের উত্তরের পর বৃন্দা দূতী পুনরায় তাহার উত্তরের প্রত্যুত্তর করিতেন। এইভাবে উভয় কবির দলের মধ্যে চাপান ও খণ্ডন চলিতে থাকিত।

যখন দুই কবির দল সঙ্গোপনে পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের চাপান ও উত্তর জানিয়া লইত এবং আসরে আসিয়া স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশ্ন ও উত্তর গীতে জানাইত তখন কবির গানকে "বাঁধুটী" এবং যখন কবি-গায়কেরা কোনওরূপ স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত না করিয়া আসরে বসিয়াই চাপানের সঙ্গে কাটান দিতেন তখন কবিগানকে "উপস্থিতি" বলা হইত। কবিগানের পূর্বরূপ "বাঁধুটী" ছিল বলিয়া মনে হয়। "উপস্থিতি গান" কবে হইতে সুরু হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। অনেকে বলেন রাম বসু ও তাহার সমসাময়িক কবিগণ আসরে বসিয়াই "চাপান" ও "কাটান" করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

সেকালে হরু ঠাকুরের সহিত রাম বসুর, রাম বসুর সঙ্গে নীলু-রামপ্রসাদ ও এণ্টনী ফিরিঙ্গীর, এণ্টনী ফিরিঙ্গীর সহিত বকু নেড়ে, ঠাকুর সিংহ ও ভোলা ময়রার, ভোলা ময়রার সহিত বলাই সরকার ও যজ্ঞেশ্বরের, মতি পসারীর সঙ্গে হোসেনের, নিতাইয়ের সঙ্গে ভবানী বেনের ও রামুর সহিত রামগতির কবির লড়াই জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। উপরি-উক্ত প্রায় সকল কবিওয়ালার আপন আপন একটি দল থাকিত, আবার এই-সকল দলের মধ্যে দোহার ও বাঁধনদার থাকিত; সময় সময় কবির মূল গায়েন বাঁধনদারেরও কাজ করিতেন, রাম বসু প্রথম জীবনে ভবানী বেনের বাঁধনদার ছিলেন, পরে আপনি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় কখনও কবির দল গঠন করেন নাই. তিনি ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নীলু পাটনী প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের দলের জন্য গান বাঁধিয়া দিতেন। গোরক্ষনাথ এণ্টনী সাহেবের বাঁধনদার ছিলেন। ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, সাতু রায় প্রভৃতির কবির দল ছিল না, কবিওয়ালা-দলের পছন্দমত গান তাঁহারা বাঁধিয়া দিতেন।

ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, মাথুর প্রভৃতি সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া কবির লড়াই চলিতে পারিত।

মা দুর্গার স্তব-স্তুতি, আরাধনা তাঁহার ও গুণ-বর্ণনার মধ্যেও প্রশ্নের বীজ

থাকিতে পারে। নিম্নলিখিত ভবানীবিষয়ক কবি-গানটিতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই :—

শুন শুন ওগো শঙ্করি
সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি
তোমায় বলতে হবে ওগো শিবে
হোয়ো নাক উতলা।

* * *

ঐ ত্রিপুরারি গলায় আছে কোন্ মেয়ের
হাড়ের মালা॥ (লালু, ৪১)

এই গানটি শুনিয়া এইবার প্রতিপক্ষ কবিওয়ালাকে বলিতে হইত যে মহাদেবের গলদেশে যে হাড়ের মালা রহিয়াছে, তাহা কাহার। প্রতিপক্ষকে অবশ্যই শঙ্করীরূপেই এই চাপানের উত্তর দিতে হইত।

শ্যামের বিচ্ছেদে কাতরা রাই নির্জনে শ্যামমূর্তি আঁকিতেছেন, শ্যামের সকল অবয়ব আঁকিয়া তিনি শ্যামের পদদ্বয় আর রচনা করিতে সাহসী হইলেন না, পাছে চিত্রের শ্যাম আবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শ্রীরাধার কোনও এক সখী তাঁহাকে শ্যামের এইরূপ অঙ্গহীন মূর্তি রচনা করিতে দেখিয়া শ্রীরাধাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "অঙ্গহীন মাধুরী শ্রীহরির করিতে নাই দরশন," এই কথাটি বলিয়া সখীর মনে হইল যে হয়ত শ্রীমতী রাধা শ্যামের পদদ্বয় অঙ্কন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাই সখী তাঁহাকে বিস্ময়ভরে শুধাইল :—

যদি সেই চরণ লিখতে হলি বিস্মরণ
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ ?
যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ কৃষ্ণের কায়
রাই রাই গো।
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ কই গো দেখতে পাই॥

বিপক্ষ দলের কবি শ্রীরাধা হইয়া আপন সখীকে অঙ্গহীন শ্যামমূর্তি রচনা করিবার কারণ দর্শাইল এইরূপে :—

নিরদয় পদদ্বয়, লিখি নাই, সেই আশঙ্কায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র-ময়ূরে গেলে হার,
বিচিত্র কি গো তার ? যদি চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলি যায়।

আবার 'খণ্ডিতা' শ্রীরাধার সহিত সখীর কিরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিত তাহাও দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার কুঞ্জে নির্দিষ্ট সময়ে রাত্রিতে উপস্থিত না হইয়া প্রভাতে আসিয়া কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, বৃন্দা দূতী শ্রীকৃষ্ণের ম্রিয়মাণ অবস্থা দেখিয়া শ্রীরাধার নিকট নিবেদন করিলেন :—

রাধে, কেঁদেছ যার আশাতে নিশিতে
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জাভয়
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্ন বাসা
কাতর মাধব অতিশয়॥
দেখে রূপের ছাঁদ পাছে রাগ হয় উন্মাদ
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।
একবার বলিস্ ত আসতে বলি মাধবকে
প্যারী তোর সম্মুখে।
ঐ দেখ্ কালিয়ে কুঞ্জের বাহির দাঁড়ায়ে
কেঁদে বলতেছে দয়া কর রাধিকে।

বৃন্দা দূতীর এইরূপ অনুরোধে বিপক্ষ দলের কবিওয়ালা 'রাধা' হইয়া উত্তর দিলেন :—

সখি, আর কৃষ্ণের কথা শুনাসনে, জ্বালাসনে
প্রাণ গো আমার!
কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর।
কুলশীল লাজ পরিহরি
যার বাঁশী শুনে দাসী হ'লাম চরণে;
করল সেই হরি চাতুরী
আর কালরূপ হেরব না, হেরিতে বল না।
কালার প্রেম কাল আমার হইল।
কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী
এখন গো সেইখানে যাইতে বল।

যদি আমারি হ'তেন শ্যাম,
হ'তেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম ল'য়ে চিকণ কালা ॥

ইহারই পরের অবস্থা,—রাম বসু 'রাধা' হইয়া সখিকে শ্যামের কাছে পুনরায় যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন :—

সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান
শ্যামের তায় হ'ল অপমান।
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না
কথা কইলেম না রেখে মান—
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে
রাগে-রাগে গো পড়ে পাছে
চন্দ্রাবলীর নব অনুরাগে।
ছিল পূর্ব্বের যে অপূর্ব্ব রাগ
পাছে রাগে শ্যাম রাধার
আদর ভুলে যায়।
শ্যাম কাল মান করে গেছে
কেমন আছে দূতি জেনে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে
গেলে কার কুঞ্জে বঞ্চিতে
হয়ে খণ্ডিতে মরি হরির প্রেমের দায়।

শ্রীরাধার এইরূপ উক্তিতে বিপক্ষ কবিওয়ালা সখী হইয়া নিম্নলিখিত উত্তর দিলেন :—

যার মানে মান রাই
সাজে না তায় অভিমান।
কমলিনি এমন মানিনি
হ'তে কে দিল বিধান।
যারে তিলেক না হেরে
হ'ও অধৈর্য্য অন্তরে
ছি ছি শ্রীমতি তার প্রতি
করলে এ মান কি করে ॥

করলে যার উপর অভিমান
শেষে তার লাগি ব্যাকুলিত হ'ল প্রাণ,
এখন মান করে কি লাভ হ'ল কিশোরি।
ধিক্ তোর মানে মানময়ী রাই
এ কি লাজ আ মরি মরি
ক'রে মান হ'ল অপমান
এখন কোন্ লাজে আসতে বল সে হরি ॥

নিতাই আর ভবানী বেনের মধ্যে যে কবির লড়াই হইত তাহাতে খুব রেষারেষি চলিত বলিয়া সে সময়ে নিতাই ও ভবানীর কবির দলের লড়াই দেখিতে লোকদের আগ্রহের সীমা থাকিত না। সে সময়ে নিতে-ভবানীর যুদ্ধ বলিয়া একটি প্রবাদ ছিল। অনেকে নিতে-ভবানীর কবির লড়াইকে "বাঘে-মহিষের লড়াই" বলিত।

এক সময়ে সভাবাজারের বাটীতে রাজা নবকৃষ্ণের সময় নিতাই ও ভবানীর কবির দলের আমন্ত্রণ হইল। এই কবির লড়াই দেখিবার জন্য বহু স্থান হইতে লোকের সমাগম ঘটিল। সভার প্রস্তাব-মতে ভবানী বণিক্ সর্বপ্রথম গান ধরিলেন। গানটির মহড়া এইরূপ :—

সখি, কও শুনি সমাচার
আসিবেন কি সে হরি পুনঃ ব্রজে আর। ইত্যাদি

কবি ভবানীর গান শুনিয়া সভার তাবৎ লোকই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। ভবানীর গানের সমাপ্তির পর নিতাই গান ধরিলেন :—

সখি, দেখে এলাম নটবর বংশীধারী
এতো গুণযুত না হ'লে হরি। ইত্যাদি

নিতাইয়ের চিতেন গান করিবার পর অনেকে তাহার গুণপনার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু অনেকে আবার তাহার গানের উপর হীন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে নিতাইয়ের গুণগ্রাহীদের সহিত নিতাইয়ের নিন্দুকদের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। দারুণ গোলমালে কবির গান আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিতাই চিতেনেই গান শেষ করিয়া স্বয়ং তিনি ও ভবানী উভয়পক্ষকে তাহাদের নিদারুণ বিরোধ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

কেহই শ্রোতাদিগকে সেই বিবাদ হইতে নিবারণ করিতে পারিল না। অবশেষে নিতাই ও ভবানী কবিগান সমাপ্ত না করিয়া আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

কবির লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্তের ভার জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিলে বেশীর ভাগ সময় গণ্ডগোল উপস্থিত হইত দেখিয়া রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর হরু ঠাকুরকে মধ্যস্থতা করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে হরু ঠাকুরের বৃদ্ধাবস্থা, স্বয়ং কবি গাহনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, মহারাজের অনুরোধে তিনি তাঁহার সভাসদ্ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভাবাজারের রাজবাটীতে যে-সকল কবির লড়াই হইত, হরু ঠাকুর তাহাদের মীমাংসার ভার লইতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে একবার রাম বসু তাঁহার কবির দল লইয়া কবি-গাহনা করিতে আসেন। এই সময়ে রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ্ ছিলেন কবিওয়ালা হরু ঠাকুর। রাম বসু ও তাঁহার বিপক্ষ দলের গাহনা শেষ হইলে হরু ঠাকুর কবি-গানের বিচারকরূপে, রাম বসুর বিপক্ষ দলের জিত হইয়াছে—এই অভিমত প্রকাশ করেন। এইরূপ অভিমতে রাম বসু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন, সভায় হরু ঠাকুরের উদ্দেশে তিনি নিম্নলিখিত গান করিয়া উঠেন :—

ঠাকুর বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ ॥

শুনিতে পাওয়া যায় রাম বসুর এইরূপ হীন উক্তিতে হরু ঠাকুর বিশেষ উত্তেজিত হইয়া রাম বসুর উদ্দেশে কটূক্তি করিতে করিতে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

কবি-গানের লড়াইয়ে প্রায়ই জয়-পরাজয় লইয়া এক দলের সহিত অপর দলের বাদ-বিসংবাদের সূচনা হইত এবং ইহার মীমাংসা কোন না কোন উপায়ে হইয়া যাইত।

সখীসংবাদ-পর্যায়ে যেমন সখী ও সখীতে, শ্রীরাধা ও সখীতে, শ্রীকৃষ্ণ ও সখীতে উক্তি-প্রত্যুক্তি দেখা যায়, "মাথুরে" তেমনি সখী ও শ্রীকৃষ্ণে, কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণে প্রশ্ন ও উত্তর চলে। মথুরা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া বৃন্দা ও শ্রীরাধার মধ্যে যে কথোপকথন চলে, তাহাও এই "মাথুর" পর্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ধরিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হইয়া বসিয়াছেন, কুব্জাসুন্দরী হইয়াছেন তাঁহার রাণী। বহুকাল হইতে চলিল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যাবর্তনের আর কোনও আশা নাই দেখিয়া শ্রীরাধা বৃন্দাকে দূতী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। বৃন্দার মথুরায় আগমন-বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া কুব্জারাণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন :—

রাজার উপর রাজা তাহা ত আগে শুনিনে
হ'য়ে আমাদের যদুপতি কোটালী করেছিলে কোন্ রাজার ?

কুব্জার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত তাঁহার প্রণয় ও তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়।

রাজসভায় বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে দোষারোপ করিয়া বলে—কি অমূল্য ধন দিয়া কুব্জা তাহাকে কিনিয়াছে যে শ্রীরাধার সকল স্মৃতি তাহাকে ভুলিতে হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীদামের অভিশাপ ও কুব্জার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিয়া বৃন্দার উক্তিগুলি খণ্ডন করিতে হয়। বৃন্দা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে হার না মানিয়া বলে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার প্রণয়, গোপীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, কালীয় দমন, গোচারণ প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত তাঁহার বিস্মৃত হওয়ার কোনও কারণ সে বুঝে না। শ্রীকৃষ্ণকে তখন বৃন্দার উক্তির উত্তরে আপনার অনন্ত বিভূতির কথা ও অপার লীলার কথা তুলিতে হয়। বৃন্দা রাধার বিরহের কথা তুলিলে শ্রীকৃষ্ণ আপনার সর্বত্র স্থিতির কথা উত্থাপন করেন।

"সখীসংবাদ" বা "মাথুর" পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ, সখী বা শ্রীরাধার উক্তির মধ্যে যে তীব্রতা বা উত্তেজনার ভাব দেখা যায়, "বিরহ"-বিষয়ক গানে তদ্রূপ ভাবের প্রকাশ একেবারে নাই বলিলে হয়। এই স্থলে "বিরহ"-বিষয়ে দুইটি গান ও উহার উত্তর উল্লেখ করিলাম :—

১ম— রাম বসু

(চাপান)

সেই তুমি সেই আমি
সেই প্রণয় নূতন নয় পরিচয় ইত্যাদি

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী

(উত্তর)

পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না * *

বিনা দোষেতে দুষো না।
সুখের প্রেমে দুখ দিও না।
মিছে অপযশ করলে ধর্মে সবে না। ইত্যাদি

২য়— কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

(চাপান)

বসন্তেরে শুধাও সখী, আমার নাথের মঙ্গল কি ?
নিবাসে নিদয় নাথ আসবে না কি ?

* * *

আমি কেমনে ভুলিব তারে
পতি গতি-মুক্তি অবলার
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার। ইত্যাদি

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

(উত্তর)

নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা
পতি বিচ্ছেদে এমনি হয় সখি মিছে নয়
তা' বলে আশাত্যাগী কেন হও। ইত্যাদি

ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, বিরহ, মাথুর, বা পৌরাণিক বা লৌকিক বিষয় লইয়া কবিগান সম্পূর্ণ হইয়া গেলে কবিওয়ালা উপসংহারে ছড়ায় পরস্পরকে ব্যক্তিগত আঘাত করিয়া কবিগান গাহিতে আরম্ভ করেন। এই সঙ্গীতগুলিকে কখনও চুটকী লহর বা খেঁউড় আখ্যা দেওয়া হয়।

কবির গানের অধঃপতনের যুগে আসল কবিওয়ালার গান সখীসংবাদ, মাথুর, বিরহ বা পৌরাণিক ঘটনা প্রভৃতি অংশ লুপ্ত হইতে লাগিল, এবং সুরুচির অভাবে শ্রোতৃদল কবির চুটকী লহর বা খেঁউড় গানের লড়াই শুনিতে বিশেষ উৎসুক হইল। কবিওয়ালা যখন রাধা, কৃষ্ণ বা বৃন্দার অংশ ছাড়িয়া তাহারা আপনারাই অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল, তখন শ্রোতৃদলের অপার কৌতূহল ও উত্তেজনার সীমা রহিল না।

আমরা এই স্থলে কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গানে যেরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ চলিত, তাহার গোটাকয়েক উদাহরণ দিয়া সেকালের কবির লহরের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

একবার রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে শারদীয়া পূজার সময় রাম বসু ও রামপ্রসাদের ডাক পড়িয়াছিল। রাম বসু তখন বাঁধনদারের কাজ ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পেশাদারী দল করিয়াছিলেন, আর নীলুর মৃত্যুর পর তাহার ভাই রামপ্রসাদ কবির দলপতি হইয়াছিলেন। সভার আরম্ভে রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম বসুকে শ্লেষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

নাইক রাম বোসের এখন সেকালের পৌরষ।
এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস রাম কামারের···

এই শ্লেষের রাম বসু উত্তর দিলেন—

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজেনাক একটি দিন॥
যেমন রাতভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক এক জন।
হরিনাম বলে না মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাই রে !)
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্ম্মা
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন॥
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে
ঢুকলো শিংভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে
যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উজীরালি আড়াই দিন।
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে
বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীচাঁদ, এই পেট্‌কো মুলুকচাঁদ
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না
দোলে লবেদার আস্তীন।

হরু ঠাকুর ভোলা ময়রার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, ভোলা ময়রাকে আপনার উৎকৃষ্ট সঙ্গীত দিতেন—ইহা রাম বসুর অসহ্য ছিল; একবার তিনি কবির লড়াইয়ে ভোলা ময়রার তাহার প্রতি কিরূপ বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নলিখিত পদে দেখিতে পাই :—

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর
তুই পাষণ্ড নচ্ছার
তুই ভজিস ঢেঁকি
বলিস কি না গৌর অবতার

* * *

সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর ॥

একবার ভোলা ময়রা ঘাঁটালের নিকটবর্তী জাড়াগ্রামে জমিদার রায়বাবুদের বাড়ীতে কবি-গাহনা করিতে যান। সেইখানে ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ ছিল জগা বেনে। জমিদার রায়বাবুদের সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে জগা বেনে জাড়াগ্রামকে গোকুল ও জমিদারকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে কল্পনা করিয়া কবি-গান গাহিয়া গেলেন। ভোলা ময়রা স্তুতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। জগা-কর্তৃক জমিদার রায়বাবুকে শ্রীকৃষ্ণ ও জাড়াকে গোলক বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন দেখান ব্যাপারটি ভোলা ময়রার বিবেকে বাধিল। ভোলা ময়রা জগা বেনের গানের পর গাহিয়া বলিলেন—

কেমন করে বল্‌লি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন ॥
জগা, কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড
কোথা রে তোর মানিককুণ্ড
করগে মূলা দরশন।
কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কারে।
সংসার সাগরে যিনি তরাইতে পারে
বাবু তো লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে ব্যাটা তো হাড়ী ॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকুতের মধু অলি।
মাপ কর গো রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি ॥
জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলবো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি ॥

সেকালে কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ভোলা ময়রা ও এণ্টনী ফিরিঙ্গীর দলের কবির লড়াই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ ভোলা ও এণ্টনীর 'কবির যুদ্ধে'র সংবাদ পাইলে দূরবর্তী স্থান হইতেও পদব্রজে চিঁড়ে-মুড়কি বাঁধিয়া স্থান-সংগ্রহের জন্য ছুটিয়া আসিতে কসুর করিত না। এণ্টনী ফিরিঙ্গীর সহিত কবির লড়াইয়ে ভোলা ময়রার প্রধান লক্ষ্য থাকিত তাহার সাজপোষাক ও ধর্মত্যাগ। একবার কবির আসরে ভোলা ময়রাকে ভগবতী-রূপে ধরিয়া এণ্টনী গান সুরু করিলে ভোলা ময়রা তাঁহাকে জবাব দিয়াছিলেন :—

তুই জাত ফিরিঙ্গী জবড়জঙ্গী
আমি পারব নাক তরাতে।
তোকে পারব নাক তরাতে।
শোন রে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট
তুই রে নষ্ট, মহাদুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী কেষ্ট
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥

ভোলার গানের পাল্‌টায় এণ্টনী গাহিয়া উত্তর দেন :—

সত্য বটে আমি জাতিতে ফিরিঙ্গি
ঐহিক লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী॥

আরও একবার ভোলা ময়রা এণ্টনীকে তাঁহার ধর্মত্যাগ ও হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিলে এণ্টনী সাহেব উত্তরে গাহিয়া উঠেন :—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমার মানব জনম সফল হ'বে
যদি রাঙা চরণ পাই॥

কবিগানের চতুর্থ অঙ্গ খেঁউড়কে অশ্লীল রসগান বলা যায়। তরজার মতই খেঁউড়ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ উপভোগ্য প্রমোদ। তরজার দ্বারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিগণ যেমন আকৃষ্ট হইত ও বিমুগ্ধ হইত খেঁউড়ের দ্বারা তেমনি ইতর ও কুরুচিসম্পন্ন শ্রোতাদের চিত্তজয় করা হইত। বাহবা পাইবার উদ্দেশ্যে তাই অনেক কবি তরজা হইতে দ্রুত খেঁউড়ে চলিয়া যাইতেন। আবার অনেক সময়ে কবিরা অনবহিত-ভাবেই তরজা ও খেঁউড়ে মিশাইয়া ফেলিতেন। সুবিধাও ছিল। তরজার শ্লেষের তির্যগ্‌তা সহজেই তির্যক্ অশ্লীলতায় পরিণত হইতে পারিত। এইরূপ সীমারেখা উল্লঙ্ঘনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত বলিয়া শ্রোতাদের নিকট এই উভয় সাহিত্যরূপের সংজ্ঞা হারাইয়া যাইত। তাহারা শ্লেষের সাধারণ ধর্মের প্রভাবে এইরূপ আত্মহারা হইয়াই তরজাকে খেঁউড় ও খেঁউড়কে তরজা বলিয়া মনে করিত ও ব্যাখ্যা করিত। অবশ্য, অনেক সভায় অনেক সময় শ্রোতাদের ফরমাস অনুযায়ী কবিদের তরজা দিয়া সুরু করিয়া খেঁউড় দিয়া গান সারা করিতে হইত। খেঁউড় বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে তাহা অকারণ শ্রোতাদের কটু-গালিগালাজে পর্যবসিত হইত। ছড়ার বাঁধুনি থাকিলেও এই অশ্রাব্য অনর্থক পরিবাদ অশ্লীল-রসগানের অন্তিম অবস্থা বটেই। খেঁউড় দুই প্রকারের বা দুই প্রকৃতির হইত; এক উপমা-অলঙ্কারমণ্ডিত সরল আর দ্বিতীয়টি রূপক। শ্লেষ এই উভয় রূপেই থাকিত। ইহাদের উদাহরণ এইরূপ :—

কবিগানের চতুর্থ অঙ্গ খেঁউড়

প্রথম (১) সুন্দরি লো সুন্দরি
আয় দু'জনে ঘর করি

(২) ও পাড়ায় গে' দেখে এলাম একটি ডাগর কালো মেয়ে।
জানলা খুলে ব'সে আছে নাগর আসার পথ চেয়ে।

দ্বিতীয় (১) চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে নীল আকাশের গায়
ও চকোরী চাঁদের মধু লুটবি যদি আয়॥

(২) স্ত্রীর উক্তি—
ওরে আমার কাল ভ্রমর, মধু লুটবি যদি আয়।
পুরুষের উক্তি—
আমি থাকতে চাকের মধু পাঁচ ভ্রমরে খেয়ে যায়।

ধ্বনির প্রতিধ্বনির মতই কবিদের খেঁউড় বা অশ্লীল রসগান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও লিখিত রসগানের লোক-সাহিত্যিক রূপ মাত্র। শুধু লোক-সাহিত্যই নয়, এই অশ্লীল রসগানের প্রকৃতি মূলতঃ লৌকিক। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের উল্লেখ খেঁউড় গানে খুব কমই দেখা যায়। ইহা যে কায়ার ছায়া বা ধ্বনির প্রতিধ্বনি তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ ইহার "খেঁউড়" আখ্যার মধ্যেই পাওয়া যায়। খেঁউড় শব্দ সংক্ষিপ্ত হইয়া স্থলে স্থলে "খেঁড়ু" ও "খাঁড়" রূপে ব্যবহৃত হয় বটে, ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল কিন্তু খেতুর হইতে, যেমন, খেতুর > খেউড়, খেউড় > খেঁউড়। নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কীর্তনে খেতুর বা খেতরীর দানের কথা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। লোচনদাস ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর, নরহরি সরকার প্রভৃতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া যে রসকীর্তন ধারার প্রবর্তন ও প্রচলন করেন তাহা কালক্রমে একান্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠায় নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের আখড়াগুলিতে ইহার চর্চা স্থরু হয়। এ বিষয়ে লোচনদাস ঠাকুরের "ধামালি" গানগুলি লক্ষ্য করিলে রসগানের রূপও স্থবোধ্য হইতে পারে। ধামালির "ধাম" শব্দ ধরণ বা ঢঙ বুঝায়। "ধাম" শব্দের সহিত বাঙ্গালা ভাববোধক— "আলি" প্রত্যয় (মিতালি, ঠাকুরালি প্রভৃতির ন্যায়) যুক্ত হইয়া "ধামালি" শব্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ধামালি গানের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) শচীর গোরা কামের কোড়া দেখলাম ঘাটের কূলে।
চাঁচর চুলে বেড়িয়া ভালে নবমালতীর মালে॥
কাঁচা সোনা লাগে ঘৃণা রূপের তুলনা দিতে।
হেম চিত চোরা মনোহরা নাইক অবনীতে॥
কি আর বলিছ গো সই, বুঝাব তোমায় কি।
স্নানে যেতে সখীর সাথে গৌর দেখেছি॥
সে রূপ দেখি দুটি আঁখি ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে দেখবার তরে কত যে সাধ করি॥

(২) আলো সই, নাগর দেখিয়া বাসর ঘরে।
মন উচাটন, প্রাণ ছল ছল—চিত যে কেমন করে॥

অঙ্গের সৌরভে আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর ॥
আঁখির ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাঁকা।
পীরিতি ছানিয়া কেবা থুইল তাতে চাহনি পীরিতি মাখা ॥

এই সকল ধামালি বা অল্প প্রাচীন রসগানের তুলনায় দাঁড়া-কবিদের রসগান যাহা পরবর্তী কালে অশ্লীল রসগান বা খেঁউড়ে পরিণত হইয়াছিল, লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে ঐতিহ্য ক্রমাগত একইভাবে চলিয়া আসিতেছে। পার্থক্য শুধু ঘটিয়াছিল লৌকিক স্বভাবে, অর্থাৎ প্রাচীন রসগানের* কেন্দ্রস্বরূপ রাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গচন্দ্র সরিয়া গিয়া সাধারণ নাগর-নাগরী বা প্রেমিক-প্রেমিকা স্থান লাভ করিয়াছিল, যেমন—

(১) হোল এ সুখ লাভ পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার
গিয়াছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি আর পাতালই বা কতদূর ॥
শেষ এই হোল, কাণ্ডারী পালাল
তরণী লাগিল ভাসিতে ॥
ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়া শরণ লইলাম যার।
তবু তার মন পাওয়া সখি যেন আমার হইল ভার ॥
না পুরিলো সাধো উদয়ে বিচ্ছেদো
মিছে পরীবাদো জগতে ॥ (লালু-নন্দলাল)

(২) মহড়া—রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে তরঙ্গে ডুবায়ে
রঙ্গ দেখ গিয়ে দাঁড়ায়ে দূরে ॥

---

* পৌরাণিক চরিত্র লইয়া অশ্লীল রসগান রচনার ধারার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অশ্লীল রসগানের ধারা ধামালির পূর্বতন। সাধারণতঃ হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ ও মহাভারত-রামায়ণোক্ত অনেকগুলি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এই অশ্লীল রসগান রচিত হইত। প্রকৃতপক্ষে এই গানগুলিতে লোকোত্তর চরিত্রগুলিতে লৌকিক ধর্ম আরোপিত হইত।—সম্পাদক

চিতেন—প্রাণ, তুমি হে লম্পটো নিতান্ত কপটো
প্রকাশিলে শঠো খল-আচারে।
নহে কেবা কোথা এত নিষ্ঠুরতা
কোরেছে সর্ব্বথা নিজ জনারে॥
অন্তরা—প্রাণ, আর এক শুনো বচনে তোমার
দাঁড়ালাম কুলের বাহিরে।
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে বিরহ-তুফানে
ভাসালে এজনে ছলনা করে॥
পরচিতেন—তোমার চরিত পথিক যেমত
হ'য়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হ'লে যায় সে যে চলে
পুন নাহি চাহে ফিরে॥ (রাসু-নৃসিংহ)

(৩) মহড়া—ধিক্ ধিক্ তার জীবন-যৌবনো
এমন প্রেমের সাধ করে যেইজনো॥
সে চাহে না আমি তার জোগাই মনো।
চিতেন—সেখানেতে না রহিল অভিমানের মান।
সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ॥
সেধে কেঁদে হওয়া কলঙ্কভাজনো ইত্যাদি
(হরু ঠাকুর)

এইরূপ লৌকিক রসগানে অশ্লীলতার বীজ দেখা দিলেই তাহা "খেঁউড়" হইয়া দাঁড়াইত। এ ছাড়া খেঁউড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত তরজার মধ্যে ও যখন বা যেখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িত তখন বা সেখানেই একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া কুৎসা সুরু হইয়া যাইত। এই কুৎসাও একপ্রকারের খেঁউড়, যেমন—

মহড়া—ও ময়রার ঝি, মাসি গো আমার,
আমি স্পষ্ট কথা কই তোমার কাছে।
ওগো বংশ-রক্ষা করবে ব'লে
পাণ্ডু রাজা আজ্ঞা দিলে
সে কথা জানে সকলে।

তাতেই ভক্তিভাবে এনেছিল ধর্ম্মকে ডেকে।
সে পতির আজ্ঞা বজায় রেখে সতীর ধর্ম্ম রেখেছে॥
(রাম বসু)

ফুঁকা—দ্রৌপদীর যখন কেশে ধরে আনলে দুঃশাসন।
তখন সে ঋতুমতী
তোমার হ'ল দুর্ম্মতি
তাই তখন তারে কুরুপতি করলি দরশন॥

মেলতা—যদি ঋতুবতী পরনারী,
তারে পর পুরুষে দেখলে পরে ঘটে মন্দ ঘটনা॥
(রাম বসু)

ফুঁকা—দ্রুপদ রাজকন্যে
তোমার ভাদ্রবধূ ছিল হস্তিনে,
তুমি নেংটো করেছ তারে সভার মাঝখানে।

মেলতা—সে যে কুলবধূ ভাদ্রবধূ তোমার
তার আবরু সরম করলে হরণ
বাম উরুতে বসালে॥
(ভোলা ময়রা)

এইভাবে খেঁউড়ের প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যায় যে, লৌকিক চরিত্র উপলক্ষ্য করিয়া সরল ও রূপক খেঁউড় বা রসগান ছাড়াও তরজার মধ্যে যে (বিমিশ্র) খেঁউড়ের বা রসগানের আমদানী করা হইত তাহা লৌকিক, অলৌকিক নির্বিচারেই চলিত। ইহাকে মিশ্র খেঁউড় বলা যাইতে পারে।

গন্ধর্ব বেদ বা গান্ধর্ব বিদ্যার অনুশীলনকে এক কথায় "আখড়াই" বলা হয়। আখড়ায় চর্চার বিষয় বা চর্চিত বিষয় বলিয়াও "আখড়াই" শব্দ সিদ্ধ হয়। এখন বিশেষভাবে যাত্রা, থিয়েটার (নাট্যাভিনয়, গীতাভিনয়) প্রভৃতি সুরু হইবার পূর্বে অঙ্কমধ্যে ও অঙ্কশেষে যে যান্ত্রিক একতান বাদন হয় তাহাকেই "আখড়াই" বলা হয়। ইহার প্রতিশব্দ ইংরাজীতে concert। কিন্তু ইহার বর্তমান অর্থের প্রয়োগ অনুসরণ করিয়াও আমরা সেই পূর্বরূপে গিয়া পৌছাইতে পারি। একটি সুরকে নানা বাদ্যযন্ত্রে রূপদান করা অথবা একটি যন্ত্রে ধ্বনিত সুরের অনুসরণে অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্রের বাদন দ্বারা সম্মিলিত ঝঙ্কার সৃষ্টির অনুশীলন চলিত যত আখড়াগুলিতে;

কবিগানের পঞ্চম অঙ্গ—আখড়াই

সুতরাং আখড় বা আখড়া+আই=আখড়াই। কিন্তু ইহা ত গেল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্য,—যখন "যাত্রাদলের আখড়া", "যাত্রার আখড়াই" প্রভৃতি কথা প্রচলিত হইয়াছিল। আরও প্রাচীনকালে বাঙলাদেশে "আখড়া" ও "আখড়াই" শব্দ প্রচারিত ছিল এবং বহুকাল পূর্ব হইতেই "আখড়া" ও "আখড়াই" শব্দ চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান বাঙলা অভিধানগুলিতে দেখা যায় ঐ শব্দ দুইটির উৎপত্তি-মূল কেহ ধরিয়াছেন "অক্ষবাট", কেহ বা—"আখেট—আখেটিক"। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে অবশ্য "অক্ষবাট" শব্দ পাওয়া যায়। সেখানে তাহার অর্থ হয় তাস-পাশা-দশপঁচিশের আড্ডা বা আখড়া। "অক্ষ-পাটক" বা "অক্ষপাট" ছিল "অক্ষবাট" শব্দের পূর্বতন রূপ। অপরদিকে "আখেট" শব্দের পূর্বতন রূপ ছিল "অক্ষত্র", অর্থ হইত ব্যাধ, বা পশুহনন করে কিংবা অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করে এমন ক্ষত্রিয়েতর ব্যক্তি। অর্থের প্রসার কালক্রমে ঘটে বলিয়া, অস্ত্রচর্চা হইতে "আখেট"—"আখেটিক" শব্দ গীত-নৃত্যাদির চর্চা ও স্থান বুঝাইতে থাকে। ফলে, "আখেট"—"আখেটিক" হইতে আখেড—আখড>আখড়—আখড়া শব্দ উদ্ভূত হইয়া নৃত্যগীত-চর্চার কেন্দ্র বুঝাইতে থাকে। ধনুর্বেদ-বিষয় হইতে গান্ধর্ববেদ-বিষয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটে মাত্র।

পূর্বে আখড়াতে আখড়াতে যে গীতবাদ্যের অনুশীলন হইত, তাহা প্রাচীন বাঙ্লার সাহিত্য চর্যাপদ ও গীতগোবিন্দ হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। প্রতিটি গানের শীর্ষদেশে ও পার্শ্বে স্বর-তালের সঙ্কেত রীতিমত সঙ্গীত-চর্চারই প্রমাণ বহন করে। "গুর্জরী", "রামকেরী", "মালবশ্রী" প্রায়ই চোখে পড়ে, আবার "মালবরাগেন", "রূপকতালেন চ গীয়তে"-ও দেখা যায়। "ধ্রু", "ধ্রুবপদ", "ধু", "ধুয়া"ও যথেষ্টই পাই। পূর্বের অনুশীলনের ফলস্বরূপ এই সঙ্গীত-সঙ্কেতগুলি পরবর্তিকালীন গায়কদের জন্য নির্দেশ-সংজ্ঞা। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যেও এইরূপ প্রচুর সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আবার মঙ্গলকাব্যের ও বৈষ্ণব-পদাবলীর যুগেও যে রাগ-রাগিণী কি স্বর-লয়-তান-তাল-মানের চর্চা হইত তাহাও ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস, সঙ্গীতরত্নাকর, রাগকল্পদ্রুম, হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরে, নবদ্বীপ-শান্তিপুরে, সপ্তগ্রামে ও ত্রিপুরায় বহু বিখ্যাত সঙ্গীত-চর্চার আখড়া ছিল। পালা-গান ও পাঁচালীগানের উদ্ভব মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতেই। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সঙ্গীতের প্রভাবের নিদর্শন বলিতে আমরা প্রায়শঃ দৃষ্ট "লাচাড়ি"র উল্লেখ করিতে

পারি। "লাচাড়ি" ছন্দ দ্রুততাল-সমন্বিত নাচারই ছন্দমাত্র। পাঁচালী আখ্যার (analogy) আনুরূপ্যে "লাচাড়ি" আখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এ ছাড়া মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ "পাঁচালীসুরে" গাওয়ার রীতিও ছিল। **পাঁচালী ও পালাগান প্রকৃতপক্ষে কবিগানের প্রাচীন পর্যায়।** বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন গ্রাম্য কবি রামায়ণ-মহাভারতের অংশবিশেষ বা দৃশ্যবিশেষ, যেমন দাতাকর্ণের পালা, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু, সীতানির্বাসন, রাবণবধ, লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার পাতাল-প্রবেশ, অর্জুনের লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি পালা সামান্য কোন বাদ্যসহ গাহিয়া বেড়াইতেন। মঙ্গলকাব্যের অংশবিশেষ বলিতে বিষহরির পালা, চণ্ডীর ছলনা, বেহুলার খেদ, বিদ্যার বিলাপ প্রভৃতি গাওয়া হইত। ইহাদিগের সহিত ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে সত্যপীরের পাঁচালী, দক্ষিণরায়ের পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী প্রভৃতির যোগ হইয়াছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে হরিসভা ও চণ্ডীমণ্ডপসমূহে সন্ধ্যারাত্রে কৃত্তিবাসের রামমঙ্গল বা রামায়ণ ও কাশী-রামের মহাভারতের অংশবিশেষ পাঁচালীর সুরে গাওয়া হইত। ইহার সহিত আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল ও গোবিন্দমঙ্গল হইতে অংশ-বিশেষের পাঁচালীগান যুক্ত হইয়াছিল। "চণ্ডীমণ্ডপ" ও "হরিসভা" আখ্যাগুলির কথা চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, গ্রামে গ্রামে ঐগুলি আড্ডাস্থল হইয়া উঠিবার পূর্বে ছোট ছোট আখড়াই ছিল। এইখানে সন্ধ্যায় গ্রামের পঞ্চজন সমবেত হইয়া চণ্ডীমঙ্গল হইতে সুরু করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল পর্যন্ত পড়িতেন এবং সময় সময় পাচালী-গানও করা হইত। এই সাহিত্যানুশীলনে চণ্ডীর ও শ্রীকৃষ্ণের স্থান মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হইত বলিয়াই "হরিসভা" ও "চণ্ডীমণ্ডপ" আখ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা ছাড়া পটুয়াগণ সে-যুগে নানা পালা ধরিয়া পটচিত্র আঁকিয়া দাতাকর্ণের পালা, বিষহরির পালা, চণ্ডীর ছলনার পালা গৃহস্থদের গৃহে-গৃহে গাহিয়া বেড়াইতেন।

প্রাচীন বাঙলার আখড়া বলিতে বুঝাইত একটি দল যাহাতে কম পক্ষে তিন-চারিজন হইতে পাঁচ-ছয়জন পর্যন্ত গায়েন, বায়েন ও দোহার থাকিত আর বাদ্যযন্ত্র থাকিত মৃদঙ্গ, মন্দিরা বা করতাল, বীণ, একতারা, ত্রিতারা, সপ্ততারা, আশুরঙ্গিনী প্রভৃতি। আউল, বাউলেরা একা-একা করতাল বা মন্দিরা, একতারা বা ত্রিতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া বেড়াইত। সমভিপ্রায়ী সহজিয়ারা মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বা করতাল বাজাইয়া পদ-কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী-কাব্যগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি শ্রীবাসের

অঙ্গনে কি বাসুদেব সার্বভৌমের বাটীতে কীর্তন করিতেন মৃদঙ্গ বা মর্দল এবং শিঙ্গা ও করতাল সহযোগে। পরবর্তী কালের কালীয়দমন বা শ্রীকৃষ্ণযাত্রায়, মনসার ভাসান ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় মৃদঙ্গ, মন্দিরা, সপ্ততারা, আশুরঞ্জিনী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহারও পরবর্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে আমাদের আখড়াই-এর সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতোপকরণ বেহালা, কর্নেট্, ক্লারিওনেট্, জলতরঙ্গ, হারমোনিঅম্ বা অর্গান যুক্ত হইয়াছিল, আর মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ডাইনে-বাঁয়া বা বাঁয়া-তবলা পরিশিষ্ট-হিসাবে কাজে লাগান হইয়াছিল।

টপ্পা গানের সহিত ডাইনে-বাঁয়া বা বাঁয়া-তবলা খুব উপযোগী সরঞ্জাম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর এই আখড়াই-এর উপকরণের প্রায় অর্ধেক অংশ লইয়া হাফ্-আখড়াই-এর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভাবাজার রাজবাটীর রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র রাজকৃষ্ণ দেবের কুলবৈদ্য কুলুইচন্দ্র সেন একজন ওস্তাদ গায়ক ও বাদক ছিলেন। ইনিই একাধারে টপ্পা-গান ও হাফ্-আখড়াই-এর প্রবর্তক। ইঁহার উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় ৺নিধিরাম গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু টপ্পা-গানের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। আবার ইনি মোহনচাঁদবাবুকে লইয়া একটি হাফ্-আখড়াই-এর দলও খুলিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর কলিকাতায় হাফ্-আখড়াই-এর যেমন অনুশীলন তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিত। দুঃখের বিষয় হাফ্-আখড়াই কিন্তু অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে থিয়েটার ও অপেরার প্রাদুর্ভাব ও সমধিক প্রচলনের ফলেই হাফ্-আখড়াই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। থিয়েটার ও অপেরায় আখড়াই-এর রূপ পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছিল। নানা বাদ্যের সহযোগে সখীদের নৃত্য ও গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সমবেত সঙ্গীত ছাড়াও থিয়েটার-যাত্রায় একাকী সঙ্গীত গাওয়ানও হইত। এই একক-সঙ্গীতে হাফ্-আখড়াই-এর প্রভাব অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও সুকণ্ঠ ওস্তাদ গায়ককে বা গায়িকাকে বিবেক, অবধূত, নিয়তি, কি কালপুরুষ সাজাইয়া কোন রাগ-রাগিণী-অনুসারে গান গাওয়ান হইত। অভিনয়ের অংশ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় থিয়েটার-যাত্রাকে "নৃত্যগীতাভিনয়" বা "গীতাভিনয়" বলা হইত।

কবিগানের মধ্যে আখড়াই-এর যে রূপটুকু পাওয়া যায় তাহাতে ইহাকে সঙ্কীর্তনের সহোদর বলিয়াই গণ্য করা যায়। কেহ কেহ ইহাকে হাফ্-

আখড়াই-এর উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভুল। কবি-গানে স্বর-লয়-তাল-মানের কসরত্ বা কালোয়াতির কোন স্থান নাই, রাগ-রাগিণীর বালাই নাই কিংবা বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য নাই। "এক ঢোল এক কাঁসি"-ই ইহার সম্বল আর মূল গায়েনের সহায়ক বলিতে থাকে "দোহার" ও "বায়েন"। সুতরাং ইহাকে কীর্তনের সমপর্যায়ভুক্ত ছাড়া অন্য কি মনে করা যাইতে পারে?

কবিগানের ষষ্ঠ অঙ্গ বা শেষ অঙ্গ বিচিত্র প্রসঙ্গ। ইহাকে কবিরা নিজেরা 'ভণিতা' বলিয়া থাকেন। স্বদেশ, সমাজ ও সমকালের যে-কোন দিক্, লইয়া অথবা স্থানীয় কোন ব্যাপার লইয়া এই ভণিতা সুরু হইতে পারে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা চিরনূতন এবং স্বতউদ্ভূত ও সদ্যউদ্ভূত, ইহা অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট নয় অথচ শ্লেষমণ্ডিত। মাধুর্যও কিছু-কিছু জড়িত থাকে বলিয়া ইহার স্বাদ হয় অম্লমধুর। এককথায় এই জাতীয় ভণিতা পল্লীবাসিনী রমণীদের 'ছড়াকাটা'র লক্ষণ-যুক্ত। আবার পল্লীকবিদের গাথার মতই এই ভণিতা হয় অনতিদীর্ঘ।

কবিগানের ষষ্ঠ অঙ্গ

ইহা একাধারে যেমন দাঁড়া-কবিগানের নবীন পর্যায় তেমনি গ্রাম্যসাহিত্য ও দাঁড়া-কবিগানের প্রাচীন পর্যায়ের সীমান্ত। আবার কবিগান যে লোক-সাহিত্য ইহা তাহারও একদফা প্রমাণ। কবিগানের প্রাচীন পর্যায় অর্থাৎ বৈষ্ণব-পদাবলীর ও শাক্ত-পদাবলীর অনুসরণের দিক্‌টুকু দেখিয়াই কেহ-কেহ ইহাকে লোকসাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা আদৌ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত নহে। বরং, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল, ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন ধ্বনি নহে, কায়ার ছায়া যেমন কায়া নহে, তেমনি কবিগানও লেখ্য সাহিত্য নহে। ইহার অধিকাংশ তাহা হইলে ধ্বস্ত ও অপচিত হইত না এবং যেটুকু সংগৃহীত হইয়া আজ সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে তাহা বস্তুতঃ ভগ্নাংশ মাত্র। কবিগানের লোকসাহিত্যিক লক্ষণগুলি অমোঘ। গ্রাম্যসাহিত্য বা গ্রাম্যসঙ্গীত যদি লোকসাহিত্য হয়, তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুবর্তন ও লিখিত সাহিত্যের অনুসরণ সত্ত্বেও কবিগান পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য। আজিও কবিকণ্ঠ রুদ্ধ হয় নাই। আজিও ঢোল ও কাঁসি বাজাইয়া অবকাশ-বিশেষে আসরে-আসরে প্রমোদানুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গস্বরূপ কবিগান গাওয়ান হইয়া থাকে। তরজা ও খেঁউড় আজিও সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। শুধু তাহাই নহে,

ইহার প্রাচীন পর্যায় ও নবীন পর্যায়ের সমানরূপ চর্চাই আজিও চলিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ অভিমত সমীচীন বোধ হয় না যে, লিখিত সাহিত্যের ধারা যখন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে রুদ্ধ হইয়া গেল তখন এই ভাব-সঙ্কীর্ণ ও উত্তেজক কবিগানের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ইহা একমাত্র শহরের বাবুদের আসরে সান্ধ্যবিলাসের উপকরণ হিসাবেই প্রবর্তিত হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, ইহার পুরান ভাবের রোমন্থন ও অরুচিকর অশ্লীলতা সজ্জনগণের শ্রবণ-পীড়াদায়ক।

আধুনিক পর্যায়ের কবিগানের বিভিন্ন দিক্‌গুলির মধ্যে গ্রামীণ জন-জীবনের দুঃখকষ্ট, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, স্বদেশপ্রেমের আবেগ, বিদেশী-শাসনের দোষ, বাংলা দেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যবর্ণন, বিপ্লবের উপদেশ, শ্রেষ্ঠ পুরুষের বন্দনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী গান, আখ্যান-গীতি প্রভৃতি যেমন লোক-সাহিত্য কবিসঙ্গীতও তেমনি লোকসাহিত্য। সমসাময়িক গণজীবন, কালের বর্তমান গতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যখন তাহার বিষয়বস্তু, গান যখন মুখে-মুখে রচনা করিয়া গাওয়া হয়, চিন্তা বা ভাবরূপ যখন সেখানে অবসরের অভাববশতঃ পক্ষবিস্তার করিতে পায় না, তখন তাহাকে পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য ছাড়া অন্য কি বলিব ?

কবিসঙ্গীত যেখানে গ্রাম্যসঙ্গীতে গিয়া মিলিয়া হারাইয়া যাইতেছে সেই সীমান্তকে বিবিধ বিষয় বা বিচিত্র প্রসঙ্গ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কবি-গানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি-বিচারে ইহা যে সম্পূর্ণরূপে লোকসাহিত্য তাহার অন্যতম প্রমাণ কবিগণের আসরে দাঁড়াইয়া বর্তমানকালের সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় রূপ ও রুচির উপর স্বতঃস্ফূর্ত ছড়া বা গান মুখে মুখে রচনা করা। তরজায় ও খেঁউড়ে যেমন কবিগণের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি দেশ-কালের অবস্থা কি ব্যবস্থার উপর কবিগণের চতুর বিশ্লেষক দৃষ্টি-ভঙ্গির ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমান ভূমিকা-স্থানীয় ছন্দোবন্ধে। তরজা কি খেঁউড়ের মতই ইহা সাধারণ শ্রোতার নিকট কৌতুকজনক বা উপভোগের বস্তু। উপরন্তু লোকসাহিত্যরূপ কবিগানে বিবিধ বিষয় বা বিচিত্র প্রসঙ্গ আধুনিকতারই পরিচায়ক।

আমাদের বক্তব্য এইরূপ যে এই ধরনের গান বাঙ্গলা দেশময় অজস্র ছড়ান রহিয়াছে। তাহার কতটুকু অংশই বা সংগৃহীত হইয়া লেখ্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে কিংবা কতটুকুই বা সংগৃহীত হইতেছে ?

টুসুগানের মধ্যে কি ভাদুগানের মধ্যে যেমন আধুনিকতার 'হুল' প্রবেশ করিয়াছে কবিগানেও তেমনি ইহা সংক্রামিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া-হুগলী-অঞ্চলে প্রায়শঃ একটি ছড়া সুর-সহযোগে গাহিতে শোনা যায়। ইহা শাঁখারী-বেশে শিবের গৌরীকে শাঁখা পরান বিষয় লইয়া রচিত। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি-অঞ্চলে আজিও "চৌধুরীর লড়াই" এক দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ গানের আকারে শুনিতে পাওয়া যায়। নটী রঙ্গমালাকে কেন্দ্র করিয়া সিপুর-কাইতের রাজনারায়ণ চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্রের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে যে গৃহবিবাদ ও প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার বিষয়বস্তু। ইহা প্রাচীন পালাগানের ভাবসন্ততি হইলেও ইহার বিষয়বস্তু হয় সাধারণতঃ কোন জনপ্রিয় ও প্রায়শঃ প্রচলিত ঘটনা। ইহার সংগঠন হয় সরল এবং ইহাতে মাধুর্য থাকে প্রচুর। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ (পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ও মৈমনসিংহ-গীতিকার) "মহুয়া", "মলুয়া" প্রভৃতি আখ্যায়িকা-ছড়া আর পূর্বোক্ত "চৌধুরীর লড়াই", "শিবের শাখা পরান" ইত্যাদি। এ ছাড়া গ্রামীণ লোকজীবনের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা ও রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক জীবনের যে ছায়াপাত এই জাতীয় লোকসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। কবিগানেও এইরূপ আধুনিকতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের এক বিখ্যাত কবি প্রসন্নকুমার চন্দের বাংলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের উপর রচিত যে গানের উদ্দেশ পাওয়া যায় তাহার কতকাংশ এইরূপ :—

"ছিল ধন্য পুণ্য জন্মভূমি
মোদের সোনার বাংলা দেশ !
হায়রে—দুর্ভিক্ষ অনশনে এ দেশে বর্তমানে
হোল দুঃখ-দুর্গতির এক শেষ।

* * *

অন্নবস্ত্রের অভাবেতে দেশে
কুলবধূ ভ্রমে ভিখারিণীর বেশে
পিতা ত্যজে পুত্র কেবা কারে পোষে
পতি ছাড়ে সতী ;
জননী দুহিতা দেখে কি দেখ নারে ভাই
দেশের কি দুর্গতি।"

কবি হরি আচার্যের নিম্নোক্ত গানের কলি কয়টি অনেকখানি মুকুন্দ দাসের জাতীয়-ভাবাদর্শের গানের মতই শোনায়। বলা বাহুল্য, মুকুন্দ দাসও ছিলেন বরিশালের একজন গ্রাম্যকবি। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম দিকে তিনি একা-একাই গান বাঁধিয়া ও গাহিয়া গ্রামের লোককে মাতাইয়া তুলিতেন এবং তাঁহার গানকে "স্বদেশী গান" বলা হইত। পরবর্তী জীবনে তিনি কয়েকটি যাত্রাগানের উপযোগী পালা রচনা করিয়া দল বাঁধিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার এই-সকল যাত্রার পালায় কথা থাকিত অল্পই, গান থাকিত প্রচুর।

"হিন্দু মুসলমান্ এক মায়ের সন্তান
একই সূত্রে গাঁথা।
ভাই রে এক প্রাণে গাঁথা।
উঠিল জয়ধ্বনি মেদিনী প্রকম্পিতা।"

কবি মুকুন্দ দাসের ও ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের প্রভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অল্প পূর্বে ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে পূর্ববঙ্গের শহরে-শহরে ও গ্রামে-গ্রামে এমনই প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহাদের রচনা হইতে বহু লোক প্রেরণা লাভ করিয়া আপন আপন হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করিয়া আধুনিক রুচির গানের সীমা অনেকদূর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ রচনাকারীদের অন্যতম হইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের সেখ গুমহানি দেওয়ান ও চট্টগ্রামের রমেশ শীল। দাঁড়াকবি হিসাবে ইঁহারাও সাম্প্রতিক কালে প্রচুর যশোলাভ করিয়াছেন। গানের মধ্যে প্রাচীন ধারার অনুবর্তন করা ছাড়াও ইঁহারা স্বদেশের সৌন্দর্যের উপর, খাদ্য-সঙ্কটের উপর, দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গুণপনার উপর, বাঙ্গালীর দাসত্বের উপর নূতন নূতন গান বাঁধিয়া আধুনিকতার অনুসরণ করিয়াছেন। যেমন সেখ গুমহানি দেওয়ানের :—

(১) "ক্ষীরস্তন্যেতে ভরা মায়ের বক্ষস্থল,
আয় ভাই তুলে নিতে কোমর বেঁধে বল।
পাঁচনি লও হাতে পাগড়ি বাঁধ মাথে
দাসত্ব ঘুচাইতে চল ভাই মাঠে যাই।" ইত্যাদি

(২) "বাংলা আমার নয়রে কাঙাল
ধনে জনে পূর্ণ রয়।
পরের পানে থাকবে চেয়ে
সোনার বাংলা সে দেশ নয়॥
বঙ্গ মা তুই বিশ্বরাণীর
আদরের ধন দুলালী।
আপন রূপের উজল ছটায়
বিশ্বটাকে ভুলালি॥" ইত্যাদি

(৩) "পরের দাসখতে শুধু দস্তখত দিতে
আসনি এ জগতে, বহু কাজ আছে ভাই।
চিরদিন উমেদারি পেশা নয় তোমাদেরই
মনুষ্য দেহ ধরি তাতে প্রাণ রক্ষা করা চাই॥
প্রসবের বহু আগে করিবারে রক্ষে
সন্তানের তরে স্তন্য জননীর বক্ষে
সে দান না চেয়ে দেখে চক্ষে
পরের দ্বারে ভিক্ষে
কে দিল হেন শিক্ষে!
ছি ছি লাজে মরে যাই॥" ইত্যাদি

(৪) "সেথা আমি কি গাহিব গান!
যেথা নিত্য নবভাবে শত অভিনয়
শ্রেষ্ঠ গীতির স্থান॥
সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্র ভারতের চন্দ্র স্বয়ং যেথায় অধিষ্ঠান—
যাঁর মধুর কবিত্বে বিমুগ্ধ ধরণী, নিস্তব্ধ জগত্থান,
এশিয়া, ইউরোপ, ফ্রান্স, আমেরিকা, রুশিয়া, চীন, জাপান॥" ইত্যাদি

(৫) "প্রেম মন্দিরে
আছে সর্ববিশ্ব বন্দী রে!
ঘরের কপাট খুলে
ঘরকে গেলে
জীবের পুরে অভিসন্ধি রে!

তোমার যাহা প্রয়োজন
আছে সকল আয়োজন
অবারিত দ্বার, বাধা দেয় না কোনজন
লও যত ইচ্ছা তার নাইরে ওজন
সেথায় বদ্ধ ও মুক্তের সন্ধিরে।”

[সুধী প্রধান : “কয়েকজন লোককবি” হইতে]

ষড়ঙ্গ কবিগানের কলেবর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য বলিতে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যই প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে। ইহা কম নহে। ষড়ঙ্গের তিন অঙ্গ যথা—সখীসংবাদ, খেঁউড় ও আখড়াই—বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য। ভাবের দিক্ হইতে সখীসংবাদ ছাড়াও ঝুমুর-গান কীর্তনেরই অংশ মাত্র; তাহার অনুসরণ মাত্র দাঁড়া-কবিগানে দেখিতে পাওয়া যায়। খেতুরের স্মৃতিপূত খেঁউড়-গান শুরু হইয়াছিল একদিন শাশ্বত পুরুষপ্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে কেন্দ্র করিয়া। কালক্রমে ইহার অলৌকিক স্বভাব লৌকিক স্বভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সখীসংবাদের নানাদিক্ লক্ষ্য করিলে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব পদে-পদে দেখা যায়, যেমন—

বৈষ্ণব প্রভাব

অভিসার—রূপাভিসার

(পদাবলীর ও কবিগানের)

লালু—ও কি অপরূপ দেখি শুনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী।
ইত্যাদি—পৃঃ ৪৮

বলরাম—চান্দবদনী ধনী করু অভিসার।
নব-নব রঙ্গিণি রসের পসার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ-কিঙ্কিণি বাজ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুনু-ঝুনু।
মদন বিজই কাম হাতে ফুলধনু॥

গজেন্দ্র গমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণী শিরোমণি কানু মনমোহিনী॥
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে রাই মুরলীর স্বরে॥

বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে অভিসার-বিষয়ক পদ কবি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ-দাস, বলরামদাস প্রভৃতির বিখ্যাত। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রারম্ভ শ্লোকে অভিসারের উল্লেখ আছে। কবি জয়দেবের পর অভিসার-বিষয়ক বিদ্যাপতির পদ যেমন বিস্তারিত তেমনি সুন্দর। ইহার আরও বিস্তার ও মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে কবিরাজ গোবিন্দদাসের পদগুলিতে ও কবি বিহারী-লালের 'সতসঈ' কাব্যের অন্তর্গত অভিসার-বিষয়ক পদে। বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণে দাঁড়াকবি লালুনন্দলাল-রচিত পদটি আরও বিস্তারিত। ইহার আখ্যা "রূপাভিসার" বলিয়া এখানে কবির দৃষ্টি নায়িকার রূপ ও সজ্জার উপর
।

খণ্ডিতা—ভোর (প্রভাতী)

(পদাবলীর ও কবিগানের)

জয়দেব—হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়া বিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিম্ ধাবসি॥

চণ্ডীদাস—ছুঁইও না ছুঁইও না বন্ধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥ ধ্রু॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥ ইত্যাদি

রাম্ন-নৃসিংহ—প্রাণনাথ মোরো সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপ দরশনো আজু প্রভাতে। ইত্যাদি

নায়িকাকে বঞ্চিতা করিয়া নায়ক কোন প্রতিনায়িকার কুঞ্জে রজনী যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে নায়িকার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তখন সেই বঞ্চিতা বা খণ্ডিতা নায়িকা নায়ককে তিরস্কার ও বিদ্রূপাদি করেন। এই বিষয় লইয়া বহু পদ রচনা করা হইয়া গিয়াছে। উপরে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যে অংশ উদ্ধার করা হইল তাহার সহিত বৈষ্ণব মহাজন চণ্ডীদাসের পদের যথাযথ সাদৃশ্য না থাকিলেও নায়কের অবস্থার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আমরা পূর্বাপর রূপ সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে উভয়ের রচনার উল্লেখ করিলাম। পরবর্তী কালে খণ্ডিতা-আখ্যাযুক্ত পদের মধ্যে নায়কের মূর্তি-বিশ্লেষণ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত পূর্বগামী উদ্ধৃত রচনাংশে প্রদত্ত নায়কের রূপের সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্য উদ্ধৃতি করা আমাদের উদ্দেশ্য। চণ্ডীদাসের পদটি কিন্তু প্রকৃতির দিক্ হইতে জয়দেবের পদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চণ্ডীদাসের পদে আমরা নায়ককে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে দেখিতে পাইতেছি, তাহার সুর সেইরূপ বিদ্রূপের। বর্ণনা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব মহাজন সম্ভোগের কতকগুলি লক্ষণ উপমা-সহযোগে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বিকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহার রসমাধুর্য উপমার ধ্বনিব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট।

দাঁড়া-কবিগানের খণ্ডিতা-বিষয়ক গানগুলিতে বৈষ্ণব মহাজনগণের ভাবানুসরণ ও বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ধৃত রাসু-নৃসিংহের পদটিতে খণ্ডিতা নায়িকাকে আমরা নায়ককে শঙ্করের সহিত উপমিত করিতে দেখিতে পাইতেছি। এই উপমার মূল বীজ জয়দেবের উদ্ধৃত রচনাংশের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

রাসু-নৃসিংহের পদটিতে সেই মূল বীজ যেন এক বনস্পতিতে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ ভাবের পরিস্ফুটন ও বিস্তার ঘটিয়াছে। নায়কের অঙ্গে মুদ্রিত গত রজনীর সম্ভোগের চিহ্নগুলির প্রত্যেকটি শঙ্করের কোন-না-কোন চিহ্নের সহিত উপমিত হইয়াছে। এইভাবে কল্পনা-চতুর কবিদ্বয় সুললিত বর্ণনার দ্বারা হরিকে হর প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা কোন তুচ্ছ কবিত্বের মান নহে।

বিরহ

(পদাবলীর ও কবিগানের)

নিত্যানন্দ বৈরাগী—ব্রজে কি সুখে রোয়েছে
কি দশা ঘটেছে।

যে শ্যামসুন্দরো বিহনে
দেখ না ওগো রাই
বনের পশু পক্ষী আদি ঝুরিছে ইত্যাদি

ভবানী—শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি
লুকালে কি প্রাণহরি ও প্রাণহরি।
এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি!
হরি ভয় কি মনে করি, মরি বলে হরি হরি॥

বলরাম—ধরণী শয়নে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
উঠিতে বসিতে নারে কাঁপে কলেবর॥

বিদ্যাপতি—সখি হামার দুখক নাহি ওর
ঈ ভরা বাদর ই মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

বিরহ নায়িকার চিরন্তন সাথী। মিলনের তুলনায় পূর্বে ও পশ্চাতে ইহার বিস্তার সাগরবৎ। তাই বৈষ্ণব মহাজনেরা বিরহ-বিষয়ক পদগুলিতে নায়িকা শ্রীমতীর বিরহের দশম দশার বিকার বর্ণনা করিতে চতুর্মুখ। বৈষ্ণব মহাজনগণ শত-শত সুন্দর পদের দ্বারা শুধু নায়িকা কেন, প্রতি-নায়িকাগণকে বৃন্দাবন, যমুনা ও বৃন্দাবনবাসী ইতর জীবকুলও, এককথায় বৃন্দাবনের সমগ্র প্রকৃতিকে করুণ রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বৃন্দাবন অন্ধকার, পক্ষী ও ভ্রমরকুল নীরব, যমুনা উজানহীন ও গোপীগণ অর্ধমৃতা। উপরে উদ্ধৃত মহাজনগণের পদে এইরূপ ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। পরবর্তী কালের দাঁড়াকবিরা এই একই ভাবের শত-শত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ-সকল গানের মধ্যে নানা দিক্ হইতে ভাবের বিস্তার ঘটিয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গি কখনও ব্যক্তিগত কখনও বস্তুগত হইলেও লক্ষ্য সব সময়ে নিবিড় করুণতার মধ্যে নিবদ্ধ।

প্রেমবৈচিত্ত্য

(পদাবলীর ও কবিগানের)

বলহরি—'রাই' বলে রাই কেন সই করিছে রোদন।
রাধাকৃষ্ণ দুইজনে
বসিয়ে সিংহাসনে বিভোর দেখিলাম নয়নে ;

ঐ শ্রীরাধিকার নয়নজলে
ভাসে রত্নসিংহাসন। (পৃঃ ১২৫)

গোবিন্দদাস—শ্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহু মুঝ মিটব
অমিয়া করব সিনান।
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহু মুঝ মিটব
অমিয়া করব সিনান।

প্রেমবৈচিত্ত্য পদাবলী-সাহিত্যের ভাবকূট। মিলন বা সম্ভোগ-কালে নায়িকার মনে যে বিবিধ বিষয়ের চিন্তা বা ভাব দেখা যায় তাহা কেবল রমণী-জাতিতে সম্ভব। ইহাদের লঘুচিত্ততা, কলহ, ঈর্ষ্যা, প্রভৃতি ব্যাপার সর্বজন-বিদিত। মিলন বা সম্ভোগ-কালেই নায়িকার মনে যে বিক্ষোভ দেখা যায় তাহারই ফলে সে নানা অপ্রাসঙ্গিক উক্তি করিয়া থাকে। এই অপ্রাসঙ্গিক উক্তিকে বিষয়বস্তু করিয়া গড়িয়া উঠে প্রেমবৈচিত্ত্যের পদাবলী।

উপরি-উক্ত গোবিন্দদাসের পদে তাই কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত অবস্থায় চিরমিলনাভিলাষিণী শ্রীরাধা আয়ত্তের মধ্যে নায়ককে পাইয়াও যেন পান নাই, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

ইহারই অনুসরণে বলহরি দাসের প্রেমবৈচিত্ত্যের পদটি কিছুটা ভিন্নরূপে দেখা যায়। এখানে নায়ক-নায়িকার মনোভাব এক হইয়া যাওয়ায় একটি শব্দ নির্গত হইতেছে তাহা 'রাই'। মিলনানন্দে আত্মহারা হইয়া নায়কের মুখের ধ্বনি কাড়িয়া লইয়া নিজমুখে বলিতেছেন ও কাঁদিতেছেন। এইরূপ পদে এবং এইরূপ উক্তির মধ্যে নায়ক ও নায়িকার দুইজনের দুই বিভিন্ন ভাবের সাম্য বা সম্মেলন ঘটিয়াছে। এখানে আত্মহারা শ্রীরাধার মহাভাব-অবস্থায় হরি বা শ্রীকৃষ্ণ শব্দ বিনির্গত হয় নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়-সমাগমে আনন্দ-প্রবাহ সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। সেই আনন্দের মত্ত অবস্থায় পূর্বাপর চিন্তায় নায়িকা প্রিয়মুখের বাণী আপনি প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। যে নায়ক মুরলীরবে সদাই রাধা নাম ধ্বনিত করেন, যে নায়ক আপনার বশ্যতা জানাইতে দাসখতে

"মহা-মহিম-মহিমান্বিতা শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী" চরণে লিখিয়া উপহার দেন, আবার যে নায়কের জন্য নায়িকা "হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্"—এইরূপ আদর্শ নায়ক-নায়িকার সম্মেলন-চিত্র ভাষায় পরিস্ফুট করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও, দাঁড়া-কবিগানের কবি বলহরি দাস ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা ইহাকে কত অল্পেই না রূপদান করিয়াছেন। History of Bengali Literature in the 19th Cent. গ্রন্থে Kabiwalas অধ্যায়-মধ্যে (pp. 302—386) Dr. S. K. De মন্তব্য করিয়াছেন যে, কবিওয়ালারা প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনের অনুসরণ করিলেও যে-সকল বিষয় ভাবের কঠিনতার জন্য দুরূহ, সে-সকল বিষয় লইয়া কোন পদ রচনা করেন নাই।

সখীসংবাদ বলিতে কবিওয়ালাদিগের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বিভিন্ন দিকের দেখা পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ভাবকূট বা সূক্ষ্মভাবসম্পন্ন প্রেমবৈচিত্ত্যের কোন পদ পাওয়া যায় না। সুতরাং কবিগান ভাবের দিক্ হইতে লঘু সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। কিন্তু আমাদের সন্ধানে অন্যরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছে এবং সাহিত্যের মানবিচারে যাহা প্রমাণ হইতে পারে তাহাই আমরা এখানে যথাযথ দেখাইলাম।

মাথুর

(পদাবলীর ও কবিগানের)

বিদ্যাপতি—হরি গেও মধুপুর, হম কুলবালা
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা। ইত্যাদি

(২) কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিনরজনী। ইত্যাদি

(৩) অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি। ইত্যাদি

রঘুনাথ—কিসে প্রাণবিহঙ্গ বাঁচে বল
কৃষ্ণের আশালতা যদি ভাঙ্গিল॥

করি মর্ম্মচ্ছেদ, দারুণ সংবাদ
বৃন্দে শুনালে আমায় !
শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ
দেহে প্রাণ ত রাখা হল দায়॥ ইত্যাদি

অক্রূর-সংবাদে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন গোপী নায়িকাগণের মধ্যে যে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে, তাহাতে নায়িকা শ্রীমতীকে সর্বাধিক বিড়ম্বিত-রূপে দেখা যায়। তাহার দুঃখ-দুর্ভাবনার অন্ত নাই, আসন্ন-বিরহ-চিন্তায় তিনি মূর্ছামলিন, প্রায় মুমূর্ষু। সখীগণ আপন আপন দুঃখ ভুলিয়া শ্রীমতীকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, আবার শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাগমনে নিষেধ করিতে ও বাধা দিতে উদ্যত। শ্রীমতীসহ গোপীগণের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া অক্রূরসহ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় যাত্রা ও সেখানে কুব্জার সহিত মিলন, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার দশম দশার সংবাদ দিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য দূতীরূপে বৃন্দার মথুরায় গমন, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার সংবাদ-প্রদান, তিরস্কার, লাঞ্ছনাদি এবং রাধার সমীপে প্রত্যাগমনের বিষয় লইয়াই মহাজনগণের মাথুর পদগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদাংশে যে ভাব প্রকট তাহার অনুসরণ দাঁড়াকবি রঘুনাথের গানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাবসম্মেলন

(পদাবলীর ও কবিগানের)

বলরাম—কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি
ছি ছি শরদের চাঁদ ভিতর কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতেক আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াইয়ে পুতলী। ইত্যাদি

চণ্ডীদাস—চকোর পায়ল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রস ভর দুহু তনু থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুক মিলনে আজি নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর॥ ইত্যাদি

জ্ঞানদাস— শুন শুন ওহে পরাণপিয়া
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া।
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

গোঁজলা গুঁই—তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহপ্রাণ, তুমি লো ছায়া। ইত্যাদি

শাশ্বত প্রকৃতি ও পুরুষ বহুবাঞ্ছিত মিলনের মধ্যে পরস্পরকে সমানভাবে গ্রহণ করিলে যে ভাষা অর্থাৎ উপমা, উৎপ্রেক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্খলিত হয় আমরা বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে সেই সময়োচিত ও উপযোগী ভাব ও ভাষার আয়োজন ও বিন্যাস দেখিতে পাই। পুরুষ ও প্রকৃতি একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই একে অন্যের পরিপূরক। এই ভাব সাধারণতঃ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্বের দ্বারা, অগ্নি ও অগ্নির তাপের দ্বারা উপমিত হয়। আবার কখনও কখনও দেখা যায় কবিরা অবিচ্ছিন্নতা বুঝাইতে দেহ ও প্রাণের কায়া ও ছায়া, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিতেছেন। তাই মহাজন-পদাবলীতে কমলিনী ও মধুপের, চাঁদ ও চকোরের উপমা যেমন দেখিতে পাই, তেমনি কবি গোঁজলা গুঁইয়ের গানে কমলিনী ও ভৃঙ্গের, ভুজঙ্গের ও ভুজঙ্গের মণির, কায়ার ও ছায়ার এবং ব্রহ্ম ও মায়ার উপমা ব্যবহৃত হইতেছে দেখিতে পাই। তুলনার দ্বারা বোঝা যায়, পরবর্তীটি পূর্বের অনুসরণ মাত্র, অনুকরণ নহে, অর্থাৎ ভাবের দিক্ হইতে পরবর্তী কবি গোঁজলা গুঁই পূর্ববর্তী বৈষ্ণব মহাজন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ঐতিহ্যের জের টানিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের দেশ ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যাপার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ভাবের দিক্ হইতে ঋণী হইলেও ভাষা ও ছন্দ কবির নিজস্ব।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় মঙ্গলকাব্যগুলিকে 'পাঁচালী' আখ্যাতে অভিহিত করা হইত। তাহার কারণ, নাটমঞ্চে কি চণ্ডীমণ্ডপে বিশেষ-বিশেষ মঙ্গলকাব্য যে সুর-লয় সংযোজনায় গাওয়া হইত তাহা পাঁচালীর। সুতরাং যেমন পড়িবার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী পয়ারের ছন্দে ঐ মঙ্গলকাব্যগুলি পড়া হইত, তেমনি বাদ্যের সঙ্গে গাওয়া হইলে তাহা পাঁচালীর ছন্দে গাওয়া হইত। পয়ার ছন্দের মত পাঁচালীর সুর বাঙ্গালীর বহুকালের পুরান নিজস্ব জিনিস। পঞ্চাঙ্গ গীতকে পঞ্চাবলী বলা হইত। পদাবলী শব্দের আনুরূপ্যেই পঞ্চাবলী>পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা শব্দ গঠিত হইয়া থাকিতে পারে। পরবর্তী কালে পঞ্চাবলী শব্দ পাঞ্চালী ও পাঁচালীতে পরিণত হইয়াছে। পাঁচালীর পাঁচটি বিভাগের নাম ছিল উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, অন্তরা, ধ্রুবপদ ও আভোগ। ইহা ছাড়া, পদাবলী ও পাঞ্চালীর মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, পদাবলী হইত সমধ্রুবা ও পঞ্চাবলী হইত বিষমধ্রুবা।

বাংলা কবিগানের সুর ও ছন্দ

মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যের শেষ পর্বে বৈষ্ণব-পদাবলীর আনুরূপ্যে যেমন একদিকে লোকসাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে শাক্ত-পদাবলীর উদ্ভব হয়, তেমনি অন্যদিকে কবিগানেরও উদ্ভব হয়। স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেই শাক্ত-পদাবলী ও কবিগানের উদ্ভব হয় কলিকাতার আশেপাশে, কলিকাতায় ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি লোকসাহিত্যের নূতন রূপ প্রাচীন মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যেরই রূপান্তর মাত্র।

তাই মঙ্গলকাব্যের পাঁচালীর সুরই কবিগানের সম্বল হইয়াছিল, তবে পরবর্তী যুগে পাঁচালীর সুরের সহিত পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত নন্দিনীর স্বর, পদ, তেন, পাঠ ও তাল[১]ও যুক্ত হইয়াছিল। তাই এখন আমরা কবিগানের সুরলয়ের চিহ্নস্বরূপ যে শব্দগুলি অর্থাৎ termsগুলি পাইতেছি সেগুলি সঙ্কর শব্দ (hybrid words), যেমন—(১) চিতেন শব্দটি গঠিত হইয়াছিল—"চিত্রপদা"

১ স্বর—সুরের আলাপ, পদ—গানের কলি বা অংশ যাহা প্রথম গাওয়া হয়; তেন—বাদ্যের সূচনা পদের সহিত মিলাইয়া; পাঠ—পদের পরবর্তী অংশ; তাল—লয় অনুযায়ী তান তোলা।

বা "চিত্রকলা"র "চিত্র" অংশ ও নন্দিনী সঙ্গীতের "তেন" (চিত্র+তেন> চিত্তেন>চিতেন) লইয়া। (২) চিতেনের পরবর্তী আভোগ অংশকে "পর-চিতেন" বলা শুরু হইয়াছিল। যাত্রাগানের "মহল্লা" ও "মহড়া" শব্দ একই, ইহা "উদ্‌গ্রাহক" শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে শুরু হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। (৩) "ধ্রুবপদ" শব্দ হইতে "ধুয়া" শব্দের অবতরণ ঘটিয়াছে। (৪) "মেলাপক" শব্দের মেল অংশের সহিত "তাল" শব্দের তা অংশ যুক্ত হইয়া "মেল্‌তা" হইয়াছিল। আর (৫) "অন্তরা" শব্দের পরিবর্তে "খাদ" ও "ফুকা" শব্দ ব্যবহৃত হইতে শুরু হইয়াছিল। "পাঠ" শব্দ হইতে "পাড়ন" শব্দ, "তাল" হইতে "দোলন" শব্দ আসিয়া থাকিতে পারে। মোটকথা, কবিগানের আভোগ অংশ পরচিতেন, পাড়ন, দোলন ও "স্বর"-বাচক "সয়োরি" লইয়া গঠিত হইত। তাহাই উদ্‌গ্রাহকের নামান্তর। কোন কোন গানে প্রথমেই চিতেন আবার গানবিশেষের প্রথমেই মহড়াপদ দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্য গ্রহণ ও সঞ্চারে কোনসময়ে কোনখানে গোলমাল ঘটিয়া থাকিতে পারে। পাঁচালী শব্দেরও উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। যেমন, ডক্টর সুকুমার সেন অনুমান করেন, পুত্তলিবাচক "পাঞ্চালিকা" শব্দ হইতে বর্তমান পাঁচালী শব্দের অবতরণ ঘটিয়াছে; আবার অপর পক্ষ অনুমান করেন, দাঁড়াগানের বিপরীত "পায় চালি" শব্দ হইতে পাঁচালী শব্দ আসিয়াছে। এ ছাড়া আমাদের যাহা অনুমান তাহা পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি।

এখন কবিগান যেভাবে গাওয়া হইত তাহার পরিচয় দিব। কবির দলে মূল গায়েন (<গায়ক) একজন বা দুইজন ছাড়া দোহার দুই বা চারিজন থাকিত। মূল গায়েনকে কবি বা কবিয়াল (<কবিপাল) বলা হইত, আর দোহারকে দোহার্‌কা (<দোহারক <ধারক) বলা হইত। লালচন্দ্র ও নন্দলাল ওরফে লালু-নন্দলাল ও রাসবিহারী ও নৃসিংহ ওরফে রাসু-নৃসিংহ এইরূপ একই দলের দুইজন মূল গায়েন ছিলেন। মূল গায়েন বা কবি চিতেন বা মহড়া দিয়া কোন পালাগানের সূচনা করিতেন—সুর পাঁচালীর অর্থাৎ বিষমধ্রুবা হইত। সেই স্বর লইয়া অর্থাৎ সেই স্বরের রেশ টানিয়া লইয়া অন্য মূল গায়েন বা সেই মূল গায়েনই পরচিতেন-এর পদ সৃষ্টি করিতেন। ইহার পর পদ ও তেন অংশ দোলন, পাড়ন ও সয়োরির[১] দ্বারা রচিত হইত, আর তাল বলিতে ফুকা ও খাদ

১ সংগীতের সম্ভোগ অংশ

অংশ পর্যন্ত মূল গায়েন ও দোহাররা মিলিয়া গাহিতেন। কেবল ধুয়া অংশ দোহাররা নিজেরা গাহিতেন ও তখন মূল গায়েন নীরব হইয়া থাকিতেন। এইভাবে পালাগান, সখীসংবাদ, গৌরচন্দ্রিকা বা ভবানীবন্দনা প্রভৃতি গাওয়া হইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে কবিগানের তিন রূপ দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে গৌরচন্দ্রিকা, ভবানীবন্দনা ও কবির লহরেই প্রযুক্ত হইত। অবশ্য, তাঁহার উল্লিখিত কবিগানের ঐ তিন রূপ—মহড়া, চিতেন ও অন্তরা প্রধান বটেই। নিরীক্ষার ফলে স্থিরভাবে বুঝা যায় যে পদাবলী কীর্তনের সর্বগ্রাসী প্রভাব এই বিষমধ্রুবা পাঁচালী গানের উপরও পড়িয়াছিল, তাই উদ্‌গ্রাহক, আভোগ, মেলাপক, ধ্রুবপদ ও অন্তরাকে সমঞ্জস হইতে হইয়াছিল স্বর, পদ, পাঠ, তেন ও তালের সহিত। ইহারা নন্দিনী সঙ্গীতের অঙ্গ। ইহা ছাড়া, চিত্রপদা বা চিত্রকলার সহিতও পাঁচালীর সন্ধি ঘটিয়াছিল এই কবিগানে।

একটি কবিগান উদ্ধৃত করিয়া পূর্বোক্ত অংশ বা অঙ্গগুলি এবার দেখান যাক :—

১। মহড়া—কুব্জার সাধ্য কি সই,
চুরি করতে পারে চোরের ঘরে।

২। খাদ—আমার মন বাঁধা আছে রাধার প্রেমডোরে॥
কুব্জার সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে
ফুকা—ছিল স্থূর্পণখার বাসনা, মনে প্রেমবাসনা
তার অন্য বাসনা নাই, মনে ছিল তাই।
দ্বাপরে সে কুব্জা হয়ে দাসী হোল কংসালয়ে
আমি তারে সদয় হয়ে মনের সাধ পুরাই।

মেলতা—রাধার ভাবেতে ভঙ্গী বাঁকা নূতন বাঁকা
বাঁকা সখা হে।
নাম বাঁকামদনমোহন ব্রজপুরে॥

চিতেন—বল্‌লে সই চোরের মন নেয় চুরি করে।
কুব্জা নয় মনোচোর, আমার নহে অগোচর,
মিথ্যে চোর বোলো না তারে॥

পাড়ন—সে যে কোন অপরাধী নয়, আছে এই মথুরায়
ছিল যে তার সাধনা, পূর্ব্বের সাধনা হে হায়-হায়!

* * *

মেলতা—সখি তাই রব মধুপুরে।
শত বৎসর হলে শাপান্তর হে,
সব জ্বালা যাবে রাধার প্রভাসের তীরে॥

৫। অন্তরা—আমি শ্রীরাধার জন্যে বৃন্দাবনে
ধেনু লয়ে রাখাল হয়ে যেতাম বনে রাখাল সনে
শ্রীরাধার প্রেম কর্জ্জ বলে
দিলেম দস্তখত লিখে সে গোকুলে
জানে সকলে।
তোমরা সব সখী সেই খতের সাক্ষী
জন্মের মত বাঁধা রাই চরণে॥

চিতেন—করেছি আমি ব্রজের ননী চুরি।
কুব্জা কংসের দাসী, সে নয় দোষের দোষী,
সব দোষী আমি শ্রীহরি॥

পাড়ন—করতে প্রেমলীলে ব্রজপুরে, ব্রজগোপীর ঘরে,
চুরি করতেম ক্ষীর সর।
মাখন ক্ষীর সর হায় হায় হে।

মেলতা।—আমি ভক্তিতে নন্দের বাধা বইতেম মাথায়
রাধার প্রেমের দায় হে।
চোরা নাম আছে আমার ত্রিসংসারে॥

এখানে আমরা পাঁচালী সুরের পাঁচটি অঙ্গ যথাযথভাবে পাইতেছি না বটে, পাঁচটি অঙ্গই যে প্রতিটি কবিগানের সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া দেওয়া থাকে এমনও নহে। কবিগানের পৃথক্ পরিপুষ্টির ধারা আমাদের চোখে যে যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লোকসাহিত্য হিসাবে প্রমাণিত করিতে চলিয়াছে, ইহা তাহারই স্বপক্ষে একটি নিদর্শনমাত্র। এই গানে ধুয়া

বা ধ্রুবপদের অনুপস্থিতি, দোলন, সয়োরি, পরচিতেন প্রভৃতি পদের অভাব নিরর্থক নহে। এখানে পাড়ন ও মেলতা (=পাঠ ও মেলাপক), দোলন, সয়োরি ও পরচিতেন-এর পরিবর্তে বসিয়া তাহাদের কাজ করিতেছে। আবার ধুয়া-র (=ধ্রুবপদের) কাজ করান হইয়াছে খাদ ও ফুকার দ্বারা, আর খাদ ও ফুকা বলিতে "অন্তরা" যথাযথ বসায় নামের দিকে হইতে না হইলেও কার্যতঃ পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পূর্ণরূপই আমরা এখানে পাইতেছি। এমন বহু কবিগান রহিয়াছে যেখানে পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিন বা চারিটি অঙ্গের দর্শন মিলে এবং তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এইরূপ বহু গান কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে, যেখানে তিনটি অঙ্গমাত্রের উল্লেখ ও পুনরাবৃত্তি দেখা যায় :—

"কদম্বতলে কে গো বাঁশী বাজায়" ইত্যাদি (হরু ঠাকুর)

গানের কলেবর পুনরাবৃত্তির কারণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। তিনটি অঙ্গ বলিতে মহড়া, চিতেন ও অন্তরার উল্লেখের কারণ সঙ্গীতাঙ্গ-স্বরূপ মহড়া উদ্‌গ্রাহকের প্রতিরূপ, চিতেন আভোগের ও অন্তরা ধুয়ার প্রতিরূপ হিসাবে গৃহীত ও প্রযুক্ত হইতেছিল। গানের কলেবর অদীর্ঘ হওয়ায় ইহা অল্পসংখ্যক গায়কের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং এইরূপ পুনরাবৃত্তির প্রচলনের ফলেই গানের বিভাগ বুঝাইতে ১ম চিতেন, ২য় চিতেন, ১ম মেলতা, ২য় মেলতা, ১ম ফুকা, ২য় ফুকা প্রভৃতি সংজ্ঞার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ অনুমান করা যায় যে পরচিতেন সংজ্ঞাটিও ২য় চিতেন হিসাবেও প্রযুক্ত হইতে শুরু হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের বিন্যাস বা সংস্থানে বৈচিত্র্য কালক্রমে গানগুলিকে এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল যাহার ফলে মূল সঙ্গীতরূপ কবিগানের বিকাশের ধারা দূর হইতে দূরে অগ্রসর হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের কবিগানের সুর

পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত মূল হইলেও কালক্রমে কবিগানের সুরের বিকাশের ধারা পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ববঙ্গেও পৃথক্ পথ ধরিয়া চলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মিয়াছিল এখানে সেগুলি দেখাইয়া ব্যাখ্যা করা হইবে। যশোহর-খুলনায়—কবিগানে চিতান, পরচিতান, পড়তা, ১ম ফুকর, মুখ, পৈঁজ, খোঁজ, ২য় ফুকর, পরফুকর, পরখোঁজ ও অন্তরা প্রভৃতি সঙ্গীতাঙ্গ-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের চিতেন=পূর্ববঙ্গের চিতান ; পশ্চিমবঙ্গের ফুকা=পূর্ববঙ্গের ফুকর ;

পশ্চিমবঙ্গের পরচিতেন = পূর্ববঙ্গের পরচিতান ; পশ্চিমবঙ্গের পাড়ন — পূর্ববঙ্গের পড়তা ও পারানি। পেঁজ ও খোঁজ প্রকৃতপক্ষে পেঁচ্ (= প্যাচ) ও খোঁচ্— পশ্চিমবঙ্গের খাদ-এর সমান। শুধু পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের সহিত পূর্ববঙ্গের কবিগানের পার্থক্য হইত এই-সকল অঙ্গবিন্যাস বা সংস্থানের বিভিন্নতায়। এ ছাড়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে মূল পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা পাঁচালীর রূপ পূর্ববঙ্গের কবিগানেও ভিন্নরূপে বজায় আছে ; যেমন—

পূঃ বঃ ১। চিতান পাড়ন	পঃ বঃ ১। চিতান বা মহড়া পরচিতান	১। পাঁচালীর উদ্‌গ্রাহক।
পূঃ বঃ ২। ১ম ফুকর পরফুকর	পঃ বঃ ১। খাদ ফুকা	৩। পাঁচালীর মেলাপক।
পূঃ বঃ ৩। মুখ পেঁজ খোঁজ	পঃ বঃ ২। মেলতা ও চিতেন বা পড়তা বা দোলন বা সয়োরী	২। পাঁচালীর আভোগ।
পূঃ বঃ ৫ বা ৪ ২য় ফুকর পরখোঁজ পরচিতান	পঃ বঃ ৫। ধুয়া	৫। পাঁচালীর ধ্রুবপদ।
পূঃ বঃ ৪ বা ৫ অন্তরা	পঃ বঃ ৪। অন্তরা বা খাদ বা ফুকা	৪। পাঁচালীর অন্তরা।

এখন দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে কবিগানের বিকাশের মধ্যে পাঁচালীর পঞ্চাঙ্গ সঙ্গীত স্বীকৃত হইলেও উহা যেমন অঙ্গসংস্থানের দিক্ দিয়া পৃথক্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল তেমনি পূর্ববঙ্গেও মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের নিকট ঋণী হইলেও, কবিগানে গীত-পঞ্চাঙ্গ আরও স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথক্ বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াছিল। ফলতঃ পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে গাওয়ার ধরন বা পদ্ধতি বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিক্রমপুর হইতে মৈমনসিংহের মধ্যে কবিগানের পদ্ধতি বা গাওয়ার ধরন যশোহর খুলনা অঞ্চল হইতে কিছুটা পৃথক্ হইয়াছিল। গীত-পঞ্চাঙ্গ বিক্রম-পুর-মৈমনসিংহে অন্ততঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অঞ্চলে এইভাবে কবিগান গাওয়া হইত :—

যশোহর-খুলনা	বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ
১। চিতান বা মহড়া ও পাড়ন বা পারানি।	১। চিতান ও পরচিতান।
২। ১ম ফুকর ও পরফুকর।	২। মিল ও মহড়া।
৩। মুখ পৈঁজ ও খোঁজ।	৩। ধুয়া ও খাদ।
৪। অন্তরা।	৪। লহর।
৫। ২য় ফুকর, পরখোঁজ, পরচিতান।	৫। ঝুমুর।

অন্তরার পরিবর্তে বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অঞ্চলে "লহর" শব্দ ব্যবহৃত হইত এবং ধুয়ার পরিবর্তে "ঝুমুর" শব্দ প্রযুক্ত হইত। লক্ষ্য করা উচিত, পরবর্তী কালে এই দুটি শব্দ—লহর ও ঝুমুর—অর্থের প্রসার লাভ করিয়া কবিগানের এক দিক্ বা এক শাখার উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। লহর হইতে পরবর্তী কালে কবির লড়াই (< লহরাই) বা তরজার, ও ঝুমুর হইতে টপ্পা ও ঢপ্ সঙ্গীতের প্রবর্তন বাঙ্গলার সর্বত্র ঘটিয়াছিল। ঢপ্-সঙ্গীত আবার খেঁউড়ে (< খেতুড়) গিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম দিকে "লহরা" অন্তরা অর্থে ব্যবহৃত হইত। গানের অন্তরা স্বরের প্রবহমান অবস্থার বিজ্ঞাপক। সমবেত-কণ্ঠে দোহার ও গায়েন স্বরের রেশ টানিত। ইহার পর ধুয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত ঝুমুর শব্দ দ্রুত লয় ও তাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে শুরু হয়। ঝুমুর প্রকৃতপক্ষে দ্রুত তালের নৃত্যবাচক হিন্দী শব্দ। মনে হয় ধুয়াপদ গাহিবার সময় দোহারদের কেহ কেহ উঠিয়া নাচিযা স্বরলয়-সংগঠিত গানের পদবিশেষ গাহিয়া উহা শ্রোতৃবর্গের মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিত।

ঢপ্-সঙ্গীত ও খেঁউড় প্রায় সমার্থক শব্দ। ধামালি গান যেমন প্রেমিক-পুরুষের রূপ, বেশ ও পীরিতি-রসের গান হইত, তেমনি খেতুড় শব্দ হইতে উৎপন্ন আদিরসাত্মক খেঁউড় গানও ধামালির আদর্শে মুখে মুখে রচিত হইত। ধামালি গান খেতুড়েও গাওয়া হইত। সুতরাং যে-কোন অর্থেই হউক না কেন, খেতুড়ের ধামালি গানের আদর্শে রচিত আদিরসাত্মক গান তাই "খেউড়" বা 'খেঁউড়' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কবির লহরের মধ্যে যে পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিয়া যাইত, তাহার সূত্র ধরিয়া পরবর্তী কালে যে প্রশ্নোত্তর বা বাদ-প্রতিবাদের ধারা জন্মলাভ করে তাহাই তর্জ্জা (< তর্জ্জন) বা কবির লড়াই নামে অভিহিত।

কবিয়ালের জীবনী ও কবিগানের পরিচয়

গোঁজলা গুঁইয়ের পূর্ববর্তী কোনও কবিয়ালের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা যে-সকল কবিয়ালের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছি, তাহার মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। সংবাদ প্রভাকরে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত এই কবির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন :—

গোঁজলা গুঁই

"প্রায় ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল গোঁজলা গুঁই নামক এক ব্যক্তি পেশাদারী দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন। ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তৎকালে টিকেরার বাদ্যে সঙ্গত হইত।

"লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী—এই তিনজন* কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সঙ্গীত শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়। তিনি তন্তুবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও স্থর ভাল করিতে পারিতেন।"

গোঁজলা গুঁইয়ের আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

লালু-নন্দলাল ও রামজীর ন্যায় রঘুনাথও গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য ছিলেন। ইনিই রাসু-নৃসিংহ ও হরুঠাকুরের সঙ্গীতগুরু। রঘুনাথ দাসের জন্মকালের কোনও তারিখ পাওয়া যায় না; তবে তাহার শিষ্য রাসুর জন্মকাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, নৃসিংহের জন্মকাল ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, আর হরু ঠাকুরের জন্মকাল ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, রঘুনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও জীবিত ছিলেন। ইনি তন্তুবায়-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান শালিখা কি গুপ্তিপাড়া—তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। একটি লহর গানে তিনি নিজেকে 'সিমলেবাসী অধ্যাপক' বলিয়া আপনাকে বর্ণিত করিয়াছেন। কলিকাতায় সিমুলিয়ায় তাঁহার বাসস্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

রঘুনাথ দাস

হরু ঠাকুরের প্রথমাবস্থার গানগুলি রঘুনাথ দাস শুদ্ধ করিয়া দিতেন।

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ধারণা লালু-নন্দলাল একজন কবির নাম, তিনি এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই "তিনজন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ধারণা লালু ও নন্দলাল দুইজন কবির নাম।

কৃতজ্ঞতাবশতঃ হরু ঠাকুর তাঁহার অনেকগুলি সংগীতের ভণিতায় রঘুনাথের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

রঘুনাথ দাস দাঁড়া-কবিগানের প্রবর্তক হিসাবে প্রশংসা পাইবার যোগ্য। আমরা সর্বপ্রথম ইঁহারই গানে তরজার ভাব পাই।

ইঁহার রচিত সখীসংবাদের অন্তর্গত মাথুর ও বিরহ-বিষয়ক পদাবলী এক সঙ্গে ওজঃ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। বৈষ্ণব-ঐতিহ্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

রঘুনাথের ভবানীবিষয়ক গানগুলির অংশবিশেষ রামপ্রসাদের সঙ্গীতরূপ প্রাণ-রসের দ্বারা সঞ্জীবিত। তবে অন্যান্য সঙ্গীতে বিশ্বতত্ত্ব, দেহতত্ত্বের ব্যঞ্জনা এবং দেবীতত্ত্বের আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা কবি রঘুনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

রঘুনাথের কবির লহরগুলি অনুধাবন করিলে তাঁহার রচনার কুশলতা ও রসজ্ঞতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে তাঁহার রচনার মধ্যে স্থলে স্থলে যে অশ্লীলতার ভাব আসিয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

লালু-নন্দলাল

লালু-নন্দলালের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর কাগজে। এই পত্রিকায় লালু-নন্দলালের "হোলো একটু সুখলাভ পীরিতে, চিরদিন গেল কাঁদিতে ইত্যাদি" গানটি ভণিতাহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই কবির প্রসঙ্গে গুপ্তকবি সংবাদ প্রভাকরে লিখেন :—"লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী—এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়। তিনি তন্তুবায় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, গান ও সুর ভাল করিতে পারিতেন। লালু-নন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। এই তিনজন পুরাতন কবিওয়ালা।"

বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রিকায় এই কবির বাসস্থান সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়, "কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া নিবাসী লালু-নন্দলাল বিখ্যাত ছিল।"

সম্প্রতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "ব্রিটিশ মিউজিয়মে বাঙ্গালা কাগজপত্র" নামক প্রবন্ধে একটি পুরানো গানের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেখিতে পাই। এই গানটিতে লালু-নন্দলালের ভণিতা দেখা যায়। পদটির শেষ পঙক্তিদ্বয় এইরূপ :—

"লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায় চলেছ লো বিনোদিনি।
নন্দলাল ভণে চেয়া আমা পানে হেসে কথা কহ শুনি॥"

বর্তমান গ্রন্থে লালু-নন্দলালের যে কয়েকটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি পদের ভণিতা এইরূপ,—নন্দলাল ভণে, লালু ভণে, লালচন্দ্র, লালু ও নন্দলাল ভণে। ইহাতে আমাদের অনুমান এই যে, লালু-নন্দলাল এক ব্যক্তির নাম নহে, দুই ব্যক্তির নাম। ইঁহাদের মধ্যে একজন গায়েন ও অন্যজন কবিগানের রচয়িতা।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে শ্রাবণ, ১৩৩৪ সনে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লালু-নন্দলালের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই কবিদ্বয়ের সম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যায়।

বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদকের মতে লালু-নন্দলালের নিবাস চুঁচুড়া; ভারতবর্ষে লিখিত প্রবন্ধকারের মতে উক্ত কবিদ্বয়ের নিবাস বীরভূম। বীরভূম হওয়ার কারণ, লালু-নন্দলালের অনেক গানে বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুলী, বক্রেশ্বর, গোদাকুড়ির আখড়া ও মুড়মাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুড়মাঠের একজন সদ্গোপ ও বরুলের সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলহরি রায় লালু-নন্দলালের শিষ্য ছিলেন। 'গোদাকুড়ির আখড়া'র কোন কালেও খ্যাতি ছিল না। কিন্তু গানে তাহারও উল্লেখ থাকায় প্রবন্ধকার মনে করেন যে কবি লালু-নন্দলালের বাসস্থান বীরভূম জেলায়। বীরভূমে বলহরি রায় ব্যতীত কালো পাল নামে আর একজন কবিওয়ালাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এই কালো পালের প্রকৃত নাম হারাধন পাল। মুড়মাঠে পালের গড় ও ভিটা এখনও বর্তমান আছে।

আমাদের অনুমান এই যে, বীরভূমই কবিদ্বয়ের জন্মস্থান। তবে পরবর্তী কালে এই দুই কবি চুঁচুড়ায় কোনও স্থানে চলিয়া আসিয়া থাকিবেন।

লালু-নন্দলালের আবির্ভাবের কাল সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহারা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমকালীন লোক ছিলেন—ইহা একপ্রকার নিশ্চিত করিয়াই বলা যায়।*

রঘুনাথের শিষ্য রাসুর জন্মকাল, ১৭৩৫ খ্রীঃ, নৃসিংহের, ১৭৩৮ খ্রীঃ, হরু

---

* তখন ভারতচন্দ্র লেখক, কবিওয়ালা নন্দলাল, কীর্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণ-বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি, যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম সুবল।

যাত্রার ইতিবৃত্ত—বঙ্গদর্শন, ১২৮৯

ঠাকুরের জন্মকাল ১৭৩৯ খ্রীঃ, লালু-নন্দলালের অন্যতম শিষ্য নিতাই বৈরাগীর জন্মকাল ১৭৫১ খ্রীঃ। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য রঘুনাথ দাস, লালু-নন্দলাল প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাদে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন।

আমাদের সঙ্কলন-গ্রন্থের মধ্যে কবিদ্বয়ের সখীসংবাদ, ভবানীবিষয়ক, কবির লহর ও গৌরচন্দ্রীর পদ দেখা যাইবে। সখীসংবাদের পদগুলি যেমন করুণ, তেমনি মধুর। ইহাদের বিরহ-বিষয়ক পদগুলি আক্ষেপ ও আকূতিতে ভরা। ইহাতে বৈষ্ণব মহাজনদিগের পরোক্ষ প্রভাব থাকিতে পারে। এই কবিদ্বয়ের রচিত রূপাভিসার পদটির গঠনকৌশল বৈষ্ণবপদের অনুরূপ। তাঁহাদের কৃষ্ণকালী-সংবাদের পদগুলি বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়া এমনি বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে যে ইহা শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য কৃষ্ণাঙ্গে কালীরূপ আরোপণ মাত্র নহে। আয়ানের ইষ্টদেবী কালিকা যে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন নন, ইহাই প্রতিপন্ন করা এবং ইহার দ্বারা শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনের চেষ্টাও পদগুলির মধ্যে পরিস্ফুট।

আমরা এই স্থলে লালু-নন্দলাল ও দাশরথি রায়ের কৃষ্ণকালী-সংবাদ-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে লালু-নন্দলালের রচনার প্রভাব কিরূপভাবে দাশরথির উপর পড়িয়াছিল।

লালু— কই গো কুটীলে বনে দেখাও আজ নন্দের নন্দন কই
করিতে সেই কালীয়ের তত্ত্ব হলেম কৃতার্থ
পড়ে পেলাম পরমার্থ;
আমার গুরুদত্ত রত্নকালী করালবদনা অই ॥

দাশরথি—কৈ গো কুটীলে, বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর হৃদি সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী ॥
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব পড়ে পেলাম পরমার্থ।
আমার গুরুদত্ত রত্নকালী করালবদনা অই ॥

এই সঙ্কলনে আমরা লালু-নন্দলালের কবির লহর মাত্র দুইটি ব্যতীত আর অন্তর্ভুক্ত করি নাই। ইঁহাদের কবির লহর বেশির ভাগই খেঁউড়। বোধ করি লালু-নন্দলালের দলের খেঁউড় গানের প্রাচুর্য দেখিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন,

"এ খেউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতা রক্ষা করিয়া বর্ণন করা দুষ্কর, যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হ'ন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয়, সন্দেহ নাই। কথিত আছ, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালু-নন্দলাল বিখ্যাত ছিল।"

গোঁজলা গুঁইয়ের ঐতিহ্যের অন্যতম উত্তরসাধক রামজী দাস। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক মহাশয় রামজী দাসের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে (১৭৭৯ শকাব্দ, ৫৮ খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ) জানা যায় যে রামজীর নিবাস হুগলী। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় ইহার কোন সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে আমরা রামজীর যে-সকল কবিগান এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, তাহাতে সখীসংবাদ, ভবানীবিষয়ক, বিরহ, সীতার জন্ম, হনুমানের জন্ম প্রভৃতি পালা আছে।

রামজী দাস

রামজীর সখীসংবাদের সহিত কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত বিরহ-বিষয়ক পদাবলীর কোন কোন অংশের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইঁহার ব্যবহৃত শব্দাবলী ও নির্বাচিত ভাবখণ্ডসমূহ যথাযথ বৈষ্ণব-ঐতিহ্য অনুযায়ীই গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইঁহার শিল্পকলার পূর্ণতার সাক্ষ্য—ইঁহার কবির লহর। রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যের বিষয়বিশেষকে লইয়া তিনি যে রঙ্গরসের হাট জমাইয়া তুলিয়াছেন তাহা চিরকালের ও সকলের উপভোগ্য। শিবায়নের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হরগৌরীর ঘরকরনা তাঁহার শিল্প-স্থষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কালিকা-মঙ্গলের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত তাঁহার বিদ্যাসুন্দর এবং রামায়ণের সীতার জন্ম ও স্বর্ণমৃগ লইয়া রচিত তাঁহার কবির লহর যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছে।

রাসু ও নৃসিংহ—এই দুইজন কবিওয়ালা ফরাসডাঙ্গার অন্তর্গত গোন্দল-পাড়া গ্রামে কোনও ভদ্রগৃহস্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পিতার নাম অনাদিনাথ রায়। ইঁহারা দুইজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। রাসু ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, ও নৃসিংহ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই ভ্রাতা গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া চুঁচুড়ায় তাঁহাদের মাতামহের আলয়ে থাকিয়া মিশনারী স্থাপিত স্কুলে বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ না থাকায় তাঁহারা পুনরায় গোন্দলপাড়ায় ফিরিয়া আসেন। চুঁচুড়া হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল বাদেই তাঁহাদের পিতা পরলোক গমন করেন।

রাসু-নৃসিংহ

ইহার পর তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় সঙ্গীন হইয়া পড়ায় তাঁহারা দুই ভাই অর্থোপার্জন-মানসে কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকট যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করেন। কিছু দিন রঘুনাথ দাসের অধীনে কবিগানের শিক্ষানবিশী করিয়া উভয়ে একটি স্বতন্ত্র কবির দল গঠন করেন। কালক্রমে ফরাসডাঙ্গায় রাসু ও নৃসিংহের কবির দল বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ফরাসডাঙ্গার শাসনকর্তার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁহাদের দলের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সংবাদ প্রভাকরে ১২৬১ সালের মাঘ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই দুই কবিয়ালের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাহা যথাযত উদ্ধৃত করিলাম,—"ইহাদের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তানমাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক দুই জনের ভিতরে এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা সখিসংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতি-সুখকর ও সর্ব্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

বাস্তবিকই, রাসু ও নৃসিংহ তাঁহাদের কবিগান রচনার মধ্যে যে অভিনবত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আরও পরবর্তী কালে অর্থাৎ একান্ত আধুনিক কালে বাংলাদেশের কবিদের গীতিকবিতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গানের দীর্ঘ অঙ্গ পরিহার করিয়া নাতিদীর্ঘ কলেবরের মধ্যে বাস্তবিক গীতিকবিতার উপযোগী ভাব প্রকাশ করা সেকালে কবিয়ালদিগের নিকট বস্তুতঃ এক অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। রাধাকৃষ্ণের মিলনবিরহের অলৌকিক প্রসঙ্গকে লৌকিকতার পরিধির মধ্যে টানিয়া আনার যে প্রচেষ্টা রাসু-নৃসিংহের গানগুলির সর্বত্র পরিস্ফুট তাহাও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রাসু-নৃসিংহ এই নবধারার প্রবর্ত্তন করিয়া যান। ইহাই পরবর্তী কালে পরিপুষ্টি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে রাম বসুর রচনার মধ্যে।

তাঁহাদের গানে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা :—

প্রাণনাথ মোর সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে। ইত্যাদি—পৃঃ ৭১

এখানে নিশিজাগরণ-জনিত ক্লিষ্টতনু কৃষ্ণের রূপ শঙ্করের সহিত শুধু অভিন্নতা লাভ করে নাই, এই অভিন্নতাকে পরিস্ফুট করিতে কৃষ্ণের ও শিবের লক্ষণগুলি একের পর এক এমনই কৌশলে সংযোজন করা হইয়াছে যে দুই বিসদৃশ মূর্তি অভিন্ন সাদৃশ্য লাভ করিয়া কবির শিল্পকুশলতার প্রমাণ দিতেছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের নিকট আত্মগত-ভাবে আপনি শঙ্কর নহেন ইহাই জানাইতেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে দেখিয়াছি যে শ্রীরাধা কন্দর্পের নিকট তিনি শঙ্কর নহেন—ইহাই জানাইতেছেন। আমাদের কবিদ্বয় রাসু-নৃসিংহ ঐতিহ্যকে শিরোধার্য করিয়া দুই বিসদৃশকে এক সদৃশে পরিণত করিয়া তাঁহাদের কবিকলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে শৈব-বৈষ্ণবের চরম আকাঙ্ক্ষিত হরিহরের যে যুগল-মূর্তি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

রাসু-নৃসিংহ যে অভিনব ধারার প্রবর্তন করিয়া গেলেন, তাহার ধারক ও বাহক হইলেন হরু ঠাকুর। ইঁহার পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী; পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী; নিবাস—সিমুলিয়া, কলিকাতা। জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া এই দীর্ঘাঙ্গী পরিবার জনসাধারণের নিকট 'ঠাকুর' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গলা ১১৪৫ সাল, ইংরাজী ১৭৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকায় হরু ঠাকুরের পিতা তাঁহার শিক্ষার প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। আর তাঁহার নিজেরও লেখাপড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ না থাকায় অতি শৈশবাবস্থা হইতেই লেখাপড়ার সহিত তাঁহার সকল সংস্রব ছিন্ন হয়। পিতার কাছে এবং সিমুলিয়ার ভৈরবচন্দ্র সরকারের পাঠশালায় যে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

হরু ঠাকুর

পিতার মৃত্যুর পর ভরণপোষণের কোনও রূপ ব্যবস্থা না থাকায়, হরেকৃষ্ণ ও তাঁহার মাতা বিষম বিপদে পতিত হইলেন। যৎকিঞ্চিৎ বিত্ত ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। অর্থোপার্জনের জন্য হরু ঠাকুর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের দলের সংস্পর্শে আসেন এবং বিনা বেতনে তাঁহাদের দলে গাহনা করিতে শুরু করেন। সময়ে সময়ে তিনি যাহা রচনা করিতেন, তাহা রঘুর দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইতেন। তাই কৃতজ্ঞতাবশতঃ হরু সেই-সব সঙ্গীতের ভণিতায় আপনার নাম না বসাইয়া

আপনার গুরুর নাম বসাইতেন। আমাদের সংগ্রহ-গ্রন্থে হরুর অনেক গানেই রঘুর ভণিতা দেখিতে পাইব।

একবার সভাবাজারের রাজবাটীতে কোন পর্বে এক কবির দলের সহিত হরু ঠাকুর শখ করিয়া গাহনা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে সকলের অনুরোধে আসরে দাঁড়াইয়া তিনি কবিগান গাহিতে থাকেন। তাঁহার সুমিষ্ট গলায় শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। রাজা নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুরের গাহনায় সন্তুষ্ট হইয়া এক জোড়া শাল উপহার দেন; কিন্তু হরু ঠাকুর রাজার এ দান গ্রহণ না করিয়া ঢুলীর মাথায় ছুঁড়িয়া দেন। রাজা নবকৃষ্ণ ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সাদরে তাঁহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া আনেন এবং কবির দল করিতে উৎসাহ দেন। রাজা নবকৃষ্ণের উৎসাহ ও প্রেরণায় হরু ঠাকুর নূতন পেশাদার দল বাঁধেন এবং সভাবাজারের রাজবাটীতে মধ্যে মধ্যে কবি-গাহনা করিতে শুরু করেন। রাজা নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আপনার সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই হরু ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং সমস্যা পূরণ করিতে দিতেন। একদিন রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার সভাসদ্দের "বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে"—এই সমস্যাটি পূরণ করিতে বলেন। তাঁহার সভাসদ্বর্গ না পারায় তিনি হরু ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠান। হরু ঠাকুর আসিয়া নিম্নলিখিত-ভাবে সমস্যাটি পূরণ করেন :—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে
মৃত্তিকা বাহির করে
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

আর একদিন রাজাবাহাদুর হরু ঠাকুরকে "তোমার আশাতে এ চারিজন" —এ সমস্যাটি পূরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হরু ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করেন :—

তোমার আশাতে এ চারিজন
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়নো
আছে অভিভূত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ
দরশ পরশ শুনিতে সুভাষ
করিতেছে আরাধন॥

এই-সকল সমস্যা-পূরণে হরু ঠাকুরের উপস্থিত-বুদ্ধি ও বিশেষ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত তিনি মহারাজার আদেশে ভক্তিরসাশ্রিত যে-সকল সঙ্গীত রচনা করেন তাহাতে তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখাপড়া করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি যথেষ্ট লেখাপড়ার চর্চা করিতেন বলিয়াই মনে হয়।

কবি-গাহনায় হরু ঠাকুরের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ধমান রাজ-সভায়, কৃষ্ণনগর-রাজসভায় এবং কলিকাতাস্থ বর্ধিষ্ণু লোকের বাটীতে তাঁহার দলের প্রতিনিয়ত ডাক আসিত। হরু ঠাকুরের অর্থোপার্জন ও প্রতিপত্তি উভয়ই বাড়িতে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সময়েই তাঁহার মাতার কালান্তর ঘটে।

ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ আপন আপন দল করিবার পূর্বে হরু ঠাকুরের কবির দলে জিল দিতেন, পরে উঁহারা আপনাদের দলের জন্য হরু ঠাকুরের নিকট হইতে গীত-সংগ্রহ ও স্বর শিখিয়া যাইতেন। ইঁহাদের মধ্যে, হরু ঠাকুর ভোলা ময়রাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; ভোলা ময়রার জয় তিনি আপনার জয় বলিয়া মনে করিতেন। নীলু ঠাকুর হরু ঠাকুরের এই পক্ষপাতিত্বে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। পরিশেষে তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ভবানী বেণে রামজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে রাম বসুর শরণাপন্ন হন।

বৃদ্ধবয়সে হরু ঠাকুর তাঁহার দলের ভার রামপ্রসাদের উপর অর্পণ করায় রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে আপন সভার অন্যতম পারিষদ নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে রাজপ্রাসাদে যে-সব কবির দলের লড়াই হইত, হরু ঠাকুর তাহার বিচার করিতেন।

রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর হরু ঠাকুর আর কখনও কবি-গাহনা বা উহার বিচার করিবেন না স্থির করেন। ইহার পর আর কেহই তাঁহার এ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

বাংলা ১২১৯ সালে (১৮১২ খ্রীঃ) ৭৪ বৎসর বয়সে হরু ঠাকুর নশ্বর ধাম পরিত্যাগ করেন।

সাতু বা সাতকড়ি রায় নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত শান্তিপুরের নিকটবর্তী

বেঁচি নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবিগান রচনায় ইনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তবে জীবনে কখনও পেশাদারী দল খুলিয়া আপনি কবিওয়ালা সাজেন নাই। ইনি পারিশ্রমিক কিছুমাত্র না লইয়াই কবিয়ালদিগের দলের জন্য ফরমাইশ মত কবিগান রচনা করিয়া দিতেন। আপনার রচিত কবিগান তাঁহারা সভায় গাহনা করিবেন, ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি ছিল।

সাতু রায়

প্রথম বয়সে ইনি শান্তিপুরে জমিদারগণের অধীনে কার্য করিতেন এবং জমিদার শিবচন্দ্রের শখের কবিয়ালদিগের জন্য অনেক কবিগান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। ভোলা ময়রাও অনেক সময় তাঁহার দলের জন্য সাতু রায়ের রচিত কবিগান গ্রহণ করিতেন।

শেষ বয়সে ইনি শান্তিপুর জমিদারদের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া রানাঘাটের জমিদারদিগের পক্ষে অনেকদিন ধরিয়া বারাসতে মোক্তারী করিয়াছিলেন।

সাতু রায়ের সখীসংবাদ-বিষয়ক কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার গঠনভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি গতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা একমাত্র নৃত্য-চপল চরণক্ষেপের সহিত তুলনীয়। রঘুনাথ দাস ও রাসু-নৃসিংহের প্রভাব ইঁহার পদগুলির উপর সুস্পষ্ট। সখীসংবাদ ব্যতীত ইঁহার অন্য কোন বিষয়ের পদ পাওয়া যায় নাই।

ইঁহার রচিত নিম্নোক্ত রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিষয়ক পদটি ভ্রমর ও পঙ্কজের রূপকের মধ্য দিয়া অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

অলিরাজ কেন ধরে তব রাঙা পায়।
ও যে ধন্য ষট্‌পদ অন্যদিকে নাহি চায়॥ ইত্যাদি

এখানে রাইকুঞ্জে আসিয়া প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মান ভাঙাইতে যে চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন তাহারই একটি সুন্দর চিত্র সখীগণের বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর প্রবাদকল্প নিম্নোক্ত পদ্যাংশে তাঁহার বাকচাতুর্যের এবং প্রাচীন ধারায় শব্দসমাবেশের মনোরম ভঙ্গীটি লক্ষণীয় :—

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই
যদি ত্যজি গোকুল, তবে হাসে গোকুল
যদি রাখি গোকুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই॥

[দ্রঃ পৃঃ ১১৫]

বীরভূমের সদর সিউড়ির নিকটবর্তী বরুল গ্রামে কবিওয়ালা বলহরির জন্ম হয়, বলহরির পিতার নাম আলমচাঁদ রায়। রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে রাজা মানসিংহের সহিত বহু রাজপুত সৈন্য বাঙ্গলাদেশে আগমন করেন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পর তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া বীরভূমে তুরীগ্রাম, বরুল প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, এবং সম্পূর্ণভাবে বাঙালী বনিয়া যান। বলহরি রায়ের পূর্বপুরুষ এইরূপ কোন রাজপুত সেনা ছিলেন।

বলহরি রায়
(১৭৪৩-১৮৪৯)

ইঁহার কবি-গাহনার শিক্ষাদাতা ছিলেন লালু-নন্দলাল। বলহরি রায় বীরভূমে কবি-গাহনায় দক্ষতা দেখাইয়া "কবির গুরু" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রবাদে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়,—

কবির গুরু সেই বলহরি
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি ॥

বলহরির শিষ্যদিগের মধ্যে বরুলে যে-সকল রাজপুতের বাস আছে তাহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাস রায়ের পুত্র নিতাই দাস ও আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র রাইচরণ কবি-গাহনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সমসাময়িক কবিওয়ালা রাইপুরের রামাই ঠাকুর, বাঁশশঙ্কা গ্রামের রাজারাম গণক, পুরন্দরপুরের কৈলাস যুগী, এবং কুড়মিঠার বনয়ারী চক্রবর্তীর নামও উল্লেখযোগ্য।

বলহরি রায়ের মালসী ও সখীসংবাদ-বিষয়ক পদাবলী কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার মালসীর অন্তর্ভুক্ত বিজয়া-সঙ্গীত ও সখীসংবাদ বিষয়ান্তর্গত প্রেমবৈচিত্ত্য বিশেষ উপভোগ্য।

জনসাধারণের নিকট ইনি নিতাই বা নিতে বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ; জাতিতে বৈষ্ণব; ১১৫৮ সালে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ) চন্দরনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিওয়ালা ছিলেন। কবিগানের রচয়িতা অপেক্ষা কবি-গায়করূপেই তাঁহার অধিক খ্যাতি ছিল। নবাই ঠাকুর ও সিমলের অধিবাসী গৌর কবিরাজ নিতাইয়ের কবির দলে বাঁধনদার ছিলেন। নবাই ঠাকুর সখীসংবাদ রচনায় যেমন সুপটু, তেমনি গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেঁউড় রচনায় কৃতী ছিলেন। কবির লড়াইয়ে অনেক ক্ষেত্রে নিত্যানন্দ যে জয়লাভ করিয়া আসিতেন, তাহার মূলে ছিলেন এই নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ।

নিত্যানন্দ বৈরাগী

কবি-গাহনায় প্রচুর অর্থ সমাগম হওয়ায় তিনি চুঁচুড়ায় একটি আখড়া ও চন্দরনগরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

বাজনদার-রূপেও নিতাইয়ের সুনাম ছিল। নিতাইয়ের দলে ঢোল বাজাইত ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত ঢুলী রাম বাইতির পুত্র—মোহন। কবির গানে সময়ে সময়ে নিতাই মাতিয়া উঠিয়া মোহনের কাছ হইতে খোল লইয়া এরূপ সুন্দর বাজাইতে আরম্ভ করিতেন যে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বাজনা ও গাহনায় যুগপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইত। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় সংবাদ প্রভাকরে নিত্যানন্দ বৈরাগী সম্বন্ধে তদানীন্তন কবি-গাহনার যে বিস্তারিত বিবরণ ও তাঁহার লোক-প্রিয়তার বিবরণ দিয়াছেন, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—"ধনীলোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন, ইহার সহিত ভবানী বেণের সাক্ষাৎ-যুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল 'নিতে ভবানে'র লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাহার গৃহ লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিনজনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহা সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না, যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইবেন,—এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার-নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহারা গাহনার প্রাক্কালে 'প্রভু উঠেছেন' বলিয়াই গোঁড়ারা ঢল ঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবৎ লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

নিত্যানন্দ বৈরাগীর খ্যাতির কারণ তাঁহার কবিত্ব, যাহাকে কবিপ্রতিভা বলা যায়। কবিওয়ালাদের মধ্যে যে সরস উদ্ভাবনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই পরিচয় নিত্যানন্দের পদে পদে বিচ্ছুরিত। তিনি লোকোত্তর পুরুষ-

প্রকৃতির লীলার বিচিত্র প্রেম-বিরহের পদগুলিকে লৌকিক ঢঙে রূপান্তরিত করিয়া অপূর্ব গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন। এজন্য তিনি অবিস্মরণীয়।

তাঁহার সখীসংবাদ-বিষয়ক কোন কোন পদে প্রহেলিকার অবতারণা দেখা দেয়। এই প্রহেলিকা একাধারে কৌতুক ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

ভবানী বেণে

ইহার পুরা নাম ভবানীচরণ; জাতিতে গন্ধবণিক। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার নিকট সাতগেছে-নামক গ্রামে ইহার জন্ম। কার্যোপলক্ষে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া ইনি সপরিবারে বরাহনগরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কবিগানের পেশাদারী করিয়া অর্থোপার্জন করিবার পূর্বে ইনি হরু ঠাকুরের কবির দলে জিল দিতেন; পরে তাঁহার দলের দোহারের কার্যও করিয়াছেন। আপনি গাহনার কার্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। স্বতন্ত্র কবির দল গঠন করিয়াও তিনি হরু ঠাকুরের নিকট হইতে কবিগান রচনা করাইয়া আনিতেন। পরে হরু ঠাকুরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রামজীর শরণাপন্ন হন। সর্বশেষ, রাম বসুর নিকট হইতে কবি-সঙ্গীত রচনা করাইয়া আনিতেন। ভবানী বেণের প্রতিপক্ষ ছিলেন নিতাই বৈরাগী। ভবানীর সহিত নিতাইয়ের কবিযুদ্ধ বেশ জম-জমাট হইত, এই কারণে কোনও পর্ব-উপলক্ষে অন্য কোনও কবির দলকে আহ্বান করিবার পূর্বে ভবানী ও নিতাইয়ের দলকেই সকলে ডাকিত। সেকালে কবি-গাহনা করিয়া ভবানী বেণে প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া গিয়াছেন।

ভবানী বণিকের রচনায় প্রসাদগুণের অল্পতা ও তত্ত্ব-প্রধানতা বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ দেখা যায়।

ইহার সখীসংবাদ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কলঙ্কভঞ্জন-এর পদটি সাহিত্যিক কুশলতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

রাম বসু

কি কবি-গাহনায় কি কবিগান রচনায় প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু অগ্রগামী ছিলেন। বিরহ ও সখীসংবাদ গাহনায় তিনি আপামর শ্রোতৃবৃন্দকে যে তৃপ্তিদান করিতেন, তাঁহার সমকালীন কোনও কবি কেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কোন কবিও তদ্রূপ করিতে সক্ষম হন নাই।

কবি রাম বসুর পুরা নাম রামমোহন বসু। তিনি সাধারণের নিকট রাম বসু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম রামলোচন বসু ও মাতার নাম নিস্তারিণী। ১১৯৩ সনে (খ্রীঃ ১৭৮৬-৮৭) হাওড়া জেলায়

কলিকাতার অপর পারে ভাগীরথীর তীরে শালিখায় কায়স্থকুলে রাম বসুর জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সেই তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হন; এবং এই পাঠশালায় শিক্ষাকালেই তাঁহার কবিত্বের স্ফুরণ হইতে থাকে। সময়ে সময়ে কৌতুকচ্ছলে তালপাতায় কবিতা লিখিয়া রাম বসু সহপাঠীদিগকে দেখাইতেন। তাঁহার সহপাঠীরা ইহাতে প্রচুর আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিত। পাঠশালায় লেখাপড়া করিবার কালেই রাম বসুর পিতা রামলোচন বসু মহাশয় গ্রামবাসীদিগের পরামর্শ অনুযায়ী কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জোড়াসাঁকোয় তাঁহার এক পিসেমশায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। কলিকাতায় থাকাকালীন রাম বসু অতিশয় মনোযোগ-সহকারে লেখাপড়া করিতেন এবং অবসর সময়ে কবিতা-রচনার অভ্যাসেও রত থাকিতেন। ভাগ্যচক্রে একদিন কবিওয়ালা ভবানী বেণে জোড়াসাঁকোর পথ দিয়া যাইবার কালে রাম বসুর লেখা কবিতা কুড়াইয়া পান, কবিতাগুলিতে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি রচয়িতার সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, সন্ধানের ফলে তিনি রাম বসুর পরিচয় পান ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবানী বেণের কবির দল ছিল। তিনি রাম বসুকে আপনার কবির দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইলেন। রাম বসু আপনার ছাত্রাবস্থার কথা ভাবিয়া প্রথমে ভবানী বেণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, পরে তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া নিয়মিতভাবে তাঁহার দলের জন্য গান রচনা করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। একবার কলিকাতায় কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে কবি-গাহনা করিবার জন্য ভবানী বেণে বায়না লইয়াছিলেন। কিন্তু তেমন সুযোগ্য গায়ক না থাকার জন্য তিনি রাম বসুর শরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে কবি-গাহনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। রাম বসু ভবানী বেণের অনুরোধে কবি-গাহনায় যোগদান করেন। কবি-গাহনায় রাম বসুর এই হইল হাতেখড়ি।

ছাত্রাবস্থায় রাম বসু কলিকাতায় থাকিয়া কবির দলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পিতা অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং পুত্রকে বিশেষ অনুযোগ করিয়া পত্র লেখেন। ইহার পর রাম বসু পঠদ্দশায় আর কখনও কবি-গীতি রচনা করিতে বা কবি-গাহনায় যোগ দিতে সাহসী হন নাই।

তবে এ অবস্থা তাঁহার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার পিতা সহসা কালান্তর গমন করিলে রাম বসুর উপর সকল সংসারের ভার অর্পিত হওয়ায়

তিনি আপনাকে বিপন্ন বোধ করিতে থাকেন। লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে কেরানীর কর্ম করিতে থাকেন; পরে তাহাও ছাড়িয়া দিয়া কবিগান রচনায় আপনাকে নিয়োজিত করেন।

সে সময়ে কবিগান রচনা ও গাহনা করিয়া অনেক কবিওয়ালা প্রচুর অর্থোপার্জন করিত। ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের দলে কবি-গান বাঁধিয়া দিয়া রাম বসুর কিঞ্চিৎ অর্থ-সমাগম হইতে থাকে। ইহার পর জনসাধারণের প্ররোচনায় রাম বসু নিজেই একটি শখের কবির দল গঠন করেন। কবি-গাহনা ও রচনায় তাঁহার সুখ্যাতি অল্প-কালের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। রাম বসু অচিরেই তাঁহার শখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। এই পেশাদারী গাহনায় তিনি প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন।

বাংলা ১২৩৬ সনে দুর্গাপূজার সময় তিনি একবার কাশীমবাজারে রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের বাটীতে কবি-গাহনা করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে পীড়িত অবস্থায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং এই জ্বরে দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল।

রাসু-নৃসিংহ তাঁহাদের গানে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার চরম পরিণতি ঘটে রাম বসুর হস্তে। অলৌকিক পুরুষ-প্রকৃতির প্রেম-বিরহলীলাকে তিনি লৌকিকতা বা স্বাভাবিকতার পরিধির মধ্যে আনয়ন করিয়া নিজগুণে বিষয়বস্তুকে আরও মনোরম করিয়া তোলেন।

রাম বসুর কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় তাঁহার মালসী ও সখীসংবাদ গানে। তিনি সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত গানে প্রেম ও বিরহের নানা ভাব ও নানা অবস্থার নিপুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, যমক ও অনুপ্রাসের সুদক্ষ ব্যবহার, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ছটা যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা চির-কালের শ্রোতার কৌতুক ও বিস্ময়ের উৎস। তাঁহার গানে ভাবের উদ্বেলতা বা হৃদয়াবেগও কিছু কম নাই।

অলৌকিক পুরুষ-প্রকৃতির প্রেম-বিরহলীলা-বিষয়ক পদাবলী রচনা ও গাহনার পাশাপাশি রাম বসুর লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম ও বিরহের বিষয়ে রসগান তখনকার দিনে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। ফলে এই রসগানগুলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উক্তির ধরন অনেকটাই ছড়ার মতন হইত।

রাম বসুর কবির লহরও সমান আদরণীয় বস্তু ছিল। প্রকৃতির দিক্ দিয়া ইহা একপক্ষের তরজাই। এই লহরের মধ্যে প্রচুর পুরাণ-জ্ঞান কোথাও বা সরলভাবে এবং কোথাও বা তির্যক্ শ্লেষের রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিতেও তাঁহার জ্ঞান যে কত গভীর ছিল তাহা এই কবির লহরে উজ্জ্বলরূপে সপ্রকাশ।

রাম বসুর মালসীগানের অন্তর্ভুক্ত আগমনী-পর্যায়ের গানের প্রতিবাৎসল্য ও বাৎসল্যরস সহজেই আমাদের অন্তরলোকে পৌছিয়া যে কারুণ্যের সঞ্চার করে, তাহা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই স্বাভাবিক ও মনোরম। কেহ কেহ এই গানগুলির উপর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তবু এ কথা সত্য যে ভাবের বিস্তারের দিকে যেখানে অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন, সেখানে রাম বসুর নিজস্বতা সুস্পষ্ট। এই কারণেই তাঁহার উপর অন্যের প্রভাবের দিক্‌টা কখনো বড় হইয়া চোখে পড়ে না; বরং তাঁহার কৃতিত্বের দিক্‌টাই আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে।

যজ্ঞেশ্বরী নামে একজন স্ত্রী-কবি, কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। তিনি ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালার সমসাময়িক। ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে তিনি দুই-একটি কবিযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রী-কবির সহিত কবি-সংগ্রামে ভোলা ময়রা যে শ্লীলতাবর্জিত খেঁউড় আমদানী করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ চমকপ্রদ হইলেও কবিগানের কলঙ্কস্বরূপ। একবার কবির লড়াইয়ে যজ্ঞেশ্বরী নিজে ভগবতী সাজিয়া ভোলানাথকে মহাদেব বলিয়া সম্বোধন করিলে ভোলা ময়রা তাহার উত্তরে নিম্নলিখিত গানটি করেন :—

যজ্ঞেশ্বরী

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব কার্যে শুভকরী
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ
যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অভয় দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে—
এখন মা! সুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছো জোরে ডাক॥
বুঝি তোমার হয়েছে কাল, বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক।

তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাতা শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই
তুমি আমার গাভী মাতা।

নীলমণি হরু ঠাকুর, রাম বসু, রাসু-নৃসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের পরবর্তী। ইঁহার রচিত গান অতি অল্পই পাওয়া যায়। গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী তাঁহার দলের জন্য কবিগান রচনা করিয়া দিতেন। নীলমণির পিতার নাম লক্ষ্মীকান্ত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর তারিখে ইনি পরলোক গমন করেন।

নীলমণি পাটনী

"নীলু-রামপ্রসাদ" নামে যে কবিওয়ালার দল সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইনি সেই দলের অন্যতম সৃষ্টিকর্তা। রামপ্রসাদ তাঁহার সহোদরের নাম; তিনি নীলুর দলের সহিত যুক্ত ছিলেন। নীলু প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে থাকিয়া দোহারের কার্য করিতেন, পরে স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের স্বতন্ত্র দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও ইনি হরু ঠাকুরের কাছ হইতে কবিগান রচনা করাইয়া আনিতেন। হরু ঠাকুরের পর ইনি কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের কাছ হইতে কবিগান সংগ্রহ করিতেন। নীলু ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার কবির দলের অধিপতি হন রামপ্রসাদ ঠাকুর। এই রামপ্রসাদ ঠাকুরের সহিত রাম বসুর অনেকবার কবিযুদ্ধ হয়।

নীলু ঠাকুর

এই কবির মালসী বা ভবানীবিষয়ক গান গতানুগতিকভাবে তত্ত্বপ্রধান হইলেও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। ইহা ব্যতীত ইঁহার পদরচনায় যমক ও অনুপ্রাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কেবল একজন ফিরিঙ্গি কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারই নাম এণ্টনী, পুরা নাম হেন্সমান এণ্টুনি, জাতিতে ফিরিঙ্গি। ইঁহার ভ্রাতার নাম কোলিসাহেব; ইনি একজন সঙ্গতিপন্ন ও অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে চন্দননগরে ইঁহারা প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া এণ্টনীর স্বভাব অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। হিন্দুঘরের এক ব্রাহ্মণ-যুবতীকে লইয়া ইনি গরীটির (গেরুটী) নিকট বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই গরীটি অঞ্চলটি সে সময়ে ফরাসীদের শাসনভুক্ত ছিল। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু "সেকাল ও একাল" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমার কোন আত্মীয় বলেন আণ্টনী

এণ্টনী ফিরিঙ্গি

সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙ্গার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেল রোড হইবার পূর্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আণ্টনী সাহেবের ভগ্নবাটী সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।”

বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার সংস্পর্শে আসিয়া এণ্টনী প্রায় হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধুতি ও চাদর পরিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় দুর্গোৎসবের সময়ে আপন বাটীতে কবির দলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। এই কবিগানে এণ্টনীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জাগিয়া উঠে। তিনি কবিগান শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সে সময়কার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের সংস্পর্শে আসেন এবং শিক্ষানবীশ থাকাকালীনই কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া শখের দল করিয়া বসেন। এই শখের দল পরিচালনা করিতে গিয়া তাঁহার উপার্জিত সকল অর্থ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতে লাগিল। অবশেষে অর্থের অনটনে তিনি আপনার শখের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। এই পেশাদারী কবির দলে তাঁহার যথেষ্ট আয় হওয়ায় তিনি আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কবির দল পরিচালনায় নিযুক্ত রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার কবির দলে গোরক্ষনাথ-নামক এক ব্যক্তি বাঁধনদার ছিলেন। এণ্টনীর ফরমাইশ মত গোরক্ষনাথ তাঁহাকে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন। একবার দুর্গোৎসবের সময় চুঁচুড়ার কোনও ধনী ব্যক্তির বাটীতে এণ্টনীর কবির দলকে কবিগান গাহিবার জন্য বায়না দেওয়া হয়। এণ্টনী তাঁহার বাঁধনদার গোরক্ষনাথকে কবিগান রচনা করিয়া দিবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। সে সময়ে গোরক্ষনাথ এণ্টনীকে জানাইয়া দেন যে পূর্বেকার বকেয়া টাকা পরিশোধ করিয়া না দিলে তিনি আর গানের যোগান দিতে পারিবেন না। এণ্টনীর সে সময়ে আর্থিক সঙ্গতি ভাল ছিল না। তিনি গোরক্ষনাথের প্রাপ্য টাকা শোধ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু নিজেই গান রচনা করিয়া আসরে ভোলা ময়রাকে শুনাইলেন :—

ভজন পূজন জানি না মা
জেতেতে ফিরিঙ্গি।

যদি দয়া করে কৃপা কর
হে শিবে মাতঙ্গি ॥

গানের উত্তরে ভোলা ময়রা গাহিলেন :—

আমি পার্বো নারে তরাতে
আমি পার্বো না তরাতে।
যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গা যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে
আমি পার্বো নারে তরাতে ॥

একবার ঠাকুরদাস সিংহের দলের সহিত এণ্টনীর কবির লড়াই হয়। রাম বসু ঠাকুরদাসের দলের বাঁধনদার ছিলেন। ঠাকুরদাস এণ্টনীকে প্রশ্ন করিলেন :—

কও হে এণ্টনি!
আমি একটা কথা জান্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে
তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ॥

এণ্টনী সাহেব তাঁহার উত্তরে বলিলেন—

এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই
কুর্তি টুপী ছেড়েছি ॥

আর একবার রাম বসু তাঁহার নিজের দলে থাকিয়া এণ্টনী সাহেবকে বলেন :—

সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরি সাহেব শুন্‌তে পেলে
গালে দিবে চূণকালি ॥

এণ্টনী তাঁহার জবাবে বলেন :—

খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই!
শুধ্ নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,

আমার মানব জনম সফল হবে
যদি রাঙ্গা চরণ পাই।

এই-সকল উত্তরে বিদেশী এণ্টনীর ধর্মসমন্বয়ের ভাব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

এণ্টনী সাহেবের যে কয়েকটি কবিগান এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল তাহাতে শৃঙ্গাররসের পাশাপাশি বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য-রসের এবং অলৌকিক ভাবের পাশাপাশি লৌকিক ভাবের সমন্বয় লক্ষ্য হইবে।

এণ্টনী সাহেবের যে হিন্দুর পুরাণাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহার পরিচয় আমরা নিম্নলিখিত গানে লক্ষ্য করিতে পারি :—

যে শক্তি হ'তে উৎপত্তি, সেই শক্তি পত্নী কি কারণ
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ ॥
জান নাকি শিব! আমি তোমার শিবানী।
তোমায় গর্ভে ধরে আমি, এখন হ'লেম তোমার রমণী ॥
সমুদ্র মন্থন কালে বিষপান করেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা বলে, রক্ষা কর আপনি।
চলেছিলে বিষপানে, বাঁচালেম স্তন্য পানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় বলেছিলে জননী?

এণ্টনী ফিরিঙ্গি কোনও আসরে ভোলার উদ্দেশে উপরি-উক্ত গান গাহিয়াছিলেন, ভোলা কিন্তু ভোলানাথ সাজিয়া এ চাপানের উত্তর না দিয়া বলিয়াছিলেন :—

ওরে, আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা
বাগবাজারে রই।

গোরক্ষনাথ

গোরক্ষনাথ একজন প্রতিষ্ঠাবান্ কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব কোনও দল ছিল না, ফরমাইশ মত কবিদলের গান রচনা করিয়া দিতেন। এণ্টনী ফিরিঙ্গীর তিনি একজন পেশাদার বাঁধনদার ছিলেন।

একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে এণ্টনী ফিরিঙ্গী চুঁচুড়ার কোন ধনী ব্যক্তির দ্বারা কবি-গাহনার জন্য নিমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে গোরক্ষনাথ এণ্টনীর দলের

বাঁধনদার ছিলেন। গোরক্ষনাথ এইবার সুযোগ বুঝিয়া এণ্টনীর নিকট হইতে আপনার পূর্বেকার পাওনা টাকা চাহিয়া বসেন। এণ্টনী সাহেব ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন, গোরক্ষনাথের সকল টাকা চুকাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করেন এবং নিজেই কবিগান বাঁধিয়া সেই সময়ে আপনার সম্মান রক্ষা করেন। গোরক্ষনাথের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার নাম রামানন্দ নন্দী। গোরক্ষনাথের নামে অতি অল্প গানই পাওয়া যায়। ইঁহার মাথুরের গানগুলি প্রশংসনীয়, গানগুলিতে করুণ চিত্র ফুটাইবার প্রয়াস পরিস্ফুট। বাৎসল্যরসাশ্রিত গোষ্ঠের গানগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সেকালে ভোলা ময়রার কবি-গাহনার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। কবির লড়াইয়ে ভোলা ময়রার ন্যায় পাল্‌টা জবাব কোনও কবিই দিতে সক্ষম হইত না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভোলা ময়রা জয়মাল্য লইয়াই ঘরে ফিরিতেন। সেকালে কি ছেলে কি বুড়ো ভোলা ময়রার কবির লড়াই শুনিবার জন্য পাগল হইত; বহু দূরবর্তী স্থান হইতেও পদব্রজে শ্রোতারা আগমন করিত। ভোলা ময়রার ছড়া বা গান পণ্ডিত-মূর্খ বালক-বৃদ্ধ সকলেরই মুখস্থ থাকিত। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভোলা ময়রার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অত্যুক্তি নহে। কথাটি এই—"বাঙ্গলা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তার, হুতোম পেঁচার ন্যায় রসিক লোকের এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

ভোলা ময়রা

অনুসন্ধানে জানা যায় যে গুপ্তিপাড়া-নামক গ্রামই ভোলা ময়রার জন্মস্থান। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম (কিপু ময়রা), মাতার নাম গঙ্গামণি, সহোদরের নাম হৃদয়নাথ। অনেক গানেই তিনি আপনাকে ময়রা ও বাগবাজারবাসী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; যেমন—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
বাগবাজারে রই।

তিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জাতিভেদ-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও প্রকার গোঁড়ামি ছিল না, এ কথাও তাঁহার কবিগানের মধ্যে পাওয়া যায়; যথা—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
ময়রাই বারমাস
জাতিপাঁতি নাহি মানি ওগো কৃষ্ণপদে আশ।

কলিকাতায় বাগবাজারে ভোলার পিতা মিষ্টান্নের দোকান করিয়া কালাতিপাত করিতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় ভোলার শিক্ষা যৎসামান্যই হইয়াছিল; কলিকাতায় কথকদিগের কাছ হইতে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া ও সঙ্কীর্তনাদিতে সাক্ষাৎ যোগদান করিয়া ভোলা ময়রা আপনার জ্ঞানস্পৃহা মিটাইয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে কবি-গাহনায় তিনি যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল এই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান।

ভোলা ময়রা ত্রিবেণীতে বিবাহ করেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যাসন্তান জন্মে, নাম কৈলাসী।

ভোলা ময়রার যে-সকল প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালা ছিলেন, তাঁহাদের নাম বলাই সরকার, এণ্টনী সাহেব আর মুরশিদাবাদের হোসেন খাঁ। বলাই সরকারের সহিত তাঁহার একবার তারকেশ্বরের মোহান্ত-বাড়ীতে কবি-লড়াই করিতে হয়। উত্তর-প্রত্যুত্তর বিশেষ জেদের সহিত চলিতেছে, কেহই হারিবার পাত্র নহেন, পরিশেষে বলাই আর ভোলা ময়রার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া গানের ছলে মান-প্রসঙ্গ অবতারণা করিলেন এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া সখীরূপী ভোলা ময়রাকে নিবেদন করিলেন :—

মান দিনু তব পায়
মনে রেখ হে আমায়
    মান দিনু তব পায়
পড়িছি সঙ্কটে হরি
এবার বাঁচি কি মরি
চেয়ে দেখ এ কি দায়
    মান দিনু তব পায়।
ধন গেলে ধন ফিরে আসে
এ প্রবাসে তব পাশে
মান দিও হে আমায়
মান দিনু তব পায়
মানের বদলে মান দিও হে আমায়
সাধের প্রাণ দিনু তব পায়॥

কৃষ্ণরূপী বলাইয়ের এইরূপ মানভিক্ষায় গোপীরূপী ভোলা ময়রা কিন্তু কোনওরূপ ক্ষমার ভাব না দেখাইয়া গাহিয়া উঠিলেন :—

সখে, প্রাণ দেবে কি আমায়
প্রাণ যে দিয়েছ রাধায় (সর্ববিধায়)
আবার প্রাণ দিবে কি আমায়
মন রাখা প্রাণ চাই না হরি
চরণ দাও চরণে ধরি
অন্তে যেন বংশীধারী
রেখো রাঙ্গা পায়।
প্রাণ দেবে কি আমায়।

ভোলা ময়রার এই জবাবে শ্রোতামাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া ভোলার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, বলাই সরকারের পরাজয় হইল।

এণ্টনী সাহেবের সহিত ভোলা ময়রার বহুবার কবিযুদ্ধ হয়, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থিত বাক্‌পটুতায় ভোলা ময়রা জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কবির লড়াইয়ে বলাই সরকার কিভাবে কবিগানের ভিতর দিয়া ভোলা ময়রার সহিত আপস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ভোলা ময়রা আপসে আপনার আত্মমর্যাদা নষ্ট করেন নাই। বলাইয়ের ন্যায় ভোলা ময়রা আর একবার এণ্টনীর সহিত কবির লড়াইয়ে এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই—বরাহনগরে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে ভোলা ময়রা ও এণ্টনী সাহেবের কবির লড়াই শুরু হয়, উভয়পক্ষের জেদাজেদি চরমে পৌছিয়াছিল, কেহই অপর পক্ষের নিকট হার মানিতে রাজী নয়। এণ্টনীর যেমন জেদ ভোলা ময়রার তেমনি প্রতিজ্ঞা। "রেইস ও রাইয়ত" পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি ঐ আসরে উপস্থিত ছিলাম। উভয়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এণ্টনী যাহা বলিতেছিল তাহা কষ্টপ্রসূত, ভোলা ময়রা যাহা বলিতেছিল তাহা বুদ্ধিপ্রসূত। It was a keen contest between labour and genius. দুইজনই সমান চলিতেছিল। রাত্রি ৯টার সময় কবি আরম্ভ হইয়াছিল, তৎপরদিবস একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত লড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এণ্টনী দলের একজন তাঁহার (ভোলার) গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেয়, ভোলা সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া বলিল—

ওরে শালা! কি জ্বালা এ মালা দিলরে আমায়
চক্ষে বহে জল, অবিরল, বিকল করিল কায়॥

কি জ্বালা, এ মালা দিলরে আমায়।
ও রে হেম্মুম মালার কুস্থম
পুষ্প নয় ফুলধনু প্রায়।
কি জ্বালা এ মালা দিলরে আমায় ॥
মনে কি হয় না উদয়
ভোলা কভু ভোলবার নয় ?
ছলে বলে কৌশলে
মালিনীর মত ফাঁকি দিলে
আচ্ছা ফন্দী এবার খেলে
তরে গেলে বড় দায়।
ওরে শ্যালা কি জ্বালা এ মালা দিলরে আমায় ॥

বলা বাহুল্য শ্রোতৃসাধারণের জয়ধ্বনি লইয়া ভোলা ময়রা কবির গান শেষ করিলেন।

কবিয়াল ভোলা ময়রা বোধ হয় রঘুনাথ দাসের পর লোকপ্রিয় অশ্লীলতার পরিবেষক। ইহার পূর্বে রাম বসুর লৌকিক রসগান প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার মার্জিত রুচির প্রমাণস্বরূপ মার্জিত ভাষায় লৌকিক রসগানের নিদর্শন দেখাইয়াছি। রাম বসুর গানে শ্লেষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে কিন্তু স্পষ্ট অশ্লীলতা নাই। কিন্তু রঘুনাথ দাসের ও ভোলা ময়রার কবির লহর পালাগান হইলেও শ্লেষ ও অশ্লীলতায় কণ্টকিত। কবির লহর ব্যতীত গতানুগতিক প্রথায় রচিত সখীসংবাদ-বিষয়ক কয়েকটি গান আমরা তাঁহার রচনার নিদর্শন হিসাবে পাইয়াছি। কিন্তু শ্লেষ ও অশ্লীলতা ব্যতীত আমাদের চক্ষে তাঁহার অপর কোন বৈশিষ্ট্য পড়ে নাই।

প্রসাদগুণই কবি সীতানাথের পদগুলির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সখীসংবাদে রাধাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ যোগিবেশে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন এইরূপ দেখা যায়।

সীতানাথ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু কবির কলাচাতুর্যে ঐ যোগীকে শিব বলিয়া বোধ হয়। একবারও তিনি কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণ যোগিবেশে আসিয়াছেন তাহা না বলায় চমৎকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার কবিশক্তির প্রমাণ-স্বরূপ এইরূপ বক্রোক্তি মালসীর মধ্যেও পরিস্ফুট। বিরহ-বিষয়ক পদে ও যশোদার খেদে সেই একই কোমলকলা পরিস্ফুট। যথাক্রমে বিরহিণী শ্রীরাধার ধূল্যবণ্ঠিত রূপ ও যশোদার সন্তানবৎসলা ও পুত্রাগমন-

প্রত্যাশায় প্রতীক্ষিতার রূপ ঐ পদ দুইটিতে উজ্জলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন দল ছিল না, পাটনীদলের সরকারি করিতেন। ইনি দিগ্বিজয়ী কবি ছিলেন। পূর্ববঙ্গেও কবির লড়াইয়ে তাঁহার ডাক পড়িত। জয়দেবপুর-নিবাসী রামকুমার সরকার তাঁহাকে চাপান দিয়াছিলেন এইরূপে :—

এক সীতানাথ ত্রেতাযুগে সীতায় হলেন বাম
আর এক সীতানাথ রাজা ছিলেন কলিকাতাতে ধাম ॥
এক সীতানাথ পাটনীর দলে করতেছে কোটনামী
বল দেখি মুখুজ্যের পো সীতানাথ, এর মধ্যে কোন সীতানাথ তুমি ?

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কবির একটি মালসীর পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল, পদটির সংগঠন গতানুগতিক।

গুরুদয়াল চৌধুরী প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণে গতানুগতিক প্রথায় পদ রচনা করিতেন। তাঁহার মাথুর ও প্রভাস-বিষয়ক দুইটি পদ মাত্র পাইয়াছি।

গুরুদয়াল চৌধুরী

মাথুর গান সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে সেইরূপ হয় নাই। উহা শ্রীরাধার বা শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত খেদোক্তির পরিবর্তে শ্রীরাধার বন্দনা হইয়াছে এবং শ্রীরাধাকে ব্রহ্মময়ী সনাতনী ও রাসেশ্বরী গোলোকবাসিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাঁহার ঐতিহ্যানুসরণ যথাযথ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রভাস-বিষয়ক পদটি কিন্তু ভিন্ন গতি লাভ করে নাই। উহার মধ্যে ঐতিহ্যানুসরণে শ্রীদামের রাধাকে শাপ ও দানযজ্ঞে প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায় শ্রীরাধার সেই শাপ বিমোচনের উল্লেখ আছে। আর, চৌধুরী মহাশয়ের পদ দুইটিতে প্রকাশমান প্রসাদগুণ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে—ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

গুরোদুম্বার পদটির বিষয়বস্তু পূর্বগোষ্ঠ। ইহার মধ্যে নন্দরাণীর বাৎসল্য মেনকার বাৎসল্যবৎ উচ্ছ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মালসীর

গুরোদুম্বা

অন্তর্ভুক্ত আগমনী-বিজয়ার গানে ইতিপূর্বে আমরা কন্যা উমার জন্য মেনকার যে বৎসলতা ও মাতৃহৃদয়ের ব্যথার প্রকাশ দেখিয়াছি গুরোদুম্বার এই পূর্বগোষ্ঠের পদেও সেই পরিমাণ ও সেই জাতীয় পুত্রবৎসলতা ও মাতৃহৃদয়ের ব্যথার প্রকাশ দেখিতে পাই।

বিপরীতে পাঁচালী. কবির পূর্বগোষ্ঠের গানে এবং ইহার পূর্বেকার দাঁড়া-কবিদের গানে অন্য বিষয় বা ব্যাপার দেখিতে পাই। রাখালগণ গোপালের ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিংবা যশোদা গোপালের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য করুণ ও কোমল স্বরে ডাকাডাকি করিতেছেন—এইরূপ। ফলে, গুরোতুম্বার পূর্বগোষ্ঠের পদ রচনা ঐতিহ্যানুসারী নয়, পরন্তু মালসী গানের দ্বারা প্রভাবিত।

ইহার মধ্যে বালগোপালের যে রূপকল্প দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা সুন্দর ও নিখুঁত। প্রসঙ্গক্রমে রামের জন্য কৌশল্যার শোকের উল্লেখ ইহার মধ্যে থাকায় করুণভাব গাঢ়তা লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রসাদগুণ পদটির মধ্যে উজ্জ্বল রত্নের মতই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

মাধব ময়রার গোষ্ঠ-বিষয়ক পদগুলি বিখ্যাত। এখানে তাঁহার একটি পূর্বগোষ্ঠের ও একটি উত্তর-গোষ্ঠের পদ সন্নিবেশিত করা হইল। পূর্বগোষ্ঠের বিষয়বস্তু ঐতিহ্যানুসারে গোষ্ঠযাত্রার উদ্যোগপর্ব, আর উত্তর-গোষ্ঠের বিষয়বস্তু নন্দরাণীর অসুর-ভয়, কালীয়দহের ভয়, যাহার জন্য মা হইয়া তিনি বালগোপালকে গোষ্ঠে পুনরায় পাঠাইতে নারাজ।

মাধব ময়রা

তাঁহার কবির লহর রামায়ণের পালাবিশেষ লইয়া গঠিত কিন্তু অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট।

কৃষ্ণলালের যে পদটি সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা মালসীর অন্তর্ভুক্ত বিজয়া-পর্যায়ের। গানটি নাতিদীর্ঘ, সরল ও ঐতিহ্যানুসারী। উমা ও মেনকার কথোপকথন ইহার বিষয়বস্তু। বাৎসল্য-রসের পরিস্ফুটন কবির লক্ষ্য ছিল, বুঝা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ভাব বজায় রাখিতে না পারায় ঐ রসের পরিস্ফুটন হয় নাই।

কৃষ্ণলাল

কৃষ্ণমোহন ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবির দলে বাঁধনদারের কার্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। নিজস্ব কোনও কবির দল তাঁহার ছিল না। তাঁহার সখীসংবাদের বিভিন্ন পদ বিখ্যাত, তথাপি গতানুগতিক প্রথামত পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ তাঁহার পদগুলিতে অতিমাত্র প্রকট। ফলে তাঁহার কোন কোন পদে স্বাভাবিক রচনাসৌন্দর্যের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। মাথুর-সঙ্গীতে ইনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য

গদাধর আগমনী-বিষয়ক পদে রামপ্রসাদের, আর সখীসংবাদগুলিতে

চণ্ডীদাস, কৃষ্ণকমল প্রভৃতির প্রভাব লক্ষণীয় হইলেও তাঁহার স্বকীয় কবিত্ব স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কবিগান রচনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কবির দল গদাধরকে আপন দলে টানিবার জন্য রেষারেষি করিত। হরু ঠাকুর, রাম বসুর পরেই লোকে গদাধরের রচিত কবিগান শুনিতে পছন্দ করিত। তিনি জোড়াসাঁকোর রামলোচন বসাকের জন্য গান বাঁধিয়া দিতেন। এই রামলোচন বসাক মোহনচাঁদ বসুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। রামলোচন ব্যতীত ইনি ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নীলুপাটনী প্রভৃতির জন্যও গান বাঁধিয়া দিতেন।

গদাধর মুখোপাধ্যায়

১২০৯ সালে (আনুমানিক) নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। পিতা জমিদারের সেরেস্তাতে সামান্য কেরানীর কর্ম করিয়া দিন গুজরান করিতেন। ঠাকুরদাস গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া পিতার ন্যায় মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত হন। এ দাসবৃত্তি ঠাকুরদাসের ভাল লাগিত না, সুযোগ ও সময় পাইলে তিনি কবিগান রচনা করিতে বসিতেন। এই সময়ে ভোলা ময়রা, এণ্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের প্রতিপত্তির কথা ইনি শুনিয়াছিলেন। একদিন ইনি গোপনে এই-সকল কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্থির করেন যে তাঁহাদের কবিদলের জন্য ইনি কবিগান রচনা করিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার পরিবর্তে ইনি অর্থাদি লাভ করিতে পারিবেন। ঠাকুরদাস কবিরূপে কখনও আসরে নামেন নাই বা কবির দল গঠন করেন নাই। কবিগান রচনা করিয়া ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী

ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর শুধু সখীসংবাদ-বিষয়ক পদাবলী পাওয়া গিয়াছে, এবং সবগুলিই প্রায় ঐতিহ্য-অনুসারী এবং গতানুগতিক প্রথায় রচিত। কারুণ্য ও কোমলতাই গানগুলির মধ্যে পরিস্ফুট এবং স্থলে স্থলে প্রসাদগুণও প্রকাশ পাইয়াছে।

রমাপতি ঠাকুর বর্ধমান মহারাজার অন্যতম প্রিয় গায়ক ও কবি, পুরা নাম রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাজা তুষ্ট হইয়া কবিকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনায় জায়গীর দিয়াছিলেন। সঙ্কলন গ্রন্থটিতে কবির যে গানটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা বিরহবিষয়ক পদ, সুন্দর ও সুগঠিত। আধুনিক রচনারীতির অত্যন্ত নিকটবর্তী। উপমা ও অনুপ্রাস এই পদটিতে প্রসাদগুণ দিয়াছে। শুনা যায় যে, কবির "সখি

রমাপতি ঠাকুর

শ্যাম না এলো" গানটি শুনিয়াই তাঁহার বিদুষী পত্নী পাল্টা জবাবে "সখি শ্যাম আইল" গানটি গাহিয়াছিলেন।

রামকমলের রচিত কবির লহরের দুইটি নিদর্শন সঙ্কলিত হইয়াছে। একটি মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শিশুপাল-বিষয়ক ও অন্যটি রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুমুনি-পুত্র ও তাহার অন্ধ পিতা-মাতার বিবরণ। কবির লহর দুইটিতে বিতর্ক ও খেদ যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত হইলেও রামকমলের ভাষা গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট।

রামকমল

নবাই ঠাকুরের রচনার মধ্যে এই সঙ্কলনে সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত নৌকা-বিহারের একটি পদ দেওয়া হইয়াছে। মহাজনগণের অনুসরণে নবাই ঠাকুর পদটির মধ্যে যথারীতি আধ্যাত্মিক রূপক সৃষ্টি করিয়াছেন।

নবাই ঠাকুর

ভীমদাস মালাকর—ইঁহার রূপানুরাগের পদ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কবির ব্যবহৃত লুপ্তোপমা ও উপমা গতানুগতিক। তথাপি সমগ্র পদটি প্রসাদ-গুণমণ্ডিত।

চিন্তামণির পদটিতে কৃষ্ণহারা শ্রীমতীর বিরহদশার ভাবব্যঞ্জক নানা খেদোক্তি স্থান পাইয়াছে। কৃষ্ণহীন বৃন্দাবনের দুর্গতির চিত্র খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাবটি সুপরিস্ফুট। করুণরস ও মধুরভাবের সম্মিলনে পদটি সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

চিন্তামণি ময়রা

মোহনের সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত প্রভাস-বিষয়ক একটি পদ সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম প্রেমিককে প্রথমে মথুরা হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া যেমন সফল হয় নাই তেমনি দ্বিতীয়বারেও সেই একই প্রচেষ্টা বিফল হইল। ইহাই কবির মোটামুটি বক্তব্য। পদটিতে করুণরস পরিস্ফুট।

মোহন সরকার

দর্পনারায়ণ কবিরাজ—ইঁহার রচিত একটি ডাকমালসী ও একটি সখী-সংবাদের অন্তর্গত বিরহ-বিষয়ক পদ সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে।

রামসুন্দর গৃহীত পদ কয়েকটিই করুণরসাশ্রিত—দুইটি বিরহ-বিষয়ক ও একটি দৈবকীর খেদ-বিষয়ক। বিরহ-বিষয়ক পদ দুইটি স্বাভাবিক কবিশক্তির প্রমাণ বহন করে। দৈবকীর খেদ পদটি ভাব ও ভাষার বয়নের মধ্যে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

রামসুন্দর রায়

গৌরী দাস—ইঁহার রচিত বিরহ-বিষয়ক পদটি কবিশক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক।

লক্ষ্মীনারায়ণের একটিমাত্র পদ "প্রভাসযজ্ঞ" সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। পুরাণে প্রদত্ত বিবরণটুকুই ইহাতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী

প্রভাস-যজ্ঞে আসিয়া যশোদা ও অন্যান্য গোপগোপীগণ আপনাদিগের প্রতি অনাদরের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্বের সত্তা পরিচয় পাইয়া বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, ইহাই ইহার বিষয়বস্তু। বর্ণনার ভঙ্গি গতানুগতিক।

আমরা এই গ্রন্থে যশোহরের কবিয়াল রাসমোহন দাস, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, কালীচরণ দাস, অক্ষয়দাস বৈরাগী, রাইচরণ মাল, আনন্দ সরকার ও পঞ্চানন

যশোহরের কবিওয়ালা

দত্তের কবিগান অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। রাসমোহনের সখীসংবাদের অন্তর্গত দুটি পদ ও কবির লহরের দুইটি পালা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ইহার সখীসংবাদে উল্লিখিত বংশীসাধন শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া শ্রীমতীর বংশীশিক্ষার চেষ্টা নহে। ইহা মথুরা হইতে নন্দের আনিয়া দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বংশী দেখিয়া শ্রীমতীর খেদোক্তি। সুতরাং পদটি বৈষ্ণব মহাজনগণের ঐতিহ্যানুসারী নহে; বরং নূতন ঐতিহ্যের পথসৃষ্টির প্রচেষ্টা। কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, যেহেতু তাঁহার এই নূতনভাবের পদটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু রাসমোহনের পরবর্তী পদটি কোন নির্দিষ্ট ভাব বহন করে না। কবির লহরে তিনি অবশ্যই নূতন পালার প্রবর্তন করিয়াছেন। দুইটি পালাই করুণরসাত্মক। চক্রব্যূহে অভিমন্যু সপ্তরথীর মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুবরণকালে মাতাপিতা ও মাতুল গোবিন্দের নাম ও লীলা স্মরণ করিতেছেন—ইহা করুণ আকৃতির রূপ পাইয়াছে। পরবর্তী পালাটি মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত। ইহা রাজা হংসধ্বজের পুত্র সুধন্বার স্ত্রী প্রভাবতীর খেদোক্তি।

কবি সূর্যকুমার গোষ্ঠের গান গাহিতে গিয়া পূর্বের সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার পদটি ঐতিহ্যানুসরণে পূর্ব-গোষ্ঠ অথবা উত্তর-গোষ্ঠের কোন একটির বিবরণ না হইয়া উভয়-গোষ্ঠভাব-মিশ্রিত কৃষ্ণমাহাত্ম্য গান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সিদ্ধান্ত অনুসরণের ফল। বিভিন্ন দেব-দেবীগণ গোষ্ঠে গোপালার্চনা করিতে আসিয়াছিলেন, ইহাই শ্রীদাম যশোমতীকে শুনাইতেছেন; কবিগানে এই ভাবের প্রবর্তন সম্পূর্ণ নূতন।

কালীচরণ দাসের গোষ্ঠগানের বিষয়বস্তু পূর্বগোষ্ঠ। প্রভাতে ব্রজের

রাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার পূর্বে নন্দলালকে আহ্বান দিতেছে। পদটিতে ভাগবত মহিমার কথা স্থান পাইয়াছে। কবির পুরাণজ্ঞানের পরিচয় পদটিতে মিলে। তাঁহার বাচনভঙ্গি গতানুগতিক।

অক্ষয়দাস বৈরাগীর গানটিও পূর্বগোষ্ঠ-বিষয়ক। বিষয়বস্তুর দিক্ হইতে ইহা বিমিশ্র এবং ঐতিহ্যানুসারী নহে। রাখালবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে গোচারণের জন্য ডাকিয়া আনিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে আসিয়া চাঁপাফুল দেখিয়া শ্রীরাধার অঙ্গের স্বর্ণচম্পক বর্ণ স্মৃতিপথে আসায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইখানেই রসভঙ্গ হইল। পদটির মধ্যে অসংগতি দোষের জন্য সকলই সামঞ্জস্যহীন বোধ হয়। এক কথায় স্নিগ্ধ শান্ত বাল্যভাব সরিয়া গিয়া পদমধ্যে বিরহের করুণতা আসিয়া পড়ায় পদবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

রাইচরণ মালের মালসী গান ঐতিহ্যানুসারী সুন্দর রচনা। প্রথমেই কবি গণেশজননীকে আহ্বান করিয়া তাঁহার শরণ লইয়া ও চরণ-বন্দনা করিয়া তাঁহার করুণার নজীরগুলি মঙ্গলকাব্য ও পুরাণগুলি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত অভাজনকে করুণা করিতে বলিতেছেন। ইহাই প্রাচীন মালসী-গানের কাঠাম। শব্দচয়ন ও বাচনভঙ্গি সরল ও স্বাভাবিক।

আনন্দ সরকারের "প্রভাস-মিলন"-বিষয়ক পদটি করুণরসাশ্রিত এবং রসোত্তীর্ণ। প্রভাসের দানযজ্ঞে প্রণয়ীর বামে রুক্মিণীকে রাইকিশোরীর দর্শন ও তাঁহার অষ্টসখীর নিকট বিলাপ—পদটির বিষয়বস্তু। শব্দচয়ন ও ভাষার বাঁধুনি চমৎকার।

পঞ্চানন দত্তের "ননীচুরি"-বিষয়ক পদটি প্রতিবাৎসল্যরসে উচ্ছল। উদূখলে বাঁধা গোপাল ও অন্যান্য গোপবালকের মুক্তির জন্য রোদন—পদটির বিষয়বস্তু। ইহার ভাবসজ্জা ও ভাষার চমৎকারিতা সুন্দর সমুপভোগ্য সম্পদ্।

জন্মান্ধ বলিয়া লোকে ইঁহাকে মহেশ কানা বলিত। ইনি জাতিতে কায়স্থ, উপাধি ঘোষ। জন্ম (আনুমানিক) ১২১০ সালে, ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসত সবডিভিসনের নিকটবর্তী মহেশ্বরপুর গ্রামে। দরিদ্রের জন্মান্ধ সন্তান সাধারণতঃ মাতাপিতার নিতান্ত অবহেলার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। মহেশচন্দ্র কিন্তু দরিদ্রের সন্তান হইয়াও মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। মহেশচন্দ্র শিশুকাল হইতে অতীব মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার স্মরণশক্তি তীব্র প্রখর ছিল; যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনীগুলি

মহেশ কানা

তাঁহার একপ্রকার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার তীব্র অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কখনও গ্রামস্থ ভট্টাচার্যপাড়ায় কাহারও বাটীতে কখনও গ্রাম্য টোলে রাখিয়া আসিতেন। ভট্টাচার্যের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি শাস্ত্রাদি-বিচার শুনিতেন, আর গ্রাম্য টোলের একধারে বসিয়া গুরুমহাশয় ও তাঁহার ছাত্রদের অধ্যাপনা ও পাঠাভ্যাস শুনিতেন। এইভাবে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার অমরকোষ ও ব্যাকরণাদি একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রাম্য গুরুমহাশয় তাঁহাকে সাদরে অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় শিক্ষা দিতে থাকেন। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান ও আপনার কবিত্বশক্তির সংযোগে তিনি নানাবিধ ছড়া ও গান মুখে মুখে রচনা করিয়া জনসাধারণকে শুনাইতেন। দেশ-বিদেশে মহেশকানার এইরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় ছড়াইয়া পড়িলে কলিকাতার কবির দল তাঁহার কাছে আসিয়া কবিগান রচনা করাইয়া লইয়া যাইত। সে সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় রামদুলাল সরকার মহাশয়ের দুই পুত্র আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু ও লাটুবাবু) বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ও সমঝদার পুরুষ ছিলেন। পাঁচালীকার, কবি ও গায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র, ইঁহারা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; অনেকে আবার তাঁহাদের গৃহে প্রতিপালিতও হইত। মহেশ কানার এইরূপ গুণের পরিচয় পাইয়া ছাতুবাবু সাদরে তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান। মহেশ কানা ছাতুবাবুর বাটীতে আশ্রয় পাইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। ছাতুবাবু সময় সময়ে নিমন্ত্রিত কবিওয়ালার সহিত মহেশকানার কবিযুদ্ধ বাধাইয়া দিতেন এবং নিজে বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাঁহাদের কবির লড়াই শ্রবণ করিতেন। এই ছাতুবাবুর আশ্রয়ে মহেশ সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মহেশ কানার একটি অসম্পূর্ণ পদ এই সঙ্কলন-মধ্যে প্রদত্ত হইল। ইঁহার কোন সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় নাই। এই অসম্পূর্ণ পদে নন্দরাণীর বাৎসল্য-রসের একটি সুন্দর কোমল চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা প্রতিভাত।

বীরভূম-সিউড়ীর কবিগোষ্ঠী বলিতে প্রায় দ্বাদশ জন কবির রচনার পরিচয় এখানে দিতেছি। ইতিপূর্বে বীরভূমের প্রাচীন কবিয়াল বলহরি রায়ের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; বর্তমানে আমরা কৈলাস ঘটক, চণ্ডীকালী ঘটক, সৃষ্টিধর, বিষ্ণু চট্টরাজ, নিতাই, রাজারাম, রামানন্দ, চাকর যুগী, বনওয়ারী চক্রবর্তী,

রাধানাথ, সারদা ভাণ্ডারী ও রাইচরণ রায়ের জীবনী ও উঁহাদের রচিত কবিগানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। বীরভূম-সিউড়ীতে কবিগানের আখড়া ছিল ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইঁহাদের সাধনার বৈশিষ্ট্য কতকগুলি অবশ্যই ছিল এবং সেগুলি সাধারণভাবে সকলের রচনার মধ্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়—প্রাচীন ঐতিহ্যের জের টানিয়া যাওয়ার প্রচেষ্টা, বাৎসল্য ও করুণরসের প্রচেষ্টা এবং মালসীর ও সখীসংবাদের প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়।

বীরভূম-সিউড়ীর কবিগোষ্ঠী

এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন কৈলাস ঘটক। যৌবনে ইনি বলহরি রায়ের সহিত কবির পাল্লা দিয়া সুখ্যাতিই অর্জন করেন। ইঁহার গোষ্ঠ-বিষয়ক গান ভাবঘন ও রসোত্তীর্ণ হইত। বৈষ্ণব-পদাবলীর মধুময় ঐতিহ্য তাঁহার গানে চমৎকার স্ফূর্তি পাইয়াছে। বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসের উচ্ছলতা তাঁহার ভাব ও বিভাবের আধার মধ্যে কত সহজে অথচ সুন্দরভাবে প্রবাহিত হইত তাহাই পাঠকদের সমক্ষে ধরিয়া দিবার উদ্দেশ্যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

চল, চল, চল বিলম্বে কাজ নাই,
ওরে ভাই প্রাণের কানাই।
তুমি বিনে যায় না বনে ধবলী-শ্যামলী গাই
শিঙা-পাঁচনী বাধা আমরা দিব বয়ে
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চেয়ে॥

ইঁহার রচিত আগমনী, বিজয়া ও গোষ্ঠ-গান লোকসমাজে এরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল যে আজিও তাহা কবির জন্মভূমির চতুষ্পার্শ্বে ভিখারীর মুখে শুনা যায়।

১২০৫ সালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সদর সিউড়ীর নিকটবর্তী চন্দ্রভাগা নদী তীরবর্তী মল্লিকপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম হরমোহন ও পিতামহের নাম সর্বানন্দ সরস্বতী। কবি বিবাহের পর আপন জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কচুজোড়-নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১২৮০ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে কবির মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে চণ্ডীকালী ঘটক তাঁহার পিতার ন্যায় কবি-গাহনা করিয়া জীবিকা নির্বাহ ও প্রতিষ্ঠালাভ

করেন। ইহার গৌরচন্দ্রী বা গৌরাঙ্গ-বন্দনা অপূর্ব মাহাত্ম্য-গানে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রসাদগুণ শ্রোতৃবর্গের চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট করে।

ছিরু বা সৃষ্টিধর ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক এবং বলহরির শিষ্য ছিলেন। ইহার নিবাস বোলপুরের পশ্চিমস্থিত কাঁকুটিয়া গ্রাম, জাতিতে বৈশ্য। এরূপ জনশ্রুতি আছে ছিরুর বংশের কোনও পূর্বপুরুষ লোচনদাসকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি আপন নিবাস কাঁকুটিয়া ছাড়িয়া জাহ্নবী গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। ইহার গীত রচনায় ঐতিহ্যানুযায়ী ভাব ও রসের অনুবর্তন উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রসাদগুণ বচন রচনায় চমৎকার বিকাশলাভ করিয়াছে। ভাবের উচ্ছ্বাস ও রসের উচ্ছলতা সমান লক্ষণীয়।

বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ একজন সুপুরুষ, সুগায়ক ও ভক্ত কবি ছিলেন; কবিগায়কদিগের ফরমায়েশ মত ইনি কবিগান রচনা করিয়া দিতেন। ইহার বিরহ-সঙ্গীতাদি গাহনায় লোকে ভাবাবেগে গদ্‌গদ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিত। ইনি শুধু ভক্ত কবি নন, ইহার বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক দরিদ্র ব্যক্তির শিশুসন্তানেরা তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে আসিত, তিনিও সযত্নে তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে "মাশয়" বলিত।

সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁহার পদটি গতানুগতিক প্রথায় শ্রীকৃষ্ণচরণে সুগতির প্রার্থনা। কবির নিরুপায় পাতকীর ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই দাস কবিগানের বাঁধনদার ছিলেন। সিউড়ীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বকুল গ্রামে ইহার নিবাস ছিল। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণদাস। ১৩০৬ সালে ইহার মৃত্যু হয়। এখানে প্রদত্ত তাঁহার মোট চারটি গানের দুইটি রাস-বিষয়ক ও দুইটি বাল্যলীলা-বিষয়ক। বলা বাহুল্য নিতাই-এর রচিত রাসলীলা জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে সুতরাং ঐতিহ্যানুসারী। নিখুঁত সুন্দর ইহার বাচনভঙ্গি। বাল্যলীলা-বিষয়ক গান সুমধুর, বাৎসল্য-রসে ভরা মালসী গানের মেনকার চেয়ে যশোমতীর মাতৃহৃদয়ের দান কোন অংশে ন্যূন নহে।

রাজারাম গণক কবিগায়ক ও বাঁধনদার ছিলেন। সিউড়ীর দক্ষিণে প্রায় ৮ মাইল দূরে পুরন্দরপুরের সন্নিকট বাঁশশঙ্কা গ্রামে ইহার নিবাস ছিল।

এই সঙ্কলন-মধ্যে ইহার দুইটি মালসী গান ব্যতীত একটী শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-

লীলা-বিষয়ক গানও সংযোজিত হইল। মালসী গান দুইটিই প্রশ্নভঙ্গিতে রচিত। দেবীর বন্দনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য সরলভাবে না গাহিয়া পুরাণের বিবিধ প্রসঙ্গ প্রশ্নচ্ছলে অবতারিত করা হইয়াছে। ঐতিহ্যের অনুসরণ ইহার মধ্যে প্রকট। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক গানে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যাপার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

রামাই ঠাকুর বা রামানন্দ চক্রবর্তীর জন্মস্থান সিউড়ির চার মাইল দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ রায়পুর গ্রাম। ইনি কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক। রামানন্দের পূর্বগোষ্ঠ ও উত্তরগোষ্ঠ-বিষয়ক মোট দুইটি পদ সঙ্কলন-মধ্যে প্রদত্ত হইল। পূর্বগোষ্ঠের পদটি সখ্যভাব ও শান্তরসের বাহক। উত্তর-গোষ্ঠের পদটি বাৎসল্যরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উভয় পদের কোমল-মধুরতা একান্ত উপভোগ্য। পদ দুইটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত এবং সংগঠন ঐতিহ্যানুসারী গতানুগতিক।

চাকর যুগীর জন্মস্থান সিউড়ির ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পুরন্দরপুর গ্রাম। ইনি ছিরু ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহার প্রতিবাৎসল্য-রসের একটি মাত্র স্বল্পায়তন পদ গৃহীত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু গোপাল যশোমতীর নিকট চাঁদ ধরিয়া কপালে তিলক আঁকিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বিষয়বস্তু-অনুযায়ী ভাবও কোমল-মধুর।

বনওয়ারী চক্রবর্তীর জন্মস্থান সিউড়ির চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে ইসলামবাজার থানার অন্তর্গত কুড়মিঠা গ্রাম। এই গ্রামে হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা এই চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সমবেত হইত। বনওয়ারীর সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে আপন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা দিতে থাকেন। হরিনারায়ণ মহাশয়ের বাটীতে আত্মীয়তাসূত্রে বনয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এই স্থলেই বনওয়ারীর সহিত বনয়ারীলালের আলাপের সূত্রপাত ঘটে। বনওয়ারীর গান শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতুল বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজের সহিত বনওয়ারীর সংযোগ করাইয়া দেন। সেই অবধি বনওয়ারী মধ্যে মধ্যে মঙ্গলডিহি গিয়া কবিগান শিখিয়া আসিতেন। ইহার পর ইনি কবি-গাহনা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গৃহীত-পদে গোপালের মাতা যশোমতীর নিকট চাঁদ ধরিয়া দিবার প্রার্থনা শুনিয়া মাতার আদরাধিক্য ও মহিমা-কীর্তন উক্ত হইয়াছে।

রাধানাথ কবির একটি মাত্র ক্ষুদ্রাকার গোষ্ঠবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।

বিষয় উত্তর-গোষ্ঠ এবং শেষে মাহাত্ম্য-বর্ণন আছে। ঐতিহ্যানুসরণ করিয়া কবি গতানুগতিক-ভাবে পদটি রচনা করিয়াছিলেন।

সারদা ভাণ্ডারীর নিবাস মল্লিকপুর গ্রাম। কবি-গাহনায় ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি কৈলাস ঘটকের সমসাময়িক। এই কবির মালসী, সখীসংবাদ ও গোষ্ঠ-বিষয়ক পদ কতকগুলি এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। নবমী-বিষয়ক তাঁহার দুইটি পদ ও ডাক-মালসীর একটি পদ লইয়া মালসী। কবি তাঁহার ডাক-মালসীতে দেবীকে আহ্বান দিয়াই মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুরু করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করুণার বা মহিমার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া মালসী শেষ করিয়াছেন। পদের বিষয়বস্তু ও সংগঠন ঐতিহ্যানুসারী ও গতানুগতিক। আকার নাতিদীর্ঘ। নবমী-বিষয়ক দুইটি পদই করুণ ও কোমল ভাবের সমন্বয়ে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠিয়াছে। রজনী পোহাইলেই হর আসিবেন এবং মেনকার একমাত্র কন্যা উমা আবার এক বৎসরের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাই গিরিরাণীর একান্ত আক্ষেপের বিষয়। তাই একবার তিনি গিরিরাজকে ইহার কোন ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন, আরেকবার তিনি নবমী রজনীকে চলিয়া যাইতে বারণ করিতেছেন। ফলে, পদ দুইটি করুণ বাৎসল্য-রসাশ্রিত হইয়াছে। আকার দীর্ঘ হইলেও গান দুইটিতে ঐতিহ্যানুসরণ সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বিরহ ও মাথুর-বিষয়ক পদগুলিতে কবির কলা-কুশলতা চমৎকার ব্যঞ্জনার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রজে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, গোপীগণ মদনশরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, অথচ সেই বহুবল্লভ নাই। কৃষ্ণ-বিরহে রাধার শোকে সারা ব্রজভূমি মুহ্যমান। এমন সময়ে ও এরূপ দশায় ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের কলগান অসহনীয়। ফলে গতানুগতিক প্রথায় বিরহের করুণতা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাথুরের পদ দুটিতে আবার এই বিরহ আক্ষেপ ও আক্রোশের আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পূর্বগোষ্ঠ পদটিতে অকপট মাতৃহৃদয়ভাব ব্যক্ত হওয়ায় অম্ল-মধুর রসসিক্ত হইয়াছে। সর্বোপরি গানটির অন্তর্নিহিত প্রসাদগুণ ও বাৎসল্যরস লক্ষণীয়।

রাইচরণ রায়ের একটি মাত্র পদ প্রদত্ত হইয়াছে—ইহার বিষয়বস্তু যশোদার খেদোক্তি।

যে যুগে হুগলী নদীর দুই কূলবর্তী স্থান এণ্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, সীতানাথ, নীলু ঠাকুর, হরিদাস প্রভৃতি কবিয়ালের গানে মুখর ছিল তখন ময়মনসিংহ জেলায় লোচন কর্মকার, হারাইল বিশ্বাস, চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ নাথ প্রভৃতি কবিয়ালগণ খ্যাত ছিলেন। অনেকে বলেন যে "ময়মনসিংহের কবিগান" নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণের সমকালীন। আমরা এই গ্রন্থে কানাই-বলাই, লাল মামুদ, রামগতি, রামু সরকার, তারাচাঁদ প্রভৃতি প্রাচীন কবিয়ালের কবি-গান সংগৃহীত ও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

ময়মনসিং জেলার কবি

ময়মনসিংহের হোসেনপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দগ্‌গা গ্রাম কানাই-বলাইয়ের জন্মভূমি। এই দুই ভাই কবিগানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহাদের পিতার নাম আশারাম নাথ। ইঁহাদের রচিত গীত শ্রীহট্ট, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে শুনা যায়। ইঁহাদের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে ইঁহারা মালসীর উপবিভাগের অর্থাৎ ডাক-মালসী ও লহর-মালসীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাববস্তু পরিবেষণের দিক হইতে ডাক-মালসী অত্যন্ত সরল সংক্ষিপ্ত। ইহাতে দেবীকে আহ্বান করিয়া আপনার নিরুপায়ের কথা নিবেদন করা হইত। উমা শ্যামা পার্থক্য করা হইত না। আর লহর-মালসী হইত তত্ত্বমূলক গান। তাহার মধ্যে দেহতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, তারাতত্ত্ব প্রভৃতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইত।

এই জেলার নেত্রকোনা বিভাগে নারায়ণডহরের সন্নিকটবর্তী বাওইডহর গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে লাল মামুদের জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালায় লালুর যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষালাভ ঘটে। ছেলেবেলায় হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে ; তিনি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন এমন শুনা যায়। তিনি আপন বাটীতে তুলসীবৃক্ষ স্থাপন করিয়া সেখানে খোল-করতাল-সংযোগে কীর্তন করিতেন। অল্পশিক্ষিত মুসলমানেরা তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া কিছু অত্যাচার করিত না। হিন্দুরা তাঁহাকে যবন হরিদাসের সঙ্গে তুলনা করিত। মধ্যে মধ্যে তিনি কবিগান রচনা করিতেন এবং আসরে কবিগানও করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পদ এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—প্রথমটি সখীসংবাদ-পর্যায়ের অনুরাগ-বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ ও শ্রীরাধার উন্মাদনা ইহার বিষয়বস্তু। রচনা প্রসাদগুণমণ্ডিত ও শব্দচয়ন মনোহর। দ্বিতীয়টি গৌরাঙ্গ-বন্দনা।

শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভু কলির জীবকে তরাইতে নাম বিতরণ করিতেছেন—ইহাই পদটির বিষয়বস্তু। রচনাভঙ্গি চমৎকার ও ঐতিহ্যানুগত।

ময়মনসিংহের রামগতি, রামু ও রামকানাই কবিয়াল একই সময়ের লোক। ইহাদের পুরা নাম রামগতি শীল, রামু সরকার ও রামকানাই নাথ। রামগতির বাড়ী গাঙ্গাইল, রামুর বাড়ী আউটপাড়া আর রামকানাইয়ের বাড়ী ঘাইটাল। এই গ্রামগুলি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। শুনা যায় যে, নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে ঝুমুরওয়ালীর দল কিশোরগঞ্জে আসিয়া রামগতি ও রামুর সহিত কবিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই কবিযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই কবিত্রয়ের মধ্যে রামগতি তাহার কবিত্বশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। কেহ রামগতিকে ময়মনসিংহের দাশু রায়, কেহ বা তাহাকে ময়মনসিংহের নিধুবাবু বলিত।

রামগতির একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সখীসংবাদ-অন্তর্ভুক্ত খণ্ডিতাবিষয়ক। পদটি নাতিদীর্ঘ ও গতানুগতিক প্রথায় রচিত ঐতিহ্যানুসারী। পদটির প্রসাদগুণ অবশ্যই লক্ষণীয় এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ভাব ও ভাষা বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ, তীব্র, মর্মস্পর্শী ও করুণরসান্বিত। কবির কলাকুশলতা পদমধ্যে সুন্দর অথচ স্পষ্টরূপেই পরিস্ফুট।

রামু সরকারের সখীসংবাদ-বিষয়ক কিছু পদ ও কবির লহর সঙ্কলন-মধ্যে প্রদত্ত হইল। সখীসংবাদ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ ও বসন্তবিষয়ক পদ দুইটি রসপূর্ণ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বংশী লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাই নিশান্তে কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি বাঁশী বাহির করিয়া দিতে শ্রীমতীর নিকট সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন—ইহাই পদটির বিষয়বস্তু। ঐতিহ্যের অনুসরণ ছাড়াও কবির কবিত্ব এই পদমধ্যে প্রকৃতি-বর্ণনায় ও প্রসঙ্গ-বর্ণনায় এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আমরা এই কবির কল্পনা ও কলাচাতুর্যের প্রশংসা না করিয়া পারি না। পদটির আকার দীর্ঘ হইলেও সংযত বটে এবং ভাবের বিকাশে পারম্পর্য রক্ষিত হইয়াছে। বসন্ত-বিষয়ক পদটিও সুন্দর বিরহমিশ্রিত বসন্তবর্ণন। বহুবল্লভবিহীন বৃন্দাবনে বসন্তবিকাশে গোপীগণ মদনশর-নিপীড়িতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য খেদ করিতেছেন। শ্রীরাধার অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। মদন তাঁহার উপর জয়ী হওয়ায় নায়কের অনুপস্থিতিতে তাঁহার জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া

পড়িয়াছে। বিরহের এই করুণ চিত্রটি নির্বাচিত শব্দের সাহায্যে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদটি নাতিদীর্ঘ এবং ইহার ভাব ও বিষয়বস্তু ঐতিহ্যানুসারী।

রামু সরকারের কবির লহর দুইটিও চমৎকার। "লহরকবি" ও "কবির লহর" সমার্থক আখ্যা। আকার-আয়তন উভয়েরই নাতিদীর্ঘ। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা কোনটির মধ্যেই নাই। ইহাদের একটিতে মহাভারতীয় মুষল বা মৌষলপর্বের আখ্যান আছে। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণহন্তা জরাব্যাধের মধ্যে কথোপকথন ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আর অন্যটিতে আছে সুসঙ্গের রাজা ও রাজবংশের এবং রাজবাটী-কাছারী প্রভৃতির বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত রামপুরে অনুমান ১২৪৭-৪৮ সালে কবিয়াল তারাচাঁদের জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় তারাচাঁদের কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভের সুযোগ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৬ বৎসর বয়সে বসন্ত-রোগে তারাচাঁদ চক্ষুরত্ন দুইটি হারাইয়া ফেলেন। বিধাতা বোধ করি তাঁহার বহির্দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন—কবি এই বয়স হইতেই কবিত্ব-গুণের অধিকারী হইয়া উঠেন। কালক্রমে কবিওয়ালাদিগের গান শুনিয়া তাঁহার মনে গায়ক হইবার বাসনা জন্মে। এই কারণে তারাচাঁদ আপনার জন্মভূমি রামপুর ছাড়িয়া চন্দনকান্দী গ্রামে আসেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিয়াল সূর্যকান্ত নন্দী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চন্দনকান্দী গ্রামে থাকিয়া অন্ধ তারাচাঁদ কবিগান গাহিয়া সুপ্রসিদ্ধ হন।

কবি তারাচাঁদের মালসী গান মাত্র দুইটি সঙ্কলনমধ্যে সংযোজিত করা হইল। গান দুইটি ঐতিহ্য-অনুযায়ী নাতিদীর্ঘ ও সরল কথায় সংগঠিত। গান দুইটির ভাব বা বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য ভক্তের শক্তির উদ্দেশে আবেদন। জগৎসংসারকে হাটের রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বয়ং ভক্ত অন্ধের রূপকে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাবের বিস্তার সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে। শব্দসম্পদ্ সাধারণ ও প্রাদেশিক উচ্চারণের চিহ্নযুক্ত।

কবি মহেশ চক্রবর্তীর প্রভাস-মিলন বা দানযজ্ঞ-বিষয়ক একটিমাত্র পদ সঙ্কলনে প্রদত্ত হইল। মাতা নন্দরাণী তাঁহার গোপাল যিনি এখন দ্বারকার রাজা হইয়া বসিয়াছেন তাঁহার দর্শন-লালসায় অধীর হইয়া প্রতিহারীর নিকট করুণ আবেদন জানাইতেছেন—ইহাই পদটির বিষয়বস্তু। শব্দ-সম্পদ্ সাধারণ এবং পদটি ক্ষুদ্রাকার। কবি ঐতিহ্যানুসরণে পদটির বিষয়বস্তু গড়িয়া তুলিয়াছেন।

মহেশ চক্রবর্তী

মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র মাথুর-বিষয়ক পদটি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কটূক্তি মাত্র। পদমধ্যে "চোর" শব্দটির পুনঃ পুনঃ নানার্থক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মাথুর ভাবের বিকাশ ও বিস্তার কিছুমাত্র নাই।

মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা-বিক্রমপুরের কবি হরিমোহন আচার্যের একটিমাত্র পদ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা শ্রীমতীর বিরহ-বিষয়ক। পদটির বিষয়বস্তু ধারণাতীত উচ্চ-স্তরের। বিরহাবস্থার দশম দশায়— শ্রীরাধা মহাসমাধিমগ্না ইহাই পদটির বিষয়বস্তু। তিনি একাধারে মহাপ্রেমিকা ও যোগিনী ইহা ঐতিহ্য-সম্মত। সুতরাং কবি এখানে তাঁহার বিরহাবস্থার বিভিন্ন লক্ষণ উল্লেখ করিয়া যে চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঐতিহ্যানুযায়ী। কিন্তু এই দশাভাব ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন বলিয়া পাঠক সাধারণের নিকট পদটি প্রহেলিকার মত বোধ হইবে। কবি পদমধ্যে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি যোগশাস্ত্রে ও বৈষ্ণবভক্তিশাস্ত্রেই সুলভ, অন্যত্র নহে। পদটির আকার-আয়তন নাতিদীর্ঘ।

ঢাকা-বিক্রমপুরের কবিয়াল

ঢাকা-বিক্রমপুরের আরেকজন কবি রসিকচন্দ্র আচার্যের উত্তরগোষ্ঠ-বিষয়ক একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পদটি আকারে অদীর্ঘ। ব্যবহৃত শব্দাবলী সাধারণ এবং বিষয়বস্তু ঐতিহ্যানুযায়ী। রাখালগণ মা যশোদার উল্লেখ করিয়া আসন্ন সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে গোপালকে গৃহে ফিরিতে বলিতেছে। সুতরাং কিছু করুণ সখ্যভাব পদমধ্যে দেখা যায়।

ঢাকার কবি কৈলাসচন্দ্রের "মঙ্গলাচরণ" শীর্ষক একটি পদ ও কয়েকটি কবির লহর সঙ্কলন-মধ্যে দেওয়া হইল। কবি গতানুগতিক পন্থা পরিহার করিয়া মঙ্গলাচরণ বলিতে সরস্বতীর ও গুরুর বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার বন্দনা যথেষ্ট বিনয়-মিশ্রিত এবং মঙ্গলকাব্যের বন্দনা বা মঙ্গলাচরণের মতই বরং লাগে এবং দেহতত্ত্ব ও ভবতত্ত্ব এই মঙ্গলাচরণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলাচরণটির কলেবর অদীর্ঘ ও দুইভাগে বিভক্ত।

তাঁহার কবির লহরের পালাগুলির অধিকাংশই রামায়ণ হইতে গৃহীত। এ রামায়ণ অবশ্য বাল্মীকির নহে, বাঙ্গালী কবিদের রচিত। পালাগুলি মায়া-সীতার, মহীরাবণের ছলনার, রাম-নির্বাসনের ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের। ইহাদের বিষয়বস্তুর আলোচনা ও উল্লেখের মধ্যে লৌকিকভাব পরিস্ফুট। শব্দ-সম্ভার সাধারণ ও আকার-আয়তন অদীর্ঘ। আর দুইটি পালা ননীচুরি ও

নিমাইসন্ন্যাস-বিষয়ক। ননীচুরির পালায় যে বাল্যলীলা, বালকের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট ভাবাবেগের সহিত প্রকীর্ণ নীতিবাক্য মিলাইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। পদটির আকার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসের মিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোনও ভাব বা কোনও রস প্রগাঢ় হইয়া ওঠে নাই। নিমাই-সন্ন্যাসের পদটি করুণ-মধুর। ইহার মধ্যে করুণ-রস পরিস্ফুট এবং সেই রস পরিস্ফুটনে প্রয়োজনীয় যে বিরহ-বিচ্ছেদজনিত খেদ ও ক্ষোভ, তাহাও যথাযথ উপস্থাপিত দেখা যায়। পদটির কলেবরও অদীর্ঘ। শব্দসম্ভার স্বাভাবিক ও সরল। ভোর বা প্রভাতী-বিষয়ক একটি পদ এইসঙ্গে সংযোজিত হইল। উহা ঐতিহ্যানুযায়ী গতানুগতিক ভঙ্গিতে রচিত হইলেও পদমধ্যে কবির নিজস্ব সরস কবিত্বও প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং পদটি করুণ-রসাশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে ও ইহার ভাব-বিভাব প্রভৃতি যথোচিত সমাহৃত হইয়াছে। ফলে, পদটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার শব্দাবলী মনোজ্ঞ এবং গঠনভঙ্গি গতানুগতিক।

আনুমানিক ১২৫৫ সালে বিক্রমপুর তন্তুর গ্রামে মাতুলালয়ে কৈলাসচন্দ্রের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম শান্তমণি দেবী। ছেলেবেলা হইতে ইঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। সখের কবির দলে যুক্ত হইয়া তিনি গ্রামে গ্রামে কবিগান করিয়া বেড়াইতে থাকেন এবং সময়ে সময়ে নাট্যাভিনয়ের দৃশ্যপট অঙ্কিত করিয়া দিতেন। তাঁহার রচিত কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতি পাওয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীতাদি রচনার মধ্যে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা ১৩০৬ সালের ৫ই পৌষ মঙ্গলবার জন্মভূমি তন্তুর গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পরাণচন্দ্র, রামকানাই ঠাকুরের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী এবং উদয়চাঁদের সমসাময়িক। পরাণচন্দ্রের প্রকৃত নাম প্রাণকৃষ্ণ। এই কবির কলঙ্কভঞ্জন, বিরহ-বিষয়ক দুইটি পদ ও মহাভারতের বা হরিবংশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও তদুপলক্ষে শিশুপালের ব্যর্থচেষ্টা ও অপমানের প্রসঙ্গ লইয়া একটি কবির লহর এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগে গানগুলি সমৃদ্ধ। রামকানাই ঠাকুরের বাসর-সজ্জা-বিষয়ক পদটির সংগঠন গতানুগতিক। উদয়ের মালসীগান, সখীসংবাদ ও গোষ্ঠগান এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মালসীগানে শিবের প্রসঙ্গ বর্ণনায় তদানীন্তন কালের উপর কটাক্ষপাত আছে। সখীসংবাদ গানটিতে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপের

বর্ণনা ও গোষ্ঠগানটিতে শ্রীকৃষ্ণমহিমা প্রচারের কৃত্রিম প্রচেষ্টার পরিচয় পরিস্ফুট।

বাংলা ১২১৮ সনে ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার ২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। তাঁহার দশ বৎসর বয়সেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়ায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে বাল্যকাল হইতে কবিতা-রচনার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, লেখাপড়ার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেও কবিতা বা ছড়া রচনা করার প্রবৃত্তি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ১২ বৎসর বয়সেই তিনি সখের কবির দলে কবিগান রচনা করিয়া দিতেন। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের উৎসাহে ঈশ্বর গুপ্ত ১২৩৭ সালে "সংবাদ প্রভাকর" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন, ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর "সংবাদ প্রভাকর"ও তিরোহিত হয়। তবে ঐ বৎসরে ১২৩৯ সালে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের উৎসাহে গুপ্তকবি "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। তাহাও বেশীদিন চলে নাই। ১২৪৩ সালে ২৭শে শ্রাবণ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" পুনরায় ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে "প্রভাকর" প্রাত্যহিক হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার প্রায় ৭ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ঈশ্বর গুপ্ত ১২৫৩ সালে "পাষণ্ডপীড়ন" ও ১২৫৪ সালে "সাধুরঞ্জন" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাদ্বয় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তাঁহাকে কবি ও হাফ-আখড়াই দলের অনুরোধে তাহাদের জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতে হইত। বোধ হয় এই কারণেই তিনি প্রাচীন কবিওয়ালা গানের অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ১২৬০ সাল হইতে প্রতিমাসের ১লা সংবাদ প্রভাকরের যে সংখ্যাটি বাহির হইত তাহাতে তিনি অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিগীত ও কবিওয়ালা-দিগের জীবনী প্রকাশ করিতে থাকেন। হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, রাসু-নৃসিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের গানগুলি যাহা আমরা বর্তমানে মুদ্রিত আকারে দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রায় সবগুলিই ঈশ্বরচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া "সংবাদ প্রভাকরে"ই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচীন কবিওয়ালার গান-সংগ্রহ ব্যতীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁহার প্রণীত কৃষ্ণকীর্তন, কালীকীর্তন, ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং অনেক প্রাচীন কবির লুপ্তপ্রায় রচনা প্রভাকরেই প্রকাশিত করিয়া

ঈশ্বর গুপ্ত

তিনি তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রিকায় তাঁহার রচিত "প্রবোধ প্রভাকর", "হিতকর" ও "বোধেন্দুবিকাশ" নামক তিনখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গ ও শ্লেষপূর্ণ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের সখীসংবাদ-বিষয়ক গান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইত। এখানে মোট দশটি গান প্রদত্ত হইল। সখীসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বিরহ, মাথুর, মান ও মিলন-বিষয়ক গান ছাড়া গোষ্ঠ-বিষয়ক গানও সঙ্কলন-মধ্যে দেওয়া হইল। শোনা যায়—কবির বিরহ-বিষয়ক গান উৎকৃষ্ট হইত। ইহার মধ্যে শ্লেষের সূচীমুখ যেমন পাওয়া যায় তেমনি করুণ-কোমলতাও সুলভ। সকল পদেই পদলালিত্যও তাঁহার আরেকটি বৈশিষ্ট্যস্বরূপ অনুভূত হয়। গানগুলির গঠনভঙ্গি গতানুগতিক এবং আকার-আয়তন দীর্ঘই বলা চলে। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পদবিশেষের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের পদবিশেষের কিছু-কিছু সাদৃশ্য আমাদের চক্ষে পড়ে; কিন্তু দাশরথি রায়ের রচনার কোন প্রভাব ঈশ্বর গুপ্তের উপর দেখা যায় না। সর্বোপরি কবির স্বকীয় কবিপ্রতিভা সকল পদেই চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

১২৫৮ সালে ভবানীপুরে দাঁড়াকবির শখের দল সৃষ্ট হইলে ইনি সেই দলের জন্য কবিগান রচনা করিয়া দিতেন। গানগুলি মোহনচাঁদ বসু প্রদত্ত

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরে তৈয়ারী হইত। সঙ্কলনে প্রদত্ত মালসী গানটি আগমনী নহে, উহার বিষয়বস্তু সপ্তমী। ইহার মূলসুর করুণ হওয়ায় বাৎসল্য-রসের পরিস্ফুটনে সহায়তা করিয়াছে। জয়নারায়ণের সখীসংবাদের পদগুলির ভাষা ও ভাব প্রাঞ্জল, করুণ-কোমল ও মনোরম। গতানুগতিকতার উর্ধ্বে তাঁহার প্রযুক্ত পদলালিত্য আমাদের অন্তর আকৃষ্ট করে।

১২৫২ সালে ২৪ পরগনায় জাগুলিয়া গ্রামে ইহার জন্ম। বাল্যকাল হইতে ইহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইত, মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া ইনি বাল্য-

মনোমোহন বসু

কালে সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। পরিণত বয়সে ইনি যাত্রা, হাফ-আখড়াই, কবি, বাউল, সংকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার সঙ্গীত-রচনায় দক্ষহস্ত ছিলেন। ইহার সম্পাদনায় "মধ্যস্থ" পত্রিকা বাহির হইত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য "রামাভিষেক", "সতীনাটক", "হরিশ্চন্দ্র", "প্রণয়-পরীক্ষা" প্রভৃতি নাটক ইহার রচনা।

কবি মনোমোহনের রচিত সখীসংবাদগুলির ভাষার চমৎকারিত্ব ও অলঙ্কার-বাহুল্য লক্ষণীয়। আধুনিক ঢঙে পদগুলি প্রকাশিত হওয়ায় ইহা সর্বতোভাবে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে।

কবি রাজকিশোরের সখীসংবাদ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিরহ-বিষয়ক তিনটি পদই সমান করুণ-মধুর। একটি বিরহ-বিষয়ক পদের করুণতা আবার কিছু তীব্রতর হইয়াছে বসন্তের আবির্ভাবের ফলে। বসন্ত সেখানে উদ্দীপন বিভাব। ভাষা ও ভাব গতানুগতিক ও ঐতিহ্যানুসারী। অলঙ্কার বলিতে উপমা, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি আছে। আকার-আয়তন অদীর্ঘ। গানগুলির পদলালিত্য মনোমুগ্ধকর।

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালসী ও সখীসংবাদ-বিষয়ক কিছু গান সঙ্কলনমধ্যে প্রদত্ত হইল। মালসী গানটির বিষয়বস্তু সপ্তমী। ইহার কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বাৎসল্য-রস পদটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সখীসংবাদের পদ বলিতে বিরহ ও মাথুর-বিষয়ক পদ সাতটি। ইহাদের ভাব ও বিষয়বস্তু ঐতিহ্যানুসারী এবং প্রত্যেকটি পদে করুণতার ছড়াছড়ি দেখা যায়। পদলালিত্য অবশ্য মোটামুটিভাবে পদগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আকার-আয়তন প্রায় সকল পদেই অদীর্ঘ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বীকৃতি

১২৬১ সালের আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাঙ্গালার প্রাচীন কবিওয়ালা গোঁজলা গুঁই, লালু-নন্দলাল, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু প্রভৃতির কবিগান প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সংকলন-গ্রন্থে আমরা "সংবাদ প্রভাকর" হইতে এই-সকল প্রাচীন কবিওয়ালার সকল গান যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়াছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য লালু-নন্দলালের একটি মাত্র কবিগান ব্যতীত রঘু ও রামজীর কোনও গানই "সংবাদ প্রভাকর" হইতে পাওয়া যায় নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে, এই তিন প্রাচীন কবিওয়ালার গানের বেশীর ভাগই মৎকর্তৃক পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মৎকর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি ব্যতীত, "বান্ধব পত্রিকা", কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "গুপ্তরত্নোদ্ধার", অবিনাশ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত "প্রীতিগীতি", "মনোমোহন গীতাবলী", মন্নুলাল মিশ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত "প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান", দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত "বাঙ্গালীর গান", "বান্ধব", "সৌরভ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং বিশিষ্ট কবিওয়ালাদিগের মুখ হইতে শ্রবণ-করা কবি-গান এই সংকলনে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল।

কবিগান সংকলন ও সম্পাদনার প্রচেষ্টা আমরা সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় ১২৬১ সালের আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলিতে দেখি। ১২৮২ সালে "বান্ধবে" কবিগানের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় কর্তৃক "প্রাচীন কবি-সংগ্রহ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন কবিগানের সংকলনে গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করা হইয়াছে; গুপ্ত কবির পর অনেক অতিরিক্ত প্রাচীন কবিওয়ালার পরিচয় ও গান ইহাতে পাওয়া যায়। এই সময়ে সারস্বত কুঞ্জে প্রকাশিত (১২৯২ সাল) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "কবিওয়ালা রাম বসুর বিরহ বিষয়ক প্রস্তাব" আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। ইহার পর ১৩০১ সালে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "গুপ্তরত্নোদ্ধার" নামে প্রাচীন কবিওয়ালা-দিগের গানের এক বিস্তারিত সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পর আমরা ১৩০২ সালে "জন্মভূমি" ও "সাধনায়" কবিগানের আলোচনার শুরু দেখি। ইহার

দুই বৎসর বাদে "ভারতী পত্রিকা"য় বিশিষ্ট কবিদের পরিচয় বাহির হয়। ১৩০৫ সালের "প্রীতিগীতি" গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রাচীন কবিগানের অংশ-বিশেষ সংগৃহীত হইতে দেখা যায়। ১৩১১-১২ সালে "সাহিত্য-সংহিতা" নামক পত্রিকায় ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক "কবি-ইতিহাস" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কবিগানের ইতিহাস, কবি-সাহিত্য বিচার ও কবিওয়ালাদিগের জীবনচরিত প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত "বাঙালীর গানে" আমরা প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতের এক বৃহৎ অংশ সন্নিবেশিত হইতে দেখি।

ইহার পর রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থটিতে ও ডাঃ সুশীল দের History of Bengali Literature In The Nineteenth Cent. নামক গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে কবিগানের ইতিহাস-সম্মত আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খয়রা অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত কবিগানের উপর নূতন তত্ত্ব ও তথ্য-প্রধান আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে আসে। ইহার পর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাময়িক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে প্রাচীন কবিয়ালাদের যথার্থ পরিচয় প্রকাশিত করিয়া পাঠকদিগের স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন।

এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চতর অধ্যয়নের ফলস্বরূপ যখন আমার অধীত বিষয়ে সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টিলাভ করিলাম তখন এই ক্ষেত্রে একই সময়ে অনেক অসম্পূর্ণতা ও অপরিণত দিক্ যেমন আমায় মানসচক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল তেমনি বহু কাজ করিবার আছে এই সত্যও প্রতিভাত হইল। তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংগীতের দিকে অনুসন্ধান-মূলক কার্যে ব্রতী হইলাম। আমার সংগ্রহকার্য সম্পূর্ণ হইলে উহা তদানীন্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিলাম। পরে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ঐ অধ্যাপক-পদে আসীন হইয়া আমাকে ঐ সংগ্রহ পূর্ণভাবে সম্পাদিত করিতে অনুরোধ করিলে আমার স্বপ্ন বা সাধনা ফলপ্রসূ হইল। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত ঋণী। তাঁহার এবিষয়ে নিরীক্ষা, সহায়তা ও সহানুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তিনি বরাবর আমার সহায়ক হইয়া সর্বতোভাবে গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশনের কার্যে সহায়তা করায় গ্রন্থটির যাবতীয় বিশেষ দিক্ বা গুণের জন্য পাঠকবর্গের প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। মনে হয় তাঁহার এইরূপ সহায়তা

ব্যতিরেকে এই বিশাল ও কঠিন সাহিত্য-কার্য কখনই বাস্তব রূপ পাইত না। সমস্ত গ্রন্থখানির সম্ভাব্য রূপের পরিকল্পনা-সম্বন্ধে খয়রা অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের পরামর্শরূপ সহায়তা আমার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছে। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ ব্যবহারের দ্বারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের পরে আমার সংগ্রহ ব্যাপারে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ঋণের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা উভয়েই সরল অন্তঃকরণে আমাকে উপাদান দিয়া ও পরামর্শ দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ রায় আজ ইহলোকে না থাকায় তিনি আমাকে যে কার্যে ব্রতী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ সার্থক রূপ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—ইহাই আমার অন্তরের গভীর দুঃখ। আমার বন্ধুবর ও সহায়ক শ্রীসত্যব্রত রায়ের আনুকূল্যের কথা এবিষয়ে ভাষায় প্রকাশ করার অতীত।

সামগ্রিকভাবে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশ ও মুদ্রণের ব্যবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। নাভানা প্রেসের ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ ও সযত্নানুশীলনের জন্যই এতবড় গ্রন্থখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারিল। সুতরাং তিনি আমাকে অশেষ উপকৃত করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

অশেষ চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও স্থানে-স্থানে যে-কিছু ভ্রম ও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল তাহা সংশোধনের জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভৌমিক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি সর্বশেষে তাঁহার উদ্দেশে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫
১৪৪বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৫

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

গৌঁজলা গুঁই

মিলন—ভাবসম্মেলন

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নীরস কোরো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি ॥
তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥ *

* সঃ প্রঃ

রঘুনাথ দাস

ভবানীবিষয়ক—বন্দনা

॥ ১ ॥

মহড়া।—এবার দেখ্‌বো শিব কেমন কোরে
রাখে পৈত্রিক ধন।
সে ধন যুদ্ধ কোরে লব কেড়ে যা থাকে কপালে ॥
জ্ঞান বিজয়ী ধনু ধোর্‌বো হাতে,
সাধন ভক্তিবাণ জুড়বো তাতে,
মার্‌বো শিবের বক্ষে।
অম্‌নি ছাড়বো চরণ কর্‌বো ধারণ, রাখ্‌বো মস্তকে।
সাধন ধনে স্বাধীন হবো, শমন শঙ্কা ঘুচাইব,
ডঙ্কা মেরে চোলে যাব, জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বোলে ॥
খাদ।—পিতা পুত্রে কোর্‌বো রণ মা
দেখ্‌বে তা দেবতা সকলে ॥
ফুঁকা।—শুনি ব্যক্ত আছে রামায়ণে,
লব কুশ যেমন বাল্মীকির বনে,
সম্মুখ রণে পিতা রামকে করে জয়,
সেইটে ভেবেছি নিশ্চয় মা গো,
কোরেছি পণ মনে মনে, ধনু ধোর্‌বো সম্মুখ রণে,
ভক্তিবাণে ত্রিলোচনে কর্‌বো পরাজয়।
মেলতা।—আমার সাধনের বল আছে কি না,
শিবকে তাই জানাবো, ওগো মা ব্রহ্মময়ী।
এতে শরীর পাতন, মন্ত্র সাধন, যা হয় হবে যুদ্ধস্থলে ॥
১ চিতেন।—মা দুর্গে দুর্গতি হরা হর-অঙ্গনা।
পাড়ন।—কলিতে সেই কাল ভয়েতে সাধন পথে মা,
কোরব ভক্তিভাবে মুক্তি লাভের শক্তি সাধনা ॥
ফুঁকা।—তুমি আদ্যা-শক্তি মুক্তি-দাত্রী
জগদ্ধাত্রী জগৎ-মাতা।

শৈলসুতা পরমাত্মা-রূপিণী ব্রহ্ম-সনাতনী মাগো,
ব্যক্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর ঐ শ্রীপদে,
তাই জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দুখানি।

মেলতা।—আমার প্রাপ্য ধনে কেনে
পিতে ভোলা বিবাদ ঘটালে—দিতে হবে বোলে,
ওগো মা ব্রহ্মময়ী, কেনে অঙ্গ ঢেলে, পোড়ে তোমার চরণতলে॥

অন্তরা।—আমি নই মা তোর তেমন ছেলে।
বারে-বারে ভোলার কথায়,
আর কত দিন থাক্‌বো ভুলে॥
করেছি এই রণসজ্জা, লজ্জা কি তায় পিতা বোলে।
এবার কাচিন্তা মরণে রণে ছাড়বো না ধন প্রাণ গেলে॥

২ চিতেন।—জানি তুমি মা যোদ্ধা মেয়ে,
আমি তোর সন্তান।

পাড়ন।—তুমি মা যার বর্ত্তমান, ভয় কি তার রণে,
আছে সার পদার্থ গুরুদত্ত ভক্তি-তত্ত্ববাণ।

ফুঁকা।—জানি শিবকে যে জন ভক্তি করে,
বিল্ব পত্র গাত্রে মারে,
দয়া করে তারে দেন শিব শিবত্ব—
আছে পুরাণে ব্যক্ত, মা গো,
তার সাক্ষী বলি শ্যামা যুদ্ধ কোল্লে অশ্বত্থামা,
তাই বোলে শিব দিয়ে ক্ষমা রাখলেন তার মহত্ত্ব।

মেলতা।—যদি হরি বলে মরি প্রাণে ক্ষতি নাই মা তাতে,
ওগো মা ব্রহ্মময়ী
তখন দয়া করে রঘুনাথে
চরণ দিও মরণ কালে॥*

॥ ২ ॥

মহড়া।—তারা গো মা পাপে তনু জীর্ণ হোলো,
তারা আমায় তরাও, তরাও তবে।
বিফল হোলো মানব জনম ভবে॥

* প্রাঃ ওঃ কঃ

হোল না মা ভজন-সাধন, দীনের দিন ফুরাল ;
শমন প্রতিদিন গুন্‌তেছে দিন,
দিন আখেরি হোলো।
দয়াময়ী দয়া করি, দেও আমায় ঐ চরণ-তরী,
শমন রাজার ভেঙ্গে জারি,
পার হ'য়ে যাই ভবার্ণবে ॥

খাদ।—দীনতারিণী তোমা বিনে দীনে কে তরাবে।

ফুঁকা।—আমার পুণ্য নাই মা পাপে ভরা,
ভয় পেয়ে তাই ডাকি তারা,
শক্তিময়ী তারা ওগো তারা মা, ব্রহ্মময়ী মা,
পুরাণে মহিমা শুনি, তুমি মা পতিতপাবনী,
নাম ধরেছ দীনতারিণী দীন তরাতে হবে ॥

মেলতা।—আছি মর্ত্ত্যে লয়ে পুত্র দারা,
ব্রহ্মময়ী মা, ভব-যন্ত্রণা আর সহে না,
তারা ভবে আর পাঠিও না শিবে ॥

১ চিতেন।—ত্রিতাপহরা ত্রিলোকতারা, নাম ধর তারা,
ভবার্ণবে তরাও শিবে, জীব তরে যায় ভবে,
মা তুমি ভব-ভয়-হরা।

পাড়ন।—ভবে এসে আমার কর্ম্ম ফেরে,
মুগ্ধ আছি মায়া ঘোরে,
বদ্ধ হোয়ে আছি ভুলে ওগো মা, ব্রহ্মময়ী মা।

ফুঁকা।—নিত্য ভাবি আজি কালি, রসনায় না বলি কালী,
অনিত্য বাসনায় কালি,
নিত্য ধন হারিয়েচি।

মেলতা।—আমার অপরাধ ক্ষমা কর',
করুণা বিতরি তার',
ব্রহ্মময়ী মা, দয়াময়ী দীনের,
প্রতি কবে দয়া প্রকাশিবে ॥

অন্তরা।—দুর্গতিনাশিনী তারা, ওগো তার'
তুমি ভব-ভয় নিবার,

ডাকি দুর্গা বলে দুর্গা নামের ফলে,
দুর্গমে রক্ষ তারা,
তারা মাগো নাই আমার উপায়, উপায় তব পায়,
ভব-রাণী ভব-দারা।

২ চিতেন।—মা দিনের অন্ত জীবনান্ত হবে যে সময়।
সিদ্ধেশ্বরী শুভঙ্করী সুরেশ্বরী গো মা,
সেই সময় দিও পদাশ্রয়।

পাড়ন।—এ দেহ পিঞ্জরে ওগো তারা,
পক্ষী যেমন থাকে তেম্নি ধারা, জীবের জীবন!

ফুঁকা।—ওগো তারা মা ব্রহ্মময়ী মা,
প্রাণ-পাখী যখন পালাবে,
দেহ-পিঞ্জর পড়ে রবে,
যাবার বেলা, কোথায় যাবে,
জান্তে কে তা পারে।

মেলতা।—পাখী উড়ে গিয়ে কালী বোলে,
বসে কল্পতরুমূলে,
রঘুর এই বাসনা ভবে মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ পেলে,
ভবের আশা দূরে যাবে ॥*

॥ ৩ ॥

মহড়া।—তারা আমায় আর কত দুঃখ দিবি গো বল মা।
রাখবি আর কত দিন বন্দী কোরে সংসার-কারাগারে।
মা তোমার ঐ বিষম মায়ার বেড়ি দিলি এঁটে,
কেবল চিরদিন মলেম আমি ভূতের বেগার খেটে,
মনে মনে করি ফন্দি, পালাতে আর পাইনে সন্ধি,
মা তোমার ঐ নিগূঢ় বন্দী খালাস হবে কেমন কোরে।

খাদ।—ষড়রিপু রেখেছো মা,
প্রহরী তায় নব দ্বারে।

---

* প্রাঃ ওঃ কঃ

ফুঁকা।—মা, সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম ন জানামি,
পঞ্চ পাতকের পাতকী আমি,
সদাই ভ্রমি কুপথে।
পথে-পথে বেড়াই গো মা যেতে পাইনে সুপথে।
পথের সম্বল গুরুদত্ত ধন, সে সঙ্গে চলে না মন,
সদা তত্ত্ব করে অনিত্য ধন মত্ত করীর বশেতে।
মেলতা।—আমার দেহের মাঝে রিপু ছ'জন মন্ত্রী ভাল নয়,
ওগো মা গো তারা, তারা।
দিয়ে কুমন্ত্রণা ঐ ছয় জনা সাধনপথে ঘুরিয়ে মারে॥
১ চিতেন।—মা বারে বারে, সহে না আর জঠর-যন্ত্রণা।
পাড়ন।—জননীর সেই জঠর হোতে বহু কষ্টে মা
এসে জন্মভূমে কর্ম্ম হোলো না।
ফুঁকা।—আমি ভেবেছিলেম ভবে যাব,
তোমার দুর্গা নামে দীক্ষিত হবো
কোর্‌বো ও নাম সাধন, ও নাম সাধন গো, মাগো,
এ ভাগ্যে তা হলো না।
তারা আমার কি কপালের ভোগ,
কায়ায় হলো মায়া রোগ,
তাতে রসনা কোরে যোগাযোগ দুর্গা বোল্‌তে দিলে না
মেলতা।—আমি সেই অপরাধে অপরাধী,
তোমার শ্রীপদে ওগো মা,
মাগো তারা, মাগো তারা॥
তাইতে চক্রাকারে চক্রকারী চক্রে রাখলি বদ্ধ কোরে।
অন্তরা।—আর কি হয় নাই মা তোর মনের মত।
দিনে দিনে দিন-আখেরি কত দিনে হবে মেয়াদ গত॥
কারো শত কারো পঞ্চাশ কেও হয়ে মরে,
কারো গর্ব্ভে বিনাশ শিবতন্ত্রে আছি অবগত।
আর কি আমার নাই খালাস,
খাটনী বার মাস,
দায়মালী কয়েদীর মত॥

২ চিতেন।—মা তোমা বই ব্রহ্মময়ী দিব কার দোহাই।
পাড়ন।—এ ভবের ঘোর বন্ধন হোতে,
ঘুচাইতে মা জীবের মুক্তি দিতে শক্তি কারো নাই।
ফুঁকা।—মা জলের মীন যেমন হয় বন্দী জালে,
আমি তেম্‌নি বিষম মায়াজালে,
বন্দী আছি চিরকাল।
গেলো কালে কাল গো মাগো।
কোন দিন কেশে ধর্‌বে কাল।
ভাই বন্ধু দারা সুত হোয়ে তার বশীভূত,
তাইতে গিয়েছে মা জন্মের মত ইহকাল আর পরকাল।
মেলতা।—দেখলেম সংসারের সুখ,
যত অসুখ
নিশির স্বপনের প্রায়।
ভেবে রঘু্ বলে অন্তিম কালে
দিও দাসে মুক্ত কোরে॥ [১]

॥ ৪ ॥

মহড়া।—ওগো তারা গো মা,
এবার দুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষনন্দিনী।
আমি এসেছিলেম ভবের হাটে,
চল্লেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সঙ্কটে,
আমার সঞ্চিত বিষয় বার ভূতে খেলে সব লুটে।
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এ ঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে হু'কর,
হৃদিপদ্মে দেখি যেন ঐ চরণ দুখানি॥
খাদ।—অনন্তরূপিণী মা অন্তর্যামিনী।
ফুঁকা।—এবার ভবে আসা মিথ্যে হোলো ওগো তারা মা,
আমি দারা-পুত্রের মায়ার বশে, ডুবেছিলেম বিষয়-বিষে
উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হোলো ভারি,
হাল ছেড়েছে মন্‌কাণ্ডারী, তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
বল মা কিসে তরি।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

মেলতা।—মা তোমা বই দীনের পক্ষে, অন্য গতি কই।
আমায় কাল ভয়েতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণধারিণী॥
১ চিতেন।—মা অনাদ্যে মহাবিদ্যে ভবের কর্ণধার।
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে তোমায় শিবে মা,
সে জীবে কর গো উদ্ধার॥
ফুঁকা।—কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা।
আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
তবে দুর্গে এ কপালে কৈ গো দয়া হোলো॥
মেলতা।—তাই তোমারে ভক্তি করি সাধন শক্তি নাই
তুমি নিজ গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তিদায়িনী॥
অন্তরা।—ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিণী বেদে শুনি।
শ্রীমন্ত মশানে মরে, তুমি রক্ষা কোরেছিলে তারে
ব্রাহ্মণীর বেশ ধোরে।
তোমায় চিনিবে কেবা অচিন্তময়ী চিন্তামণির শিরোমণি।
১ চিতেন।—মা প্রসন্না অন্নপূর্ণা হলে কাশীতে।
শক্তিরূপা, মুক্তিরূপা, বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে॥
ফুঁকা।—সবাই জানে তুমি জগৎ-মাতা ওগো তারা মা,
তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে, সগর বংশ উদ্ধারিলে,
তোমার অপার লীলে, আবার শুনি সীতা উদ্ধারিতে,
অভয় দিয়ে অকালেতে, লঙ্কাপুরে রঘুনাথে
আপনি সদয় হোলে॥
মেলতা।—এই অধমে দয়াময়ী করগো নিস্তার।
তাই রঘু বলে নিদেন কালে
দিও মা পদ-তরণী॥[১]

॥ ৫ ॥

আগমনী

মহড়া।—পিতঃ বল গো অধিক বেলা হোলো
সেই হিমালয় আর কতদূর আছে।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

পারিনে আর চোলে যেতে,
অঙ্গ অবস পথ শ্রান্তে,
দারুণ কঠিন পথ,
আমি দেবের দেব-নারী, রাজার কুমারী,
চরণ আমার ভারি-ভারি হয়েছে ॥
খাদ।—কন্যের মায়া জান বোলে,
কই তোমার কাছে ॥
ফুঁকা। আমায় আনলে যখন,
বোললে তখন,
অধিক দূর নয় সে হিমালয় পিতে গো ওগো পিতে,
এক দিন আঙ্গিনে হতে,
প্রাঙ্গণে শিব দেন নাহি যেতে,
কেমন কোরে চোলবো পথে সহজেতে কুলবালা ॥
মেলতা।—দারুণ রবির কিরণ, সর্ব্বাঙ্গ করে দাহন,
আবার ক্ষুধানলে আমার জীবন দহিছে ॥
১ চিতেন।—গিরি সুষষ্ঠীতে,
কৈলাস হতে গৌরী লয়ে আগমন।
পাড়ন।—গেছে নিরানন্দ,
কি আনন্দ প্রেমানন্দে, করিছেন গমন ॥
ফুঁকা।—আপনি ভগবতী,
অগ্রবর্ত্তী গতি অতি ধীরে ধীরে,
চলে সুধীরে ধীরে।
গজেন্দ্রগমনে গমন,
খঞ্জনের প্রায় চলে চরণ,
পথশ্রান্তে বিধুবদন, ভাসে দুটী নয়ননীরে।
মেলতা।—গৌরী কোরে সবিনয়,
পাষাণ পিতার প্রতি কয়।
যাব কতক্ষণে পাষাণী মায়ের কাছে ॥
অন্তরা।—কতক্ষণে যাব,
গিয়ে মা বোলে মায়ের প্রাণ জুড়াব।

বোসে মায়ের কোলে বাৎসল্যছলে,
মায়ে ঝিয়ে দুঃখের কথা কব।
২ চিতেন।—যাব পিতৃ গৃহে,
জননীর স্নেহে মনে কল্লেম বাসনা।
পাড়ন।—আমি মনের সাধে, সুখ সাধে,
ঘুচাব মা'র মনের বেদনা।
ফুঁকা।—আমি আদরের ধন, যতনের ধন,
আমার আদর মা জানে, পিতে গো ওগো পিতে,
বৎসহারা গাভী যেমন,
পথ চেয়ে মা আছে তেমন,
কন্যের মায়া পিতে এখন,
জানিতে কি পার মনে।
মেলতা।—কন্যা-সন্তান জন্মে যার,
সদাই মনে চিন্তা তার,
ভেবে রঘু বলে এমন কন্যা কার আছে ॥[১]

॥ ৬ ॥

সখীসংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ কথাতে কুঞ্জেতে ছিলেন প্যারী,
আচম্বিতে চমকিত মনে হলো কি রূপ-মাধুরী,
অধৈর্য্য হইল অঙ্গ, [ধৈর্য্য] অবসান,
কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে প্যারী হতজ্ঞান।
দেখে ললিতে সশঙ্কিত,
কি হলো কি হলো আচম্বিত—
প্যারীর নিমিখ নাই আঁখিতে ॥
মূরছি পড়িল প্যারী অমনি ধূলাতে ॥
বিন্দে সখি, হলো একি চন্দ্রমুখী [র]
আপনার বঁধুর কথা কহিতে।
বিবর্ণ হইল রাই সর্ব্ব অঙ্গেতে ॥

১ প্রা: ও: ক:

শীতল হইল রাঙ্গা চরণ
কোমল[১] অঙ্গ-ভঙ্গ হেম বরণ।
রাইকে দেখে বিদরে বুক
মলিন হ'য়েছে বিধুমুখ।
যেন দংশিল[২] ভুজঙ্গেতে[৩] ॥
বিশাখা গো, এতদিনে বৃন্দাবনে তেমন চাঁদের
হাট সকল ভাঙ্গিলি,
তোরি এত সাধে[৪] হলো পরমাদ
চিত্রপটের সাধ[৫] পুরাইলি।
বিরহ-বিচ্ছেদ আনলে গোকুলে রাই যদি মলো,
এতদিনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আসিবার আশা ফুরাইল।
শ্যাম শোকেতে সবে[৬] আকুল,
আবার রাই করিল শূন্য গোকুল। [৭]
আহা মরি গো[৮] মরে যাই,
বিধুবদন শুকায়েছে[৯] রাই—
(দেখে) আমরা ধৈরয নারি ধরিতে ॥
পদ্মা পেয়ে সমাচার হাহাকার করে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চলে
'বসে কর কি ও চন্দ্রমুখি প্যারী মলো' কেন্দে বলে।
শুনিয়ে ধাইল ত্বরিতে সঙ্গেতে লয়ে সখীগণ
এলোকেশে এলোবেশে চন্দ্রাবলী করে গো রোদন
আহা রাই কি হল ব'লে সঘনে,
উপনীত হোল গিয়ে কুঞ্জ ভবনে।
দাস রঘুনাথে বলে প্যারী যদি মরে গোকুলে,[১০]
কৃষ্ণ আসিবেন না আর ব্রজেতে ॥ [১১]

॥ ৭ ॥

বিরহ

সকাতরে ললিতে কহিছে কমলিনী রাই,
অকস্মাৎ বংশীরব তোমার কুঞ্জে শুনিতে পাই।

পুঁথির পাঠ

১ কুমল, ২ ডংসিল, ৩ ভোজঙ্গেতে, ৪ সাদ, ৫ সাদ, ৬ সভে, ৭ গকুল, ৮ গ, ৯ সোসাইছে, ১০ গকুলে, ১১ সংগৃহীত পুথি।

এই ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ গেছে।
আমরা যত গোপীগণ ভাবি সর্ব্বক্ষণ
প্যারী কহে তোমার কাছে ॥
ইহার তদন্ত না জানি
শুধাই তোমায় ও কমলিনী,[১]
আমার বিস্ময় হলো মনেতে।
কে বাঁশী বাজায় গো নিশিতে
বংশীধ্বনি নিতি শুনি কমলিনী ওগো তোমার কুঞ্জেতে।
বাজে বাঁশী বিপিনে শুনি কর্ণেতে,
যদি পেয়ে থাক কালাচান্দে তাই সত্য বল রাই তোমারে শুধাই;
বিচ্ছেদ ঘুচুক গো আমাদের।
যে হতে গেছেন হরি বংশীরব শুনি নাই প্যারী,
ওগো আমরা এই ব্রজেতে।
সত্য বল গো শ্রীরাধে যদি কালাচান্দে
এসে থাকেন তোমার কুঞ্জেতে,
তবে কেন আর করি হাহাকার
আমরা এই ব্রজের মাঝেতে।
ব্রজপুরী ছাড়িয়ে কালিয়ে গেছে গো প্যারী,
কৃষ্ণ বিনে আমরা সব প্রাণেতে মরি,
বুঝি হয়েছ কৃষ্ণসুখী,
আমরা যত গোপীগণ সে কৃষ্ণধন না হেরি গো চন্দ্রমুখি,
আমরা মরি মনখেদে,
তুমি কি জান না শ্রীরাধে,
ওগো না পেয়ে কৃষ্ণে দেখিতে।
বাঁশী শুনে বনে ভাবি মনে আমরা যত ব্রজাঙ্গনে,
কৃষ্ণ দেখিতে সঙ্গেতে লয়ে যাব তোমায় বনে।
কালাচান্দ বিহনে বৃন্দাবনে দেখি শূন্যময়,
কমলিনী কিসে তোমার হলো এত সুখোদয়।

পুঁথির পাঠ

১ কুমলিনী

আমরা কৃষ্ণ বিনে সদা মরি
হায় নিশি দিশি শ্যাম জপি অবিরাম
তুমি কি জান না প্যারী।
এই ব্রজের ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ বিনে বাঁচিবে না
রঘু বলে প্যারীর কাছেতে।[১]

চিতেন।—নিতি নিতি বল আমারে সখি আসিবেন শ্যাম
ব্রজপুরী ত্যাজ্য করি, হরি রহিল পেয়ে উচ্চ ধাম।
মিছে আর আশাতে কত রব সই।
শ্যামের বিচ্ছেদেতে প্রাণ-দগধ হই॥
শোন শোন গো সজনি,
শ্যাম বিনে হলাম কাঙ্গালিনী
এখন কথাতো কেউ শুধয় না।
ধুয়া।—সখি, আর আসিবে কবে কালিএসোনা।
সহচারী বংশীধারী বিনে মরি
আমার শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না॥
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবন শূন্য দেখ না।
অবলার বিরহেতে প্রাণ যায়।
সখি, শ্যাম রহিল্ল গিয়ে মথুরায়,
আমায় অনাথিনী করে,
শ্যাম গেল সই যমুনা পারে
দিয়ে অবলারে যন্ত্রণা॥
ছিলাম শ্যামের গৌরবিণী,
কাঙ্গালিনী, এখন হলাম সই—
শ্যাম অভাবে ব্রজের মাঝে
মরি গো লাজে,
এমন দশা হল তবে

---

১ সংগৃহীত পুঁথি।

আমার করম দোষেতে[১]
কৃষ্ণ বিনে এ অধীনে
ও পাপ মনেতে কত কহিছে ॥
যারে পরশিলে সিন্যাইতে[২] হয়।
দশা দেখে তারা কত মন্দ কয়।
আমার কপাল ভেঙ্গেছে সই।
তাইতে পরের কথা সয়ে রই ॥
তবু কাউকে কিছু বলি না ॥
দেখেছিলি সখি তোরা
মনচোরা আমায় যত সুখে রেখেছে ॥
ব্রজে এলে শ্যাম
তারি মতন দুঃখ দিল।
কনকনূপুর, কিঙ্কিণী
কামিনী অঙ্গে আভরণ
হেম জিনি
সৌদামিনী
রূপে আন[৩] হইল যত আভরণ
বানায়ে দেখেন বেণী শ্যামমাথে
তত সাধে অবিরত ধূলাতে
দাস রঘুনাথে বলে—
কালা আমায় যত কান্দালে লোকের সব কত গঞ্জনা।[৪]

॥ ৯ ॥

যতন করিয়ে ললিতে পরাইতে নীল, পীত বাস।
প্রাণ সখি, একি দেখি প্রিয় বিনে সকলি উপহাস ॥
ঘোচাগো অঙ্গের আমার আভরণ।
ভাল লাগে নাকো আর এ ভূষণ ॥
আমার সিঁথির সিন্দূর।
মুছায়ে কর গো দূর ॥

১ পুঁথির পাঠ "দুষেতে", ২ নাইতে হয় অর্থাৎ স্নান করিতে হয়, ৩ অন্য, ৪ সংগৃহীত পুঁথি।

কেবল মিছে এ যন্ত্রণা সার।
এ বেশ আর লাগে না ভাল শ্যাম বিনে আমায় ॥
ব্রজপুরী শূন্য করি বংশীধারী।
এখন রইল সে যমুনা পার ॥
শোভিত না লাগে সই গজমোতি হার।
রতন কঙ্কণ আমার করেতে,
সখি শঙ্খচূড় কর দূরেতে ॥
আমার অঙ্গের আভরণ
শ্যাম বিনে কি সাজে গো এখন ॥
সই গো প্রাণ বাঁচান হলো ভার ॥
কালা বিনে প্রাণসখি, কুঞ্জে থাকি
যেমন জল বিনে চায় চাতকিনী
দিবা নিশি সই।
আঁখি মুদে রই ॥
মণিহারা যেন ফণী।
শয়নে-স্বপনে সখিরে, কালারে জপি অবিরাম।
জলধর মনোহর আমার নবীন নীরদ রাধাশ্যাম ॥
মন কি চাতকী আমার হয়েছে।
সদা শ্যাম পিয়াসে চেয়ে রয়েছে ॥
আমার চাঁচর চিকুরে,
শঙ্খধর শোভিত করে।
এখন দেখে লাগে শূন্যাকার ॥
তত শোকে এত জ্বালা,
দিলে কালা,
আমার নবীন প্রেমের অঙ্কুরেতে,
দশা হলো তায়,
কাঙ্গালিনীর প্রায় ॥
দাঁড়াইয়ে থাকি পথে,
আমারে দেখিয়ে গোকুলে সকলে নিন্দা করি কয়।
সে গৌরব গেল সব এখন লোকের গঞ্জনা সইতে হয় ॥

ইথে কি অবলার আর বাঁচে প্রাণ।
তাহে শ্যাম মেরেছে আমার অঙ্গে মদন বাণ॥
দাস রঘুনাথে বলে,
অবলার প্রাণ দহিলে,
বিচ্ছেদেতে সে কালার॥[১]

॥ ১০ ॥

মাথুর

ব্রজপুরী ত্যাজ্য করি শ্যাম গেল মথুরায়।
রাধা বলে রইল ভুলে হরি পেয়ে সে রাণী কুব্জায়।
আমি আজি-কালি করে গুণি দিন।
শ্যামের লাগি ভেবে অঙ্গ হ'ল ক্ষীণ।
গেল কাল বলে কালাচাঁদ
কি হ'ল, কি হ'ল পরমাদ
আমার প্রাণ গেল সই ভাবিতে॥
শ্যাম আমার এল না ব্রজেতে॥
কৃষ্ণনিধি দিয়ে বিধি নিলে বিধি
এখন উপায় বল কি ললিতে॥
হরি বিনে মরি প্রাণ নারি ধরিতে॥
আমার শ্যাম বিরহে
সদা কান্দে মন।
উপায় বল কি করি তোরা সখিগণ,
গেছে মথুরায় কৃষ্ণধন।
শূন্য ক'রে বৃন্দাবন।
আমায় একা রেখে কুঞ্জেতে॥
মোর অঙ্গ হোল জরজর বনমালী এখন।
বাঁকা হ'য়ে রইল ভুলে
একাকিনী রই উদাসিনী সই
কলঙ্কের পাথারে ভাসালে!

---

১ সংগৃহীত পুঁথি।

কাল বলে কালিয়ে অন্ধকার করে মধুপুরী
করিলা গমন।
দিবানিশি ভাবি বসি
ও সই মনে তাই করি সর্ব্বক্ষণ।
নিশি পোহাইলে হবে সুপ্রভাত।
বলি কাল আসিবে ব্রজে ব্রজনাথ।
আমি মনে যা ক'রে রই,
বিধাতা হয়েছে বাদী সই,
শশী পাব কি ঘোর নিশিতে॥
আগে জানিলে ললিতে স্বপনেতে
আমায় কালাচাঁদ নিদয় হবে
যদি জানিতাম তবে বান্ধিতাম প্রেমডোরে গো মাধবে।
অক্রূর আইল গো তখন বৃন্দাবন শূন্য করিতে
মায়াছলে ভোলাইল গোপীরে প্রিয় ভাষাতে॥
অবলা আমি না জানি চাতুরী
কথায় কথায় করলে কৃষ্ণধন চুরি।
দাস রঘুনাথে বলে মরি শ্যামের বিচ্ছেদ অনলে
কৃষ্ণ রইল মধুপুরীতে॥*

॥ ১১ ॥

ওগো প্যারি তোমার সে মদন
সখীময় বৃন্দাবন
শূন্য করিয়ে গেছে জ্বালাতে।
আমরা ভাবি সদা প্যারী মনে,
সেই মথুরা ত্যেজে ব্রজের মাঝে,
কৃষ্ণ আসিবে কতদিনে॥
ও না হেরে কৃষ্ণধন,
কেঁদে খেদে মরে গোপীগণ,
তোমার বিচ্ছেদ নাই মনেতে॥

* সংগৃহীত পুঁথি

শ্যামপ্রিয় রাই আছে শোকেতে
ওগো প্যারি বংশীধারী ও না হেরি
আমরা মরি মনের শোকেতে ॥
বিপক্ষ করেছ সব গোপীগণেতে ॥
বুঝি ভুলেছে সে দীন কিশোরী,
এই ব্রজের মাঝে শ্যামেরে ত্যজে
একলা ছিল কুঞ্জে প্যারী।
তুমি হারায়ে কৃষ্ণধন
কত সেধেছিলে তখন
এখন পর হলাম কিরূপেতে।
পশুপক্ষী আদি করি ও কিশোরী, আছে নীরবেতে বৃন্দাবনে,
ব্রজের মাঝেতে ॥
হারায়ে কৃষ্ণধন
বসে তরু তমালে কোকিল নীরব আছে।
কৃষ্ণ বিনে তারা সব ফল-জল ত্যজেছে।
দেখ শারী-শুক তারা পাখী,
এই ব্রজের মাঝেতে
মনের দুখেতে
সদা আছে মুদে আঁখি।
কৃষ্ণ ত্যজিয়ে বৃন্দাবন।
মথুরাতে করেছেন গমন।
শ্যামের নীলকান্ত কলেবর মনোহর
ও সেই কাল মাণিক, কাল অঙ্গ।
তোমারে লয়ে কুঞ্জে আসি
সুখে থাকিতেন সে ত্রিভঙ্গ—
আমরা না জানি রাই, বলি তাই তদন্ত ইহার,
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে করিতেন শ্রীকৃষ্ণ বিহার।
এখন তুমি কৃষ্ণের, তোমার কৃষ্ণ রাই, হরি তোর সখ্য
আমরা বিপক্ষ
একি মোদের গো অদৃষ্ট!

এখন তোমার সে মান নাই,
শ্যাম আনিতে সাধবে ওগো রাই,
দাস রঘু কহে খেদেতে।*

॥ ১২ ॥

তোমায়, বিজ্ঞ জনে কয়, করুণাময়,
এই কি তব করুণা !
আত্মসুখে সুখ, না ভাব পর দুখ,
করলে ভাল বিবেচনা।
চক্রী নাম ধর, করিয়ে বিচক্র
বক্র হ'লে গোপিকায়, এত চক্র জান হে মুরারি,
মরি ধন্য ধন্য শ্যাম রায় !
আর কে আছে বল যে এমন,
নিতান্ত অনুগতে করে বিসর্জ্জন।
রাজ্যপদে ভুলে, রাইকে ত্যজিলে
ভাবলেনাক নারী বধের ভয় ॥
কিন্তু দিতে হবে রাজা রাধার কর।
কৃষ্ণ, হ'লে বটে রাজ্যেশ্বর ॥
দেখ মনে বুঝে, বৃন্দাবন মাঝে,
রাজ-রাজ্যেশ্বরী রাই ;
সে যে বৃষভানু-রাজ-কন্যে
তেমন মান্যে, ত্রিজগতে নাই।
যার নাম ক'রতে, মুরলীতে গান,
সে রাধা সর্ব্বপ্রকৃতি প্রধান।
সে রাজা রাখিয়ে নাম না সই লইয়ে,
রাজ্য কর, কর বংশীধর।
জান না সে আছে রাজা, রাজারও উপর।
স্থূলে ভুল, মূল হে তোমার যে জন,
বিনে তার আজ্ঞা হ'য়েছে রাজন।

* সংগৃহীত পুঁথি

ধন্য ক'রে তারে, মানতে হবে শ্যাম
করতে পারবে নাক অনাদর ॥
তুমি হও না কেন নৃপ, ব্রহ্মস্বরূপ,
মূলাধার শ্রীরাধা।
তাও জান শ্যাম! তোমার ঐ কৃষ্ণ নাম,
রাধা নামের সঙ্গে বাঁধা।
আত্মবিস্মৃতি, হয়েছে কী শ্রীপতি?
সত্য কহ দয়াময়!
তোমার শক্তি-স্বরূপিণী সে রাধা
আছে ব্যক্ত ত্রিজগতময়।
জল, স্থল, শূন্য যেখানেতে রও;—
শ্রীরাধার রাজ্য ছাড়া কভু নও।
রাধার রাজ্যের অধীন, তার প্রেমাধীন,
তুমি স্বাধীন কবে হ'লে নটবর ॥
এমন ভাগ্য কবে হবে গো শ্রীরাধার,
হরি! হরি! হরি কি আসিবেন আর।
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ করি,' আমি ডেকে মরি,
কৃষ্ণ অতি নিষ্করুণ।
পেয়ে কংস রাজার সৈরিন্ধ্রী,
হলেন ব্রজাঙ্গনায় নিদারুণ।
আর তাঁর কার প্রতি বা মমতা,
কি প্রেমে কৃষ্ণ আসিবেন হেথা।
আজ কী অভাব্য, অচিন্তনীয়।
আশ্চর্য্য শুনালে এ সমাচার ॥
তুমি বটে হিতকারিণী আমার।
হিত, নীত, প্রীত বচনে এখন,
হবে কি স্নিগ্ধ এ তাপিত মন!
বিনিসূতে গেঁথে, আর কি গলেতে,
পরবো নীলকান্ত-মণি-হার ॥

তুমি করছ বটে সখি, কর্ণেরে সুখী,
প্রত্যয় না হয় মনে।
শুষ্ক শাখাদল, সে অতি নিষ্ফল,
ফল্‌বে কি গো এতদিনে!
দেখলে স্বনয়নে, সে বংশীবদনে।
হয় সে মনের প্রীত।
তাহা নইলে তথাপি অন্তর—
বৃথা করছ অধিক তাপিত॥
কও এ সখীরে স্বরূপ,
পুনঃ কি হের্‌ব সেই কালরূপ।
প্রাণচাতক আর কি করবে প্রাণ,
সেই নীলমেঘের কৃপাজলধার॥
জবা-বিল্বদল তুলে, কালিন্দীর কূলে,
কাত্যায়নীরে আরাধি।
কামনা ক'রে এই, পেয়েছিলাম সেই
কৃষ্ণ প্রেমানন্দ-নিধি।
আর কি কাত্যায়নী অঘটন-ঘটনী,
ঘটনা ঘটাবেন এমন॥
পাব ব্রজবাসীর জীবন সাধনের ধন কৃষ্ণধন,
নয়ত গো তেমন কপাল!
দুঃখিনীর আর কি হবে সুখের কাল!
সই কি পুনঃ, শ্যাম চন্দ্রোদয়েতে
হরবে মম মনের আঁধার?
আর কি বাজবে নিধুবনে, রম্য কাননে,
মধুর বংশী ধ্বনি!
প্রাণ হবে স্থির, কি এ দুঃখিনীর
অন্তর জুড়াবে শুনি!
সঙ্কেত কাননে, যমুনাপুলিনে
কেলিকদম্বমূলে।

আর কি তেমন রূপে পুনঃ হরি আসি',
করবেন মধুর লীলে !
সেই ওগো ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি !
তেমনি কি হেরিবে আসি কুরঙ্গী !
যত সঙ্গিনী মিলি, তেমনি কি গো সই
ভজবো কালাচাঁদে পুনর্ব্বার ॥
আমার কৃষ্ণ হারাধন, মিলবে গো পুনঃ
পুণ্য কি আছে বল ?
অন্য না জানি কেবল সজনি,
ভরসা সে পদ-কমল।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফল করেছি সকল,
দুঃখে কৃষ্ণেতে অর্পণ।
এমন নাইক, কিঞ্চিৎ সুকৃতি
কিসে পাই সে দুরারাধ্য ধন।
হোক্ সত্য গো তোমারি কথা,
আসুক শ্যাম কুঞ্জে, ঘুচুক গো ব্যথা
মৌখিক বচনে, মন, বোধ্ না মানে
দাস রঘুনাথে কহে সার ॥[১]

॥ ১৩ ॥

যে ধন আনতে গেলে, আমার সে ধন কৈ ?
গেলে একা, একা দেখা দিলে সই ॥
সেই যে গেলে তুমি, ও বৃন্দে সজনি,
বাক্যে তুষিয়া আমায়।
আছি ঊর্দ্ধ বদনেতে চেয়ে,
সদা কৃষ্ণের আসার আশায়।
দিনে দিনে দিন হ'তেছে অবসান ;
দুঃখের দিন গেছে যুগের অবসান।

---

১ বাঃ পাঃ

বল্লে সুসংবাদ, শুনলে পরে তবে,
অন্তরেতে আমি সুখী হই ॥
রসহীন কেন বৃন্দে, হ'য়ে রসময়ী !
বল ত' বিশেষ সমাচার
কোথা নীলকান্তমণি সে আমার !
সেই কালিয়ে আমার, প্রাণ জুড়াবার ধন
অন্য ধনের অভিলাষী নই ॥
বড় দর্প ক'রে মনে হাস্য বদনে,
বল্লে গমন কালে আনবে কালাচাঁদ,
পূরাব মন সাধ, সর্ব্বসখীমণ্ডলে।
এক্ষণে যে সখি ! কেন অধোমুখী,
দেখিতেছি যে মৃদুভাব।
ইহার ভাব কি, বল দেখি শুনি,
বুঝি হয় নাই কৃষ্ণ ধন লাভ !
বার বার আর, শুধাব কত বার,
শুধালে উত্তর না কর তার।
আমি যে মরি সখি, তার উপায় কি,
মন যে স্থির না হয় তাহা বই !
আমি কুঞ্জে একাকিনী বঞ্চিব রজনী
হইয়ে কৃষ্ণ হারা।
শ্যাম নটবর, সজল জলধর
চিন্তি চাতকিনী পারা।
ভরসা মনে এই, ভুবনবিজয়ী
বৃন্দে তুমি যে আমার।
তুমি আপনি গেলে মধুপুরে,
কৃষ্ণ আস্‌বে ব্রজে পুনর্ব্বার।
কৈ ? কৈ ? কৈ গো তার নিদর্শন ?
কৃষ্ণ তোর সঙ্গে নাহি ত এখন।
জ্ঞান হয়, যেন লুকায়ে রেখে কালা,
ক'রছ ছলা, যাতে দুঃখী হই ॥

বৃন্দে, সব জান তুমি, বলিব কি আমি,
কৃষ্ণ হেন যে নিধি !
ছিল পীতবাস, তাহার সহবাস
বঞ্চিত করেছেন বিধি।
তাহাতে তুমি ধনি হইয়ে সহায়িনী
গেলে যমুনারি পার।
অনেক ক্লেশ পেলে, কৃষ্ণ আনৃতে
পথশ্রান্তে, ক'রে উপকার।
দেও ত গো ! কোথা কৃষ্ণধন ;
পেলে তায় ক'রবো রতনে যতন।
হৃদি মন্দিরেতে, রাখবো যতনেতে
দাস রঘু কহে উচিত ঐ ॥[১]

॥ ১৪ ॥

কিসে প্রাণবিহঙ্গ বাঁচে বল।
কৃষ্ণের আশালতা যদি ভাঙ্গিল ॥
করি মর্ম্মচ্ছেদ, দারুণ সংবাদ,
বৃন্দে শুনালে আমায়।
শুনে শূন্য হ'ল মম দেহ,
দেহে প্রাণ ত রাখা হ'ল দায় ॥
হায় ! হায় ! হায়রে ! সুখের পিঞ্জর।
বিনা সুখ, দুঃখে হতেছে জর্জ্জর।
শ্যাম-তমালতরু আশ্রয় বিনে,
যত গোপিকা নৈরাশ হ'ল।
ফুরাল গো ব্রজে, কৃষ্ণলীলা ফুরাল।
হায় ! হবে বন, এবে বৃন্দাবন ;
বিনা সে জীবনধন, না র'বে জীবন।
লতা হ'ল তরুহীন, বারিহীন মীন ;
কি দুর্দ্দিন ফণী মণি হারা'ল[২] ॥

---

১ বাঃ গাঃ ২ বাঃ গাঃ

॥ ১৫ ॥

মহড়া।—কুব্জার সাধ্য কি সই,
চুরি করতে পারে চোরের ঘরে।
সই রে আপন মন না দিলে মন পায় কি সাধ্য,
বাধ্য না হলে কে কার থাকে বাধ্য।
মিথ্যে আজ কুব্জারে, মনচোরা বলে তারে,
আমার মন বাঁধা আছে রাধার প্রেমডোরে॥
খাদ।—কুব্জার সঙ্গে সত্য ছিল সেই রাম অবতারে॥
ফুঁকা।—ছিল স্বর্পণখার বাসনা, মনে প্রেম-বাসনা,
তার অন্য বাসনা নাই, মনে ছিল তাই।
দ্বাপরে সে কুব্জা হয়ে, দাসী হলো কংসালয়ে,
আমি তারে সদয় হয়ে, মনের সাধ পুরাই॥
মেলতা।—রাধার ভাবেতে ভঙ্গী বাঁকা নূতন বাঁকা,
বাঁকা সখা হে!
নাম বাঁকা মদনমোহন ব্রজপুরে॥
১ চিতেন।—বল্লে সই চোরের মন নেয় চুরি করে।
কুব্জা নয় মনোচোর, আমার নহে অগোচর,
মিথ্যে চোর বলো না তারে॥
পাড়ন।—সে যে কোন অপরাধী নয়, আছে এই মথুরায়,
ছিল যে তার সাধনা, পূর্ব্বের সাধনা হে, হায় হায় হে!
চন্দন দানের ফলাফলে, তাইতে কুব্জা আমায় পেলে,
আমি তার লীলে-ছলে পুরাই বাসনা॥
মেলতা।—সখী তাই রব মধুপুরে।
শত বৎসর, হলে শাপান্তর হে,
সব জ্বালা যাবে রাধার প্রভাস-তীরে॥
অন্তরা।—আমি শ্রীরাধার জন্যে বৃন্দাবনে
ধেনু লয়ে রাখাল হয়ে যেতেম বনে রাখাল সনে।
শ্রীরাধার প্রেম কর্জ্জ বলে,
দিলেম দাসখত লিখে সে গোকুলে,
জানে সকলে।

তোমরা সব সখী, সেই খতের সাক্ষী,
জন্মের মত বাঁধা রাই চরণে ॥
২ চিতেন।—করেছি আমি ব্রজের ননী চুরী।
কুব্জা কংসের দাসী, সে নয় দোষের দোষী,
সব দোষী আমি শ্রীহরি ॥
পাড়ন।—করতে প্রেম-লীলে ব্রজপুরে, ব্রজগোপীর ঘরে,
চুরি করতেম ক্ষীর সর।
মাখন-ক্ষীর-সর, হায় হায় হে।
চুরির জন্যে নন্দ-রাণী, আমায় বেঁধেছিলেন তিনি,
ভক্তের প্রেমে বন্ধন আমি করেছি স্বীকার ॥
মেলতা।—আমি ভক্তিতে নন্দের বাধা বইতেম মাথায়,
রাধার প্রেমের দায় হে।
চোরা নাম আছে আমার ত্রিসংসারে ॥[১]

॥ ১৬ ॥

কবির লহর

আছে চতুর্ব্বর্ণের লোক তোমারি সভায়
করেছি জয় তোমাকে নতুন সমস্যায়।
সৃষ্টিধর যারা, কোথা সব তারা,
আনিতে ভানুমতী কন্যা করেন ত্বরা
তুমি সুবোধ শান্ত বুদ্ধিমন্ত সামান্য ভূপতি নও।
আর কি ভোজরাজা কথা কও,
তুমি কন্যা দিয়া শ্বশুর হও,
ক'রে হেঁট মাথা কেনে সভার মধ্যে রও।
নতুন শোলোক শুনিল বিস্তর লোক,
ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা হলে ডুবিবে পরলোক,
শুভদিনে, শুভক্ষণে শুভকর্ম্ম করে নাও।
তোমার যে অবধি বুদ্ধি সাধ্যি করো না কসুর,
আমি তোমার জামাই তুমি হও আমার শ্বশুর।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

কালু পাল আমায় শ্বশুর বলে অতঃপর,
পালের বেটা সম্বন্ধী[১] ভানুমতীর[২] সহোদর।
এরা চারজনে, আসুক এখানে,
আনিতে কও সভার মাঝে তুমি সে জনে।
আগে করেছ প্রতিজ্ঞা তাহা দিয়ে থুয়ে সব ঘুচাও।
তুমি কাল অতীত কর যত আমার কি তায় ক্ষতি,
বিচারে হেরেছ দিতে হবে যে ভানুমতী।
তোমায় দশ দিকে দশ জনেতে দিচ্ছে টিট্‌কারী,
ইথে ক'রে লজ্জা কি হয় না তোমারি।
ওহে ভোজপতি, তুমি দুর্ম্মতি,
যোগ্যা হয়েছে তোমার কন্যা ভানুমতী,
ইহার বিহিত কর নৃপবর কেনে তাহার জ্বালা সও।
কয় রঘুনাথে কি উৎপাতে পড়িল ভোজ রাজন্,
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করে ভক্তিভাজন।
তুমি জান যদি মনে কন্যা দিবে না তাকে,
তবে কেনে প্রতিজ্ঞা করেছ মুখে।
জয় গো মহারাজ, কল্লে ভাল কাজ,
রঙ্গ এই দেখে তোমার পেলাম বড় লাজ,
পূর্ব্বে আছ প্রতিশ্রুত এখন কেনে মুখ লুকাও।

॥ ১৭ ॥

ভাই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেখিলাম নানা দেশ,
এমন রাজা দেখি নাই পাপিষ্ঠের শেষ।
বাঁজা ভানুমতী কন্যা যুবতী
তুমি কি ভেবেছ মনে হবে তার পতি,
তোর জামাইকে আজ ফাঁকি দিয়ে বাগবাজারের রাখবে সখ।
ভণ্ড ভোজপুরে চাষা ঠক্,
তুই রাত জাগালি হক না হক্।
কোন গুণে বলিব তোরে বিবেচক।

১ সমুন্দী (প্রাদেশিক), ২ ভানবতী।

কন্যা দিবে পণ করেছ তখন হারিলে সভাতে
রাজার .... কাটে এখন,
যে মনস্তাপ পেলাম আমি কহিব তা কাঁহাতক।
এই সভার মাঝে বুদ্ধিমন্ত আছেন অনেকেতে,
বল দেখি বিচারে হেরে তোর, একি চমৎকার,
ভানুমতী যে কন্যা তার মূল্য দেওয়া ভার।
মন্ত্রেরি সাধন, কি শরীর পাতন,
ছাড়িব না ভানুমতীকে দেখিছি যখন।
তুই মাথায় ক'রে ব'য়ে দিবি আপনা আপনি মেনে ঝক
আমি হাজাগজা পণ্ডিত নই যে রাখিব চোপাড়ি,
নতুন শোলক শুনাইলাম আর কি কন্যা ছাড়ি।
ঘরে ব'সে জোর জুলুম করিতেছ দেখ,
কুন্দের উপর চাপলে......বাঁকা থাকিবে নাক,
প্রতিজ্ঞা করে শোলকে হেরে, দেখিব ভানুমতী—
কন্যা কে রাখে ধরে,
আমি ত সামান্য নই সিমলেবাসী অধ্যাপক।
আমি এখনো রয়েছি, গায়ের আগুন গায়ে মেরে,
জিতেছি রাজার কন্যা নিব হাত ধরে।
ধর্ম্মের মুখ চেয়ে ভাই করিনাক জোর,
দেখিব উহার কাছে কতদূর দৌড়,
রঘুনাথে কয় এত বড় দায়, হারিয়া বিচারে
কন্যা দিতে নাহি চায়।
ধর্ম্ম নষ্ট করলে পরে মরবি ঘুরে ঘোর নরক।[১]

॥ ১৮ ॥

অহল্যা জননী তোর পাষাণ হয়েছে।
বল কি পাপেতে তোর পিতে শাপ দিয়েছে ॥
তাই বল দেখিরে গৌতমের সন্তান।

১ সংগৃহীত পুঁথি

আর কোন দেশে বসতি মুনির কয়না নিশ্চয়।
আর একটি কন্থে বটে তার পুত্র বটে ছয় ॥
ও তারা থাকে কৈ কোথা।[১]
কোন[২] রমণী গর্ভে ধরে কে তাদের মাতা ॥
আর কেমন করে বেঁটে তারা খায় জননীর খীর।
এই কথা রাজ-বেজ[৩] তোকে শুধাইছি ॥
ছয় পুত্র একটি কন্থে কোন মুনির। ধু।
আজ তোমারে উচিত কইতে হয়।
এই মুনি তেজা কুস্‌রি অঙ্গিরস।
এমন কথা বুঝ্‌তে নার কও বুঝাব ॥
আর এ কথাটি না বলিলে কাটা যাবে তোমার শির ॥
পাণ্ডবেদের কাণ্ড কথা তাই জানে সকলে।
আর একটা নারী তিনটে পতি বেশ মুনি মিলে ॥
এইটা বিধাতারি[৪] কাণ্ড কিছু বুঝা নাহি যায়।
আর এক উদরে কেমন ক'রে আছে দুটা ভাই ॥
কে দিয়েছিল বর।
সাতটি ছেলে জন্ম নিল গর্ভেরি ভিতর ॥
শ্রীমধুপুরী বিরচিয়া রঘুনাথে কহে ধীর।

॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর করলে সে বিরাজমান।
তায় তদুপরে ব্যাস মুনি রচিলেন পুরাণ ॥
ও তোর পিতে মুনিরাজ।
কেমন করে কন্থে ব্রহ্মা শুনতে হবে লাজ।
তায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি হয়েছিল অবতার।
এই কথাটি রাজবেজ তোকে বল্‌তে হয়।
তিন পতি একটি নারীর কি প্রকারে বিয়ে হয় ॥ ধু।
কেনে বিধাতা কর্‌লে অবিচার।
সে দেবতা কি ন্যায় বিবেচনা কর ॥

১ কুথা (ঐ), ২ কুন্‌ (প্রাদেশিক), ৩ বৈদ্য, ৪ বিধেতারই (ঐ)।

দিবা নিশি ফিরছে কেনে পৃথিবী ভিতর।
এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালপুরে সবে[১] আছে অধিকার
আমি বলতে কথা লাজে মরি না বলিলে নয়।
আর কোন দেশে বসতি মুনির কয় না যে নিশ্চয়॥
এই চতুষ্পদ পশু-পক্ষী নয়ক কোন জীব।
হায় বলিরে ভগবতীর পতি একি শিব॥
ও সে পাণ্ডবের কুলে আকর্ষণে,

কে কোন মুনি বটে নারীর রঘু কহে শাস্ত্র সার॥

॥ ২০ ॥

সব মুনিগণে ভাবিছে একি হলো হায়।
তায় দুটি পুত্র একটি নারীর গর্ভেতে জন্মায়॥
সে গর্ভেতে থেকে,
তিন জনারে করলে বিয়ে মুনির কন্যেকে॥
তায় জয়ধ্বনি সকল মুনি করিছে মনের পুরে।
এই কথা রাজবেজ সুধাই তোমারে॥
সে গর্ভে থেকে মা দিনে দিনে বাড়ে।
ধু। এই সাত জনার কার বা কোন কায়া।
সবিশেষ না যায় চেনা চিনতে পারি না।
কার সিঁথিতে দিবে সিন্দুর কার হাতে শাঁখা।
তায় দেবতাগণে সকলে দুঃখ দিছে মুনিবরে॥
আর কি না হ'লো শব্দ করে যতেক রমণী।
তায় শ্রেষ্ঠ বদন হয়ে বসে রয়েছেন মুনি॥
আর দ্বিজবর কিযে করে গর্ভের ভিতর রব।
তায় পাত্র কন্যে কোথা রয় কেউ দেখিতে না পায়
বলে দেবের কুমার।
কি প্রকারে বিয়ে হবে বুঝিতে নারি।
শ্রী রঘু বলে হয় নাই প্রসব আছে তারা উদরে।

[১] সভে।

॥ ২১ ॥

তায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেব সে জানে না কথা।
তায় মহামুনির ঘরেতে কি কর্লে বিধাতা॥
কেউ বুঝিতে নারে।
সাতটী ছেলে জন্ম নিলে দেবতার বরে॥
তায় যত ঋষি তপ ছাড়ি যে সবে গেল পাতালে।
ওরে এই কথা শুধাই তোরে সে জন হল গর্গ
নারী-গর্ভে থাকবে কত কাল। ধু।
বল কোন যুগে হবে ছাওয়াল॥
যে সে দেখ বিধান পুরাণের লিখন।
তিনটে পতি একটি নারী আছে বা কোন খান॥
তায় পঁচিশ জনা চৌকিদার আছে তারা হাঁকে হান।
এই তিন ভুবন সংসারে তারা ভ্রমণ করিছে।
সে গর্ভে লইয়া মহা মুনি কোন সমুদ্রে আছে॥
ও দিবা নিশি থাকে তারা জলের ভিতর।
তো নিজে হলি গণ্ডমূর্খ পাবি কি ঠাওর॥
এই বলি তোরে আদি অন্ত।
কার কাছে শুধালে পাবিরে অন্ত॥
শ্রী রঘু কহে নইলে বাছা ভেবে হবে লবেজান।

॥ ২২ ॥

তার রাগ হ'ল বলিছে কেহ দেখিতে না পাই।
তার একটি নারীর তিনটে পতি তারা ছয়টা ভাই॥
সে মুনি তাদের ছেড়ে জপ-তপ।
সমুদ্রেতে ডুবে আছে একটি কাটা কান॥
আর যোগিগণে যোগ ছাড়িয়ে মুনি ডুব্‌লো সমুদ্রে,
ভাব হে সব দেবতাগণে স্বর্গেতে।
সে কি প্রকারে বিহার করে গর্ভেতে॥ ধু।—
তারা কতকাল থাক্‌বে জলেতে।
তারা বাঁচে কিরূপে।

রয়েছে ডুবে ইহার বৃত্তান্ত শুনি তোর মুখে।
তায় তিনটা স্বামী একটা নারীর রয়েছে সংসারেতে ॥
এমন আশ্চর্য্য কথা কভু নাই শুনি।
তায় গর্ভের ভিতর থেকে না বিয়াল গর্ত্তিণী ॥
ফল-ফুল পথ।
তায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রয়েছে গাথা,
তারা ছিল ছ'টা সহোদর।
অনন্তর যায় না কেহ বলে নিরন্তর।
তাদের খবর লয়ে এসব কহিছে রঘুনাথে ॥

॥ ২৩ ॥

তারা কোন যুগে হইবে প্রকাশ শুনে লাগে ত্রাস।
তারা সত্য ক'রে বল না কোনখানে করে বাস ॥
শুন ওরে মুনির সন্তান,
দেবতাগণের সভাতে হয়েছে বদনাম।
তায় আবাল-বৃদ্ধ থাকি সবে দিচ্ছে টিট্‌কারি,
দোলাতে তিন পতি তায় একটা নারী ॥
তোরা ছয় ভায়েতে কাছে করে বসাইলি। ধু।
তোদের কাণ্ডটা বুঝিতে নারি।
তোরা প্রসব না হতে, গর্ভেতে থেকে,
ছ' জনারে দিলি বিয়ে বাপকে লুকায়ে।
সে মহা মুনির নাম হাসালি তোদিগে গর্ভে ধরে।
সে দৌড়াদৌড়ি করে এল মুনি তিতিক্ষেতে।
তোরা গর্ভের ভিতর দিলি বিয়ে কার মন্ত্রণা শিখে।
সে দরিয়াতে মুনি রাজা যেতে পাচ্ছে কি।
এই কথাটা বল আমায় তোমায় জিজ্ঞাসি ॥
তারা পুত্র ছয় জনা,
কতকাল থাক্‌বে গর্ভে প্রসব হল না।
শ্রীরঘু বলে হয় না প্রসব আমরা সে লাজে মরি ॥

১। গর্ত্তিণী—গুর্ব্বিণী (প্রাদেশিক)।

॥ ২৪ ॥

ও সে মজেছে মুনি লজ্জাতে তায় কি হবে গতি।
তায় দেবতাগণে সে সকলেতে করতেছে ছি ছি।
তোরা পুত্র ষাট জন।
তোর কুলে কলঙ্ক হল নাইকরে সরম॥
তোরা তিন জনাকে দিলি বিয়ে মুনির হুকুম রদ করি।
এক ঘরেতে থাকিস তোরা লজ্জাতে মরি॥
তোরা গলাতে নেগা দড়ি। ধু।—
তোদের ভগ্নি সে মাথা মুড়ি।
ঘরে বসে সবে করে রঙ্গ রস।
মহা মুনির সংসারেতে করলি অপযশ॥
তায় আবাল বৃদ্ধ আদি করি সবে দিচ্ছে ধিক্কার॥
তারি ঔরসে জন্ম নিয়ে তারি সঙ্গে বাদ।
আর দেবতাগণে বলিছে ছ'জনা হারামজাদ॥
কাঁপে দেখে মুনিরাজ হল কম্পমান।
আর ছয় জনাকে ধরতে পারলে করবে খান খান॥
তোরা ভগ্নী-ভায়েতে।
কুলেতে কলঙ্ক দিলি, বস্‌তে পায় না সভাতে॥
শ্রী রঘু কহে বিস্তারিয়ে মিছে করিস্ জাঁকজারি॥

লালু-নন্দলাল

ভবানীবন্দনা

মা জগদ্ধাত্রী শব-শিবে যত অবতার
যত দেখি সকলি মা মহিমা তোমার।
দেখে এলাম দশটা[১] রমণী !
তাদের দেহতে ওমা নাইক গো তুমি,
আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করী দেখে লাগে ভয়।
বল মা তারা দুঃখহরা, দেগো পরিচয়,
সেই দশটা মেয়ে বসে আছে ন'টা কেনে হয়॥
তোমার যত মহিমা আগম-তন্ত্রে কয়,
যদি এই কথাটা আমায় না বল্‌বে,
দুর্গা নামেতে তোমার কলঙ্ক হবে,
আমি পদ্মা সখী সদাই থাকি
নিয়ে তোমার পদাশ্রয়॥
মা আমি তোমার দাসী তেঁই সব কথা জিজ্ঞাসি—
এই নিগূঢ় কথা বলগো ভবানী !
আমি ভাবছি দিবা-নিশি,
তাদের রঙ্গ দেখে আমার লাগলো চমৎকার,
ওগো আমার মনের ভাবনা ঘুচাও মা এইবার।
তুমি দুঃখহরা পুরাণে শুনি,
হরের ঘরণী তুমি ভবের তরণী,
কবি লালু ভণে তোমার রণে কত অসুর হ'লো ক্ষয়

॥ ২ ॥

(এই চাপানের দ্বিতীয় গান।)

এই পদ্মা বলে তোমার চরণ করেছি মা সার,
ওগো তুমি বিনে সন্দেহ কে ঘুচাবে আর।

১ দশমহাবিদ্যা

এই দশটা'র মধ্যে একটা[১] রমণী,
তার আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিছি আমি !
তোমায় সদাশিবের দোহাই লাগে
বল্লাম আমি এককালে।
বল মা দুর্গে ধরি তোমার চরণকমলে,
কেনে একটা মেয়ের মস্তকেতে সপ্ততাল অগ্নি জ্বলে।
এমন রূপ আর দেখি নাই ত' মহীমণ্ডলে।
যদি হতো বাজীকরের বাজী,
বুঝে দেখেছি আমি নয় কারসাজি,
এমন হবে নাক হবার নয়ক
দেখি নাইক কোনো কালে।
শিবের নাভিপদ্মবনে তারা খেলা করছে কেনে,
ওগো তাই দেখে ভুলেছে ভোলানাথ
সেই অগম্য শ্মশানে।
ওগো শিঙ্গা-ডম্বুর লয়ে গান করে শূলপাণি,
তার নাভিপদ্মে নাচে সেই দশটা রমণী।
তাই দেখে আমি স্থির হ'তে নারি
জানাইতে এলাম শুন শঙ্করী,
মা নিদানকালে ভুল নাক লালু নন্দলাল বলে ॥[২]

॥ ৩ ॥

ত্বং হি তারা ভবার্ণবে কি হবে বল গো শিবে
আমি অতি অভাজন।
আমি সখাদ সলিলে ডুবে রই ওগো ব্রহ্মময়ী,
আমায় কোরো না বিড়ম্বন ॥
দীন দেখে দীনে কর দয়া।
আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভক্তি-স্তুতি,
কটাক্ষে সংপ্রতি হের অভয়া ॥
তুমি কৃষ্ণলীলার সহায়কারী শুনাও সে কারণ।

---

১ দুর্গা বা কালী ২ সংগৃহীত পুঁথি

ধুয়া। কোন্ খানে চব্বিশ মূর্ত্তি ধরেছেন,
বল তাই দেব নারায়ণ।
ভক্ত ছিল কে কোথা বল বল সেই কথা,
কার বাসনা পুরাইতে হয়েছে এমন অবস্থা,
এক শরীরে এক মূর্ত্তি হয়েছিল কি কারণ ॥
এক শরীরে চব্বিশ[১] মূর্ত্তি হয়।
আমি দেখে ভয়ে মরি, মা গো জিজ্ঞাসা করি,
এ কথা না বল্লে যাবে না সংশয় ॥
নৃসিংহ রূপ হয়েছিলেন
প্রহ্লাদে করতে মোচন।
অনন্ত মহিমা হরি, ভ্রমণ করেছে, কত রূপ ধরি
কিন্তু এরূপ কোন যুগে হল
তাই বল বিশেষ বিবরণ ॥
সত্য যুগে লয় এ মূর্ত্তি জানি মা সে ভগবতী
এ মূর্ত্তি লয়েন ত্রেতাতে।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার ঘুচাইতে ভূভার,
অবতার নন্দালয়েতে ॥
অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমে।
ব্রহ্মা আদি দেবতাগণে আর যত মুনিগণে,
ঐ নামের কেউ দিতে পারে না সীমে ॥
চব্বিশ মূর্ত্তি একি মূর্ত্তি এক শরীরে হয় ধারণ।[২]

॥ ৪ ॥

মা দুর্গমে দুর্গতিহরা, তারিণী পরাৎপরা,
ভাবেতে ভব ভবানী।
শ্রীদুর্গা নামে পুরে মনস্কাম, অন্তে মোক্ষধাম
তারা নাম তরবার তরণী ॥

১ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অথবা ১০ অবতার + ১০ মহাবিদ্যা + দুর্গা + জগদ্ধাত্রী + অন্নপূর্ণা +
= ২৪ অবতার মূর্ত্তি। এই ধারণা নূতন।

২ সংগৃহীত পুঁথি

যদি দিনান্তে শ্রীদুর্গা নাম বলে।
এমনি শ্রীদুর্গা নামের গুণ,
নামে হয় শমন দমন,
চতুর্ব্বর্গের ফল অনায়াসে মিলে ॥
ভুবনে ভ্রমণ কর মা তুমি ভুবনেশ্বরী।
এ দীনে কর দয়া, ওগো অভয়া
রাজরাজেশ্বরী।
যেন অন্য কথা বল না, পূরাও মনের বাসনা,
অন্য কথা বল্লে মা, আমি তাতে ভুলব না।
মা, সূর্য্যদেবের লেঙ্গুর কখন হয়েছিল শঙ্করী ॥
অসম্ভাব্য এ কথা মা জানতে না পারি।
মা বিস্তারিয়ে এই কথা বল,
দীননাথ সেই দীন নরহরি,
কতই মহিমা তারি তবে তার····· লেঙ্গুর কেন হলো।
মা বিশেষ করে বলতে হবে
রেখো না গোপন করি ॥
এত' অসম্ভাব্য কথা বুঝতে না পারি করি জিজ্ঞাসা।
পুরাইতে হবে গো জননী আজ আমার মনের যে আশা ॥
কেনে সূর্য্যদেব কী করেছিল,
কি জন্যে বা এমন হলো,
শুনি তাই তোমার মুখেতে।
যদি কথা না কও জননী
দুঃখ ভুঞ্জিলে কলঙ্ক হবে নামেতে ॥
আমি তব দাসী নিকটেতে রৈ।
যে বাসনা হয় গো মনে,
আমি গো মায়ের স্থানে,
সকল কথা মা তোমার কাছে কই ॥
মা তোমার চরণ বিনে আমি জানি না মহেশ্বরী ॥

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

॥ ৫ ॥

ডাক দুর্গা দুর্গা বলে মনের কুতূহলে
চিতান।— দুর্গা নামে দুঃখ হরে।
দুর্গা নামত' ভবের তরণী, মুক্তিদায়িনী,
নরক দুস্তর বারিণী ॥
আমি ত' মা তোমারি দাসী, মনেতে এই অভিলাষী।
বাসনা পুরাও যদি, আমি অনুগত হৈয়ে রই তোমার দাসী
তুমি মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী বলি গো মা সে কারণ।
ধুয়া।—চতুর্ভুর্জ কুকুর মুখো হলো গো বল মা
কোন্ মুনির নন্দন।
পরধুয়া।—কেন হলো কুকুরের মাথা, বল গো মা সেই কথা,
কিবা নামটী তাহার।
কিবা নাম ধরে তার পিতা,
ব্রহ্ম অংশে জনম হয়ে কুকুর মুখ তার কি কারণ ॥
মাঝার।— হস্ত পদ মানুষের লক্ষণ।
গলে যজ্ঞসূত্র ধরে, জিজ্ঞাসি তেঁই তোমারে,
সত্য করে আমায় বল মা এখন ॥
কার গর্ভেতে জনম হলো কি জন্যে কুকুর বদন ॥
লহর।—সত্য করে বল গো মা
সভার সাক্ষাতে মিথ্যে বলো না,
প্রবঞ্চনা কর যদি, তুমি
আমি সে কথাতো মানব না ॥
চিতান।—সত্য কথা কও জননী, মা গো ত্রিলোকতারিণী,
আমাকে মিথ্যে বল না।
আমি তোমার পদের দাসী, এই অভিলাষী,
আমাকে কপট করো না ॥
কে জানে মা তোমার মহিমে।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে, দেখা পায় না গো ধ্যানে,
আমি কি গো জানি তোমার মহিমে ॥
তুমি ত্রিলোকতারিণী মাতা ত্রিলোকের শরণ ॥

॥ ৬ ॥

দুর্গা নাম ভবের তরণী, মা গো মা দুঃখহরা আপনি
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী।
এই দীনের প্রতি হের কটাক্ষে, করি এই ভিক্ষে,
মা তুমি জগৎ-জননী ॥
তোমার অযোধ্যাতে—নাম সীতা সতী।
কৈলাসেতে হৈমবতী ॥
ব্রজপুরে নাম শ্রীমতী।
কাশীর অন্নপূর্ণা এই আছে খ্যাতি ॥
তুমি ভুবনে ভুবনেশ্বরী নীলাচলে বিমলা।
মনের বাসনা পুরাও ওগো মা তারা সর্ব্বমঙ্গলা।
তোমারি দেব ত্রিলোচন কোথা পেলে বৃষভবাহন,
বল প্রকাশ করে আমার এই মনের আকিঞ্চন।
মা সর্ব্ব ঘটে বিরাজ কর তুমি ভক্ত-বৎসলা ॥
কে জানতে পারে তোমার অপার সব লীলা।
মা কৃপা করে জানাও গো যারে,
তোমার লীলার সে মহিমে,
কেউ দিতে নারে সীমে তোমার গুণের কথা জানব কি করে।
বিরূপাক্ষে বর দিয়েছ করেছ কতই লীলা ॥
অপার মহিমা তোমার ওগো শঙ্করী কে জানতে পারে ?
কালু বীরকে ধন দিয়ে তুমি,
আবার গিয়েছিলে তার ঘরে ॥ লহর।
আমি তব পদের দাসী,
মনেতে অভিলাষি,
কেবল ঐ চরণ দুখানি।
আমি ভজন-সাধন কিছু জানি না, কর করুণা,
ওগো মা গণেশজননী ॥
ভজন-সাধন যে তোমার জানে,
সে ত' আপন গুণে তরে।
তরাবে কি মা তারে ॥

দীনে দয়া করে রাখ মহিমে।
সসম্মানে শ্মশানে সদাই থাকে গো তোমার ভোলা।[১]

॥ ৭ ॥

এই পদ্মা ব'লে শুন গো দেবি ভবানি
ওগো শুনে যেন অভিমান কর না তুমি।
শবের উপর আছেন মহাকাল
ধুতুরা পানেতে মগ্ন সদায় বাজায় গাল
আমি দেখলাম চক্ষে ভস্ম মেখে পড়ে আছেন শূলপাণি॥
কও দেখি মা পার্ব্বতি গো, তোর মুখে শুনি,
শিবের নাভিপদ্মে কেন বসে দশটী রমণী।
এই ক'জনা কে বটে তাই বল গো তারিণি॥
সেই দশটা মেয়ের দুখানি চরণ,
রক্ত-উৎপল জিনি অরুণ নয়ন,
তারা মৃদু হাসে মুক্তা খসে দেখে এসেছি আমি।
ওগো কারু মুণ্ডু কাটা, কারু মাথায় একটী জটা
মজেছে মজেছে, ভুলেছে ভুলেছে সেই ভোলা জটে বাটা
আমার দেখে শুনে সন্দেহ হয় দে গো পরিচয়
ওগো দুর্গানাম করে তারা কুচুনিয়া লয়।
ওগো হত কি তোমার মন্ত্রণা
আমি তোর পদ্মা সখি কিছুই জান্তাম না,
তাই ভেবে মনে এলাম কেনে তুমি বিপদভঞ্জিনি॥[২]

॥ ৮ ॥

এই পদ্মা ব'লে তোমার চরণ করেছি মা সার
ওগো তুমি বিনে সন্দেহ কে ঘোচাবে আর!
সেই দশটার মধ্যে একটা রমণী
তোমায় সদাশিবের······
বল মা দুর্গা ধরি তোমার চরণকমলে
কেন একটা মেয়ের মস্তকেতে সপ্ততাল অগ্নি জ্বলে।
এমন রূপ আর দেখি নাই মহীমণ্ডলে॥

১ সংগৃহীত পুঁথি ২ সংগৃহীত পুঁথি।

যদি হ'ত বাজিকরের বাজী
বুঝে দেখিছি আমি নয় কারসাজি,
এমন হবে নাক, হবার নয়কো দেখি নাই কোন কালে ॥
শিবের নাভিপদ্মবনে তারা খেলা করছে কেনে
ওগো তাই দেখে ভুলেছে ভোলানাথ
সেই অগম্য শ্মশানে।
ওগো শিঙ্গা-ডম্বুর ল'য়ে গান করে শূলপাণি
তার নাভিপদ্মে নাচে সেই দশটা রমণী।
তাই দেখে আমি স্থির হ'তে নারি
জ্বালাইতে এলাম আমি শুন শঙ্করী,
মা, নিদান কালে ভুলনাক লালু-নন্দলাল ভনে ॥[১]

॥ ৯ ॥

ওগো ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সব দেবতা-কিন্নর
মা ত্রিভুবনে নাই গো কেহ তোমার অগোচর ॥
শুন শুন ওগো শঙ্করী,
সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি,
তোমায় বলতে হ'বে ওগো শিবে হোয়ো না'ক উতলা,
মনের বাঞ্ছা পূরাও ওমা সর্ব্বমঙ্গলা।
ঐ ত্রিপুরারির গলায় আছে কোন মেয়ের হাড়ের মালা। ধুয়া
এই কথাটা আমারে বল মা বিমলা।
তুমি সকল জান ওগো ভবানি,
কোথায় পেয়েছে মালা ভাঙ্গড় শূলপাণি
কেন কৈলাসে সে শ্মশান মাঝে সার করেছে বেলতলা।
মা তুমি ক্ষেমঙ্করী।
আমায় কর না চাতুরী।
ওগো মিথ্যে কথা আমায় বল না;
তুমি ভবের কাণ্ডারী ॥
মা আগম-নিগম-তন্ত্রসার তোমা হ'তে।
ওগো কত কথা সৃষ্টি হয় তোমায়

---
[১] সংগৃহীত পুঁথি

আমার মনে হয়েছে আকিঞ্চন।
সন্দেহ ঘোচাও তারা করি নিবেদন ॥
মা দুর্গা নামে কলঙ্ক রেখ না হ'য়ে চঞ্চলা ॥[১]

॥ ১০ ॥

কৃষ্ণকালীসংবাদ

কি আশ্চর্য্য কি মাধুর্য্য হেরিলাম কাননের মাঝে
ঐ নীরদবরণী ধনী কে গো নীলশতদলে বিরাজে।
এমন নারী দেখি নাই জগৎ সংসারে!
চিন্‌তে কেউ নারে ব্রহ্মাণ্ড আলো করে
রবি-শশী লুকান নখরে।
আজ কোটী চন্দ্রের উদয় যেন হয়েছে একই কালে।
কে গো ঐ কার কামিনী বসে আজ নীল শতদলে ॥
নয় গো ঐ রাই চন্দ্রাবলী,
এমন নারী চিন্‌তে নারি চন্দ্রকে ধ'রে গিলে।
এমন সুন্দরী তায় দেখিলে মন ভোলে ॥
এমন বামা দেখি নাই ভুবনমোহন বেশ
দেখি এলোকেশ, নয় গো জানি হৃষীকেশ,
তখনি হয় সদাশিবের বেশ,
নয় পশুপতি হৈমবতী মাণিক জলে কপালে ॥
যেমন কালিদহেতে ঐ বসে কমলদলেতে
শ্রীমন্তে রূপ দেখায় কামিনী।
ঐ কমল কালিকা তারা হৈমবতী নয়
আর নয়ক ব্রজের রমণী।
আর কত সুধা দিয়ে বিধি গড়েছে রূপের মাধুরী
ঐ নারীর রূপে নারী ভোলে
হায় গো হেরে প্রাণ ধরিতে নারি।
শ্রীমন্ত হেরিল রূপ সেই যে কমলে
ধরে গজ গিলে কালিদহের জলে
সে নারী নয় দেখলে মন টলে ॥

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

তার অঙ্গেতে সব চান্দের বাজার
চান্দমালা হিয়ায় দোলে ॥[১]

॥ ১১ ॥

ঐ কুটিলার মুখেতে আয়েন শুনিয়ে যায় গো নিধুবন,
যেয়ে শ্যামকে নাই চক্ষে হেরে
ত্রাসে করে আজ শ্যামা দরশন।
এই ব্রজেতে বসতি তোর ওগো কুটিলে, এই নিশি কালে
আনলি আমায় কি ব'লে ॥
হেরি চণ্ডমুণ্ড ঐ গলে কেন কিসের জন্যে
এই অরণ্যে এসেছেন মুণ্ডমালী,
কই গো কুটিলে বনে দেখাও আজ সেই বনমালী।
আর সেই কালী করে ধরে বাঁশী
মুখেতে হাসি, ক্ষরে কত সুধারাশি
ঐ এলোকেশী সর্ব্বনাশী করে অসি কংকালী।
উহার চরণেতে কি বাহার চন্দ্র সকলি।
ধন্য ওগো জটিলে, ধন্য ব্রজে বাস
হ'ল সপ্রকাশ
রূপ হেরে হয় মন উল্লাস,
হল এই যে নিধুবন কৈলাস!
আমার ইচ্ছা হয় যে ঐ চরণে দিই জবাঞ্জলি।
ঐ যে রূপসী আমি দেখছি অতি,
অনুমান হয় মহেশ-মহেশী।
আজ নয়নেতে হেরি যেন তারকব্রহ্মময়ী,
শুধুই হয় যেন মন উদাসী ॥
আজ অনন্তরূপিণী এই যে কৃষ্ণকালী হেরলাম নয়নে।
আমি নয়ন ফিরাতে নারি বারি ঝরে কি করে যাব ভবনে ॥
মহিষমর্দ্দিনী কি হরের ঘরণী।

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

জলদ বরণী,
নয় ক কুলের কামিনী,
মন রসনা ও কার কামিনী ॥
নয় শিরে শোভা করে বাক্যসুধাবলী ॥[১]

॥ ১২ ॥

(জটিলার প্রতি আয়ানের উক্তি)

আজ তোর মুখেতে শুনে ওগো জটিলে লাগল চমৎকার
এই গোকুলের মাঝেতে তোরা দুজনে অরি শ্রীরাধার ॥
তোদের মুখে শুনব আজ সকল বিবরণ
হবে না এমন
কৈলাস হ'ল নিধুবন
রূপের ছটা বিদ্যুতের মতন !
আজ মরি মরি কি মাধুরী চমৎকার লাগল দেখে ।
বল গো জটিলে,
আবার শুনুক আজ গোকুলে
লোকে তুই বলিস্ যে বটে বনমালী,
দেখি কংকালি, ঘোররূপা ঐ মুণ্ডমালী ।
যদি বনমালী হ'ল কালী চরণে শিব হ'ল কে ।
আজ শুনি সকল বিবরণ কও না আমাকে ।
কৈলাসে শিব নয় ঐ রূপসী নারী
জান্‌তে না পারি
এ কি অপরূপ হেরি !
কে হ'ল এমন ত্রিপুরারি
দেখি অসম্ভব
নয় ত শিবের শিঙে-ডম্বুর দিল কে ॥
এমন রমণী যার পদতলে শূলপাণি
কে হ'ল শিব বল গো জটিলে ?
ঐ করে অসি মুক্তকেশী কার বা কামিনী
তার কোন পুরুষ পদতলে ?

১ সংগৃহীত পুঁথি

আমার মনেতে সন্দেহ কিছু রেখ না তাই বলতে হবে,
যদি বনমালী হ'ল কালী হায় গো এমন শিব কে হবে তরে ॥
চরণতলে দেখি ঐ নয় ত্রিপুরারি।
জিজ্ঞাসা করি কোরো না গো চাতুরী,
শিবের মতন হ'ল কোন নারী ॥
ইহার ব্যাপার কও দেখি আজ চমৎকার লাগুক দেখে ॥[১]

॥ ১৩ ॥

ঐ মহিষমর্দ্দিনী তারা চণ্ডিকে এনে দেখাইলে,
করে অসি মুক্তকেশী কালী নরমুণ্ডমালা গলে,
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী হুহুঙ্কার ছাড়ে, দানব নাশ করে,
শমনকে দমন করে, ভবভয়ে ত্রাণ করতে পারে,
ঐ সদাশিবের হৃদিপরে এ যে কালী ব্রহ্মময়ী।
কই গো কুটিলে বনে দেখাও আজ নন্দের নন্দন কই,
করিতে সেই কালীয়ের তত্ত্ব হলেম কৃতার্থ,
পড়ে পেলাম পরমার্থ,
আমার গুরুদত্ত রত্ন কালী করালবদনা অই ॥
দেখি পূর্ণ সনাতনী অই তারক-ব্রহ্মময়ী।
পদতলে মহাকাল যার করে সাধনা,
অন্ত পেলাম না, সংখ্যে করতে পারলেম না,
ঐ নামে যায় ভব-যন্ত্রণা,
আমার ইচ্ছে হয় ঐ পদাম্বুজের রজে মন মজিয়ে রই।
তোরা ভাবিস্ কি আর,
এখন অরি হলি শ্রীরাধার
নিধুবনকে আন্লি দেখাইতে,
এখন সেই কোথা তোমার ওলো কুটিলে
দিলি বদ্‌নামী আচম্বিতে,
তোর কথা শুনে খড়্গ হাতে
আমি আজ এলাম সেই কোপে,

১ সংগৃহীত পুঁথি

এসে বনের মাঝে যা দেখিলাম আজ,
মন আমার ভুলেছে সেই রূপে।
জগত-জননী ঐ হয়ে অধিষ্ঠান, দেখি মূর্ত্তিমান,
শীতল করে তাপিত প্রাণ, চতুর্ভুজে করে বর প্রদান,
কবি লালু বলে অন্তিমকালে ঐ চরণ যেন ছাড়া নই।[১]

॥ ১৪ ॥

তোর কথা শুনে এলাম আমি নিধুবনে দেখলাম কালিকে,
ঐ শ্রীরাধিকার নিন্দা করে তোরা ডুবে থাকবি নরকে।
শক্তিময়ী রাধিকা শক্তিমূলাধার
মিছে বার বার কেন নিন্দে করিস তার
কালী পূজে সাধ্য আছে কার!
ঐ পরের মন্দ করে তোদের জন্ম গেল বিফলে।
তোর মতন মিথ্যেবাদী দেখি নাই গো জটিলে।
তোরা দেখাইতে না পারিলি কৃষ্ণকে
এ যে রাধিকে লাল জবা দিচ্ছেন কালীকে।
তোরা শুধুই বলিস কমলিনী কলঙ্কিনী গোকুলে,
তোদের লজ্জা নাইক পোড়ারমুখী যাবি কি বলে।
সহস্রধারাতে জল আনলে কিশোরী।
দেখলে সব নারী তবে বাঁচলো শ্রীহরি,
তাকে নিন্দা করিস নচ্ছারি ॥
ঐ নাক কেটে তোর ঝাঁও দিব মাথায় দিব ঘোল ঢেলে ॥
ঐ যে কিশোর কৃষ্ণকে দেখাতে পারলি না,
তোদের সতীপনা জানা গেল নন্দের ঘরেতে
তোর জল আনা তো হলো না।
ঐ শ্রীমতী সতী বলে সকলে গোকুলের লোকে,
ওলো জটিলে, কুটিলে তোরা দু'জন বেড়াস গা তার মন্দ দেখে
বৃন্দাবনে যে সব সতী আছে তা' জানা গেল
এখন কি বল চোখের পাপ সব পালাইল।

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

কালীপদে রাধা বিকাইল ॥
আর সতীরে অসতী বলে যাবি তোরা রসাতলে।[১]

॥ ১৫ ॥

নারদ সংবাদ

তুমি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় মহাশয় নারদ তপোধন।
আজ দৈবযোগে তোমার সঙ্গে আমার হয়েছে দরশন ॥
আজ সুপ্রভাত হয়েছে রজনী, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে,
এসে চাঁদ উদয় হ'লে, ওহে কও দেখি যথার্থ শুনি,
ওহে তোমার সুখের কথা শুনে সদাই আনন্দে ভাসি।
কও দেখি নারদমুনি তোমায় জিজ্ঞাসি।
তুমি পূর্ব্বজন্মে ছিলে কি, কোথা পেয়েছ ঢেঁকি,
পরিচয় দিতে হয় কোরো না ফাঁকি,
তোমার পিতার সঙ্গে রঙ্গে ফিরে কে বটে ঐ রূপসী ॥
ঐ রমণী কার কামিনী ওহে দেবর্ষি ?
সে নয়ক বুদ্ধি ব্রহ্মার ঘরণী, কমণ্ডুল ধরেছে হাতে
তেড়ে যায় তোমারে খেতে
আগে খায় নব রঙ্গিণী
সেই অরুন্ধতী নয় সাবিত্রী,
বটে কোন অভিলাষী ॥
সম্পর্কে তোমার কে হয় বুঝি ভাবে বুঝা যায়।
ঐ রসবতী নব যুবতী কেন তোমায় দেখে লজ্জা পায় ॥
তুমি প্রবঞ্চনা কোরো না তপোধন যথার্থ বল,
সেই চন্দ্রমুখী তোমায় দেখি, কেন আজ হেঁট মাথা, হল,
তার ভাবের কথা ভেবে পেলাম না।
শুন ওহে নারদমুনি তোমার কে হয় রমণী,
না বল্লে যেতে দিব না ॥
কবি লালু বলে মরি মরি কিবা চাঁদমুখের হাসি।[২]

১ সংগৃহীত পুঁথি
২ সংগৃহীত পুঁথি

॥ ১৬ ॥

সখীসংবাদ

ও কি অপরূপ দেখি শুনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরণী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী
অলকবেষ্টিত কনকে রচিত সীঁথি কিম্বা সৌদামিনী।
তার অধোদেশে অন্ধকার নাশে সিন্দুর কি দিনমণি॥
খঞ্জনযুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরী অনুমানি।
কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি॥
কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি কি কোকবিহীন পাণি॥
কি মৃণালদণ্ড কিবা করি-শুণ্ড কিবা বাহুর সুবলনী।
ত্রিবলী ত্রিগুণ কি কাম সোপান কিবা নাভি তরঙ্গিণী
কিবা কটিদেশ কিবা পার্শ্বশেষ মধ্যে শোভিছে কিঙ্কিণী।
কিবা রম্ভাতরু কিবা যুগ্ম উরু কিবা মরালচলনি॥
লালচন্দ্র কহে এ বেশে কোথায় চলেছ লো বিনোদিনী।
নন্দলাল ভণে চেয়ে আমা পানে হেসে কথা কহ শুনি॥[১]

॥ ১৭ ॥

"হ'ল এ সুখ লাভ পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর।
শেষ এই হ'ল কাণ্ডারী পালাল ; তরণী লাগিল ভাসিতে॥"
ধনোপ্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে শরণো লইলাম যার
তবু তার মন পাওয়া সখি আমারে হোলো ভার
না পুরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরীবাদো জগতে॥[২]

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩২৯ সাল, ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র-ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২ সংবাদ প্রভাকর— ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

॥ ১৭ ॥

ওগো কুঞ্জবনে বাজিল বাঁশী শুন ওগো রাই,
চল শীঘ্র করি যাই,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে খলের বাঁশী ডাকে রাধার নাম।
চল গো প্যারী ত্বরা করি দেখি যেয়ে শ্যাম,
নটবর ত্রিভঙ্গরূপ অতি অনুপাম॥ (ধুয়া)
চল চল কমলিনী দেখিতে শ্যামেরে,
বিহার ছলে কদমতলে দেখাব তোমারে,
তার চরণে চরণে ছাঁদা বঙ্কিম নয়ান
হেরি জুড়াবে পরাণ!
তার কালো অঙ্গে শোভা করে বিন্দু-বিন্দু ঘাম
কি কর কি কর রাধে মন্দিরে বসিঞা
শ্যামেরে দেখিবে চল আনন্দিত হঞা।
চৌদিকে বেড়িয়া যাব যত সখীগণ
অঙ্গে পরহ ভূষণ
ধীরে ধীরে চল মুখে জপ কৃষ্ণ নাম॥
লালু-নন্দলাল বলে শুন রসবতি,
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে অখিলের পতি।
জনমে-জনমে প্যারী তুমি গো তাহার,
তোমার জন্যে অবতার।
কিশোর-কিশোরী হ'য়ে পুরাও মনের কাম॥

॥ ১৮ ॥

বহু সাধে ওগো রাধে ঘষিলে চন্দন,
পরম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে করিতে লেপন,
যারে আপনার বলে কর আকিঞ্চন,
তোমার হলো না রাধে সে বংশীবদন।
কোথা কালিয়ে আছ মুখ চেয়ে
কোন্ রমণীর মন্দিরে রইলো মুরারি!
তোমার কুঞ্জেতে কালা এল না প্যারী,

ওগো এ সুখ সময় কোথা রইল প্রিয়—
না আইল, পোহাইল শর্ব্বরী ॥
রাই কি মনে করেছ কিছু বুঝিতে নারি,
শঠ স্বভাব তার কপট ব্যবহার,
অধিক বাড়িল দুঃখ রাধে গো তোমার ॥
মনে এ সন্তাপ বিনে প্রাণনাথ
বিচ্ছেদেতে সবে করে মন ভারি।
নিকুঞ্জে এল শ্যাম আস্‌বে বলে মিছে প্রত্যাশায়,
এল না নিঠুর কালা নিশি ব'য়ে যায়,
রাই গেঁথ না কুসুমের হার গলে দিবে কার,
বন্ধু বিনে হল না সে সুখ-বিহার,
সে লম্পট মন জোগাইল যার,
তার ভাবেতে ভেবে তনু ক্ষীণ হলো আমার ॥
নিশি প্রভাত হ'ল শ্রীরাধে
বড়ই প্রমাদ ঘটাবে তাই ভেবে মরি ॥
আসব বলে সে কালিয়ে এল না কেনে
চন্দ্রাবলী লয়ে গেল নিজ ভবনে।
সে পুরাইল মনো-বাসনা
তার ছিল কামনা
তার পথ চেয়ে উঠি আর বসি,
পোহায়ে পোহায় না কেনে দুঃখের এ নিশি ॥
দাগাদারি কল্লেন হরি লালু বলে এ কি শ্যামের চাতুরী

॥ ১৯ ॥

বিরহ

সে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার জীবনের জীবন।
ওগো সে কৃষ্ণকে হরণ করে নিলেগো কোন জন।
সে ত ছিল নয়ন তারা
দুঃখের দুঃখ হরা।

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

ও সে কৃষ্ণ কি ডুব ডুবলে।
দারা-পুত ছেড়ে দিয়ে চক্রধারী কৃষ্ণ হেরিব নয়ানে,
দেখিলে তায় প্যারীর প্রাণ জুড়ায়।
চোখে ধারা বহে কৃষ্ণ বিনে।
দারা পুত ছেড়ে দিয়ে যাব তার কাছে।
ওহে মনের অনুরাগ, বিচ্ছেদেতে তার মৃত দেহ পড়ে আছে।
ওগো শ্যামের রাজ্যেতে আমরা ছিলাম সুখেতে।
ওগো রাই, রাজ্যেতে
অনুক্ষণ আছি দুঃখেতে।
যেন জল ছাড়া থাকা মীন; হয়েছি তার অধীন,
ওহে কত দুঃখ স'ব পেলে।
দুঃখের দুঃখী করলে নন্দের নন্দন।
ওগো কি কহিব ইতি আপনার আধটি
কপাল হয়েছে মন্দ।
যেমন রাম অবতারেতে হয় সীতা বনেতে।
ওগো তেমনি ত্যাজ্য করে গেছে কৃষ্ণ আমাকে।
বড় হেনেছে বিচ্ছেদ বাণ,
যায় কি বাঁচে নারীর প্রাণ।
বড় বিচ্ছেদ ব্যথা না পারি সহিতে।[১]

॥ ২০ ॥

যশোদার খেদ

কান্দিছে যশোদারাণী করি হাহাকার,
এখনি আছিল ভাল নীলমণি আমার!
অচেতনে ধূলায় পড়ে কি হলো তার,
আয়গো আয় দেখে যাগো রোহিণী
হায় কেমন করে নীলমণি,
ছল ছল দুটী আঁখি মলিন হলো মুখখানি॥
অনেক তপের ফলে আমি পেয়েছি গোপালে,
না জানি কি হবে নন্দ-যশোদার কপালে,

১ সংগৃহীত পুঁথি

নয়ানের তারা গোপাল নন্দ ঘোষের প্রাণ,
তিল আধ না দেখিলে বিদরে পরাণ,
আমি কেমন করে পাসরিব তোমার চাঁদবদনখানি ॥
কে আর সম্মুখে আসি বলিবে জননী,
কে আর মাগিয়া খাবে ক্ষীর-সর-ননী,
ঐ ঘরের আঙ্গিনার মাঝে কে আর নাচিবে,
নন্দ ঘোষের বাধা কে আর বহিবে
ব্রজাঙ্গনার ঘরে কে আর চেয়ে খাবে নবনী।
আর না রাখিবে তুমি বৃন্দাবনের ধেনু,
কদম্বতলাতে বসি কে পূরিবে বেণু,
আঁখি মেল প্রাণের গোপাল ডাক রে মা বলে,
ক্ষীর-ননী দিব তোমার বদন কমলে,
বাঁচবে না তোর পিতা নন্দ লালু-নন্দের এই বাণী।

॥ ২১ ॥

কবির লহর—রামায়ণ

আমি তোমারে দিলাম পাঁচটী ফল।
দুটী কেবল দিও গো শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আর একটী দিও স্বর্গের রাজাকে। একটী দিও বাঁদরের গলে।
ওরে পবনের নন্দন, শোন্ আমার বচন,
তুমি অবশেষে এই ফলটি কররে ভোজন।
তোরে এক গোটা ফল খেতে বল্লাম,
সকলগুলি খেয়েছ।—
জ্ঞানবান বীর বাঁদর হয়ে একি করেছ।
দিলাম রামের জন্যে ফল ; সে ফল কেমনে তুই খেলিরে পাগল।
বাছা টুঁটিতে লাগয়ে
আঁটী শ্রীরাম বলে ডেকেছ। ধু।—
তুমি যার সেবক তাকে যে ফাঁকি দিয়েছ।
তোর গলাতে আঁটী লেগেছে একটী।
পড়ে সমুদ্রতে দণ্ড চার কবুলি ছটফটী।
সেই রামকে স্মরণ করে বাছা তবে প্রাণে বেঁচেছ।

ওরে বললাম সেই রঘুনাথের
দিও গা আমায় নিদর্শন। তুই মিষ্ট আস্বাদে
পাসরি গেলি; বাছা, সকল কর্‌লি পেট-ভোজন।
ওরে সরমা ফল দিলে মোরে,
এই দিলাম তোরে, শোন্‌রে বাছা হনুমান।
এই লঙ্কার মাঝে আম বাগান আছে।
তোমারে বলে দিই প্রমাণ। যদি যাওরে সেখানে, রাবণে শুনে,
হাতে অস্ত্র ধরে দণ্ডেকে বধিবে প্রাণে।
আর লালু ভণে অশোক বনে তত্ত্ব কর্‌তে এসেছ।—

॥ ২২ ॥

কিবা শোভা হয়েছে অযোধ্যা পুরে। রামের দরবারে
দুর্ব্বা ধান হাতে কোরে মুনিগণ আছে বা কি করে।
এই অযোধ্যাতে রঘুমণি রাজ্যেশ্বর বামে বসেছেন জানকী।
তাঁর শিরে নব ছত্র ধরেছেন দেখ লক্ষ্মণ ধানুকি।
তখন অঞ্জনা-নন্দনে দেখে জিজ্ঞাসেন দয়াময়।
বিরস বদন কেন আজ পবনের তনয়। তুমি আমার
প্রাণের প্রাণ, প্রধান শিষ্য হনুমান, তোমার বীরপণা
সব আছে জানা শমন দেখে করে ভয়॥ ধু।—

মোট মাট কেনে আজ করে হেঁট মাথা। বল সব
কথা, কেন বা বসে হেথা। বুড়নির নাইক যোগ্যতা।
তোর হেঁট বদন দেখে আমার মনেতে বড় সন্দেহ হয়।
তোকে যে জন্যে পাঠালাম কি হল সে বিষয়। পর ধুয়া।

বড় রহস্যময়, উঠে গেলি পবনের কুমার॥
কার নিকটে পেলি অপমান তোর ঘুচে গেল অহঙ্কার।
সীতার তথ্য এনে দিলি ওরে হনুমান। গিয়েছিলি লঙ্কা
ভুবনে। তুমি এক লাফেতে হলে সাগর পার, এখন
ভাবতেছ কেনে।
বাছা লম্ফ-ঝম্প গেল তোমার নন্দলালে কয়।—

মাথায় করে আনিতে যত গাছ পাথর, বেন্ধে ছয়
সাগর। এমন কি খালি গতর। হলি ত বুড়া বীর বাঁদর —

॥ ২৩ ॥

হনু ফলের ধরা আন্‌তে পাঠাইলাম তোরে,
শুধাই কেন শুধু শুধু এলি রে ফিরে।
আর এসেছে সব মুনিঋষিগণ সে ফল দেখিবার তরে।
এনে কোথা রাখ্‌লি বাছা আনরে আন শীঘ্র আন।—চিতান
ফলের ধরা কৈরে কৈ বাছা হনুমান। তুই গেলি
আমার আজ্ঞাতে। নন্দিগ্রামের বৃক্ষেতে। বিশ্বাস
নাই পশু জেতে। ওরে কেন এলি শুধু হাতে, সঙ্গে
থাকতে জাম্বুবান। ধুয়া।—
যদি দেখিতে চায় সকলেতে ধিক তোরে পবনের সন্তান।
তুই এখন কেন এমন হলি বুড়া বীর বলবান।
তোমার যত দম্ভবল সকলি গেল।
এখন এই হল মুখ দেখান ভার হল।
(* * *) তোর লেঙ্গুর সান্ধাইল।
বড় দম্ভ করে লেঙ্গুর নেড়ে আন্‌তে গেলি ফল।
এখন ফলের ধরা কৈরে মুখপোড়া, তোর গেল সকল দম্ভ বল।
রাবণ রাজার আমবাগান ভাঙ্গিলি
তুই, লঙ্কা পুড়াইলি নিমেষে।
আর, চড়-চাপড় মেরেছ কত শত-শত রাক্ষসে।
কত লক্ষ-লক্ষ বানর আছে, তুই হলি তার প্রধান।
সেই হনুমান আছিস তুই, আছে সেই গতর।
মরকটে বানর। হলি কি বোকা বর্ব্বর।
বুকে তোর হল নাক ডর।—
কেন আন্‌তে পারলি না সেই ফলের ধরা,
হনু মুখ পোড়া, নিতান্ত কি দাঁত কড়া,
বুদ্ধি তোর নাইক এক কড়া॥—

॥ ২৪ ॥

৮ ইন্দ্রজিতের বধের কথা শুন্‌লাম আজ
বল্‌লেন বশিষ্ঠ তপোধন।
আজ চৌদ্দ বছর অনাহারে ভাই, আমার প্রাণের লক্ষ্মণ

ওরে মুনি মুখে শুন্‌লাম আমি না জানি তার খবর।—
ফলের ধরা নাড়াইতে নারিলি বীর বানর।
বার বছরের পথে,
গন্ধমাদন পর্ব্বতে গেলি, এলি এক রেতে।
এখন বল্‌তে গোঁসা করিস,
ভুষা পুযে রেখেছিস গতর ॥ ধু
নির্ব্বলী হয়েছ বুঝি, কতদিন
ভরে নাই উদর।
তা নইলে বাক্য হেলন কর্‌লি পবনের কুমার। পর ধুয়া।
আম পাতা ঘাস ঝিঙ্গে মূলা গাছে নাই পাতা,
থাকৃতে পায় না কচি কলা,
এইত তোদের জেতের জানা।
ওরে না বুঝে ফলের নিকটে পাঠাইলাম তোকে।
আর কলা মূলা দেখে হনুমান তোর সেইখানেতে মন থাকে।
তুই অশোক বনে
শুনাইলি রামের নাম, অমর বর দিলেন জানকী।
আজ তবে কেন গুরুর সঙ্গেতে তুমি কর্‌তেছ ফাঁকি।
তুই রাবণরাজার অন্তঃপুরে গিয়া আন্‌লি মৃত্যুশর।
দাঁত নিকুটে তেড়ে যাস মানুষকে দেখে,
বড় জোর পাতে, তুল্‌তে নারিলি ধরাকে।
ঘরকাটা কি বল্‌ব তোকে ॥

॥ ২৫ ॥

সেই পাতালেতে মহীরাবণ হরিলে জানিস্‌ত পবনের কুমার,
আর পাতালেতে যেয়ে হনুমান তুমি করেছ উদ্ধার।
বাছা তবে কেনে ফলের ধরা নড়াইতে পারলি না।
এই বাঁদর থাকিতে ত কোন্ বাগানে। আহাম্মক
হলি। আর যত ঢেঁকি গণি। দাঁত ফিঁকে করেছ বিকনি।
আগে বল্‌তে হয় সে ফল আন্‌তে পারব না।
তুই এনেছিলি গাছ পাথর।

বেঁধেছিলি সমুদ্দর। এখন বুড়ানি বাঁদর,
তোর লম্ফ-ঝম্প সকল গেল দাঁত নিকসা গেল না। ধু।
ওরে অঞ্জনার পো, বসে থেকে লোক দেখে ভাবকি দিও না।
এখন যার কচু পাবি কলা খাবি সেই তোকে মানবে না।
কেউ বা সিঁথি, কেউ তেল কেউ বা নীল বাঁদর
দেখতে কুঁড়ে ঘর, সকলগুলা পোড়া গড়।
তোদের কি হল নাক ডর।
এখন লেজের ভরে নড়তে নার আহা রে দড়।
আর কলাই মাকড় পেলে হনুমান তুমি চপ-চপাইতে দাঁত নাড়।
ওরে অতিকায় নিকটে বাছা গিয়েছিলি
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশেতে। তার অক্ষয় কবচ আন্‌লি
হনুমান দিলি লক্ষ্মণের হাতে। এখন ফলের ধরার
নিকটেতে কারসাজি খাটল না।
এত শক্তি থাকতে তোর ওরে হনুমান, হলি হতজ্ঞান।
সঙ্গে বুড়া জাম্বুবান, সে থাকিতে অপমান॥

॥ ২৬ ॥

যদি বলিস হনু লক্ষ্মণ আজ্ঞা দিলেন না,
তাই ফল আন্‌তে পারলাম না।
ওরে পশু জেতের বটে ধারা বলিস কথা উড়ান খই।
বাছা, আন্‌তে পার্‌লে ফলের ধরা গুণ দেখিত সবাই।
ঘর পুড়াইতে যে জেতে হলি মুখপোড়া, ওরে বাঁদরা।
নিতান্ত কি দাঁত কড়া, লোকে তোকে দিবে তাড়া।
তোমার মতন জ্ঞানবান বীর বাঁদর দেখি নাই।
আম খেয়ে আমের আঁঠি গলায় লাগালি একটি।
হনু কর্‌লি ছট ফটী।
আবার লেজের আগুন নিভাইতে মুখ পুড়িয়ে কর্‌লি ছাই। ধু—
ঐ বুড়ো জাম্বুবানের মুখে আমি আজ সকল শুন্‌তে পাই।
ওরে চৌদ্দ বছর অনাহারী আমার প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই।
ফলের ধরার কাছে গেলি দুষ্টরে, ওরে মরকটে,
বল্‌লিনাক লক্ষ্মণকে, হনুমান ধিক্ থাকুক তোকে।

ওরে সেই হতে তো আম খাওয়া ছেড়ে খাস আমের খুসি।
আর বড় বিচি পাকুড় বিচি দেখে তোর মন করে মুস্‌পুসি।
তুমি সকল কর্‌তে পার
বাছা হনুমান প্রধান করেছি তোমাকে।
এখন আম পাতা জাম পাতা খা গা যা সকল বাঁদর কেড়ে।
কবি লালু বলে আমের মুকুল কি ছুঁইতে রইল না।
বল্‌ বুদ্ধি কি তোর হয়েছে পবনের তনয়। কর্‌লি নাক ভয়।
শুধুই তোর পুড়্‌ল মুখ, এমন তোর করা উচিত নয়।

॥ ২৭ ॥

হনু ফলের ধরা আন্‌ গা যেয়ে, এই বারে
আজ্ঞা দিয়েছেন ভাই লক্ষ্মণ। তুমি আমার কথায়
উষ্মা হয়ো না বাছা পবনের নন্দন। তুমি
নহিলে এই সভাতে বীর বল্‌তে কে আছে।—
আবার ফিরে যা হনু সেই ফলের কাছে,
তোর মুখ পুড়ে হল জ্বালা। মুখটি হল টুন-
ছোলা! ফোক্‌লা হল দাঁতগুলা। তুই কাজের
বেলায় ভাব্‌কি দিয়ে লাফ দিয়ে উঠিস্‌ গাছে। ধু।—
আজ বনের দুখে মনের দুখে দুয়ে একতা
হয়েছে! ওরে গৌর বরণ লক্ষ্মণ আমার উপবাসী আছে।—
সেই ফলের ধরা অন্যেরে বর দিব
হনুমান। এই প্রভাতে দশ দণ্ড যাহা খাবি, তাই
হবে অমৃত সমান। সেই পিতৃসত্য পালনে
চৌদ্দ বছর তিন জনায় গিয়েছিলাম বন। আমি
ভোজনের কালেতে ফল বেঁটে দিই
ধররে লক্ষ্মণ। আমি শুনেছি জঠরের জ্বালায়…
বাকল পুড়ে গেছে।—[১]

১ লালু-নন্দলাল ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদই, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত—"কবিওয়ালা লালু-নন্দলাল" ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ প্রবন্ধ হইতে ও মৎকর্তৃক সংগৃহীত পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

॥ ২৮ ॥

চৈতন্য-বিষয়ক

জীবের ভাগ্যে গৌর হরি, এয়েছেন অবতরি,
নবদ্বীপেতে।
হরিনাম বিলাইছেন গোরাচান্দ, সঙ্গে নিতাই চান্দ,
কলির জীবে নিস্তারিতে ॥
শ্রীরাধার ঋণে হয়ে ঋণী।
সদাই গো প্রেমে মাতোয়ারা, কটিতে কৌপীন পরা,
সর্ব্বদা মুখেতে হরিনাম ধ্বনি ॥
চৈতন্য চৈতন্য-হারা ক্ষণে ক্ষণে চেতন পায়।
ধুয়া।—এলেন নদেতে গৌর হরি অবতরি হোল কি ভাবের উদয় ॥
সঙ্গে যত ভক্তগণ, করেন হরি সংকীর্ত্তন।
কিছু যায় না জানা গৌর ভাবের নিরূপণ।
রাধা রাধা রাধা বলে শ্রীবৃন্দাবন পানে চায়।
নদের ধুলা লেগেছে গোরা চান্দের গায় ॥
কি অপরূপ ভাবের নিছনি।
অঙ্গেতে রাধা নাম লেখা, সে কাল বর্ণে ঢাকা,
এক ভাবে নৃত্য করেন গৌরাঙ্গ মণি ॥
নরহরি গৌর হরির শ্রীঅঙ্গে চামর ঢুলায়।
আচণ্ডালে করেন কোলে নিতাই গৌরের জাতের বিচার নাই,
সকল জীবে সমান দয়া নিতাই গৌর দুটী ভাই ॥
চৈতন্য চৈতন্য দিতে, অবতরি কলিতে,
পাষণ্ড করিতে উদ্ধার।
ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম, অন্তে মোক্ষধাম,
হরিনাম দিলেন জগতে ॥
পরম দয়াল সেই গৌর মণি।
নিতাই চাঁদকে সঙ্গে লয়ে, সর্ব্বদা দুটী ভায়ে,
কেবল করিতেছেন হরিনাম ধ্বনি ॥
ভাবে অঙ্গ অবশ হয়ে অমনি ভূমেতে লোটায় ॥[১]

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

রামজী দাস

সখী-সংবাদ

॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বিনে কমলিনি ভাবিছ বৃথায়,
সই গো কালাচান্দ পাবে
যদি বলি গো কোথায়।
চিন্তামণির একবার মনে মনে চিন্তা কর
চিন্তাহরা সেই গো শিবে।
তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ঘুচিবে।
রাধে, দুর্গা বলে ডাক গো তবে ॥
দয়াময়ী তারা সে সদয়া হবে।
তার কৃপা বলে প্যারি
তোমার সে বংশীধারী
শ্রীবৃন্দাবনেতে আসিবে ॥
দয়াময়ী তারা সেই বেদেতে বলে।
সে নাম ভুলিলে,
কেন রাই বিপদকালে ॥
একবার কাত্যয়নী করে আরাধন।
পেয়েছিলে সেই ফলে সে বংশীবদন ॥
পুনঃ সেই দুর্গানাম,
জপ রাধে অবিশ্রাম,
সে শ্যামসুন্দরে পাইবে ॥
হায় কোনও উপায় কর গো রাই,
এ দুঃখে তোমার।
যে দুঃখে শ্রীমন্তে বাঁচালে অতি চমৎকার
দক্ষিণ মশানে তারে লইল যখন।
কোথা দুর্গা দুর্গা বলে ডাকিছে তখন ॥

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে, কোলেতে করিল এসে
শ্রীমন্তকে পুত্রভাবে ॥
রাই, গঙ্গাজল আর বিল্বদল ল'য়ে জবাফুলে,
পূজ গিয়া শ্যামসুন্দরী কালিন্দীর কূলে ॥
বিরহের যন্ত্রণায় তবে হইবে উদ্ধার।
রামজী কহে আসিবে হরি ব্রজে পুনর্বার ॥
নিকুঞ্জে শ্রীহরি ল'য়ে কুসুমসজ্জা করিয়ে,
সুখেতে রজনী বঞ্চিবে ॥[১]

॥ ২ ॥

একে জ্বলে মরি দিবা শর্ব্বরী কৃষ্ণ-বিরহানলে।
তাহাতে দ্বিগুণ জ্বলিছে আগুন কুহুরব শুনিলে।
ওরে নিদয় অকাল কোকিলে,
তুমি কি মুখে ডাক কৃষ্ণ বলে। ধুয়া।
বিনয় করে শ্রীমতি বলে,
ওহে পিকবর ডেক না আর শূন্যময় এ গোকুলে ॥
ডেক না আর শ্রীকৃষ্ণ বলে ॥
কৃষ্ণ গেছে যথা তুমি যাও তথা বৃন্দাবন ত্যজিয়া,
তোমার রোদন কোকিলা মোর শুনিলে প্রাণ জ্বলে।
না হবে পৌরুষ, হবে অপযশ বিরহিণী বধিলে ॥
একে অভাগিনী সহজে রমণী আমাকে কেন জ্বালাও
কুবুজা রাণীরে মথুরা গিয়া কৃষ্ণগুণ শুনাও।
শ্রীমতীর প্রাণদাহন কেন কর ব্রজমণ্ডলে ॥
মোরা বিরহিণী কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী ব্রজগোপী সকলে ॥
রব নিবারণ করহ এখন ব্রজে যদি থাকিবে।
আমার মিনতি পুনর্ব্বার যদি কুহুরব শোনাবে।
রামজী দাসেতে বলে সব সখি মিলে
যমুনার জলে, ঝাঁপ দিব একই কালে ॥[২]

---

১ সংগৃহীত পুঁথি
২ সংগৃহীত পুঁথি

॥ ৩ ॥

মাথুর

তবে হরি বলে শুন দূতি মোর নিবেদন,
র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে নিকুঞ্জ কানন,
কুবুজারে দেখি প্রেমে ছাড়া নাহি যায়।
আমি আর ব্রজে যাব না ব'লো শ্রীরাধায় ॥
অভিমানী হ'য়ে কেন আমারে খেয়ায়,
দেখে যেতে বোলো তারে এসে মথুরায় ॥
হায় নন্দালয়ে চুরি করে খেতাম নবনী,
তুটী করে বেঁধেছিল যশোদারাণী,
দেখ শিশুকালে নন্দরাণী করিত পালন,
মা হইয়ে বেঁধেছিল নিগূঢ় বন্ধন,
ব্রজেতে যাইতে দূতি বোলো না আমায় ॥
এ ব্রজেতে বসতি দূতি ঘুচিল আমার,
আমার দৈবের ফের কি দোষ রাধার,
দেখ নিকুঞ্জেতে রাধে ছিল ক'রে অভিমান,
যোগী হ'য়ে সাধিলাম কাতর পরাণ,
দাসখত লিখে দিলাম ধ'রে রাধার পায় ॥
রাধে রাজা গোপী প্রজা কোটাল হরি,
সেই দিন ব্রজাঙ্গানার হার যায় চুরি,
দেখ চোর ব'লে বেঁধেছিল যত গোপীগণ,
সেই খেদে ছাড়িলাম বাস বৃন্দাবন,
'ব্রজেতে যাব না' দূতী বলি গো তোমায়।
বৃন্দাবনে মহারাণী রাজকুমারী,
র'য়ে র'য়ে পড়ে মনে প্রাণকিশোরী,
দেখ নিকুঞ্জেতে রাধে মোরে দিলে যন্ত্রণা,
সেই খেদে ছাড়িলাম ব্রজের বাসনা,
আর ব্রজেতে, যাবে না হরি রামজীদাস গায় ॥[১]

---

১ সংগৃহীত পুঁথি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কবিওয়ালা', ভারতবর্ষ, চৈত্র-১৩৩৪, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

॥ ৪ ॥

গৌরাঙ্গ বন্দনা

এবার গৌরাঙ্গ হ'লে কালরূপ অন্তর রেখে,
কপট সন্ন্যাসী প্যারীর প্রেমেতে ঠেকে,
আর ব্রজপুরের পুরে পুরে বধেছ কুলবালিকে।
পূর্ব্বেতে ছিলে হরি শ্রীনন্দ যশোদার ঘরে,
চরাইতে ধেনু সেই মোহন বেণু লইয়ে করে,
যত সব ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে,
আর ধেনু সনে যেতে বনে শ্রীরাধার নাম বাঁশীতে ডেকে
দ্বাপরে নন্দালয়ে করেছ শ্যাম এ সব লীলে,
যমুনায় সাধিতে দান দাঁড়ায়ে কদমতলে,
কাণ্ডারী বাইতে তরী তুমি হে যমুনার ঘাটে,
ধরিয়ে পশরা সব দধি-মাখন খেতে লুটে,
কাঁদিত গোপীগণ
তাই দেখে বংশীবদন
হাসিতে কদম্বতল থেকে।
একদিন ঠেকেছিলে রাধে প্যারীর দুর্জ্জয় মানে,
তোমারে কয়না কথা প্যারী বিরস মনে,
সাধিতে শ্রীমতীর মান আপনি শ্যাম হলে যোগী,
বিভূতি মাখিয়ে শ্রীঅঙ্গেতে প্রেম-অনুরাগী,
যত সব লীলে সেই প্যারীর কারণে।
আর 'ভিক্ষে দেহ রাধে প্যারী' ফুকারিতে বাহিরে থেকে
ওহে শ্যাম যত লীলে করেছ সব আছে মনে,
করেছ যে রাসলীলে প্যারীর সনে কুঞ্জবনে,
শোন সেই নিধুবনে রাজা হলেন রাধা প্যারী,
ত্যজিয়ে মুরলী তার কোটাল হলে বংশীধারী,
বেড়াইতে শ্রীরাধিকার হুকুম ব'য়ে—
আর রামজী ভণে অভাজনে ভাব মনে শ্রীরাধিকে।[১]

১ সংগৃহীত পুঁথি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিওয়ালা'—ভারতবর্ষ—চৈত্র-১৩৩৪, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

॥ ৫ ॥

কবির লহর—হরগৌরীর ঘরকরনা

শুন ভাগিনা ভীমে কথা মোর কই তোমার স্থানে,
জেনে শুনে তোর মামী এমন হয় কেনে,
শাঁখা পরিতে সাধ, সদাই করেন বাদ,
আমার দিবানিশি ঘটে পরমাদ,
আজ শাঁখার জন্যে বিনয় করে ধরেছে সে আমার পায়।
(ধু) আমার হলো এ কি দায়, তোর চাষা মামী শাঁখা চায়।
বুঝে না অবোধ নেকী ধরে দুটা পায়,
কার্ত্তিক গজানন, ছেলেরা দু'জন,
ক্ষুধাতে আকুল হ'য়ে কান্দে সর্ব্বক্ষণ, ভাত না পেলে
বাবা বলে দিগম্বরকে খাবলে খায়॥ পরধুয়া
তোর চাষা মামী সদা মোরে বলে কুবচন,
সে মানে নাক সদাই বলে ভাঙ্গড় ত্রিলোচন,
দিবানিশি দেয় মোরে কতই যন্ত্রণা,
ভাঙ্গড় বলে তোর মামী করে গঞ্জনা,
আমি কাঙ্গাল ত্রিলোচন, কোথা পাব ধন,
কি দিয়ে কিনে শাঁখা দিবরে এখন,
(আমার) সম্ভাবনা ছেঁড়া তেনা বাঘের ছালা পরি গায়।
আমার যত সম্ভাবনা সকল জান তুমি,
যে রূপেতে কার্ত্তিক, গণেশ পালন করি আমি,
ভিক্ষা করে দেশান্তরে বেড়াই নিরবধি
এতদিনে উপরে ঘরকে এলাম যদি,
উম্মা করে দক্ষ রাজার ঝি,
বল দেখি ভাগিনা আমার উপায় হবে কি,
একে অন্নচিন্তা চমৎকারা এ দুঃখ আর কইব কায়।
এ দুঃখ তোমার মামী জানে না আমার,
কুবেরের বাড়ীতে রে তোর মামা করে ধার,
আমার কাছে হবে না তোর মামীর শাঁখা পরা,
এত পরে করতে হবে রামজীদাসের সারা,

আমি ত একা, কোথা পাই টাকা,
তোর মামী আমার কাছে পাবে না শাঁখা,
শাঁখার তরে উম্মা করে বাপের বাড়ী চলে যায় ॥[১]

॥ ৬ ॥

কবির লহর—বিদ্যাসুন্দর

আমি এসেছি তোমার সভাতে,
এই বিদ্যার বিচার দেখিতে। ধুয়া
শুন নৃপতি আমি বাস করি বদরিকা-আশ্রমে,
তীর্থ ভ্রমণ কর্তে যাই সাগর-সঙ্গমে,
আমি এই তামাসা শুনিয়ে পথে,
কৌতুকে এসেছি দেখিতে,
যে বিচারে হারাবে তারে লয়ে যাবে সঙ্গেতে ॥
তুমি এড়াইতে পারিবে না আর পড়িলে ফেরেতে।
তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ মহারাজ,
এখন কেন কর মিছে লাজ।
দেখিব কত অভ্যাস আছে বিদ্যার যে বিদ্যাতে
দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী আমি ফিরি তীর্থ করে।
আমি শুনলাম অনেক দূরে
তোমার বিদ্যা কন্যা নাকি হে বড়ই সুন্দরী,
কত রাজার পুত্র এসে সব গিয়েছে হারি।
যেমন জনক রাজার ধনুকভঙ্গ পণ
ওহে বীরসিংহ করেছ তেমন
তোমার এ প্রকার পণ খ্যাত ত্রিভুবন!
শুনলাম ভাটের মুখেতে
ওহে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আমি কিছু-কিছু এসে
সকলের সঙ্গেতে বিচার করিবো সভায় বসে।
ওহে আমি যদি বিদ্যারে হারাই শাস্ত্রেতে
ওহে আমার কোন প্রিয় জন নাইক জেতাতে ॥

১ সংগৃহীত পুঁথি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রণীত 'কবিওয়ালা'—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যদি সঙ্গে যায় প্রতিজ্ঞার দায়
ওহে কত তীর্থ দেখাইব তায়
দিব সিদ্ধি-ঘোঁটা লোটা হাতে ফিরিবে আমার সঙ্গেতে।
যদি বিদ্যার প্রসঙ্গে আমি বিদ্যার কাছ হারি
মুড়াই মস্তকের জটাভার আমি হব শিষ্য তারি
বিচারে মোর কাছে·তোমার বিদ্যা যদি হারে
আমার পদ সেবায় নিযুক্ত করিব যে তারে
যেন নারী হয়ে এমন ধারা পণ
কখন না করে কোন জন।
আর রামজী বলে কত তীর্থ দেখিবে পথে যেতে ॥[১]

॥ ৭ ॥

কবির লহর—সীতার জন্ম

তোমারে জিজ্ঞাসি সেই কথা
বল সীতের জন্ম হয় কোথা ?
বিশেষ করে বলিতে তোর হবে যে হেথা।
ওরে অযোনিসম্ভবা রমণী সীতে পরম লক্ষ্মী জগৎ-জননী
আর জনক রাজার ঘরে ছিলেন কন্যা নামেতে সীতা।
আমি তোকে ত্রেতাযুগের কথা কিছু জিজ্ঞাসি এখানে,
সেই সীতার জন্ম বিবরণ হয়েছে কেমনে।
ওরে কার যৌবনে সে হ'ল কি প্রকার
এই সেই, তদন্ত কও দেখি একবার
কার গর্ভেতে সে জন্মে ছিল কে হ'লো তার মাতা॥
ওরে কার গর্ভেতে কি প্রকারে হল সীতা সতী
কে বটে তার জন্মদাতা পিতা কেন পৃথিবীতে স্থিতি।
শুনেছি জনক রাজার নাকি লাঙ্গলে উৎপত্তি
এই কন্যা ভাবে নিয়ে তায় রাখিল যে ভূপতি।
তার বিশেষ কথা শুধালে না পাই
ওরে ইহার জন্মে তোমারে শুধাই।

---

১ সংগৃহীত পুঁথি। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ 'কবিওয়ালা', ভারতবর্ষ, চৈত্র—১৩৩৪ দ্রষ্টব্য।

ইহার আগু-অস্ত কি সিদ্ধান্ত জনক হয় কন্যাদাতা।
রাম জনকের গৃহ হ'তে কন্যা আনিল বিভা করে
বিশেষ করে বল দেখি শুনি রাম শ্বশুর বলিবে কারে।
আমি তার তত্ত্ব জানিনাক তাই তোমারে জিজ্ঞাসি
এই অযোনিসম্ভবা কে সে সীতা রূপসী
হলো কিরূপেতে ধনুর্ভঙ্গ পণ,
ওরে কও দেখি তার শুনি বিবরণ,
আর রাম-লক্ষ্মণে কিসের জন্য গিয়াছিলেন সেথা।
আমি একে একে বিশেষ কথা কহি তোরে এখানে
বিবরিয়ে কইতে হবে তোকে, যেন সকলেতে শুনে।
নতুবা এক্ষণে যে তোরে বিদায় করিবে সকলে
এই সীতার জন্ম বিবরণ বলিতে না পারিলে।
তোমার বড়ই ফের দেখি
সভার সঙ্গে খাটিবে না করিবে যে ফাঁকি
আর না পারিলে রামজী বলে সকলি হবে বৃথা ॥[১]

॥ ৮ ॥

কবির লহর—স্বর্ণ মৃগ

ও ভাই জানকীকে সঁপেছিলাম তোমারি হাতে,
ওগো[২] লক্ষ্মণরে আমি গেলাম মৃগ[৩] ধরিতে॥
আর প্রাণপ্রেয়সী সীতা আমার সুন্দরী
বনে কে করেছে চুরি।
সেই জনকনন্দিনীর শোকে মরে আছি প্রাণেতে।
সোনার মৃগ[২] চেয়ে সীতা কোথা গেল রে আচম্বিতে॥
এ দুঃখে প্রাণ বাঁচে না, নারি ধৈরয ধরিতে॥
ওরে ভাই যতন করে আনলাম মৃগ যায় পাছে।
এ মৃগ দিব কার কাছে॥
আমি যতন করে আনলাম ধরে রাখরে ভাই যতনেতে।

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

২ অরে ৩ মৃগী—পুঁথির পাঠ।

আমি রাজা হব, রাজ্য পাব আশা ছিল মনে।
আর বাপ হ'য়ে পাপ নারীর কথায় পাঠাইলে বনে॥
ওরে কি ধন ল'য়ে যাব ভাই সেই অযোধ্যাতে॥
আমার অন্তরের ধন কেবা নিল, গেল কোন্ পথে॥
যেমন সোনার মৃগ হ'ল মারীচ নিশাচর।
একবাণে গেল সে যমের ঘর॥
এই সোনার মৃগ কে হল বা কি ছিল ঐ পুরেতে॥[১]

রাসু-নৃসিংহ

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

মহড়া—সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়॥
সুহৃৎ-ভঞ্জনো, লোক-গঞ্জনো, কলঙ্ক-ভাজনো
হোতে হয়।
চিতেন।—এমনো পীরিত করি, যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আরো পারত্রিকো॥
শ্রীনন্দনন্দনো, দুখভঞ্জনো,
সদা রাখি মনো তাঁরি পায়।
অন্তরা—অমিয় ত্যজে, গরলে মোজে,
উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে,
মরণো হ'তে অধিকো॥
চিতেন।—হৃদয়ো মন্দিরো মাঝে, রসরাজে বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়।

১ সংগৃহীত পুঁথি।

অন্তরা।—মনে রে কোরে চাতক পাখি, রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি দেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে॥
চিতেন।—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো পদ, সে নীরদ হইতে।
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে।
সেই কৃপাজলে, মনো ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয়॥
অন্তরা।—কমলজ জনো, সেবিত ধনো,
অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে,
পাইলে কিরণো॥
চিতেন।—হৃদে আছে, শতদলো,
সে কমলো ফুটিবে।
প্রেম পীযূযো ঘটিবে।
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায়।
অন্তরা।—অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন্ বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে।
ত্যজিয়ে এ সুধারসো, কেন বিযো ভখিবো।
কলুযো কূপে ডুবিবো।
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,
পেয়ে প্রেমধনো সে হারায়॥

॥ ২ ॥

মহড়া।—শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেও না।
মানা করি, কলহ আর বাড়ায়ো না॥
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিও না।
চিতেন।—নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।

কত নারীর সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতির শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না ॥

অন্তরা ।—শ্যাম, নিতি নিতি তব, দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি ।
এবারো তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বসেছেন্ কিশোরী ॥

চিতেন ।—জিনি মরুগিরি, মানভরে ভারি,
মরিবার ভয় করে না ।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবে না ॥

অন্তরা ।—শ্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমেতে ।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিতেন ।—সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না ।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা ॥

অন্তরা ।—শ্যাম সরমে কি করে, বলিহে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটী ।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটী ॥

চিতেন ।—দিয়ে পদদুটি, মাড়াবে যে মাটী,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না ।
তুলিয়ে যে মাটী, দিবে ছড়া ঝাঁটি
শ্রীরাধার এটি কটকে না ।

মহড়া ।—যেন প্রাণ, অরসিক সহ,
মিলন নাহিক হয় ।

তুমি আরো অন্য তাপ, দিও শত শত
যত তব মনে লয় ॥

॥ ৪ ॥

মহড়া। শ্যাম, তুমি যত রসিক, রসে পারক,
শ্রীমতী তা জানে।
ভারি ভুরি কোর না, বঁধু এখানে।
গিয়াছে সে কালো, জানিহে সকালো,
কুবুজা মিলিছে কপালগুণে ॥
চিতেন।—নন্দ ঘোষের বাড়ী, ধূলায় গড়াগড়ি
কড়া দুই ননীর কারণে।
এবে রাতারাতি, শিরে দণ্ড ছাতি
শৃগাল ভূপতি, হোয়েছো বনে ॥

॥ ৫ ॥

মহড়া।—রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥
চিতেন।—প্রাণ, তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা কোরেছে সর্ব্বথা,
নিজ জনারে ॥
অন্তরা।—প্রাণ, আরো এক শুনো, বচনে তোমার,
দাঁড়ালেম কুলের বাহিরে।
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে
ভাসালে এ জনে, ছলনা করে ॥
চিতেন।—তোমার চরিত, পথিকো যেমত,
হোয়ে শ্রান্তি যুত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চাহে ফিরে ॥[১]

১ এই পদটি গুপ্তরত্নোদ্ধার, সংগীতসারসংগ্রহ ও রস-ভাণ্ডার গ্রন্থে রাস্থনৃসিংহের নামে কিন্তু প্রাচীন ওস্তাদি কবির গানে সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত বলিয়া বর্ণিত আছে।

॥ ৬ ॥

মহড়া।—প্রাণনাথো, মোরো, সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজ প্রভাতে
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।
চিতেন।—পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধশশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দূরো ভালেতে॥
অন্তরা।—হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠদেশো নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রয়েছে ঘোষণা॥
চিতেন।—আমার নাগরো, গিয়েছিলেন্ কারো,
কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন্ নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥
অন্তরা।—হায়! সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা
গলে অস্থি-মালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে॥
চিতেন।—পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন্ মন্ তুষিতে।
গুঞ্জছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে;
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥
অন্তরা।—হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,
একচক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ-প্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতূরা শ্রবণো-যুগলে॥

চিতেন। ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণ-যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তিমানো,
কপালে কঙ্কণো আঘাতে॥

॥ ৭ ॥

মহড়া।—কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতির প্রয়াগে, মুড়োব মাথা॥
চিতেন।—আমি রসিকের স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা॥
অন্তরা।—হায়, কোন প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত-ভূমে॥
চিতেন।—কোন প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা॥[১]

॥ ৮ ॥

মহড়া।—ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে॥

---

১ 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গানে' ইহা নিত্যানন্দ বৈরাগীর বলিয়া বর্ণিত।

চিতেন ।—জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে ।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলাল কি গুণে ॥

অন্তরা ।—শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ ; সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো ।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি,
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥

চিতেন ।—শ্যাম, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো
মজেছো যাহারো কারণে ।
ওহে লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥

অন্তরা ।—শ্যাম, গুণেরো গরিমে কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো ।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নামধর বংশীবদনো ॥

চিতেন ।—শ্যাম, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে ।
ওহে এ বড় বেদনো, ত্যজিয়ে সে ধনো,
অধীনে রেখছ যতনে ॥

চিতেন ।—শ্যাম, আপনারো অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে ।
কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥

চিতেন ।—শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধা-কৃষ্ণ বলে নিদানে ।
এখন্ কুঁজী-কৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে ॥

অন্তরা ।—শ্যাম, ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি
যুবতী সকলি সহিলো ।

ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরে নিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো, রহিলো ॥

চিতেন।—শ্যাম, প্রদীপের আলো, প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরেরো জলো, জগত ব্যাপিলো,
সাগরো শুখালো তপনে ॥[১]

॥ ৯ ॥

মাথুর

মহড়া।—কুব্জা গো, তোদের রাজ্যে কি গো,
শ্যাম-শুকপাখী এসেছে।
ব্রজে আমাদের রাই চন্দ্রমুখী পুষেছিল শ্যাম-শুকপাখী,
প্রেম-পিঞ্জরের সে পাখী অক্রূর এনেছে হরে।
আমরা তার পাইনে দেখা, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
সেই পাখায় শ্রীরাধার নাম লেখা আছে ॥

খাদ।—যথার্থ বল আমার কাছে ॥

ফুঁকা।—সে যে শ্যাম শুক-পাখী, রাধার প্রিয়-পাখী,
ছিল কুঞ্জধামে কুব্জা গো।
তার ভঙ্গী সুঠাম থাকতো রাই-প্রেম-পিঞ্জরে,
মুরলী করে, বলিত সে চন্দ্রাধরে, শ্রীরাধার নাম ॥

মেলতা।—তারে দেখলে চিন্তে পারি,
ভঙ্গী দেখে নয়ন দেখে গো,
ভৃগু-পদচিহ্ন তার বক্ষে রয়েছে ॥

১ চিতেন।—অষ্ট সখিগণে কংসের ভবনে হইয়ে উদয়।

পাড়েন।—কুব্জার অন্তঃপুরে, বলে ভঙ্গী করে,
কৌশলে পরিচয় জানায় ॥

ফুঁকা।—আমরা ব্রজবাসী, রাই দুঃখিনীর দাসী,
ছিলাম স্বদেশে এলেম এ দেশে।
শ্যাম নামে শ্যাম শুক-পাখী, আমরা তারে হারিয়ে সখি,
অন্বেষণ করি পাখী, দেশে দেশে ॥

---

১ দ্রঃ—রাম্-নৃসিংহের সকল সখীসংবাদ গানগুলি 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে সংগৃহীত হইল।

মেলতা।—হলো অনেক দিন পাইনে কোন দেশে, কুব্জা গো
অবশেষে জান্‌তে এলেম তোমার কাছে ॥
অন্তরা।—সে যে সুঠাম শুকপাখী,
অক্রূর আনলে রাধায় দিয়ে ফাঁকি।
পাখীর বরণ চিকণ-কালো, তার রূপে করে ভুবন আলো,
এমন রূপ আর কোথাও নাই।
আমরা ব্রজ-গোপীকায়, ঠেকিছি এ দায়,
তায় ঝোরে আঁখি ॥
২ চিতেন।—সে যে শ্যাম শুক-পাখী, প্রেমসুখের পাখী,
সামান্য সে নয় ॥
পাড়ন।—তার যে ভঙ্গী বাঁকা, দুটী নয়ন বাঁকা,
সর্ব্ব অঙ্গ কেবল বাঁকাময় ॥
ফুঁকা।—শুন গো কুব্জা সখি, শ্যাম কেমন শুক-পাখী,
জান না মর্ম্ম, কুব্জা গো
সে পূর্ণব্রহ্ম নাম নিলে জীবের নিস্তার,
অনায়াসে হয় ভবপার, দক্ষিণ চরণেতে যাঁর গঙ্গার জন্ম ॥
মেলতা।—ত্যজে বৈকুণ্ঠ, ব্রজমাঝে হলেন উদয়।
রাইপ্রেমের দায় গো।
পাখী হয়ে পাখীর ব্যাভার ধরেছে ॥[১]

হরু ঠাকুর

ভবানী-বন্দনা

চিতান।—আত্মাপঞ্চবিংশতি গুণেতে জীবদেহেতে বসতি তোমার।
মহড়া।—কিছু নাই তোমা বই ভবে,
ওগো শিবে ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মমূলাধার ॥

১। প্রাঃ ওঃ কঃ

ফুকর।—আত্মা পঞ্চরসে হৃদি বাসে, করে যোজনা।
করিতে তব ভজনা।
মা, মা, মা ও মা বাঞ্ছা ছিল হৃৎকমলে
তব চরণ ভজব বলে,
সে আশা নৈরাশ করিলে
মা গো করে ছলনা॥
পায় না অনন্ত সে তব অন্ত
অনন্ত নীলে রাখ জীব সকলে
মায়ার ভোলে
অকালে জীব যায় যে মারা॥
মুখ।—বিশ্বেশ্বরি, বিশ্বোদরি, বিশ্বপালিকে কালিকে মা তারা।
পড়তা।—ত্বং সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী,
ত্বং হি অত্রিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী।
ত্বং হি যোগমায়া
ত্বং হি পদারবিন্দ না পায় ইন্দ্র যোগীন্দ্রজায়া
ত্বং হি নিস্তারিণী কর দয়া
কর না চরণছাড়া॥
খোঁজ।—দুঃখহারী দক্ষকুমারী শঙ্করী ত্বং ত্রিতাপহারা॥
২য় ফুকর।—আছ মূলাধারে কুণ্ডলিনী চতুর্দ্দল পরে।
র'য়েছ সর্পাকারে॥
মা, মা, মা ও মা তুমি অনন্তরূপিণী
তব অন্ত কিবা জানি,
জাগ চৈতন্যকারিণি ষট্‌চক্রভেদ করে॥
ল'য়ে হরি-হরে
মিলন করে
বস একত্রে
যেন হ'য়ে দ্বারী দ্বিজহরি দিতে পারে পাহারা॥
অন্তরা।—কালিকে, করালবদনি, হররাণি
গলে দুলিতে মুণ্ডমালিনি।

স্বকরে কাটিলে শিরে,
তুমি ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি ধরে,
অসুরকুলনাশিনী।
তুমি সাবিত্রী গায়ত্রী,
গঙ্গা ভাগীরথী,
দক্ষপুত্রী ত্রিনয়নী ॥[১]

॥ ২ ॥

মহড়া।—ওগো তারা গো মা
দীনের দিন গেলো কি হবে শিবে নিদেনের দিনে।
তারা, দিনমণিসুত ভয়ে,
অভয় দে মা সদয় হোয়ে ওগো শঙ্করী,
গেল কালের বশে দিন বয়ে মা হলো আখিরি,
ভেবে তনু হোলো কালি,
যেতে হবে আজ কি কালি,
রক্ষা কর রক্ষাকালী স্থান দিয়ে শ্রীচরণে।
খাদা।—চরণ বিনে দীনের আর উপায় দেখিনে।
ফুঁকা।—পথের সম্বল ছিল যাদের তারা ওগো তারা মা
তারা পার হোলো সব অনায়াসে,
আছি আমি পারে বোসে অপার সিন্ধু ভেবে।
তারা ভাবছি বোসে ভবের কূলে,
ডাক্‌ছি দুর্গা দুর্গা বোলে,
দুর্গা তোমার দয়া হোলে, পার হোয়ে যাই ভবে ॥
মেলতা।—আমার সঞ্চিত ধন, কিছুই নাই মা,
বঞ্চিত কোরো না,
দিয়ে পদতরি পার কর মা ভবে যেন আসিনে ॥
১ চিতেন।—জন্মভূমে এসে তারা
উপায় দেখিনে

১ এই সঙ্গীতটা শান্তিপুরনিবাসী শ্রীহৃদয়নাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিওয়ালা শ্রীহৃদয়নাথ তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে এই গানটি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

জয় জয় কালী কালী কালী কালী মা
কালীনাম মুখে আনিনে।
ফুঁকা।—ভেবেছিলেম আজি কিম্বা কালি ওগো তারা মা
সদা বোলবো মুখে কালী
বিফলে দিন গেল কালী,
কালের বশে ভবে।
দেখি কাল আগত হোলো কালী,
ভয় পেয়ে মা বলি কালী,
সঙ্কটেতে রাখ কালী, কালবারিণী শিবে ॥
মেলতা।—দেও সকলের মুক্তি তারা বরাভয় দিয়ে,
আমি কাল ভয়ে মা ভীত হোয়ে শরণ নিলেম চরণে
অন্তরা।—দীনতারিণী, তারা,
তুমি নাম ধরেছ ত্রিলোক-তারা,
শরণ নিলেম ঐ চরণে,
তারা বঞ্চিত না হই শমন-দিনে,
দীনময়ী শিবে শিবে,
তারা মা বিনে কার কাছে যাব,
কার শরণ আর লব তারা।
২ চিতেন।—কুপুত্র হয়েছি মা কালের বশেতে ওগো তারা
তারা তারা মা, কুমাতা পার কি হোতে।
ফুঁকা।—কুসন্তানের দয়া কি রবে না, ওগো তারা মা,
তারা বংশেতে কুপুত্র হোলে,
মায়ে কি করে না কোলে,
দয়াময়ী মা আমায় কালের হাতে সঁপে দিবে,
মা কিগো কুমাতা হবে,
কার শরণ আর লব ভবে, বল দেখি গো উমা।
মেলতা।—তুমি শরণ্য জনে তারা কর করুণা,
যাই ডঙ্কা মেরে ভবপারে ভয় করিনে শমনে ॥[১]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

॥ ৩ ॥

আগমনী

মেনকার উক্তি।

মহড়া।—ওগো তারা, আয় মা দুখ পাসরি
বল দেখি 'মা' আমারে।
কন্যে দিয়ে দৈত্যের ঘরে,
সদাই ভাবতেম তোমার তরে,
দুঃখে মন পোড়ে॥
জামাই ভিক্ষে কোরে খায়,
শ্মশানে বেড়ায়,
কোথা ছিলে তুমি ভিখারীর ঘরে॥
খাদ।—শুনে তোমার দুঃখের কথা হৃদয় বিদরে।
ফুঁকা।—তোমার কথা শুনে,
ভাবতেম মনে,
ফেটে যেতো বক্ষস্থল,
মনের কথা বল আমায় বল গো বল,
আমি শুনে লোক-মুখে, কাঁদতেম মনোদুঃখে,
চক্ষে না রহিত জল।
মেলতা।—এখন সে সব দুঃখ গেলো,
তাপিত প্রাণ জুড়ালো
এখন হোয়েছে আনন্দ তব মুখ হেরে॥
১ চিতেন।—শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে
উমা এলেন হিমালয়।
পাড়ন।—করে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদবদন
অভয়ায় গিরিরাণী কয়॥
ফুঁকা।—আয় মা পূর্ণশশী স্বর্ণশশী বিধি আমায় দিয়েছে
কপাল ফিরেছে, বল্ গো কে আছে,
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা বোলে,
পাষাণেতে পথ ফুটেছে।

মেলতা।—গেলো মনো-দুঃখ দূরে,
তোমার বিধুমুখ হেরে,
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে ॥
অন্তরা।—বল মা আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে।
শিবের সুমঙ্গল, শুনিলে সকল,
শুন্‌লে পরে আমার জীবন বাঁচে ॥
২ চিতেন।—মনে কত্তেম আমি সদাই বাসনা,
উমাধনে আন্‌তে যাই।
পাড়ন।—ভাবতেম মনেতে, কাঁদতেম নিশি-দিনেতে,
চলিবার কিছু শক্তি নাই।
ফুঁকা।—গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে পূর্ণ হলো বাসনা
ঘুচ্‌লো বেদনা, সকল যন্ত্রণা।
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না।
মেলতা।—এখন জুড়াল হৃদয়, দুঃখ গেল সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে ॥[১]

॥ ৪ ॥

সখী সংবাদ

মহড়।—কদম্বতলে কে গো বাঁশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনাজলে
আমি এমনো মোহনো মূরতি কখনো
দেখিনি এসে হেথায় ॥
চিতেন।—অঙ্গ অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায় ॥
অন্তরা।—সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ্।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ
এই কি রসিক শেষ ॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

চিতেন।—চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥
অন্তরা।—হায়, অনুপম রূপমাধুরী সখি,
হেরিলাম কি ক্ষণে।
প্রাণ নিলো হরে, ঈষৎ হেসে
বঙ্কিম নয়নে॥
চিতেন।—মন্দ মধুরো মুচকি হাসি চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো
মন্ মজিলো হেরে উহায়॥
অন্তরা।—সই, অলক-আবৃত বদন, তাহে মৃগমদো তিলকো
মনোহরো সাজো নাসাগ্রে গজোমুক্তার ঝলকো।
চিতেন।—বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়
কিবে সুন্দর সুঠামো ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমো
রূপে ভুবন ভুলায়॥
অন্তরা।—সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে
কি শোভা আমরি হায়।
গগনেতে তারাগণমাঝে, চাঁদ যেন শোভা পায়॥
সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায়॥

মহড়া।—দীননাথ, দীন ডাকে তোমায়
হে দীনবন্ধু বোলে।
পোড়ে অপার অকূলে॥
সে কি এম্‌নি দুঃখে জ্বলে।
চিতেন।—ওহে নিতান্ত যে সপে মন প্রাণ,
তব শ্রীচরণকমলে।
ডাকে সে মনের ব্যাকুলে॥

অন্তরা ।—তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর
মুকুন্দ মধুসূদন নাম ।
বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়,
হেলে পায় সুখ-মোক্ষ-ধাম ॥
চিতেন ।—ওহে তব দীন প্রতি, এ, যে বিপরীত
একি হে তব লীলে ।
না পাই কোন কালে ॥

॥ ৬ ॥

মহড়া ।—শ্যাম, তিলেকো দাঁড়াও,
হেরি চিকণো কালো বরণ ।
শ্যাম, তিলেকো দাঁড়াও,
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও ।
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও ॥
চিতেন ।—নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন ॥
তাহাতে নহি খেদিতো,
শুন ওহে ব্রজনাথো ॥
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥
অন্তরা ।—শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন ।
তোমার বাঁশীর গান্ আমি করিব শ্রবণ ॥
চিতেন ।—কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি কুলবতীর মন ।
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥

॥ ৭ ॥

মহড়া ।—আবার ঐ দেখ বাঁশী বাজেগো কুঞ্জবনে
শুনগো সখি, এবার্ গেল কুলবতীর কুল মান,
হবে কি, মনে হোলে হৃদি বিদরিয়ে যায়,
বারে বারে সবো কেমনে ॥

চিতেন।—একবার্ বেজে শ্যামের্ মুরলী গো,
সই ঐ কাল বিপিনে।
মনো সহ প্রাণো, করেছে হরনো,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

॥ ৮ ॥

মহড়া।—অতি কাতরে কিশোরী কয়।
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি, কহে সবিনয়॥
যেমন্ আছিস্ তেমনি আয়গো,
আর বিলম্ব নাহি সয়।
চিতেন।—মুক্তকেশী, হোয়ে আসি গৃহ-বাহিরে
সজল নয়নে সাধে সবারে॥
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার্,
এসো গো এ সময়।

॥ ৯ ॥

(ঐ গানের পাল্টা অথচ উত্তর)

মহড়া।—ইথে কার্ অসাধ কমলিনি।
বল শুনি হাঁগো রাধে, হেরিতে নীলকান্তমণি
আমরা তো সব তব আজ্ঞাবর্ত্তিনী।
যাবে কৃষ্ণ দরশনে, এতো শ্লাঘা কোরে মানি॥
চিতেন।—কায় মনো প্রাণো করো, পদে সমর্পণ্।
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কথন্॥
যদ্যপি কাল্ বল তুমি, আমরা প্রস্তুতো এখনি।

॥ ১০ ॥

মহড়া।—আজ্ বাঁধবো তোমায় বনমালি
করিয়ে সখীমণ্ডলী॥
নাগরালি তোমায় যত কর্ব্ব হত
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসেরো অবশেষো দিব মস্তক ঢালি॥
(অপরাংশ নাই)

॥ ১১ ॥

মহড়া।—শ্যামের ঐ গুণেতে ঝোরেগো নয়ন।
সে যে বিপদে মধুসূদন॥
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, ত্রিলোকো তারণ
মহাঘোরে বিপত্তি কালে।
যে ডাকে শ্রীকৃষ্ণ বোলে॥
সে সঙ্কটে কৃষ্ণ তারো করেন্ দুখো নিবারণ॥

চিতেন।—সাধে কি আমারো মনো কৃষ্ণ প্রতি ধায়।
কি গুণে বেঁধেছে, পাসরিতে, নারি তায়॥
যত লীলা করছেন্ মাধব্।
অন্তরে জাগিছে সে সব্॥
বাঁচাইলেন ব্রজপুরী, ধরি গিরি গোবর্দ্ধন॥

॥ ১২ ॥

মহড়া।—সখি শ্যাম্চাঁদে করগো মানা
কোন ছলে, যেন আসে না কদম্বতলে।
ললিত ত্রিভঙ্গরূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না॥

॥ ১৩ ॥

মহড়া।—অকূলো পাথারেতে
ডোবে নৌকা রাখ ওহে রাধানাথ॥
তরি করে টলো টলো, কি হলো, কি হলো
জলেতে ডুবিলো অকস্মাৎ।

চিতেন।—প্রতিদিনো হরি, এই তরি, লোয়ে করি যাতায়াত
এমনো সঙ্কটে ঠেকিনি কখনো
তোমার চরণো প্রসাদাৎ।

॥ ১৪ ॥

মহড়া।—সখিরে রসেরো আলসে।
গত দিবসেরো রজনী শেষে॥
অচেতন হ'য়ে সুখো আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে শ্যামেরে হারায়ে
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে।

চিতেন ।—যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাণো শিহরে
তাই ঘটেছিলো সই, ।
অমনি কম্পান্বিতো হৃদি, হেরে শ্যামনিধি,
হরে নিলো বিধি কি দোষে ॥

অন্তরা ।—রাই, অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্ ।
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম ॥

চিতেন—কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে এ বনো অতি দুর্গম
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী বদনে দিতেছে হুতাশে ॥

॥ ১৫ ॥

মহড়া ।—মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে
তুমি হোয়েছো রাধে ॥
ঠেকিলাম্ আজু একি প্রমাদে !
ম্লানো শশিমুখো কেনগো রাই, হেরিগো
আজু এত আহ্লাদে ॥

চিতেন ।—এই দেখে এলেম্ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে ।
ছিলে গো রাই, দোঁহে অতি পুলকে ॥
ইতি মধ্যে বিচ্ছেদো অনল্,
উঠিলো কি বাদানুবাদে ॥[১]

॥ ১৬ ॥

মহড়া ।—যদি শ্যাম না এলো বিপিনে ।
তবে কি হবে সজনি ।
লম্পটো স্বভাবো তার্ জানি ॥
ওগো বৃন্দে, এই সন্দ হয় ।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় ॥
বুঝি কারো সহবাসে পোহায়ে রজনী ।

আহা, ! ইহার সংপূর্ণ ও দ্বিতীয় পাইলাম না. সঃ-সঃ প্রঃ

চিতেন।—ছিলো যে সঙ্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়্।
বিলম্ব দেখে তায়, হতেছে সংশয় ॥
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার
গাঁথিলাম্ সখি গলে দিব কার্ ॥
যদ্যপি বিস্মৃতো হোয়ে থাকে গুণমণি।

অন্তরা।—কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার্ অনন্য গতি
বোলে কি জানাবো তোমায়, তুমি কি জান না দূতি

চিতেন।—ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ্
শ্যাম বিনে ততই, বাড়িছে ক্লেশ্ ॥
আসারো আশয়ে এতক্ষণ
রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ।
মাধবো না আসে যদি, এসে দিনমণি।

॥ ১৭ ॥

মহড়া।—কি হবে। কোথা গেলে হরি অনাথো করি,
ত্যেজিয়ে পথ মাঝে।
তব বিরহে, হৃদয়ো, বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে রহিব কেমনে,
হরি মরি প্রাণে যে।

অন্তরা।—হায়। ওহে তরুগণো, মোর শ্যামধনো
দেখছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলে বিধি সেই প্রতিনিধি,
এই খানে হোয়েছি হারা।

চিতেন।—হায়, এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি
লইতে চাহিলে যে।
আবার কিবে ভাবান্তর, অদেখা আমারে,
হোলো কি মনে বুঝে ॥

অন্তরা।—হায় ওহে তরুগণো, মোর শ্যামধনো,
দেখছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলে বিধি সেই প্রতিনিধি
এই খানে হোয়েছি হারা ॥

॥ ১৮ ॥

মহড়া ।—আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে ॥
আমি যে সই গৌরবিনী, তারি গৌরবে।

চিতেন ।—যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃতদেহে সখি আমার, আসিত জীবন ॥
এখনো এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে।

অন্তরা ।—শ্যামের গুণের কথা, শুন প্রাণ সই।
ছলক্রমে এক দিনে অভিমানী হই ॥

চিতেন ।—সে মান-ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগীর বেশ
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে।[১]

॥ ১৯ ॥

মহড়া ।—ও সখিরে
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে এ বিধুবয়ানো,
সখি এ যে পাপো প্রাণে ধৈরয ন মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বল না ॥

চিতেন ।—সই হেরি ধারাপথো, থাকয়ে যেমতো, তৃষিতো চাতকজনা।
আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথো চেয়ে,
মানসে করি সে রূপো ভাবনা ॥

অন্তরা ।—হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে রহিল না জানি কারণো ॥

১ এই গীতের বয়স ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে, বরং অধিক হইবে। সেই সময়ের এই রচনাকে অতি উৎকৃষ্টই কহিতে হইবে। আহা! "এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে" এই পদের পারিপাট্য, শব্দ কৌশল ও মধুরতার বিষয় কি ব্যাখ্যা করিব? পরিতাপ এই, ইহার অপরাংশ ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না সং-সঃ প্রঃ।

চিতেন।—বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে স্থির মানে না
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি, পাই যাতনা॥

অন্তরা।—সই, রবি কিরণেরো প্রায় হিমকরো এ তনু আমারো দহিছে
শিখি পিকি রবো, অঙ্গে মোর সবো বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

চিতেন।—সই, করিয়ে সঙ্গ তো, হরি কেন এতো, করিলেকো বঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভখি সেও ভালো,
কি ফলো বিফলে কাল্ যাপনা॥

অন্তরা।—সখি, দেখ নিজ করে, প্রাণপণো কোরে,
গাঁথিলাম এ কুসুম-হার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥

চিতেন।—সই, খেদে ফাটে হিয়া, কারো মুখো চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম্ অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে,
তারো সঙ্গে কেন প্রাণো গেল না॥

॥ ২০ ॥

মহড়া।—সখিরে গৃহে ফিরে চলো
শ্রমে শ্রীমতীর শ্রীমুখো ঘামিলো॥
নিকুঞ্জে আজ্ যাওয়া না হোলো॥
ঐ দেখ না কিশোরী, বৃক্ষ শাখা ধরি,
কাতরা হোয়ে দাঁড়ালো॥

চিতেন।—কিশোরী কিশোরে, দোঁহে একত্ররে,
হেরিব সাধো ছিল।
তাহে নিদারুণো বিধি হোয়ে প্রতিবাদী
সে আশা পূরাতে না দিলো॥

অন্তরা।—হায় শ্রীহরি স্মরিয়ে, সুযাত্রা করিয়ে
যেতেছিলাম কুঞ্জ-কাননে।
তাহে হেন বিঘ্ন জন্মিলো গো কেন
আমাদের কি কপাল্ বিগুণে॥

॥ ২০ক ॥

(ঐ গানের পাল্টা অথচ উত্তর।)

মহড়া।—অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো
আর না চলে চরণ্।
সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে
সম্বরা যে ভারো অম্বরো ॥

অন্তরা।—হায়, সে যে কটাক্ষেরো অপাঙ্গ ভঙ্গিমো
বয়ানো কোরে তা কি কবো।
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে সে ভাবো ॥

চিতেন।—কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ে,
না রাখে জীবনো আশ্।
তারো জলে বা স্থলে বা অন্তরীক্ষে কিবা
সন্দেহ নাহি মরিবারো ॥

॥ ২১ ॥

মহড়া।—আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম্।
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিশ্রিতো
কারো মুখে যদি শুনিতেম্ ॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভখিতেম্।

চিতেন।—যখন মদনমোহন আসি,
রাধা রাধা বোলে বাজাতো বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্।
সই, আমি ও চাতুরী, করিয়ে যে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম্ ॥

অন্তরা।—হইয়ে মানিনী, যতেকো গোপিনী
বিরহ জালাতে জলিতেম্।[১]

[১] জ্বালাতেম্।

সই ষড়জাল সম, সেবক নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ
সমর্পণো করিতেম্।
চিতেন।—আগে গুরু জনো, বুঝালে যখনো
তা যদি গ্রহণো করিতেম।
রিপুগণো বশে, রহিতো অনাসে,
মনেরো হরিষে থাকিতেম্॥

॥ ২২ ॥

মহড়া।—আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম্ তোমার্ শ্যাম্চাঁদেরে
শুয়ে কুসুমশয্যা পরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন
কারো অঙ্গে নাহি বসনো ভূষণ,
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে॥
চিতেন।—তুমি রাধে, অতি সাধে, করেছ প্রণয়
সে লম্পটো কভু নয়, সরল হৃদয়॥
তোমারে সঙ্কেতো জানায়ে।
শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লোয়ে।
দেখবি তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে।
[সব নাই]

॥ ২৩ ॥

মহড়া।—ঐ আসিছে কিশোরি তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে
বঁধু ঘুমে ভূমে ঢুলে পড়ে নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো বঁধুর
এলায়েছে পীতবাসো, নারে তুলে পরিতে॥
চিতেন।—যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত।
ওই সই সেই প্রাণোনাথ্॥

প্রভাতো অরুণ সহ উদয় আসি
বঁধুর হোয়েছে অরুণো আঁখি নিশি জাগরণেতে।

(সম্পূর্ণ নাই)

॥ ২৩ক ॥

(ঐ গানের দ্বিতীয় অথচ উত্তর।)

মহড়া।—নিজ দাসের দোষে ক্ষমা কর,
ওগো কিশোরি।
পীতবাসো গলে দিয়ে, বলে বংশীধারী ॥
যদি হোয়ে থাকে অপরাধো চরণে ধরি ॥

চিতেন।—পোহাইলেম্ সঙ্কটে রজনী দুখেতে
কহিব কার সাক্ষাতে ॥
বরং তুমি সুবলে জিজ্ঞাসা কর,
আমি ভ্রমিলামো বনে বনে হারাইয়ে বাঁশরী

॥ ২৩খ ॥

(ঐ গীতের তৃতীয় অথচ উত্তর।)

মহড়া।—এসেছো শ্যাম্, কোথা নিশি জাগিয়ে
শূন্যদেহ লইয়ে, এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে ॥
এখন্ কি হইল মনে, শ্রীমতী বোলে
কি ভাবিয়ে রাধানাথো, এখন হোলে উপনীতো
কোথা করিলে প্রভাতো,
শ্রীরাধারে ত্যেজিয়ে ॥

চিতেন।—কোন্ প্রাণে সে তোমারে, দিলেহে বিদায়।
তুমি বা কেমনে ত্যেজে, আইলে হেথায় ॥
বিদরে আমারো বুকো, তব মুখো হেরিয়ে।[১]

॥ ২৪ ॥

চিতান।—চন্দ্রার নিকুঞ্জে নিবাসেতে শ্যাম রসময়।
রতি-নিশির শেষে
প্রেমের সুবাতাসে
অনায়াসে যামিনী পোহায় ॥

১ এই গীতের অপরাংশ ও দ্বিতীয় পাইলাম না, সঃ-সঃ প্রঃ।

প্রভাতে গেল অস্তাচলে সুখশশী
জাগল যত গোকুলবাসী ব্রহ্ম ঋষি
প্রাতঃস্নানে যায়।
যত অলিকুল ফুলবাগে ধায়।
বাজল ভেরী আঙিনাতে
সাজল রাখাল গোষ্ঠে যেতে
ভোর বেলাতে চোরবেশেতে
চল্লেন রাধার কুঞ্জে রসময়।
তখন নিকুঞ্জের দ্বারে
বৃন্দে শ্যামকে দেখে
মনের কৌতুকে
বিনয় করে বলতেছে ॥

মুখ।—ওহে শ্যাম রসময় এখন চললে কোথা
আর কি প্রেমের সময় আছে ॥
নিশি জেগেছেন অভিসার
গেঁথে বনফুলহার
রাজকন্যে গেঁথেছেন ফুল তোমার জন্যে
রাইচাঁদ শ্যামচাঁদের আশে
নিকুঞ্জে ছিলেন বসে
অমনি মান বিচ্ছেদরাহু এসে
সে চাঁদে গ্রাস করেছে।

খোঁজ।—ফিরে যাও, যাও হে বঁধু
ছিলে কাল কার কাছে।

২য় ফুকর।—মাখমচোর গোপীর বসনচোর কেলেসোনা
সে ভাব ছাড়তে পারলে না।
গেছে জানা ॥
জানি মনেত ভাল সুচরিত বেশ তুরিতে
তুমি হে চোরা বোম্বেটে।
নবদ্বারের কপাট কেটে
কোন রমণীর যৌবন লুটে

বঁধু ছুটে এলে প্রভাতে।
তোমার বাঁশীটি যেন সিঁধেলের কাটি
কাটে অনায়াসে সিঁধের মাটী।
জানা আছে॥
অন্তরা।—ফিরে যাও হে হরি
রাই কিশোরীর কুঞ্জে যেয়ো না।
গেলে মানময়ী মান রাখবে না।
নিকুঞ্জে জেগে প্যারী॥
অভিসার হল না॥[১]

॥ ২৫ ॥

মহড়া।—ওহে চাতুরী করিয়ে হরি ভুলাও আমায়।
ওহে চতুরেরো শিরোমণি, শ্যামরসরায়॥
বনে নয়নেরো অঞ্জনো
তোমার লাগিল কোথায়॥
চিকুরেরো চিহ্ন হেরি হৃদয় তোমার
তোমার কক্ষেতে কঙ্কণো চিহ্ন
ঐ যে হে দেখা যায়।

॥ ২৬ ॥

মহড়া।—ও শ্রীরাধে তোমার প্রেমেরো
প্রেমী যে হওয়া ভার।
মহিমা অপার।
তব মায়াতে ত্রিজগতো বশো প্যারি
তুমি বশো বল দেখি কার॥
চিতেন।—গজগামিনী রাই, জানিয়ে তত্ত্ব
জান না আপনার।
দেখ ত্রিদশেরো পতি যে জনো
তারে স্থাপিবারে তুমি মূলাধার

১ শান্তিপুরনিবাসী কবিওয়ালা শ্রীহৃদয়নাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

॥ ২৬ক ॥

(ঐ গীতের পালটা)

মহড়া।—রাধে, তুমি কি সামান্যা নারী
তব প্রেমে বাঁধা বংশীধারী ॥
দেখগো মনে বিচারি
শ্রীদামেরো শাপে, সেই মনস্তাপে,
উদয় হইলে গোলোকপুরী ॥

চিতেন।—বৃষভানু ঘরে জন্মিছে গো রাই
করিবে লীলা প্রচার।
রাধাতন্ত্রে শুনেছি মহিমা তোমার ॥
পূর্ণব্রহ্মময়ী তুমি রাধে
গোলোকের ধামের ঈশ্বরী ॥

(এই দুই গীতের সম্পূর্ণ পাইলাম না)

॥ ২৭ ॥

মহড়া।—ওহে, বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশায় ॥
তুমিতো আমারি আছো
গিয়েছো কোথায়।

চিতেন।—সুখে থাকো মনে রাখো, এখন্ এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই ॥
তুমি যত ভালবাসো ভাবে বুঝা যায়।

অন্তরা।—ওহে, তোমারো ও গুণো প্রাণো,
থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে, না লাগে কারো গায় ॥

চিতেন।—তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর।
হেন অসাধারণ, গুণ আছে কার ॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়।

অন্তরা।—যদি নারী হয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক্ পেলে, পূরো তার আশ্

চিতেন।—সে রূপো সুখে সে ভাসে, বিধি-বিধানে।
কব কেমনে, সেই সে জানে॥
এক মুখো তব গুণো, কোয়ে না ফুরায়।
অন্তরা।—ওহে যত দিনো দেহ-প্রাণো, থাকিবে আমার
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥
চিতেন।—তুমি যেমনো সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষো লেশ॥
তোমারো রীতো চরিতো, জাগিছে হিয়ায়॥
অন্তরা।—তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি, তব কি সরলো মন্॥
চিতেন।—রঘুনাথো কহে কেন, ও বিধুমুখি।
কি দোষে দেখি হোয়েছো দুখী॥
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়।

॥ ২৮ ॥

মহড়া।—যৌবনকালে যদি নারী বুঝিতো পীরিত।
তম গুণে না হইত পূরিত॥
পুরুষেরো হইত বাধিত।
তবেতো হইত প্রেমে, সুখো সমুচিত॥
সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন
করয়ে কখন্ যায় যৌবনো যখন॥
সে প্রণয়ে হয়ে কিনা নানা বিঘটিত॥

॥ ২৯ ॥

মহড়া।—ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন্॥
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন।
চিতেন।—যেখানেতে না রহিল, নাহি জনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান্, তাঁরে সঁপে প্রাণ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক-ভাজন।
অন্তরা।—একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন

চিতেন।—শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়
সে জনো তাহায়, ফিরে নাহি চায়।
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ।
অন্তরা।—সখি পীরিতি পরমো ধনো, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারখার॥
চিতেন।—সামান্য খেদেরো কথা, একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই॥
ঘরে পরে আরো তারে করয়ে লাঞ্ছন।
অন্তরা।—যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই।
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই।
চিতেন।—হেন অরণ্যে রোদনে, ফলো আছে কি।
এ হোতো সুখী একা যে থাকি॥
খোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন।
অন্তরা।—যার স্বভাবো লম্পটো সই, তারে কি এ বোধ।
আছে, কি করিবে তব, প্রেম অনুরোধ।
চিতেন।—অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন।
এরূপো মিলন্, না দেখি কখন॥
রঘু বলে কোথা মেলে, দুজনে সুজন।[১]

॥ ৩০ ॥

মহড়া।—যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ, তা কি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন্ তোমারে॥
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো, ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।
চিতেন।—নিম্বতরু যদি রোপণো হয়ো, শত ভারো শর্করো।
সে যে মিষ্ট রসো, না হয়ো কখনো, নিজ গুণো প্রকাশো করে॥

॥ ৩১ ॥

মহড়া।—তুমি কার্ প্রাণ্ করি দেহ শূন্য এলে বাহিরে।
হেরে যেরূপো, বাসনা করে॥
করি পরিত্যাগ্, আপনো প্রাণ, সেইখানে রাখি তোমারে।

---

১ গুপ্তরত্নোদ্ধার—পৃঃ ৮৩, ২ বাঙালীর গান—পৃঃ ১১৬, ৩ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ—(২য় ভাগ) ১৫নং পদ, ৪ শ্যাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৯৫।

চিতেন।—পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ্ তেমনি।
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ পাইতেছে তব অম্বরে

॥ ৩২ ॥

মহড়া।—পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জলন্তো আগুনো, বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে।
চিতেন।—প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে॥[১]

॥ ৩৩ ॥

মহড়া।—এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে॥
হোতেছে এখন, নৃতনো যতনো,
কি হলো কি হবে শেষেতে।
চিতেন।—প্রাণ নব অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে, আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো, পাই সদা দেখিতে॥
হেন ভাবো যদি, থাকো নিরবধি, তবে যাবে প্রাণ সুখেতে।

॥ ৩৪ ॥

মহড়া।—রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়॥
কুলকুলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে;
অবশেষে দেখো প্রাণ যায়।
চিতেন।—আমি ভাবিলাম আগে, সে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমারে সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোক গঞ্জনায়॥

১ 'তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে' এ কথার তুল্য নাই সঃ প্রঃ

অন্তরা ।—হায়, কতজনে কত, বলেছ নাথো, মোরে থাকি মরমে ।
বদনো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে ।
চিতেন ।—হায় কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায় ।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মরা যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায় ।
অন্তরা ।—হায়, হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে, সদা রাখি প্রেমো রতনে ।
কি জানি কেমনে সখা তথাপি লোকে জানে ॥
চিতেন ।—হায় পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয় ।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিলো জগতোময় ।

॥ ৩৫ ॥

মহড়া ।—পীরিতের ও কথা, কোয়ে তা ফুরায় না ।
প্রাণ যত কও ততই
উপজে কতই
পরিসীমা হয় না ॥

॥ ৩৬ ॥

বিরহ

মহড়া ।—তোমার আশাতে এই চারি জন্ ।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্ ॥
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ ।
দরশো পরশো, শুনিতে সুভাষো
করিতেছে আরাধন্ ॥
চিতেন ।—অন্যরূপো আঁখি না হেরে আর
শ্রবণো, প্রাণো তুমি জুড়িবার ॥
শয়নে স্বপনো, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন্ ।
অন্তরা ।—প্রাণ, ইহারো কি বলো উপায় ।
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায় ॥

চিতেন ।—অস্থির হোলো এ চারি জনে ।
প্রবোধি প্রবোধো নাহি মানে ॥
ইহার বিহিতো, যে হয় ত্বরিতো,
কর প্রেয়সি এখন্ ।

অন্তরা ।—প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো
এতো চির পদ নহে জানো ॥

চিতেন ।—এ তুমি শুনেছো জান তো প্রাণো ।
অনুগতেরো রাখ সম্মানো
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধা বিতরণ্ ॥

অন্তরা ।—প্রাণ্, এরূপো আশ্বাসো কথায় ।
বল কি ফল আছে তায় ॥

চিতেন ।—প্রতিদিনো আসি বিমুখে যাই ।
নিবৃত্তি না হয়ো এ আশা বাই ॥
ত্বরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,
আরো না সহে যাতন ।

॥ ৩৭ ॥

(ঐ গীতের দ্বিতীয় অথচ উত্তর)

মহড়া ।—প্রাণ স্থিরো নীরে বেঁধে প্রস্তরো
তুমি চঞ্চলো কেন এতো
যাতে জন্মিবে তব মনো প্রীতো
তাই কিনা হবে, বুঝ নাহে ভাবে আছিতো অনুগত ।

চিতেন ।—আয়াসো পেয়ে হয় যে সুখো লাভ ।
সেই সে সুখেতে সুখো প্রভাব্ ॥
দেখো তার প্রমাণো, চাতক নবঘনো
ব্যাভারে কি কি মতো ।

॥ ৩৮ ॥

বিরহ-পুরুষোক্তি

মহড়া ।—বুঝেছি মনেতে ।
রমণীর প্রেম কেবল্ ধন্ ।
মিছে মিছি সে মিলন ।

তাদের ধন্ লয়ে কথা, পীরিতি বা কোথা,
কা কস্য পরিবেদন।

চিতেন।—তুমি হৃদয় চিরে প্রাণ্ নারীরে কর সমর্পণ
তবু কেমন চরিতো, তাহে কদাচিতো
নাহি পাওয়া যায় মন॥

অন্তরা।—রূপে কাম্ সদৃশো, পুরুষো অর্থহীন যদি হয়।
সেই রসিকো জনে, নারী নয়নে না ফিরে চায়॥

চিতেন।—অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয় যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিতো কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য্য করে সাধন॥

অন্তরা।—কেবল অর্থেতেই লোভো,
মৌখিকো সে সবো,
কহে যে প্রেমো কথন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী, সহস্রে মেলে একজন॥

চিতেন।—সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায় হোলে হয় স্বর্ণভূষণ।
তাদের্ সেই হয় প্রিয়তমো, সেই মনোরমো, ধন্ দে তোষে যে জন

অন্তরা।—যার স্বামী অকৃতী, তারে সে যুবতী, নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক্ ধিক্ পিতামাতারে এমন দরিদ্রে দিয়েছে দান॥

চিতেন।—যদি কপাল গুণে, পুনো সে জনে অর্থ করে উপার্জ্জন।.
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি কোরে হর-আরাধন॥

অন্তরা।—দেখে অর্থ আছে যারো, সদা নারী তারো, করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদপদ্মে স্থানো, দিও ওহে প্রাণো, আমি করিব সহগমন।

চিতেন।—পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা, কথাতে করে কেমন্।
করে আগেতে যেমনো, না থাকে তেমনো,
হোলে পরে পুরাতন।

॥ ৩৯ ॥

মহড়া।—এত দুখো অপমান। সাধেরো পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, স্বতনো আগুনো উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥

চিতেন।—অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে, কোরেছিলাম পীরিতি।
আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো
সদা ঝুরে দুনয়ান॥

॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধার বিরহ

মহড়া।—এ সময়ে সখা দেখা দেওহে।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ,
আমার আঁখি মনো সদাই দয় হে॥
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়
হায় হায় হায় হে।

চিতেন।—গীরিষ্ম, বরষা, হিমো শিশিরে যত দুখো হে
সব সম্বরণো কোরেছি, কৃষ্ণ
বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে।

অন্তরা।—প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়
কোকিলের স্বর-জাল্।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো
ডাকিহে তোমারে নন্দলাল্॥

চিতেন।—জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেন
নিদয়ো জনার্দ্দন হে॥

॥ ৪১ ॥

বসন্ত

মহড়া।—এমন সুখদ সময়ে কোথা হে, ত্যজিয়ে এ সুখো
ত্যজিয়ে এ সুখো বৃন্দাবন।
দুখিনী রাধারে মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন॥
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন॥

চিতেন।—একেতো সহজে এ ব্রজধাম, সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কালগুণেতে, পূর্ণ সুখো সম্পদ॥
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা :—প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
সব মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন, এ ব্রজধাম ধরিল নব যৌবন ॥
চিতেন।—মুকুলে মুকুলে, কোকিল-জালে করে কুহু কুহু
করে কুহু কুহু রব !
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জরে অলি সব ॥
আমরি আমরি, এই শোভা হেরি,
হইলো কি সবো !

॥ ৪২ ॥

মাথুর

মহড়া।—ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে।
বল না কি বাদ সাধিলে।
নবীনো পীরিতো, না হইতে নাথো,
অঙ্কুরে আঘাতো করিলে ॥
চিতেন।—একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো
কে আনিলো রথো গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥
অন্তরা।—শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো,
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী ॥
চিতেন।—শ্যাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে।
কিসে হলেম্ দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি,
কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে ॥
(এই গানটি সমুদায় পাই নাই)

॥ ৪২ ক ॥

(ঐ গীতের পালটা মহড়া)

মহড়া।—যদি চলিলে মুরারি, ত্যজে ব্রজপুরী
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও।
জীবনো উপায় বোলে দেও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো
বদনো তুলিয়ে কথা কও।

চিতেন।—শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধো না করি,
থাক হরি যথা সুখো পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥[১]

(গীতটী সম্পূর্ণ পাই নাই)

॥ ৪৩ ॥

মহড়া।—কি কাজ আর ব্রজভুবনে।
হায়, সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে ॥
রোয়ে রোয়ে চিতো, হয় চমকিতো
কেঁদে কেঁদে প্রাণ্ উঠে সঘনে।

চিতেন।—হায়, যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী
অনাথিনী করি গোপীগণে।
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ
পরাণো গিয়েছে তাহারি সনে।

অন্তরা।—হায়, কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো,
কিরূপে মিলিব তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরো, নাগরো বিনে ॥

চিতেন।—হায় রজনী কি দিনো, হোয়ে জ্বালাতনো
এই আরাধনো, করিগো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে ॥

---

১ অতিরিক্ত পাঠ: জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি। আর হেরিব আশা না করি। হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার, হৃদে বজ্রহানি চলিলে সঃ প্রঃ।

অন্তরা।—হায়, সে শ্যাম সোহাগে, যারো অনুরাগে
আমি সোহাগিনী, সকলো স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনো,
সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে ॥
চিতেন।—হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরে,
কি কাজো এ ছারো, দেহ ধারণে।
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ্ দিব যমুনা জীবনে ॥
অন্তরা।—হায়, এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো
হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বেরো তলো, বিহারেরো স্থলো
হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে ॥
চিতেন।—হায় ঘটায়ে প্রমাদো গিয়েছে, বিনোদো,
এ খেদো সম্বরি রহি কেমনে !
হে যদুনন্দনো, বিপদো ভঞ্জনো,
দিয়ে দরশনো, বাঁচাও পরাণে ॥

॥ ৪৪ ॥

মহড়া।—কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার ॥
ইথে যে উচিত তোমার।
করহে মুরারি, অধীন তোমারি সকলি
তোমারে লাগে ভার ॥
চিতেন।—আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো,
পুন করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো সে ক্ষতি,
যে দুখো হলো অবলার ॥
অন্তরা।—ওহে শ্যাম, ভাবি দেখো একোবার,
গোকুলেরো সে লীলে।
কিরূপ ব্যাভারো, হোতো নিরন্তরো
সকলি বিস্মরিলে ॥

চিতেন।—হোতেম্ যখন্ মানিনী,
আপনি করিতে যে ব্যবহার্।
সে সবো এখনো, হইলো স্বপনো,
স্মরণার্থে রয়েছে আমার ॥
অন্তরা।—ব্রজনাথ্। এক্ষণে, ব্রজভূমেরো,
হোয়েছে হে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে বিশেষো,
কি কহিব সহসা ॥
চিতেন।—আগমন কালে মাধবো, আসিবো,
কোয়েছিলে এই সার।
কেবল্ মাত্র এই আশা, ব্রজেরো ভরসা,
নতুবা হে সকলি আঁধার্ ॥
অন্তরা।—কেবল এই হেতু প্রাণো আছে গোপিকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারি, রাধা বনমালি, জাগিতেছে অন্তরে ॥
চিতেন।—দিবানিশি এই ধ্যানো, বাহ্যজ্ঞানো হারা
হোয়ে অনিবার।
কখনো চেতনো, পেয়ে ডাকি প্রাণোকৃষ্ণ
কোথায়, দুঃখে কর পার ॥
অন্তরা।—আর কি হবে হে এমন দিন্,
পুন যাবে ব্রজেতে।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারি,
যমুনা পার হোতে ॥
চিতেন।—আর কি কদম্বতলে, কৌশলে, লবে দান পশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো
সকল ব্রজবাসী জনার ॥

॥ ৪৫ ॥

মহড়া।—পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো
সখি কও শুভ সমাচার।
জীবনো জুড়াও রাধার ॥

মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে
কিরূপ ব্যবহার ॥
চিতেন।—না হেরো নবীনো জলধরো রূপো
আকুলো চাতকী জ্ঞান।
দিবানিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান ॥
জীবনো যৌবনো ধনো প্রাণো
হরি বিনে সকলি আঁধার ॥
অন্তরা।—হায়, ভূপতি নাকি হ'য়েছে হরি
মধুপুরো সুখোবিলাসী।
স্বরূপে কহ না, সেখানে রাজার কে রাজমহিষী।

॥ ৪৬ ॥

মহড়া।—বোঝা গেল না, হরি কেমন্ তোমার করুণা—
মরিছে কি বিবেচনা ॥
দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পূরাতে কুবুজার মনোবাসনা ॥
চিতেন।—সকলি বিস্মৃতো, কি ব্রজনাথো, হোলো একোকালে;
ভেবে দেখহে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না ॥
অন্তরা।—শ্যাম, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো, রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ, জো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ, বোলে লুটায় ক্ষিতি।
চিতেন।—আর শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজেরো সমাচার।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে কেবলো
প্রবলো হেরি যমুনা ॥[১]

॥ ৪৭ ॥

মহড়া।—মনে জানি গো সই,
প্রতিকূল আসবে না আর এই গোকুলে।
যখন অনুকূল ছিলেন হরি, ব্রজপুরে
সাধলেন মানের দায়, দুটি চরণ ধরে।

১ "বাঙ্গালীর গানে" এই পদটি একবার হরুঠাকুরের, অন্যবার ভবানী বেণের নামে আছে। অন্যান্য গ্রন্থে হরুঠাকুরের নামে, 'প্রাঃ কাঃ' গ্রন্থে ভবানী বণিকের নামে আছে।

হারায়ে কালাচাঁদে, মরি সই তার বিচ্ছেদে,
চিতে সাজিয়ে দে প্রাণ ত্যজি তায় কৃষ্ণ বলে ॥
খাদ।—শোন গো শোন বলি সই সাহায্য করো সকলে।
ফুঁকা।—এখন ধূলায় আন্‌তে নারায়ণ, শ্রবণে করি শ্রবণ,
দেখ ভুল না, তুমি ভুল না গো ও গো।
হরি ব'লে মৃত্যু হলে, গোলোকধামে যাব চলে
ম'লে কৃষ্ণ নামের ফলে, চরণ ছাড়া হব না ॥
মেলতা।—সখি বল নাম বল মুখে, অঙ্গে দাও নাম লিখে,
কৃষ্ণ নাম লিখে, হয় গো সাপক্ষ, আমার প্রাণান্তকালে ॥
১ চিতেন।—ব'লে কি জানাবি আর জানা গেছে।
ব্রজে শ্যাম আসা, ঘুচলো মনে আমার আশা,
সখি, সে আশার বাসা ভেঙ্গেছে ॥
পাড়ন।—মধুপুরে পীতাম্বর হয়েছেন রাজরাজেশ্বর।
সুখের সীমা নাই, সুখের সীমা নাই, গো ওগো ॥
ফুঁকা।—রাখাল ছিল এ গোকুলে, মথুরাতে রাজ্য পেলে,
এখন কৃষ্ণের জামা জোড়া, চূড়া ধড়া নাই ॥
মেলতা।—এখন কুব্জা রাণী তার, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী তার,
ভঙ্গী চমৎকার।
বাঁকায় বাঁকায় এখন গেছে মিলে ॥
অন্তরা।—সখি শ্যাম আসার আশা আর করিনে।
ভেবে যে রূপ মনে, আমি প্রাণ ত্যজি শ্রীবৃন্দাবনে ॥
আসুক বা না আসুক হরি, সুখে থাকুক লয়ে কুব্জা নারী,
ওগো বৃন্দে সই, ত্যজে মধুর ধাম, যদি আসে শ্যাম,
রাই মরেছে বলো মানে মানে ॥
২ চিতেন।—গোপীর যা ভাগ্যে ছিল হয়ে গেল।
হলো দশম দশা, আর কেন সই প্রেমের আশা,
আমার আজ হ'তে আশা ফুরালো ॥
পাড়ন।—ঘটলো আজ নাম কলঙ্কিনী,
শোন গো শোন বলি সজনী।
ঘুচলো না গঞ্জনা, গুরুগঞ্জনা গো ওগো ॥

ফুঁকা।—শ্রীবৃন্দাবন পরিহরি, গিয়াছেন সে বংশীধারী,
আমি জীবন পরিহরি, ঘুচাই যন্ত্রণা ॥
মেলতা।—মনে ছিল সই চিরদিন, সুখেতে যাবে দিন,
বাকী যে ক'দিন।
আমার সে সাধে বিষাদ বিধি ঘটালে ॥[১]

॥ ৪৮ ॥

মেলতা।—জান্‌তে এলেম তাই হে বল শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে
মধুর রাজ্যে মধুসূদন।
তোমরা দুই রাজ্যের দুজন রাজা,
আমরা কার হব প্রজা,
বল শুনি, বল ওহে চিন্তামণি,
আমরা কোন্ রাজার রাজ্যেতে বাস করিব এখন ॥
খাদ।—শুনবো তোমার মুখে বাঁকা মদনমোহন ॥
ফুঁকা।—কৃষ্ণ সূক্ষ্ম বিচার কর তুমি,
ধর্ম্মভার দিলাম আমি, ওহে দয়াময়,
ও দীন দয়াময়, লয়েছি ঐ পদাশ্রয়,
করো না অবিচার হরি, ধরি ঐ শ্রীচরণ ধরি
গুণনিধি থাকে যদি তোমার ধর্ম্মভয় ॥
মেলতা।—এবার জানিব শ্যাম কেমন তোমার করুণা।
ওহে করুণাময়, করুণাময়,
কর হে বিপদে রক্ষে বিপদভঞ্জন ॥
১ চিতেন।—বৃন্দে গো মধুপুরে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয় ॥
পাড়ন।—ওহে বংশীবদন, মদনমোহন,
শুন হে দীন-দয়াময় ॥
ফুঁকা।—কৃষ্ণ আমরা জানি বৃন্দাবনে,
রাই রাজা সেই নিধুবনে,
ওহে শ্যামরায় শ্যামরায়, নিবেদি ঐ রাঙ্গা পায়।
ব্রজধামে ছিলে যখন, রাজবেশ ছিল না তখন,
রাখাল ছিলে রাজা হলে, এ মধুপুরে ॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

মেলতা।—নূতন রাজ্যেতে নূতন রাজা হয়েছ,
রাণী পেয়েছ, শ্যাম শ্যাম,
ভুলেছ ব্রজলীলা, ব্রজের জীবন ॥
অন্তরা—তোমায় তাই শুধাই শ্যাম দয়াময়,
ওহে নিরদয়, হয়ো না নিদয়,
বঞ্চনা করো না হরি, শুন ওহে রসময় বাঁকা শ্যাম হে।
করতে হবে এমন দিন, কুদিনের সুদিন,
পাব ঐ পদে পদাশ্রয় ॥
২ চিতেন।—শুনলেম এই রাজ্যে এসে হয়েছ নূতন ভূপতি ॥
পাড়ন।—এই যে নূতন রাজ্যে, পাইয়ে নূতন ভাগ্যে,
মনে আর নাই সে শ্রীমতী ॥
ফুঁকা।—কৃষ্ণ আমরা তোমার দাসীর দাসী,
আমরা তোমায় ভালবাসি,
দেখিতে আসি তাই দেখিতে আসি তাই,
শুন হে নাগর কানাই;
কোথায় তোমার পীতধড়া, কোথায় তোমার মোহন চূড়া ॥
ব্রজের বেশ আর নাই হে তোমার,
রাজার বেশ শ্যাম দেখিতে পাই ॥
মেলতা।—এসে মথুরায় হলে ছত্রধারী শ্যাম,
গুণের গুণধাম ওহে গুণধাম হে।
কে দিলে তোমারে ঐ রাজসিংহাসন ॥[১]

॥ ৪৯ ॥

উদ্ধব সংবাদ

মহড়া।—ওহে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী মনে ধরে না;
মনো সে প্রেম পাসরে না।
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধেয়ায়ে কিশোরী
উপজয়ে কত ভাবনা ॥
চিতেন।—আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো
তাতো তুমি বুঝ না।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

আমার এ মন মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা ॥

॥ ৪৯ ক ॥

(ঐ গীতের পালটা)

মহড়া ।—ওহে উদ্ধব্, আমি সেই রাধার প্রেমেরি প্রেমাধীনো
সেই নিত্যবস্তু হে জেনো ॥
আরো সকলি অনিত্য, সেই সত্য সত্য
এ তত্ত্ব তুমি তো না জানো ।
(পদটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই)

॥ ৫০ ॥

প্রভাস

মহড়া ।—হরি, ব্রজনারী চেন না এখন
রাধার প্রাণধন ।
প্রভাস তীর্থে দরশন পাইয়া কৃষ্ণের,
অভিমানভারে কহে করে ধরে গোপীগণ ॥
চিতেন ।—নাহি পীতধটি-মুরলী, গোচারণের সে ভূষণ
এবে যদুপতি, হয়েছো ভূপতি দ্বারকার পতি সোনারো ভবন ।
যদুনাথ্, আর কেন দুখিনীগণে ;
স্মরণ হবে ।
গিয়াছে সে সবো, ব্রজেরো ভাবো,
মজেছো গৃহ ভাবে ॥
চিতেন ।—রুক্মিণী আদি রাজসুতা, বশতা,
সবে সেবে ও চরণ ।
রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী কি লাগে মন ॥
অন্তরা ।—ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব,
সে সুখোবিলাস ।
মহিসীগণেরো, বিবিধ প্রকারো,
পূরাতেছ অভিলাষ ॥

চিতেন।—সত্যভামার মানো রাখিলে,
রোপিলে পারিজাতেরো কানন।
তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয় সাধা
ভুলেছ রাধার প্রেমধন॥
অন্তরা।—তোমারে, আকিঞ্চন জন নাথো,
কৃষ্ণ জগজনে কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো
ও পদে আশ্রয় লয়॥
চিতেন।—সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে
যখন শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না লবে শরণো
দুখে গেলো প্রাণ দুখিজন॥
অন্তরা।—শুনহে বহু কালান্তরে,
প্রাণবঁধু পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে হরি তোমা বিনে
আর নাহিকো সখা
সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত,
রঘুনাথ, করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজো
ব্রজরাজো নন্দেরো নন্দন॥

॥ ৫১ ॥

মহড়া।—সত্যভামা দেখ গো, মুনির সঙ্গে আজ গো,
মনের ধন শ্যাম ঐ যাচ্ছেন বনে।
কৃষ্ণ ত্যজেছেন আভরণ, ডোর-কৌপীন কল্লেন ধারণ,
বংশীধারী, সেজেছেন রাম জটাধারী,
এমন কে কল্লে বনচারী কৃষ্ণধন॥
খাদ।—কৃষ্ণের কষ্ট দেখে কষ্ট সয় না প্রাণে॥
ফুঁকা।—একবার ত্রেতাযুগে ঐ বেশ ধরে,
শিরে জটা বাকল পরে, গেলেন বনবাসে।
কল্লেন বনে বাস, মনে হ'লে হয় হুতাশ,

দ্বাপর যুগে সেই বৈলক্ষণ, শ্যাম করেছেন রামরূপ ধারণ,
কোন অভাগী আমার কল্লে সর্ব্বনাশ ॥
মেলতা।—মুনির সঙ্গেতে, কঠিন পথে হেঁটে যেতে,
পথে পথে গো, কুশাঙ্কুর বাজবে কত শ্রীচরণে ॥
১ চিতেন।—করিলেন সত্যভামা পারিজাত ব্রত দ্বারকায় ॥
পাড়ন।—ব্রত উদযাপনে, নারদ তপোধনে,
দক্ষিণে দিলেন শ্যামরায় ॥
ফুঁকা।—যেমন অমূল্য ধন পরশ-মণি,
তার অধিক ধন চিন্তামণি, নারদ মুনি পায়।
বনে লয়ে যায়, কুলবধূ দেখতে পায়,
কে ও কেঁদে ধায় পথ-অগ্রে, কে ও কেঁদে যায় পথ-অগ্রে,
কেও বা শোকে মনোদুঃখে মুনির অগ্রে ধায় ॥
মেলতা—বলে রুক্মিণী ডেকে সত্যভামাকে, এ দায় কল্লে কে,
কে দিলে গরল আমার সরল প্রাণে ॥
অন্তরা।—কৃষ্ণের মুখ দেখে বুক ফেটে যায়।
কেঁদে কেঁদে যায়, ফিরে ফিরে চায়,
অরুণ কিরণ লাগে কালার কাল গায়, মরি হায় হায় গো,
কাজ কি ঐ সজ্জা এখন, দিয়ে বহু ধন,
ধরি গিয়ে দুজন মুনির পায় ॥
২ চিতেন।—কোন দিন গৃহ হ'তে রাজপথে যেতে দেখি নাই।
পাড়ন।—আজ গো সেই হৃষীকেশ, সেজে সন্ন্যাসীর বেশ,
বনের বেশ চক্ষে দেখ্‌তে পাই ॥
ফুঁকা।—যে জন দেবের দুর্লভ, দেবীর দুর্লভ,
নরের দুর্লভ নারীর দুর্লভ, পরম দুর্লভ ধন,
যোগীর যোগের ধন, হারা চক্ষের তারা ধন।
দিবা নিশি ঐ ধন লাগি, ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মযোগী,
শঙ্কর হয়ে সর্ব্বত্যাগী করেন যোগ সাধন ॥
মেলতা।—লোকে অন্তিমে যাঁর নাম বলে কর্ণমূলে,
আজি কি ছলে গো মুনি তাঁর মন্ত্র দিলে কাণে ॥[১]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

কেষ্টামুচি

মাথুর

হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতি পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।
শ্যাম সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,
রাখালের বেশ, এখন্ কোথা লুকালে।
মাতুল বধিলে, প্রতুল করিলে,
গোপ-গোপীকুলে, গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে।[১]

১ সঃ প্রঃ

সাতু রায়

সখী সংবাদ

মহড়া।—তাই শুধাই গো সুধামুখি রাই তোমায়
হোয়ে বিবাগী কি বিবাগে,
কি ভাবের অনুরাগে ॥
অলিরাজ ধরে তার তবো রাঙ্গা পায় ॥
ও যে ধন্য ষট্‌পদ অন্যদিকে নাহি চায়।
কতো প্রফুল্ল ফুল্ল রাধার কুঞ্জে,
তাহে সুখে নাহিকো সুখ ভুঞ্জে,
পাইয়ে ও পাদপদ্মের সুধা।
ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায় ॥

চিতেন।—ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হোয়ে
শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার
বৃন্দে বুঝি সার
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয় ॥
ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ
পদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ।
ও যে সাধিছে সাধের কাম
কি সাধে অলিরাজ
পদপঙ্কজ রজ মাখে গায় ॥

অন্তরা।—ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।
হ'য়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ॥

চিতেন।—অরণ্যের অলি বলো
কি জন্যে ব্যাকুলো
অন্য শুধালো না কয়।
অতি কুণ্ঠিতেরো প্রায়,
লুণ্ঠিত প্রায়,
কোলে তবাঙ্গে আশ্রয়॥
ও কে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে,
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে।
করে ব্রহ্মাদি তপোধন,
যে ধনের আরাধন
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায়।[১]

॥ ২ ॥

মহড়া।—এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি গো সই।
যদি ত্যজি গো কুল তবে হাসে গোকুল
যদি রাখি গো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই॥[২]
চিতান।—হাঁ গো বৃন্দে! শ্রীগোবিন্দের পায়;
ক'রে প্রাণ সমর্পণ;
১ পরচিতান।—হ'ল এ গোকুল, আমায় প্রতিকূল
অনুকূল কেবল শ্যামধন।
১ ফুকা।—সে ধন সাধনে, হই বুঝি নিধন;—
সই, চারিদিকে গঞ্জনা, পাপ লোকে তা বুঝে না
কৃষ্ণধন কি ধন॥[৩]

১ গুপ্তঃ, সঃ প্রঃ

২ কোন কোন পুস্তকে এই গানের প্রথম তিন ছত্রের পর, নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি অতিরিক্ত দেখা যায়;—

উভয় সঙ্কট সম্প্রতি, সসম্ভ্রমে বল কিসে রই।
সীতার হরণে মারীচ যেমন।
গেলে বধে শ্রীরাম, না গেলে রাবণ।
হচ্ছি ততোধিক, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিক
সই আবার কুটীলে গঞ্জনা দেয় সয়ে রই। শ্রীঃ গীঃ, ৩৭৩।

৩ ইহার পর প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ, বাঃ গাঃ, শ্রীঃ গীঃ প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ আছে;—

আমার মন চাহে রাখি কুল,
প্রাণ তাহে হয় ব্যাকুল সই।

মেলতা।—আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ দেয় কালার পরীবাদ
আমি কি রূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই ॥

॥ ৩ ॥

মহড়া।—অপরূপ একি রূপ, কৃষ্ণের রূপ
লিখেছ গো রাই।
যে চরণ দেবের পূজ্যধন, গতি নাই সে চরণ বই,
সে চরণ কই গো কই, রাই, রাই গো।
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।
কি ভাব সুধাংশুমুখি তাই সুধাই।
বল কি ভাবে এ ভাবের হ'লো উদয়।
কিশোরি শ্যামেশ্বরী লিখে লিখলে না কেন পদদ্বয়,
আমরা যে চরণের শরণ, লয়েছি সর্ব্বজন,
রাই রাই গো,
আজ কি সেই চরণ লিখতে তোমার
স্মরণ নাই।

চিতেন।—কৃষ্ণ বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী,
কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন।
অতি নির্জ্জনে, শ্যামধনে
দেখবার হ'লো আকিঞ্চন।
ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ করে লিখন,
কি ভেবে, কি ভাবে, কি ভয়ে লিখে,
লিখলেন না যুগল চরণ।
সে রূপ করিয়ে নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসে সখীগণ
রাই রাই গো, ওগো রঙ্গময়ি,
একি রঙ্গ দেখতে পাই।

পাইনে অকূল পাথারে কূল শ্রীকৃষ্ণ বই ॥
ও কি করবো তা তো বুঝিতে নারি;
শ্যামের প্রেম ত্যাগ করবো কি কুলত্যাগ করবো
আমার মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালা পরীবাদ
সই আমি কুলে থাকি কুলের নারী ॥

অন্তরা।—এই বিনয় করি লেখ গো কিশোরী
শ্রীহরির চরণ।
অঙ্গহীন মাধুরী শ্রীহরির করিতে নাই দরশন।
শ্যাম কি সামান্য তোমার কিশোরি,
তুমি কি সামান্য নারী
এ বিচ্ছেদ মনোভেদ, শ্যাম নিতান্ত তোমারি।
তবে করবে কি, আছে সেই শ্রীদামের শাপ,
তাইতে রাই, উপায় নাই,
মানুষী লীলায় পাচ্ছ মনস্তাপ।
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা-পারাবার, যা হ'তে হবে পার,
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই।
যে চরণ লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
বিরাগী ধ্রুব হয়, সকলি ত তুমি জান রাই।
যে চরণ সাধন কারণ,
সদাশিব যোগধর্ম্ম করেছেন আশ্রয়।
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়।
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হলি বিস্মরণ,
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ।
যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখছে কৃষ্ণের কায়
রাই রাই গো।
যাতে বিপদ যায়, সেই পদ
কই গো দেখ্‌তে পাই॥

॥ ৪ ॥

উত্তর

মহড়া।—নিরদয় পদদ্বয়, লিখি নাই সেই আশঙ্কায়।
সই, সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র-ময়ূরে গেলে হার,
বিচিত্র কি গো তার,
যদি চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায়।

চিতেন।—গোবিন্দের পদারবিন্দে,
বৃন্দে গো, হৃদয়ে করেছি ধারণ।
অন্য সব অবয়ব, ভূমেতে করেছি লিখন ॥
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই চরণ।
কি কারণ, বিবরণ, শুন গো,
তার চরণের কি আচরণ।
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়,
আন্‌লে না আর পুনরায়, সই সই গো,
রইলো সচল গিয়ে, অচল হয়ে মথুরায় ॥

[লেখক অজ্ঞাত][১]

॥ ৫ ॥

মাথুর

মহড়া।—কও কথা বদন তুলে হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলেম অপার্য্যে,
তোমার কংস রাজ্যের অংশ নিতে আসি নাই।

চিতান।—সঙ্গীনী প্রধানা, রঙ্গিনী যে জনা,
ভঙ্গি ক্রমে[২] কৃষ্ণে কয়;
ছিলে নব্য [৩]রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল
এবে সভ্য এই কংসালয়[৪]।
আমার এই দশা (দেখ হে)
আমি ব্রজের সেই বৃন্দে,—
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।

মেলতা।—পার কি চিনতে কেন সচিন্তে
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণির চিন্তা নাই ॥

খাদ।—অধো বদনে রবে যদি, বাঁকা মদনমোহন,
তোমার কুবুজার দোহাই।

---

১ বাঃ গাঃ —১৯৩
শ্রীঃ গীঃ —৭৫৩
২ গুপ্তঃ, ব্রজের; ৩ ঐ, বাক্যচ্ছলে; ৪ ঐ, সভ্য এখন কংসালয়।

দোলন।—তোমার সহাস্য বদনে নাহি রহস্য
কিসে এত ঔদাস্য।
মেলতা।—তোমার চন্দ্রাস্য নহে আজি প্রকাশ্য।
যেন সর্ব্বস্ব নিতে এলেম ভাবছ তাই॥
অন্তরা।—অন্য মনে কেন রইলে, কথা কইলে
ক্ষতি কি তোমার।
(শ্যাম হে) যেতে হবে না পুনঃ বৃন্দাবন
নিতে হবে না রাধার ভার।
পরচিতেন।—তোমার দাসত্ব গিয়েছে, রাজত্ব বেড়েছে[১]
তত্ত্ব করেতে হয় একবার;
আমরা অর্থলোভে আসি নাই হে
কেবল স্বার্থ ভেবে শ্রীরাধার॥[২]
সে ত রাজার নন্দিনী, আর রাজ্যেশ্বর
তুমি ত নূতন রাজা বংশীধর॥
তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম
মর্ম্ম জান্‌তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই॥[৩]

॥ ৬ ॥

উদ্ধব-সংবাদ

বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে?
একবার এসে অক্রূরমুনি, কল্লে´ কৃষ্ণ-কাঙালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্তমণি, হ'রে লয়ে গিয়েছে।
উদ্ধবের আগমন দে'খে বৃন্দাবনেতে;
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব, কও কিমর্থে আগমন?—
আসা সুলক্ষণ, কি হে বৈলক্ষণ,
কোন ছলে গোকুলে আসি কর্‌লে পদার্পণ!

১ গুপ্তঃ, রাজত্ব হ'য়েছে প্রভুত্ব বেড়েছে; ২ ঐ, অতিরিক্ত পাঠ—অতি শত্রু এসে যদি শরণ লয়, সম্ভাষণ করতে হয়, তাতে মহত্তের বাড়ে আরো মহত্ত্ব; ৩ বাঃ গাঃ সাতু রায়ের নামে, প্রীঃ গীঃ-তে কিন্তু কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে প্রচলিত। গুপ্তঃ ২১০ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠায় সাতু রায়ের প্রণীত বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

দেখে মথুরানিবাসী ভয় হয়,
একজন এসে ছদ্মবেশে,
প্রেম ভেঙ্গে, বাদ সেধেছে।
সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্দ হতেছে।
যেমন সেই অক্রূর দেখতে সুধার্ম্মিক[1] ;—
তোমায় ততোধিক, দেখ্‌ছি শতধিক,
সুধারা, বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্ত্বিক।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয় ;
ধর্ম্ম রহিত, তাদের চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে।[2]

॥ ৭ ॥

ফেরো উদ্ধব ! শূন্য ব্রজে প্রবেশ করো না।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য,
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখ না।
কৃষ্ণের কথায়, আজ হেথায় আগমন তোমার ;
গোপিকার বিরহ-বিকার, করতে প্রতীকার।
কৃষ্ণ প্রেমানল, মনানলময় :—
সে কি নির্ব্বাণ হয় ! দেখ গোকুলময়,
হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টিময়।
দিলে প্রবোধ-বারি, কি হইবে তায় !
দাবানলে যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না।
করি কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলো না।
দেখ্‌লে ত উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব ;—
আমরা গোপী সব, জীবন থাকতে শব ;
সবার দশা সমান দশা, করেছেন কেশব।
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা ;
নৈলে বেঁচে কি সুখ আছে ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা।[3]

---

১ শ্রীঃ গীঃ—সৎ অধিক

২ গুপ্তঃ, ২৭৯, বাঃ গাঃ—১৯২

৩ গুপ্তঃ, বাঃ গাঃ

॥ ৮ ॥

মহড়া।—দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই, শুধু রাইকমল ধূলায় পড়ে রয়েছে।
বনের কথা মনের কথা কই তোমার কাছে।
ফুলে-মূলে, জলে-স্থলে, সকলেতে সমান জ্বলে,
নয়ন জলে ভাসে অনিবার।
হাহাকার সবাকার, গোপিকার প্রেমবিকার,
না হয় প্রতীকার।
তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে অতি শীর্ণাকার
দুঃখের অলঙ্কার অঙ্গে সবাই পরেছে।

চিতেন।—বসন্তকালে ব্রজে আসিয়া হেরিয়া দুঃখ সমুদয়
পুনরায় মথুরায় রাজসভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।
শুন ওহে বনমালি, বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি
পত্রাবলী করে এনেছি।
ভাণ্ডীরবন, তমালবন, মধুবন আর নিধুবন, ভ্রমণ করেছি।
করতে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে,
তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে।

অন্তরা।—সুখশূন্য সবে শোকাকুল, তোমা বিহনে বনমালি হে,
যেমন শ্রীরাম বিহনে, অযোধ্যা ভবনে,
ব্রজের গোপীগণ তৎপ্রায় সকলি হে।
সানন্দ, উপানন্দ, শ্রীনন্দ কহিছে মনের বিষাদে।
গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ কোথারে আছিস্ দেখা দে।
যশোদা রোহিনী আদি, রোদন করে নিরবধি,
বলে বিধি কি করিলি হায়!
মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, আয় গোপাল কোলে আয়,
আয়রে গোপাল আয়।
সেথা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেথা হয়েছে ভূপাল,
ব্রজের রাখাল সব গোপাল বলে কাঁদিছে॥

বলহরি দাস

॥ ১ ॥

ভবানী বন্দনা

ও মা আদ্যাশক্তি মহামায়া
ত্বং হি হরজায়া।
কটাক্ষে হের নয়নে
ওমা, গতির গতি এই যে অধীনে।
তন্ত্রমন্ত্র জানি না মা
আমি ত অতি অভাজন ॥ ধুয়া।
অভয়া নামটি ধর
রিপুত্রয় কর্ত্তে পার
পুরায়ে আকিঞ্চন ॥ ধুয়া।
ওমা কালপত্র কালশমন
এল কালভয় কর মোচন ॥
একবার মোর হৃদয়মাঝে
অভয়া দাও গো দরশন ॥
আমি আছি তিমির অন্ধকারে
কি লাঞ্ছনা দাও আমারে,
এ আন্ধার যাবে দূরে
ও মা কাণ্ডারী বিনে
কে করে দুঃখ নিবারণ ॥
ওমা কেবলমাত্র ভরসা আমার
তব শ্রীচরণ ॥
জগৎ-জননী তুমি, আমি ত জগৎ-ছাড়া নই।
কেন মা গৃহজালে আসিবে বন্ধ ফেলে
বল মা আমি এ জালে কিসে মুক্ত হই।
তুমি শক্তিরূপা মুক্তিদাতা
জানি নামের গুণাগুণ।

ওমা আমি শিশুমতি,
না জানি ভক্তিস্তুতি,
নিজগুণেতে কর পার।
যেমন শ্রীমন্তে সিংহল পাটনে
মা তুমি করেছ উদ্ধার॥
আমায় যদি নিজগুণে পার কর এ ভব
নইলে এ তনু-তরী অগাধে রৈল পড়ে।
বিনে তুমি কাণ্ডারী কিসে যাই পারে।
ওমা পারের কর্ত্তা জগৎ-মাতা
আমায় যা কর এখন।[১]

॥ ২ ॥

বিজয়া সঙ্গীত

হ'ল নবমী যামিনী গত দশমী উদয়।
গিরিবর হ'য়ে সকাতর অভয়ারে কয়॥
আমার মা তুমি গো ত্রিপুরেশ্বরী।
তব পিতা আমি গিরি॥
কৃপা করি ডাক পিতা বলে।
দয়াময়ি গো মা, মা তারা গো মা,
আমার সৌভাগ্য ফলে,
গিরিপুরে উদয় হলে।
মহানন্দ প্রকাশিলে সুখময় সকলে॥
তবে আজ কেন মা অধোমুখ।
নেহারিতে ফাটে বুক॥
ওগো জননি বুঝি গিরিপুরী শূন্য করি
কৈলাসে যাবে।
তারা গো মা তোমায় বিদায় দিয়া
নিরানন্দ অন্ধকার হবে।
ও মা হেরে তোমার চান্দবদন,
দিতে হবে বিসর্জ্জন॥

১ পুঁথি হইতে সংগৃহীত

বুকে প্রাণ বেন্ধে আমরি শঙ্করি
আমার তাই ভেবে প্রাণ কান্দে।
মেনকারাণী শুনি শিবের শিঙ্গার ধ্বনি
হলো অচৈতন্য নিমিখশূন্য
কি ক'রে প্রাণ ধ'রে রবে ॥
কেমন ক'রে যাবে ছেড়ে কি হবে
তাই বল গো মা শিবে ॥
হিমালয়ে সব আছে সুখে
মনের সুখে আছে এ সকলে
দয়াময়ী গো মা, মা তারা।
এ সুখেতে বিঘ্ন করি যাবে নাকি হরপুরে
তাই ভেবে মা প্রাণে মরি
ভাসি নয়নজলে ॥
উমা ছিলে হাস্যবদনে।
এক্ষণে হেরি মলিনে হেরে বাঁচিনে ॥
ও বদনকমলে পিতা বলে আর কবে
আমায় ডাকবে।
তব মহিমা
কি জানি মা আমি অতি হীন।
কি আছে আমার
কি আছে মা ভক্তি-শক্তিহীন
মা ও মা কি ধন আছে
দিব আমি তোমায় জগৎ-জননী।
দয়াময়ি গো মা, তা তুমি আমায় দিলে যেমন
তোমায় আমি দিলাম তেমন।
বিল্বপত্রে পূজিলাম চরণ
দিয়ে গঙ্গাজল অন্যথা ভেব না মনে ॥
ভক্তিহীনে রেখ মনে।
ও গো জননি, বলহরি দাস কহে
শুন ওগো ভবানী ॥

॥ ৩ ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য

বৃন্দে কহে শুন ওহে ললিতে
এ কি আজ অপরূপ হেরি।
আজ শ্যামের বামে সেজেছ ভাল
রাধে রাজকুমারী এই কুঞ্জবনে।
রাধাশ্যামে ঘেরে সব সখীগণে ॥
'রাই' বলে রাই কেন সই করিছে রোদন
রাধাকৃষ্ণ দুই জনে ॥
বসিয়ে সিংহাসনে বিভোর দেখিলাম নয়নে ॥
ঐ শ্রীরাধিকার নয়নজলে
ভাসে রত্নসিংহাসন ॥ ধুয়া ॥
এই রেখ *   *   *   বল দেখি
আমি তাই ভাবি সর্ব্বক্ষণ।
থেকে শ্যামের সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে
কেন হ'ল এমন ॥ ধুয়া ॥
এত বড় জ্বালা হ'ল শুন গো ললিতে,
'রাই' বলে রাই করিছে রোদন
ঐ বসে কৃষ্ণের বামেতে ॥
এত সুখে শ্রীমতীকে মনের দুঃখ
কে দিল বুঝিতে নারি।
আমি জানি যে ঐ প্রেমময়ী রাই
রাধে গুণকে স্মরি
কেনে কিসের জন্য কুঞ্জবনে অধৈর্য্য হ'ল মন

॥ ৪ ॥

গোপী-বিরহ

উদ্ধবে দেখি ব্রজে সব গোপীগণ।
নয়নজলেতে অতি গলিত হ'য়ে
কাতরে শুধায় বিবরণ ॥

আমরা যত সব ব্রজনারী প্রাণে মরি
আছি দুঃখে ধারা বয় চক্ষে
উদ্ধব কি কান্দিস গোকুল চারিদিকে
ব্রজপুরে এমনি বেশে অক্রূর নামে।
কৃষ্ণবিচ্ছেদ শেল হেনে গেছে
আমাদের শ্রীরাধায়।
উদ্ধব বলরে বল কার অনুচর হ'য়ে
এখন ব্রজেতে এলি কি আশায়॥
কপট বেশ ধরিয়ে কংসের দূত হ'য়ে
অক্রূর আসিয়ে প্রাণে দুঃখ দিয়ে
নয়নের নিধি কৃষ্ণ ল'য়ে
গেছে সেই মথুরায়॥
কদম্বতলায় এই ব্রজে নাই বনমালী
সব ব্রজাঙ্গনা প্রাণে বাঁচে না।
কিছু বুঝতে নারি উদ্ধব তোর মন্ত্রণা
বিধি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি
করলে কাল-মাণিক চুরি
মনে মনে তাই ভাবি আবার নিয়ে যাবি রাধিকায়॥
উদ্ধব অতএব দেখে তোকে সবাই ডরায়।
এ দশায় কি ঘটাবি আবার বা কারে কান্দাবি
সকলে মনে ভাবি তাই॥
ক'রে ছলনা এই গোকুলে অক্রূর নিলে
কৃষ্ণধনে, বাঁচি না প্রাণে।
তাই ভাবি মনে,
পাছে রাই-রতন লয়ে
উদ্ধব যায় সেখানে॥
তবে সে ইহা হইবে,
কৃষ্ণ মাধবের আশা যাবে
ব্রজগোপীরা রাইয়ের শোকে
ঝাঁপ দিবে যমুনায়॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী

॥ ১ ॥

সখী সংবাদ

মহড়া ।—বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে ।

চিতেন ।—বৃক্ষডালে বসি, পক্ষি অগণিতো,
জড়বতো কোন কারণে ।
যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥

অন্তরা ।—একি একি সখি, একিগো নিরখি,
দেখ দেখি সবো, গোধনে ।
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ে তৃণো,
আছে যেন হীনো চেতনে ॥

চিতেন ।—হায়, কিসের লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে ।
অকস্মাতো একি, প্রেম উপজিলো
সলিলো বহিছে নয়নে ॥
আর এক দিনো, শ্যামেরো ঐ বাঁশী,
বেজেছিল কুঞ্জ-কাননে ।
কুল-লাজো ভয়ো, হরিলো তাহাতে
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে ॥

মহড়া ।—আমার মনো নাহি সরে তায় ।
তুমি প্রেম করিবারে বলিছ আমায় ॥
শুন সজনি, বলি তোমায় ।

ইহা জেনে শুনে, ফণির বদনে,
কর দেয় কে কোথায় ॥
চিতেন ।—বারে বারে পীরিতে সই,
বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার ।
ইহাতে যত সুখো সম্পদো,
নাই অবিদিতো আমার ॥
সুধারো কারণে, বল কোনোখানে,
কে কোথা গরলো খায় ।

॥ ৩ ॥

মহড়া ।—সই কি কোরেছ হায় ।
তোমারো সরলো পরাণো সপেছ কারে ।
চেন না উহারে প্রাণো সখিরে ॥
কত রমণীরো বধেছে জীবনো,
ঐ শঠজনো, পীরিতি কোরে ।
চিতেন ।—নয়নেরো বশ হোয়ে প্রাণসখি,
পোড়েছ যে দেখি, বিষম ফেরে ।
হৃদয়ো মণ্ডলে, কারে দিল স্থান,
পুরুষো পাষাণো, চেন না ওরে ।
তুমিলো যেমনো, রমণ ভাজনো,
তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে ।
ও যে অতি শঠ, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে ।

॥ ৪ ॥

মহড়া ।—পীরিতি নগরে বিসমো সখি,
মনোচোরেরো সে ভয় ।
বসতি ইহাতে দায় ॥
নয়নে-নয়নে সন্ধানো,
মনো অমনি হরিয়ে লয় ।

চিতেন ।—সন্ধানো করিয়ে মনোচোর্,
ভ্রমিছে নগরময় ।
কুলেরো বাহির হও না,
থেকো সাবধানে লো, সদায় ॥

॥ ৫ ॥

মহড়া ।—হেরি প্রাণ্রে, তব মুখো কমলে,
নয়নো খঞ্জন্ ।
ওলো হবে দুখো নিবারণ্ ॥
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ্ যুবতি,
বুঝি ভূপতি হবে এখন ।
চিতেন ।—কমলোপরেতে খঞ্জন, যদি দেখে কোনো
যদি দেখে কোনো জন ।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্যলাভ,
ওলো এইতো বেদের বচন্ ॥
অন্তরা ।—হায়, ইহার কারণে, যাত্রাকালেতে,
শুন ওলো সুন্দরি ।
বামে শব শিবা কুম্ভ,
দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি ॥
চিতেন ।—তারি ফলো বুঝি আমারে আসি,
ফলিলো এখন্ ।
ছত্রধারী হব তোমারো হৃদয়ে,
পাব হৃদি সিংহাসন্ ॥

॥ ৬ ॥

মহড়া ।—যে কালে সলিলে বটপত্রে
ভাসেন শ্রীপতি ।
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতী ॥
ইহার তত্ত্ব কথা কই সম্প্রতি ও দূতি ।
রাধা ছাড়া হরি নয় সবে কয় ।
সই আমার ঐ সন্দ হয় ॥

জানি রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা,
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি।
চিতেন।—তুমি চতুরা গোপী মধ্যে, বৃন্দে সজনি।
সবিশেষ আমার কও দেখি শুনি॥
মহাপ্রলয় যেদিন্, সে কালীন্।
শ্যাম সঙ্গ রাই কেন বিহীন্।
জানি শ্রীকৃষ্ণ পুরুযোত্তম,
প্রধানা রাই প্রকৃতি।

॥ ৭ ॥

মহড়া।—কও দেখি সখি রাধারে কেন,
মা রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতি বটে সজনি, প্রকৃতিরূপে প্রধানা
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে,
জড় তায় হয় রসনা।
চিতেন।—যে সীতে সে রাধা,
ব্রহ্মরূপিনী একই জানি দুজনা।
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে,
মা মা বলে করে সাধনা।—॥

॥ ৮ ॥

মহড়া।—পরাণো থাকিতে প্রেয়সি
তোমারে কি ত্যজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি॥
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো,
ইহারো কারণো, বুঝিতে নারি।
চিতেন।—ছলো ছলো করে নয়নো,
দেখে প্রাণো ধরিতে নারি।
কি দুখো ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখো মলিনো করি।

॥ ৯ ॥

মহড়া—ওরে প্রাণ্ রে।
কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার।
এ সরোবরে, না হেরে তারে,
আমি সবো হেরি শূন্যাকার॥
আমায় কে দেবে মধু দান্।
কার মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ্॥
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে,
চারিদিকে অন্ধকার।

চিতেন।—পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো,
জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম,
তারো মনো রাখিতে॥
বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে।
কি হোলে, কি হোলো, কমল্ কোথা গেলো,
তারে কি পাব না আর॥

॥ ১০ ॥

মহড়া।—সে কেন রাধারে; কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে।
দ্বারিকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন।—ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই, যে জনো গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে,
আরো মায়াতে ব্রহ্মার মন্ ভুলালে॥

অন্তরা।—হায় দেখ প্রাণ সখি, যোগীজন যারে, সদা করে ধ্যান্।
যাহারো বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান্॥
যার বেণু রবে ধেনু সবে, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে, হর পার্ব্বতী,
আসিতেন এই গোকুলে॥

অন্তরা ।—হায় ! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি, কর দেখি প্রণিধান

যাহার গুণে পশু পক্ষীর্, ঝুরিতো দুটি নয়ান্ ॥

চিতেন ।—সীতা উদ্ধারিতে যে জন, জলেতে ভাসালে শিলে ।

যার পদরেণু পরশে দেখো, অহল্যা মানবী দেহ পেলে ॥

অন্তরা ।—হায় সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি ।

প্রেমের বন্ধনে হোলেন্, বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী ॥

চিতেন ।—হিরণ্য বধিতে যে জন, নৃসিংহ রূপ ধরিলে ।

প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে শ্রীহরি, স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে

অন্তরা ।—হায় ! ত্রিপুরারি যার নাম জপে অবিশ্রাম দিবা রজনী ।

বীণাযন্ত্রে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি ॥

চিতেন ।—শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে ।

মিত্রভাবে যে জন কোরেছিল কোলে গুহক চণ্ডালে ॥

॥ ১১ ॥

মহড়া ।—রাই এসো তোমারে, রাজা করি নিধুবনেতে ;

বহুদিনের এই সাধো আছে মনেতে ॥

দোহাই রাধারো, বোলে শ্যাম নাগরো,

ফিরিবে নগরেতে ।

॥ ১২ ॥

মহড়া ।—পীরিতে সই, এমন্ বিবাগী হই,

ভাবি তারো মুখো নিরখিব না ।

এ মুখো তারে দেখাব না ॥

বিরহে প্রাণ্ গেল, তবু কথা কব না ।

পুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো,

তখনো সে মনো থাকে না ॥

চিতেন ।—সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে,

হইলো বিধিরো ঘটনা ।

অন্তরো সদা উদাসী,

দিবানিশি ঐ ভাবনা ॥

সখি হেন নাহি কেহ,
নিবারে এ দেহ,
কালী হোলো দেহ দেখ না।

॥ ১৩ ॥

মহড়া।—প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।
যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ্,
তারে লোকে প্রেমিক বলে॥
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পীরিতি
জীবনে মরে পীরিতি গেলে।
চিতেন।—প্রেমরসে যেই জনো হয়ো রসিকো।
নিরবধি ধরে সে যে মিলনো সুখো॥
স্বপনে না জানে কারে, বিচ্ছেদো বলে।
অন্তরা—প্রাণ্, সতীরো পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চিরদিনো সমভাবে যায়ো সুখেতে॥
চিতেন।—আশ্চর্য্য মিলনো হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদো কাহারো নাম, না শুনে কাণে॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে।

॥ ১৪ ॥

মহড়া।—সখি ঐ মনোচোরো মোরো,
মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণ্ সখি, ধরিব উহায়॥
আঁখিরো অন্তরো, হোতে অন্তরে লুকায়।
চিতেন।—চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন্।
নয়নে নিদালি, মোরো দিলেগো কেমন॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম,
কি হলো আমায়॥

মহড়া।—তুমি কার্ প্রাণ্, মম মনো হরিলে এসে।
মৃগনয়নি, নয়নো বাণে হানো অনায়াসে॥

জয় জয় জয়, কোরে কলরব,
বাঁধিলে ধনি প্রেমো ফাঁসে।

চিতেন।—তোমারে হেরিয়ে, আমারো মনেরো
তিমিরো বিনাশে।
স্বরূপে বল না, ও শশিবদনা
ছিলে কার্ হৃদয় বাসে॥

॥ ১৬ ॥

মহড়া।—প্রাণ, আমি তোমারি।
নিতান্ত জেনো সুন্দরি॥
তুমি যত কর অপমান্,
অঙ্গেতে ভূষণো করি।

চিতেন।

অন্তরা।—প্রাণ্, তুমি কাদম্বিনী, মনেতে মানি
আমি তো চাতকী।
অন্য মত মোরা, নাহিকো মনেতে,
বিচারিয়ে দেখ দেখি॥

চিতেন।—পিপাসাতে পীড়িতো হোয়ে, যদি ত্যজি
এ জীবন্।
তথাপি অন্য নীরো, না করি ভক্ষণ্।
উর্দ্ধ কণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদম্বিনি দেহ বারি

॥ ১৭ ॥

মহড়া।—প্রেয়সি, তোমার প্রেমধার্, আমি শুধিলে
কি তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি।
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো,
পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন।—মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,
লইলাম্ প্রেম করজো করি।
সে ধারে উদ্ধার হইবে কেমনে,
লাভে মূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি।

॥ ১৮ ॥

মহড়া ।—কমল কম্পিতো পবনে ।
অলি কাতরো প্রাণে ॥

চিতেন ।—এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত ।
এমনো কখনো নাহি হয় ব্রজাঘাত ।
অস্থির নলিনী প্রাণে সহে কেমনে ।

অন্তরা ।—হায়, যে দিকে নলিনী হেলে,
মধুকরো ধায় ।
পবনেতে বাদো সাধে,
বসিতে না পায় পায় ॥

চিতেন ।—হায়, গুণ্ গুণ্ স্বরে কাঁদে অলি, অধোবদনে ।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে ॥
অলিরো দুর্গতি দেখি, হাসে তপনে ॥

॥ ১৯ ॥

মহড়া ।—নয়নো সন্ধানে নয়ন মজালে ;
রূপে মন্ ভুলালে ।
তুমি প্রাণো যে আমায়
কিনিলে বিনিমূলে ॥

চিতেন ।—প্রাণ্ যে দশ ইন্দ্রিয়, মম শরীরে
তোমারে হেরে বিভোর্ ।
রসিকে রমণী তুমি রসের সাগর্ !
রস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে ।

মহড়া ।—"ফিরে ফিরে চায় ফিরে চায় ঐ শ্যামধন ।
পিয়ারী খানিক বই, বলবে কৃষ্ণ কই কই,
তখন কোথা যাব, কোথা পাব শ্যামের অন্বেষণ ।
অভিমানে রয়েছেন মানিনী রতন !
মানের অধীন হ'য়ে কোন দিন
কি ঘটিবে মানে, মান যাবে, প্রাণ যাবে, মাধব যাবে.

না মরিব দেখিব তখন।
পেয়ারী কেমন না হেরে কালবরণ ॥
চিতেন।—যা করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই,
কেন্দে কৃষ্ণ যায় ফিরে, চাইতে চাইতে রাধারে,
যখন যাই রাই যাই রাই মাধব বলে,
অমনি বয়ান ভাসে শ্যামের নয়নজলে।
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়
চলিতে না চলে চরণ ॥
অন্তরা।—রাধার একি মান সই গো, রাইকে মানা কর,
মানে মজে রাই, শ্যামের আর সে পিরীত নাই,
এখন মানের সঙ্গে পিরীত হল।
মানিনী কৃষ্ণ প্রতি, কোপে মজে হয়েছে অধীরা অতি,
এবে হয়ে রাধা মানগ্রস্ত
অমনি শ্যামের প্রতি হল খড়্গহস্ত।
পরচিতেন।—নিকুঞ্জেতে ললিতে সই বৃন্দের প্রতি কয়,
মানময়ীর মান হেরে হয়েছে হে বিস্ময়।
রাধার যুগল চরণ-কমল করে ধরি,
অমনি ধূলায় লুণ্ঠিত বংশীধারী,
তথাচ মান নাহি গেল
উথলিল দুর্জ্জয় মান-সরোবর।

॥ ২১ ॥

মহড়া।—মনো জলে মানো অনলে,
আমি জ্বলি তারো সনে ॥
এ পীরিতি মিলনে।
তুয়া দুখে আমি দুখী কি অদুখী, বিধুমুখি
ইহা বুঝ না কেনে।
চিতেন।—অভিমানো দূরে, না ত্যজিলে প্রাণো,
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ো লক্ষণো, হোতেছে এখনো,
দুই জনো পাছে মরি পরাণে ॥

অন্তরা।—হায়, কাননে অনলো লাগিলে যেমন্,
কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন্।
তোমারো পীরিতে দিবসো শর্ব্বরী,
ততোধিকো আমি হোতেছি দাহন্।
চিতেন।—ওলো এ দায়ে যে জনো, করে পলায়নো
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে।
আমি লো সুন্দরি, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমার ঐ মমতাগুণে॥

॥ ২২ ॥

মহড়া।—আমার মনো চাহে যারে,
তাহারো রূপো নিরখিতে ভালবাসি।
যেবা যার্' প্রাণো প্রেয়সী।
নয়নো চকোরো, পিয়ে সুধা যারো,
সেই জনো তারো, শারদ-শশী॥
চিতেন।—তব বিধুমুখো, হেরিয়ে আমার,
ঘুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি।
যে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখোসিন্ধু নীরে অমনি ভাসি।
অন্তরা।—হায়, কালো কলেবরো, দেখিতে ভ্রমরো
তাহে ষটপদো, কুৎসিতো অতি।
এ তিনো ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীরো মনো, তাহারো প্রতি॥
চিতেন।—কমলিনী মনে ভাবে নিরন্তরো,
নাহিকো সুন্দরো অলি সদৃশি।
দিবসেতে হেরে, সাধো নাহি পূরে,
মানসেতে হেরে, হইলে নিশি॥

॥ ২৩ ॥

মহড়া।—একা নহে প্যারী, তোমার শ্রীহরি, অনেকেরি তুমি জেনো।
জগত সংসারে তারো, সকলি যে আপনো॥
জগন্নাথো নাম, কোরেছেন্ ধারণো, হরি জগতেরো প্রাণ।

চিতেন।—যে ভকতি করে, সে পায় কৃষ্ণেরে, কৃষ্ণ ভক্তেরো অধীনে।
নিতান্ত তোমারো, প্রেম বশো হরি, ভেব না তুমি কখনো
অন্তরা।—নন্দালয়ে দেখ, নন্দ যশোদারো অতিশয় প্রেমবশো।
যমুনারো তীরে গোধন চারণো, আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশো।
চিতেন।—ভ্রাতৃভাবে দেখ, বলরাম সনে, হয়েছে প্রেমো ঘটনো।
শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম সনে, রাখাল ভাবে মিলনো॥

॥ ২৪ ॥

মহড়া।— আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই
লোকে দত্তহারী কবে সই॥
চিতেন।—ভাল বলে ভালবাসি যায়, প্রাণো সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হোলে তারে, মন্দ বলা যায়॥
এত তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যজ্য আমার।
সখ্যতা কোরেছি আগে কেমনে বিপক্ষ হই॥

॥ ২৫ ॥

মহড়া।—তুমি হে ব্রহ্ম সনাতন।
অপার মহিমা জনার্দ্দন।
শুনহে শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুরারি,
ধোরেছিলে গিরি গোবর্দ্ধন॥
চিতেন।—কতরূপে কত লীলে করেছ, ওহে দৈবকীনন্দন।
গোলোকো ত্যজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে
প্রকাশো করিলে বৃন্দাবনে॥
অন্তরা।—হায়, শিশুকালে শকটো ভঞ্জন কোরেছিলে শ্যামরায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদরো মাঝে, দেখাইলে যশোদায়॥
চিতেন।—আরো একদিনো, কুঞ্জকাননে, লোয়ে ব্রজগোপীগণ।
মহারাস কোরে, অন্তর্ধান হোয়ে, হোলে চতুর্ভুজ নারায়ণ॥
অন্তরা।—হায় কাঞ্চন হোলো কাষ্ঠের তরী, শুনেছি পুরাণেতে।
অহল্যা পাষাণী মানবী হোলো পদরেণু হইতে॥

চিতেন ।—দ্রৌপদীরে যখন্ বিবস্ত্রা করে
দুষ্টমতি দুঃশাসন ।
বস্ত্রধারী হোয়ে বস্ত্র দান দিয়ে,
করেছিলে লজ্জা নিবারণ ॥

অন্তরা ।—হায় শুনেছি তুমি পাণ্ডবসখা,
বনমালী কালিয়ে ।
রহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী,
প্রেমবশো হইয়ে ॥

চিতেন ।—হিরণ্যকশিপু করিলে বধ নৃসিংহ রূপোমোহন ।
প্রহ্লাদ ভক্তেরো কারণে দিলে
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন !

॥ ২৬ ॥

ঐ গীতের পাল্টা

মহড়া ।—তোমারি প্রেম কারণে
আমি অবতার ব্রজভবনে ॥
রাই বুঝিয়ে দেখ মনে ।
রাধা রাধা বলি, বাজায়ে মুরলী
গোচারণ করি বিপিনে ।

চিতেন ।—বংশীধারী কহে কিশোরি,
এত বিনয় কর কেনে,
রাধে বিনোদিনি, জানতো আপনি,
যত লীলা করি যেখানে ॥

অন্তরা ।—হায়, অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে, রামরূপে অবতার ।
জনক দুহিতা, তুমি হে সীতা, গৃহিনী ছিলে আমার ।

চিতেন ।—জটাধারী হোয়ে, তোমারে লোয়ে ভ্রমিলাম কাননে
বন্ধন করিয়ে সাগরবারি,
বধেছি লঙ্কার রাবণে ॥

অন্তরা ।—হায় দেখনা ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ আসিয়ে বৃন্দাবনে ।
প্রেমে কত জনা, করে আরাধনা
চাহিনে কারো পানে ॥

চিতেন।—নিকুঞ্জ কাননে করিয়ে মহারাস,
প্যারি তোমারি সনে।
পরশুরামরূপে নিক্ষত্রিয় করি জানে তিন্ ভুবনে

॥ ২৭ ॥

মহড়া।—ওহে নারায়ণো, আমারে কথনো
বোলো না জানকী হোতে।
সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে॥
দুর্জ্জয় রাবণো করিয়ে হরণো
রাখিলে অশোক বনেতে।
চিতেন।—কহিছে রুক্মিণী, ওহে চক্রপাণি
আসিছে পবনো সুতে।
রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো
আমি তো হব না সীতে॥

॥ ২৮ ॥

মহড়া।—ও যে কৃষ্ণচন্দ্ররায় হের না ও বয়ান।
রেখো সখি, দুটি আঁখি কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলো-মান॥
চিতেন।—নব ঘনশ্যাম রূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান
রাধার মনোমোহন্, মুরালী বয়ান।
মোজনা রূপসি, শশি দেখে রূপবান॥

॥ ২৯ ॥

মহড়া।—আমি তোমার মন্ বুঝিতে করেছি মান।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ॥
মনে তোমায় একবারো,
নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান॥
চিতেন।—তুমি বল প্রেয়সি, আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস, নাহি কোন দিন॥

প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ ॥[১]

॥ ৩০ ॥

মহড়া।—ঐ কালো রূপে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো বাঁকা না হোলে।
হরি তোমার আশ্চর্য্য লীলে ॥
যার কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায় করে আরাধন ॥
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য ধরিতে এই ব্রজমণ্ডলে ॥
চিতেন।—কত রূপে হোলে তুমি, কত অবতার
না জানি তোমার লীলা অতি চমৎকার ॥
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার।
করিলে হে মনো চুরি যত অবলার ॥
মোহন বাঁশীর গানে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা মজালে ॥

॥ ৩১ ॥

মহড়া।—মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে ॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব হৃদয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ॥
মনেরো তিমিরো যাবে মনো-মিলনে।
চিতেন।—সাজগো সাজগো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকোলতা, আর ললিতে ॥
রঙ্গদেবী, সুদেবী গো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ॥
রাধা বলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥

॥ ৩২ ॥

মহড়া—পিরীতের কি ধারো ধারো তুমি,
সেতো নবীনা নারীরো কাজ নয়।

১ নবাই ঠাকুরের প্রণীত—প্রাচীন কবিগান সংগ্রহ

কখন রাজা, কখনো প্রজা,
কখনো বা যোগী হতে হয় ॥
সখি, আঁখি-মনো-প্রাণো, সদা সাবধান,
ধ্যানো শবসাধনেরো প্রায় ॥

চিতেন ।—আগে মাথায় করিয়ে কলঙ্কের ডালি,
কুলো জলাঞ্জলি দিতে হয় ।
মান-অপমানো,
সইরে নাহি থাকে কুলো লাজোভয় ॥
দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন,
দাহন করয়ে নিজ কায় ॥

অন্তরা ।—সখি, পিরীতেরো অনন্ত আকার,
অন্ত নাহি তার, অন্তরে থাকে ।

চিতেন ।—আগে অতি অন্তরঙ্গতা জানাবে তোমারে,
অথচ অন্তরে তাহা নয় ॥
অপরূপ অসম্ভব অবিরত হইবে উদয়,
সখি আঁখির নিমিখে, কতো বিভীষিকে
সুখে দুখে হাসায় কাঁদায় ॥

॥ ৬৩ ॥

মহড়া ।—আমি তো সজনি জানি এই,
যে ভালোবাসে ভালবাসি তায় ।
পরেরি সনে কোরে প্রণয়
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয় ॥

[চিতেন ।—প্রেয়সির দুখে যে নহে দুখী,
আপন সুখে সুখী সদায় ।
তবু তার মুখ না হেরিলে সখি,
আঁখি জলে আঁখি ভেসে যায় ॥][1]

অন্তরা ।—আমারে যে জন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতে সই ।

---

[1] প্রীঃ গীঃতে এ অংশ নাই ।

আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,
বিনামূলে দাসী হই ॥

চিতেন ।—কিঞ্চিৎ চাতুরী যাহার হেরি, মনেতে বিবেক উপজয় ॥

॥ ৩৪ ॥

মহড়া ।—কমলিনী নিকুঞ্জে কি কর,
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো ।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো,
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ, নন্দের ভেরী বাজিলো ॥

চিতেন ।—সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো ।
[১]মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে, অক্রুর আইলো ॥[১]

অন্তরা ।—যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে
সে শ্যামসুন্দর মথুরা নগরে যাবে নিশি প্রভাতে ॥

চিতেন ।—সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী, ত্যজে গোকুলো ।
নিধুবনে রাধা রাধা বোলে কে বাঁশী বাজাবে বলো ।

॥ ৩৫ ॥

মাথুর

মহড়া ।—গমনো সময়েতে
কেন কেঁদে গেল মুরারি,
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী ।
জনমেরো মত রাধারে কাঁদালে সই,
বুঝি ব্রজে আসিবে না হরি ॥

চিতেন ।—হরি কি আসিবে ব্রজে আর্
মনে সন্দেহ্ করি ।
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি,
পুনো আসিতো বংশিধারী ॥

অন্তরা ।—হায় দুটি করে ধরি, যখনো আমায়,
যাই যাই বঁধু কয় ।

১-১ পাঠান্তর—"কংসেরো প্রেরিতে, অক্রুর খুড়া রথে, রামকৃষ্ণ হোরে লইলো" ॥

তখনো শ্যামেরো কমলো বদনো,
নয়নজলে ভেসে যায় ॥
চিতেন ।—এতই মমতা শ্যামেরো, যাইতে মধুপুরী ।
সজলো নয়নে, উঠিলেনো রথে, বিধুমুখো মলিনো করি

॥ ৩৬ ॥

মহড়া ।—আমার কুচ্ছ হোলে কি লজ্জা সে পাবে না ।
একি পতির ব্যাভার সই,
ভেবেছ তাহার্ আমি কেউ নই,
মিছে ফুলে বদ্ধি কোরে, সে গেল আমারে,
আমি তার পেলেম্ না ॥
চিতেন ।—প্রবাসেতে গিয়ে
পুরুষের্ রাজ্য লাভ যদি হয় ।
সে সবো সম্পদো তেজিয়ে,
আসে বসন্ত সময় ॥
আমি তাই ভাবি প্রাণ্ সখি ।
সে এমন্ ইন্দ্রত্ব পেয়েছে কি ॥
বিরহ দাহনে, মদনেরো বাণে,
মনো কি চঞ্চলো হয় না ॥

॥ ৩৭ ॥

মহড়া ।—কেন সজনি, মোরো মরণো নাহিক হয় ।
সুখোকালে সুখো ধাতু,
দুখো দেয় অতিশয় ।
তথাচ এ পাপ প্রাণো,
কি সুখে এ দেহে রয় ॥
চিতেন ।—যারো অনুগত প্রাণো,
সে গেল, ত্যজে আমায় ।
তারো সাথে, সেই পথে,
প্রাণ কেন নাহি যায় ॥

অন্তরা ।—মরিলে এ দেহ সখি, জ্বলে চিতা আগুনে ।
দুখো বোধো নাহি হয়ো, শব অঙ্গ দহনে ॥
চিতেন ।—সজীব শরীরো এ যে বিরহ অনলে দয় ।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয় ॥

॥ ৩৮ ॥

মহড়া ।—পুরুষো নিদয়ো সজনি কি জান না ।
সমাদরে রাখে না ।
আমি যারে ভাবি আপনো,
সে আমারে ভাবে না ॥
চিতেন ।—যে দুখো যুবতী জনার, সখি
তাহা জ্ঞাত নয় ।
জানিতো যগ্যপি আসিতো নিশ্চয় ॥
ধনলোভে আছে ভুলে,
প্রিয়ে বোলে তোষে না ॥
অন্তরা ।—আপনি রামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ ।
উদ্ধারিয়ে সীতে অনলে করে দাহন্ ॥
চিতেন ।—অযোধ্যা নগরে গিয়ে,
রাজা হলেন শেযেতে ।
বনবাসে দিলেন পুনো সে সীতে ॥
নারীর পঞ্চমাস গর্ভ কালে
কিছু দয়া হোলো না ।
অন্তরা ।—নল নরপতি তার্,
দময়ন্তী ভার্য্যা লোয়ে ।
প্রবেশিল বনে, দুইজনে একত্র হোয়ে ॥
চিতেন ।—অর্দ্ধেকো বসনো পোরে, নিদ্রাগত যুবতী ।
বসনো ছিঁড়িয়ে যায় নৃপতি ॥
কাননেতে, রেখে যেতে,
তিলেকো ভাবিল না ॥

॥ ৩৯ ॥

মহড়া।—সখি, এই বুঝি সেই রাধার্ মনোচোর,
নটবর, বংশীধারী।
ত্যজে সেই বৃন্দাবন্, শ্যাম এলেন্ এখন্ মধুপুরী
আমা সবা পানে, কটাক্ষে চেয়ে,
কোরে নিলে চিতো চুরি॥

চিতেন।—মথুরা-নাগরী, কহিছে সবে,
কৃষ্ণের লাবণ্য হেরি।
অক্রূরো সহিতে, কে এলো হে রথে,
কালো রূপে আলো করি॥

অন্তরা।—শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম্ সই,
দেখিলাম আজ্ নয়নে।
আঁখি-মনেরো বিবাদো আমার্,
ঘুচে গেল এতদিনে॥

চিতেন।—এত গুণোরূপো না হোলে সখি,
গুণময়ো হয় কি হরি।
এমনো মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি॥

॥ ৪০ ॥

মহড়া।—ব্রজে মাধবো এলো না।
কি হবে বল না॥
কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,
প্রাণ্ থাকিতে মিলনো হোলো না।

চিতেন।—হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে মিছে
মিছে করি দিন্ গণনা।
এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত, বসন্ত
বসন্ত উদয়ো দেখ না॥

অন্তরা।—আঁখি জলে, তরুমূলে,
সিঞ্চিলাম হায় ব্রজাঙ্গনা।

চিরো দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো,
আশাতরু তো ফলিলো না ॥

॥ ৪১ ॥

মহড়া।—কাল্ নিশিতে দেখিছি স্বপনে।
বুঝি প্রাণনাথ এসেছেন শ্রীবৃন্দাবনে ॥
চিতেন।—নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্যগত,
চৈতন্য ছিল না প্রায়।[১]
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে
জাগালে বঁধু আমায় ॥
মৃদু মৃদু হাসে, বসি বামপাশে,
ধন্য শ্রীঅঙ্গ আলাপনে।

॥ ৪২ ॥

মহড়া।—ধিক, ধিক্, ধিক্ আমারে ললিতেগো,
ধন্য কুবুজায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায় ॥
হেন গুণসিন্ধু হরি,
কি গুণে ভুলালে তায়।
চিতেন।—এতদিন অবধি আমরা কোরে আরাধন।
হইলাম বঞ্চিতো সে হরির চরণ ॥
গৃহে বোসে অনায়াসে,
অতুল চরণো পায় ॥

॥ ৪৩ ॥

বিরহ

মহড়া।—ব্রজে কি সুখে রোয়েছে,
কি দশা ঘটেছে।
সে শ্যামসুন্দরো বিহনে দেখ না ওগো রাই,
বনের পশু পক্ষি আদি ঝুরিছে ॥

---

১ ইহাতে—'চৈতন্য ছিল না প্রায়'—স্বপ্নাবস্থার যথার্থ লক্ষণ বর্ণনা। সঃ প্রঃ

চিতেন।—হায় সহজে শ্রীমতী
তোমার কোমল অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো,
পাষাণো বিদারো হতেছে॥

অন্তরা।—হায়! ভ্রমরার্ দশা দেখ,
এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধূলায়ে ধূসরো, হোয়ে কলেবরো ভূমেতে
ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥

চিতেন।—হায় সখি কোকিলেরা না করে গানো,
অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহেতে দেখ না প্যারী,
খেদে কুহুরা ভুলেছে॥

॥ ৪৪ ॥

মহড়া।—কোকিল রে, কিছু দয়া ধর্ম্ম নাই তোমার শরীরে।
হয়ে মদনের অনুচর, রাধায় জালাবে নিরন্তর,
তবে স্ত্রীহত্যার ভাগী কর্‌বো তোমারে;
দেখবে ব্রজনগরে॥
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মজে ত্রিজগৎ মাঝে কালাকলঙ্কী হল নাম,
আবার কাল তমাল ডালে ঐ কাল কোকিল,
বসন্ত কালে জালায় আমারে॥

চিতেন।—নিষেধ করিলে তোমায় না শুন কথা,
দেখি তোমার রীত একি বিপরীত,
দেহ বারে বারে অন্তরে ব্যথা;
যদি তোমার রব শুনে মরিবে পরাগ্রে
তবে তোর গতি হবে কি;
বিহঙ্গ তুই কাননের পাখী;
তুমি না চেন আত্মপর হানতেছ পঞ্চশর,
দুঃখিনী কমলিনীর হৃদপিঞ্জরে॥

অন্তরা।—ওরে কোকিল রাখরে কমলিনীর মিনতি,
কৃষ্ণপ্রেমের অনল জ্বলে আবার তায় দিতেছরে আহুতি,

রাধার হয়ে মধুপুরে যেতে ত পাল্লে না
এই শ্রীমতির হ'ল কি দুর্গতি।
মনের খেদে প্রাণে বাঁচিনে,
যদি আছ হে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণবিহনে,
প্রাণেতে মরি, তবু অন্তে পাব শ্রীহরি।
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ
জ্বালালে রাধার প্রাণ
একাকী পেয়ে কুঞ্জ-কুটীরে ॥

॥ ৪৫ ॥

মহড়া।—তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাক একবার।
শুনরে কোকিলে, শুন শুন, বলি শুন,
বলি, শুন মিনতি আমার ॥
হরি হারা হোয়ে আছো মৌন বসিয়ে,
মধুর রবো শুনি যে আর ॥
চিতেন।—এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরব রোয়েছ কেন, ওরে কোকিলো ॥
হরি গুণো গানো পিক কররে এখন,
শুনে প্রাণো জুড়াক শ্রীরাধার ॥

॥ ৪৬ ॥

মহড়া।—তোমা বিনে গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার ॥
ওহে ব্রজহরি, মরে রাধা প্যারী
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার ॥
চিতেন।—দীনবন্ধু, দুখোভঞ্জনো
অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলে হে, হেন নিদারুণো ॥
কুলাইতে পারো, ব্রহ্মাণ্ডের ভারো
রাধার ভার কি হোলো এত ভার্ ॥

॥ ৪৭ ॥

মহড়া।—কোথায় যুবতীর যৌবন
তোমা বিনে নারীর মান গেলো।
নবীন কালে দেহে ছিলে
প্রবীণ কালে কোথা গেলে
তোমায় হোয়ে হারা
হয়েছি কাতরা
আপন্ বঁধু এখন্ পরের হোলো ॥

চিতেন।—নবীন বয়সে, রঙ্গরসে
দিনে দেখা হতো শতবার।
নীরস নলিনী বোলে এখন্ ভ্রমর
চায় না ফিরে একবার ॥
আগে প্রাণ হোলো
তার্ পরে হোলো যৌবন ঘটনা।
বিধাতার এ কি বিবেচনা!
যৌবন্ গেল প্রাণ তো গেল না ॥
আমি কি ছিলাম, কি হলেম্
আর বা কি হই, অনুতাপে তনু শুখালো ॥[১]

॥ ৪৮ ॥

বৃন্দাবন লীলা

মহড়া।—যেতে বলো মুরারি বৃন্দাবন।
শ্যাম্, তোমার ব্রজবালকগণ ॥
তোমারে না দেখে, অস্থির ক্ষণেকে,
ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন।

চিতেন।—কহিছে দৈবকী প্রিয়বচনে,
শুনরে প্রাণ গোপাল্।
শুনেছি বৃন্দাবনে, তব সব রাখাল্ ॥

---

১ 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গানে' রাসু-নৃসিংহের নামে 'রসভাণ্ডার' 'বাঙালীর গান' ও 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে' রাম বসুর নামে ও 'গুপ্তরত্নোদ্ধার', 'রামবসু হরুঠাকুর প্রভৃতির গীত সংগ্রহ' গ্রন্থে নিত্যানন্দের নামে এই পদটী চলিয়া আসিতেছে।

হায় কৃষ্ণ বলিয়ে, ভূতলে পড়িয়ে
সকলে করে রোদন ॥
অন্তরা ।—সে ব্রজনগরে, নন্দেরো ঘরে
কাতরা নন্দরাণী।
নবনী করে, ডাকে উচ্চস্বরে,
কোথারে নীলমণি ॥
চিতেন ।—ঘরে ঘরে ফেরে, তোমার তরে,
কথনো গোষ্ঠতে ধায় ।
ভ্রমিতে পথে পথে, ডাকিছে কৃষ্ণ আয় ॥
শিরে করাঘাত করে, যমুনার নীরে
ত্যজিতে যায় জীবন ।

॥ ৪৯ ॥

মহড়া ।—হরি ব্রহ্মাণ্ড দেখালে বদনে,
কৃষ্ণ কি-গো জানে ।
বালকো হোয়ে গোকুলে, মৃত্তিকা ভোজন ছলে,
মায়া করে মায়েরো সনে ॥
চিতেন ।—যশোদা কহিছে ওগো রোহিণি,
কেমন বালকো কৃষ্ণ, কিছুই জানি না
শকট-ভঞ্জন সে দিনো করিলে চরণে ॥

॥ ৫০ ॥

মাথুর

মহড়া ।—ওহে কৃষ্ণ, রাই কেন কৃষ্ণবর্ণ ব্রজে হলো ।
কুব্জা কুৎসিতা নারী, হলো সুন্দরী,
হেমাঙ্গিনী রাধার শ্রীঅঙ্গ কালো ॥
চিতেন ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী,
বিনয় বাক্যেতে কয় ।
কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ
শুন দয়াময় ॥

রাধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল শ্যাম।
সেই রূপে প্রাণ সঁপে
তোমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম।
গমনো কালেতে, কংসেরো রাজ্যেতে,
রাহু যেন আসি শশী ঘেরিলো।
অন্তরা।—তাই জানতে এসেছি, বলতে এসেছি,
বল্‌-তে হবে তোমারে।
কিসে এমন হলো, কি সে সেরূপ গেল
শ্যাম, হায় হায় কি কালো দংশিলো রাধারে
চিতেন।—যেদিন হইতে মথুরাতে করিলে পদার্পণ।
সেই হইতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন॥
তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হলো।
কুলে কালি, মানে কালি,
ছিল রূপ তাও কালি হলো॥
সে যে ত্যজে তাম্বুল বেণী, ওহে চিন্তামণি,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিশালো॥

॥ ৫১ ॥

মহড়া।—বঁধু কও দেখি কোন্ ভাবেতে
ত্যজে মধুপুর,
আইল অক্রূর, শ্রীবৃন্দাবনেতে
চিতেন।—বৃন্দে বলে কালাচাঁদ হে, করি নিবেদন।
কখনো দেখিনে বঁধু হে অক্রূরের আগমন॥
বামা জাতি গোপরমণী,
পলকেতে প্রমাদ গণি,
নিরানন্দ দেখি কেন নন্দের আলয়েতে॥

॥ ৫২ ॥

মহড়া।—রাধারো বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি, তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ্‌ ধরেছ হে মথুরায়॥

রাখালেরো বেশ লুকায়েছ বঁধু,
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়।
চিতেন।—এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন্ কিশোরী, ওহে বংশীধারি,
প্রতারণা কোরো না আমায়॥
অন্তরা।—এত যে মুরারি, জামা জোড়া পরি,
বার্ দিলে গঞ্জ পরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো শ্যামো
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে॥

॥ ৫৩ ॥

মহড়া।—যদি বৃন্দাবনে এসেছেন্ হরি।
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরি॥
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরী।
কেন গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা, বাজাইছে বাঁশরী॥
চিতেন।—বিধাতা সাজালেন্ শ্যামে অতি চমৎকার্।
বারো একো সাধো ছিলো, শ্রীমতী রাধার॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী॥
অন্তরা।—হায়! কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হইলো, বঁধুরে পাইয়ে॥
চিতেন।—কোকিলো পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্।
কমলে বসিয়ে অলি, করে মধুপান্।
আনন্দে মগনা হোয়ে, নৃত্য করে ময়ূরী॥

ভবানীচরণ বণিক

॥ ১ ॥

কলঙ্কভঞ্জন

মহড়া ।—ভাল ভাল হে শ্যাম,
কালা-কলঙ্কী নাম
থাক আমার ব্রজপুরে ।
আমার কাজ কি আর সতী নামে,
মন যেন তোমার প্রেমে
সদাই রয় হে ।
বলে বলবে কলঙ্কিনী হে ।
ছলের জল নিতে এসে
না পারি কর্ম্মদোষে,
তবে কালামুখ দেখাব শেষে
কেমন করে ॥
খাদ ।—প্রেমে না মজিলে কলঙ্কিনী হ'লে
পায় না তোমারে ॥
ফুঁকা ।—আমি প্রেমসাগরে ডুবেছি
কাল ভালবেসেছি
সুখে আছি গোকুলে গোপকুলে ।
কেবল জ্বালায় কুটিলে ॥
তাই ব'লে কি কৃষ্ণনিধি,
সৃজিলে চিন্তাজ্বর-ব্যাধি,
আনতে মহাজন ঔষধি
ছিদ্রঘট দিলে ॥
মেলতা ।—তোমার এই কি হে উচিত হয়,
অসাধ্য দায়, কি দায় ঘটালে ॥
হয়ে কলঙ্কী সতী হই কেমন করে ॥
১ চিতেন ।—কলঙ্ক ঘুচাবে শ্যাম বলে আমায় ।

পাড়ন।—তোমার দৈব কথা, পেলেম মনে ব্যথা।
ফঁুকা।—তোমার এ কষ্ট তা দাসীর প্রেমের দায়॥
আমার কলঙ্কিনী নাম ঘুচাবে,
সতীত্ব সব জানাবে,
দেখাবে এই নন্দালয়।
শ্যামরায় মনে মনে সন্দ হয়॥
ব্রজে যারা সতী আছে,
তাদের গৌরব ভেঙ্গে গেছে,
আমার গৌরব রাখিতে পাছে
তোমারও গৌরব যায়॥
মেলতা।—আছে সকল অঙ্গে আমার।
কলঙ্কের অলঙ্কার, কালাচাঁদ হে।
আমি ডুবেছি প্রেম-কলঙ্কের সাগরে॥
অন্তরা।—প্রেম-কলঙ্কিনী হ'লে কি শ্যাম পাওয়া যায়।
সতী নারী হয়ে হরি, ধ্যান করে কেউ পায় না তোমায়।
তার সাক্ষী গোলকধামে,
ছিল একজন নারী বিরজা নামে,
উন্মাদিনী তোমার প্রেমে
হলো জলসই তার ভাগ্যক্রমে।
শুন তার প্রমাণ বলি
একদিন চন্দ্রাবলী,
প্রেম কলঙ্কের ডালি
নিলে মাথায়॥
২ চিতেন।—কলঙ্ক হলো বলে পেলেম তোমায়
পাড়ন।—যুগযুগেতে শ্যাম
কৃষ্ণ-কলঙ্কী নাম।
যেন বলয়ে শ্যাম
আমায় জগৎময়॥
ফঁুকা।—যদি শুক্ল বস্ত্র কালি হয়,
উত্তম শোভা দেখা যায়

শুনিতে কেমন চমৎকার
আর এক প্রমাণ আছে তার
প্রেমের দায় গগনচাঁদে
কলঙ্কের দাগ পদে পদে
পরেছি তাই মালা সাধে
শ্যাম-কলঙ্কের হার ॥

মেলতা।—এ দাগ জন্মে আর মিটবে না,
ঘুচালে ঘুচিবে না
কালাচাঁদ হে।
যেন কলঙ্ক হয় জন্ম জন্মান্তরে[১] ॥

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

মানিনি শ্যামচাঁদে রাধে কি অপরাধে।
কে বল গো শুনি এ বাদ সাধে ॥
ঠেকিলাম আজ এ কি প্রমাদে!
ম্লান শশিমুখী কেন লো রাই,
হেরি গো আজ এত আহ্লাদে ॥
এই দেখে এলাম,
শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্যকৌতুকে,
ছিলে গো রাই অতি পুলকে।
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদের অনল
উঠিল কি বাদানুবাদে ॥[২]

॥ ৩ ॥

মহড়া।—সখি একি হল দায়।
শ্যাম বুঝি নিতি-নিতি এসে ফিরে যায়।

চিতেন।—নিশিতে ঘুমায়ে থাকি হয়ে অচেতন,
কোথা হতে শ্যাম আসি দেয় দরশন।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

২ বাঃ গাঃ হইতে সংগৃহীত

অলস ঘুমের ঘোরে ধরিতে না পারি তারে
আমারে পাগল ক'রে চকিতে পলায় ॥
অন্তরা।—কভু মোর কাছে আসে, কভু দূর হ'তে হাসে,
কভু রাধা-রাধা বলে বাঁশরী বাজায়।
বাঁশী শুনে প্রাণ মোর ছাড়ি দেহ তারি পিছু ধায় ॥
চিতেন।—যদি সখি রাগ-ভরে শুয়ে থাকি মান-ভরে,
তখনি সে দুই করে ধরে মোর পায়।
ছি ছি সখি লাজে মরি কথা না জুয়ায় ॥
সারানিশি এইরূপে কেটে যায় চুপে চুপে,
প্রভাত না হ'তে সে যে অমনি পালায়।
কেঁদে মরি হায় সখি, পাগলিনী-প্রায় ॥[১]

॥ ৪ ॥

বিরহ

মহড়া।—শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি।
লুকালে কি প্রাণহরি ও প্রাণহরি ॥
এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি ;
হরি ভয় কি মনে করি, মরি ব'লে হরি হরি ॥
চিতেন।—হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস।
বনমালী, বনকেলি, করিলে নিরাশ ॥
না জানি কি অপরাধে,
ত্যজিলে দুঃখিনী রাধে।
সাধে বাধে সুখে-সাধে,
গেল হে বিষাদিত করি ॥[২]

॥ ৫ ॥

মহড়া।—একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাক্ রে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ,
জুড়াবে গোপীগণে
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ডালে ॥

---

১ গঃ বঃ পঃ ২ সাঃ গাঃ

জুড়াবে প্রাণ গোকুলবাসী গোপীসকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর
রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণ প্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে ॥

চিতেন।—বসন্ত সময় ব্রজে হল না বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যে, কৃষ্ণপদ পক্কে,
অঙ্গ ফেলে আছে রাই ;
জুড়ায় কমলিনীর জীবন।
ব্যথার ব্যথী এমন কে,—
ওরে পক্ষ, হও স্বপক্ষ, দুখিনী বলে ॥

অন্তরা।—আমরা দুখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণবিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বনে ত্রিভঙ্গ, অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর,
শোনরে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে ॥[১]

॥ ৬ ॥

মাথুর

মহড়া।—শুন ওলো রাই নিবেদি তোমায়।
যেইখানে কৃষ্ণ রয়, সেইখানে সুখোদয়
সুখ বুঝি কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যায় ॥

চিতান।—যতদিন ছিলেন কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে
কতই সুখেতে ছিল ব্রজবাসিগণে,
কোকিল গাহিত, ময়ূরে নাচিত,
ব্রজনারী যত আনন্দে ভাসিত,
মধুর বাজিত বাঁশরী নিশায় ॥

---

১ বাঃ ভাঃ লেঃ, বাঃ গাঃ

অন্তরা।—যবে হ'তে শ্যাম গেছে মথুরায়,
কেবা সুখে বল আছে গো হেথায়।
এক কৃষ্ণ বিনে সকলি আঁধার,
যেদিকে ফিরাই আঁখি সব শূন্যাকার;
ব্রজনারীগণ ছুটে পাগলের প্রায়॥
চিতান।—বন উপবনে, গোষ্ঠ নিধুবনে
তন্ন তন্ন করি খুঁজে কৃষ্ণধনে
কোথাও না পেয়ে কৃষ্ণ, মনে বড় পেয়ে কষ্ট
প্রাণ ত্যজিবারে ধায় ওই যমুনায়॥[১]

॥ ৭ ॥

মহড়া।—আর দেখে এনু কৃষ্ণ এবে আছেন মথুরায়।
কি আনন্দ সেথা বলা নাহি যায়॥
প্রাসাদে কুটিরে পথে কিম্বা বনমাঝে
কৃষ্ণ পেয়ে তুষ্ট হোয়ে সবে আনন্দেতে নাচে।
চিতেন।—আর যেই কৃষ্ণ হেথা চরাত গোপাল,
কংস বধে মথুরায় হয়েছে ভূপাল।
কুব্‌জা নামে ছিল যেবা কংস রাজার দাসী,
এবে তিনি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণরাজমহিষী।
কি বলিব ওলো রাই; সেথা দাসীর দাসীত্ব নাই,
দাসী হল রাজরাণী দেখে হাসি পায়॥[২]

॥ ৮ ॥

মহড়া।—আর তুইলো প্যারি রাজকুমারি
কুলের মাথা খেয়ে
তুবেছিলি সেই শ্যামে মন প্রাণ দিয়ে।
তাই তোরে ছেড়ে সেই কৃষ্ণ,
কুব্‌জা নিয়ে হয়ে তুষ্ট,
মনের সুখে এখন কৃষ্ণ আছেন মথুরায়
ছি ছি প্যারি কাঁদিস্ নাকো পড়িয়ে ধরায়॥

১ গঃ বঃ পঃ ২ গঃ বঃ পঃ

অন্তরা।—তোমার কথায় বড়ই আশায়
গেছলাম কৃষ্ণে দেখিতে,
বৃথা হল সকল কষ্ট তোমার কৃষ্ণ
পারল নাক চিনিতে।
বলে কে সে রাই মনে নাই
কাজ কি আর সে কথায়?
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
ফিরে এনু নিরাশায়॥

চিতেন।—তাই বলি ওলো রাই, তার কথায় আর কাজ নাই,
শঠ-শিরোমণি সেই নহেক প্রেমিক,
তার কথা ভালবাসা সকলি অলীক,
আমরা অবলা বালা কি করিব তায়,
"উঠে আয় ওলো রাই, উঠে আয় আয় আয়॥"[১]

॥ ৯ ॥

মাথুর

সখি, কও শুনি সমাচার।
আসিবেন সে হরি পুনঃ কি ব্রজে আর॥
হবে কি আমার হেন কপাল আবার!
মথুরা নগরে মাধবের দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার॥
না হেরে নবীন জলধররূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান।
দিবানিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান॥
জীবন-যৌবন ধনপ্রাণ হরি বিনে সকলি আঁধার!
হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি মধুপুর সুখবিলাসী
স্বরূপ কহ না সেখানে রাজার কোন মহিষী।
ব্রজের চূড়া-ধড়া নাকি ত্যজেছেন শ্যামরায়।
কুব্জা নাকি বামে শোভা পায়।
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি
কি দিলেন উত্তর তার॥[২]

---

১ গঃ বঃ পঃ ২ গঃ সঃ পঃ

॥ ১০ ॥

বোঝা গেল না হরি, তোমার কেমন করুণা
জানা গেল নাহি নারীবধের ভাবনা।
ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনো-বাসনা।
সকলি বিস্মৃত, ব্রজনাথ, হোলে কি এককালে
তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
ভেবে দেখ হে গোকুলে, করিলে কি লীলে,
তা কি তোমার পড়ে না মনে।
শ্যাম, নন্দ, উপানন্দ, সুনন্দ,
আরো রাণী যশোমতী।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ
বোলে লুটায় ক্ষিতি ॥
আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজেরো সমাচার।
কি কব মাধব গো অতি চমৎকার।
ব্রজ-গোপিকা সকলের নয়নের জলে,
কেবল প্রবল হেরি যমুনা ॥[১]

রাম বসু

॥ ১ ॥

আগমনী

গত নিশিযোগে আমি হে দেখিছি সুস্বপন
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই,
মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে !

১ গঃ বঃ পঃ

অমনি দু'বাহু পসারি
উমা কোলে করি
আনন্দেতে যেন আমি নই।
ওহে গিরি গা তোল হে,
উমা এলেন হিমালয়।
জয় দুর্গা দুর্গা বলে
দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়॥
কন্যা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।
আঁচল ধ'রে তারা বলে, বলেছি মা কি মা,
মা গো, ও মা বাপের কি এমন ধারা!
গিরি তুমি যে অগতি
বুঝে না পার্ব্বতী
প্রসূতির অখ্যাতি জগৎময়॥
মা হওয়ার যত জ্বালা
যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে
তিলেক না হারিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে।
তোমাকে কেউ কিছু বল্‌বে না
দেখে দারুণ পাষাণ,
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ।
তোমার ত নাই স্নেহ,
একবার ধর কোলে কর
পবিত্র হ'ক পাষাণ দেহ।
আহা এত সাধের মেয়ে,
আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখেন না মৃত্যুঞ্জয়॥

॥ ২ ॥

মহড়া।—গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।

শিব কে পূজিবে বিল্বদলে, সচন্দন গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অম্নি সদয় হবেন সদানন্দ আস্‌তে দিবেন হারা তারাধন।
এলো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী
ভগবতী এলো মস্তকে কোরে॥

খাদ।—জামাই যদি আসেন এনো সমাদর কোরে।

ফুঁকা।—শুনি পুরাণ চণ্ডীতে,
পূর্ব্ব জন্মেতে উমা ছিল দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব নিন্দা শুনে,
সেই অভিমানে, প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে!

মেলতা।—আমি সেইটে করি ভয়,
ঝি, জামাই আনতে হয়,
এলো কৈলাসবাসিনী সব নিমন্ত্রণ কোরে!

১ চিতেন।—নিশি সুপ্রভাতে,
শুভষষ্ঠীতে, শুভক্ষণ সময়।

ফুঁকা।—কোরে সঙ্কল্পনা, ষষ্ঠীর কল্পনা,
কল্পনা করলেন হিমালয়।
বলে পাষাণ কে রাণী, সবিনয় বাণী,
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে,
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন,
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে॥

মেলতা।—আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে॥

অন্তরা।—কোরবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডীগণ পোড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী, চণ্ডীর ফলে।
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মঙ্গল-চণ্ডী সুমঙ্গলে॥

২ চিতেন।—কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে,
যুগান্ত সকলে, দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে ॥

ফুঁকা।—শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্য তারা
দুঃখ-পসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তরে জীব,
ভবতারিণী ভবানী ॥

মেলতা।—আমার এমন ঝি-জামাই,
জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি,
আমার মানস অন্তরে ॥[১]

॥ ৩ ॥

মহড়া।—গিরি হে তুমি আন্‌তে আমার গৌরীমাকে
বিলম্ব আর কোরো না।
আমি ষষ্ঠীকল্প কোরে,
বোসে আছি শূন্য ঘরে,
বাঁচি কি সুখে কেবল ভাসি নয়ন জলে,
দুর্গা আমার এলে তবে পূরণ হবে মনের বাসনা

খাদ।—উমা বিনে আমার মন ধৈর্য্য মানে না।

ফুঁকা।—সে যে সামান্যা নয় আমার মেয়ে,
তিনি থাকেন শিবালয়ে জান তা হে গিরি।
ব্রহ্মা সদাই ভাবে মনে,
সাধন করে যোগীগণে,
সে ধন আসবে কতক্ষণে রয়েছি অধৈর্য্য লোয়ে।

মেলতা।—তুমি ভক্তি ভাবেতে যদি ভাব মনেতে,
তবে সিদ্ধ হবে তোমার সকল সাধনা॥

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

১ চিতেন।—হতে ষষ্ঠী গত হিমালয়ে
সকল দেখি শূন্যময়।
দুর্গা বিহনে আর আনন্দ নাই
খেদে রাণী গিরিরাজে কয়।
ফুঁকা।—আমি দিবানিশি ভেবে মরি,
আমার কোথায় প্রাণকুমারী,
বল হে ওহে গিরি
তারাধন হারা হয়ে,
আছি পথ নিরখিয়ে,
এত দিনে হিমালয়ে,
কৈ এলো আমার শঙ্করী॥
মেলতা।—উমা জগৎ মান্য হয়
শিবের ঘরে সুখে রয়,
বুঝি পাষাণীকে মায়ের মনে পড়ে না।
অন্তরা।—প্রাণ যায় উমার জন্যে,
কন্যে মায়ের প্রাণ তা কি জানে!
অন্যের সাধনেরই ধন, সে যে পরম ধন,
জগৎ মাঝে সবাই করে মান্যে।
২ চিতেন।—দেখ দুর্গা বিনে গিরি
ভবনে মনের সুখে কেহ নাই।
আন্‌তে সেই ধনে হে,
সযতনে তোমায় এক্ষণে যেতে বলি তাই।
ফুঁকা।—আমায় বিধি করলে অচল নারী,
মাকে দেখতে যেতে নারি, এ দেহে ওহে গিরি,
পাষাণ কুলে জন্ম লয়ে
আমার ভাগ্যে পাষাণ হয়ে,
ভুলে আছেন শিবালয়ে আমার সেই প্রাণের ঈশ্বরী॥
মেলতা।—তুমি যাত্রা কালেতে দুর্গা বল মুখেতে,
গিরি দুর্গা এলে তোমার দুঃখ থাকবে না॥[১]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

॥ ৪ ॥

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই ॥
শিব এসে বলে মা,
শিবের সে দিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বলে,
বিবাহের কালে
সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের সব
অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডার তার।
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় নাক মেয়ে
আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই ॥
ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা এই
এলো সঙ্গে শিব পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে
ওহে গিরিরাজ
গঞ্জনা দূরে গেল।
"আমার মা কৈ মা কৈ"
বোলে উমা ঐ
ব্যগ্র হ'য়ে দাঁড়াল।
বলে তোমার আশীর্ব্বাদে আছি মা ভাল।
দুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই।
হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্
সদাই হোতো মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে।

দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি
যে সুখ হয় আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে
অন্যে কি জানিবে আর।
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই
অমনি ধেয়ে যাই
আনন্দে হোয়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই॥
এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,
সে দুর্গার দুর্গতি এ কি প্রাণে সয়।
তুমি যে কোয়েছ আমার গিরিরাজ
কত দিন কত কথা।
সে কথা আছে শেলময়,
মম হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক সোনার কার্ত্তিক
ধূলায় পোড়ে লুটাতো!
গেল গেল যন্ত্রণা,
উমা বলে মা,
আমি এখন অন্ন অন্যকে বিলাই॥

॥ ৫ ॥

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন, শুন তোমার মেয়ে কি বলে।

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী,
আপনি ঈশানী আসতে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ॥
তারাহারা হোয়ে,
নয়নের তারাহারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই।
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতে সারা
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা, মা, মা বলে ॥
উমা যত হেসে কয় ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ॥
ভাল হোক্‌ হোক্‌ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমার কি মনে, হোত না হে সাধ
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ॥
আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ রহে বল কতদিন।
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,
আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মা হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে,
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহারব, ছিলেম্‌ যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥

॥ ৬ ॥

গৌরী কোলে করে নগেন্দ্ররাণী করুণ বচনে কয়।
উমা মা আমার সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥

মরি জামাতার খেদে,
তোমার বিচ্ছেদে,
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচলা নারী,
চলিতে নারি
পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃত হ'য়ে
আশাপথ চেয়ে
তোমায় না হেরিয়ে
নয়ন ঝরে।
কও দেখি উমা,
কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে?
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।
শুনে জামাতার দুখ খেদে বুক বিদরে॥
তুমি ইন্দুবদনী কুরঙ্গনয়নী কনকবরণী তারা
জানি জামাতার গুণ
কপালে আগুন
শিরে জটা বাকল পরা।
আমি লোকমুখে শুনি ফেলে দিয়ে মণি
ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে॥
মরি ছি! ছি! ছি! একি কবার কথা
শুনে লাজে মরে যাই।
তোমা হেন গৌরী
দিয়াছেন গিরি
ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই।
মাখে অঙ্গেতে ছাই॥
তুমি সর্ব্বমঙ্গলা,
অকূলের ভেলা,
কূলে এনে দিতে পার।

দেখে খেদে ফাটে বুক
তোমার এত দুখ,
সে দুখ ঘুচাতে নার।
তুমি রাজার বালিকা
মায়ের প্রাণাধিকা
ভাগ্যেতে মা হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী
শঙ্কর ভিখারী
উপজীব্য ভিক্ষা করা।
সদা বলি মা, গিরিকে
আন গে গৌরীকে
কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে॥

॥ ৭ ॥

মহড়া।—একবার্ আয়্ উমা, তোমারে মা, করিগো কোলে
বিধুমুখি ওগো জননি, ডাকো জননী বোলে।
তুমি তো ভাব'না মা বোলে॥
তোমা বিনে যে দুখ গেছে।
সে সব কথা কব উমা তোমারো কাছে।
বর্ষাবধি, পরে যদি, অঙ্গনে দেখা দিলে॥

চিতেন।—মেনকা কহিছে উমা, তোমা বিহনে।
অন্ধকার ছিলো সব, গিরি ভবনে॥
ঘুচিল তিমির নিশাচয়;
উমা আসি পূর্ণশশী হইল উদয়।
অঞ্চলে অঞ্চলের নিধি, বিধি আনি
মিলালো॥

॥ ৮ ॥

সখী সংবাদ

মহড়া।—জলে কি জলে, কি দোলে, দেখ গো সখি
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে যে স্থির নির্ণয় করিতে॥

শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি
নির্ম্মল যমুনা জলেতে।

চিতেন।—নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি॥
জলে কি এমন দেখেছ কখনো বল
দেখ ওগো ললিতে।

অন্তরা।—সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা
হেরি জলের মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যারো কালো
ঐ ছায়া কি ইথে॥

চিতেন।—আরো সখি কালাচাঁদ কি আছে।
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে॥
বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি
উদয় হয় দিবসেতে॥

॥ ৯ ॥

ঐ গীতের পাল্টা

মহড়া।—ওগো চিনেছি, চিনেছি চরণে দেখে ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ্ ছাঁদ্, দীপ্ত হোয়েছে,
যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে॥

চিতেন।—ভুবনমোহন, না দেখি এমন, ঐ বই।
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আমরি সই॥
কুলে শীলে কালি দিয়েছি,
আমি কালো রূপ্ নয়ন হেরিয়ে॥[১]

॥ ১০ ॥

মহড়া।—নাথো, কোন গুণে মন চায় তবু তোমাকে।
ঝোরে প্রাণ আমার দুনয়ান্,
এক তিলও না দেখে॥

১। রাম বসুর গান নীলু ঠাকুর গাহেন।
প্রাঃ কঃ সঃ, প্রীঃ গীঃ, বাঃ গাঃ—প্রভৃতি গ্রন্থে হরু ঠাকুরের নামে পাওয়া যায়।

চিতেন।—তুমি নারীর বেদন জান না লম্পট আপনি
প্রীতি ডোরে বন্দী কোরে বধ কর রমণী॥
হানো দারুণো বিচ্ছেদ শেল যুবতীর বুকে॥
অন্তরা।—ওরে প্রাণ, আমি অবলা বুঝিতে না পারি।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥
চিতেন।—আমি সরল ভাবে তোমায়
প্রাণ্ রাখ্‌বো কেমন্ কোরে।
তুমি যে দেবে দুঃখ আমায়,
জান্‌বো কি প্রকারে॥
পোড়া পীরিতি করিয়ে আমার
জন্ম গেল দুঃখে॥[১]

॥ ১১ ॥

মহড়া।—আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্য্যোগ;
প্রেমের আশা না পূরিলো॥
উপায় এখন্ কি করি বলো॥
তুমি এ পথে এলে।
করে কুরব কুচক্রী সকলে॥
দিনান্তরে দিতে দেখা,
বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো॥
চিতেন।—না হোতে তোমার সহ সুখ সংঘটন।
জানাজানি, কানাকানি করে রিপুগণ॥
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে॥
না পেলেম প্রাণ জুড়াইতে,
লাভ হোতে দুকূল গেল॥
অন্তরা।—তোর সাধে এত পরীবাদ সয় কি অবলার।
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর্॥

---

১ মোহন সরকার এই গান করেন—সঃ-সঃ প্রঃ

চিতেন।—না করিতে চুরি লোকে চোর্ বলে আমায়।
মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায়॥
মনে মনাগুন
যেন বোবার স্বপন সম হয়।
গুমুরে গুমুরে বঁধু, হৃদয়ে মধু
হৃদে শুখালো।
অন্তরা।—সরমে মরি মরমে লোক যদি হাসে।
তোমার লজ্জায়, আমার লজ্জায়, বাঁচিব কিসে।
চিতেন।—দু'জনে গোপনে যদি অন্য কথা কয়।
অমনি চমকে উঠে, অভাগীর হৃদয়॥
ফুটিতে না পারি হায়।
যেন বোবার স্বপ্ন প্রায়॥
মনাগুন মনে জ্বলে, নয়ন-জলে, হোয়ে প্রবলো॥

॥ ১২ ॥

উক্ত গীতের পাল্‌টা

মহড়া।—এই কোরো প্রেম গোপনে রেখো।
কেহ না জানে, তুমি আমি বই
কথা প্রকাশ করো নাকো।
দেখো প্রাণ, অতি সাবধানে থেকো॥
তোমায় আমায় ঐক্যতা।
কেউ শুনে না, যেন একথা॥
পথে দেখা হ'লে সখা,
নয়ন ঠেরে সঙ্কেতে ডেকো॥
চিতেন।—পীরিতের আশা আমার নিরাশা বা হয়।
কুলনারী সদাই করি কলঙ্কেরি ভয়॥
যৌবন করেছি দান।
তার দক্ষিণা পেলাম কুলমান॥
না হই যেন অপমান,
গুণমণি, দেখো হে দেখো॥

অন্তরা।—অবলা আমি সরলা তায় কুলবতী।
প্রেমের আশে পাছে শেষে হই অসতী॥
চিতেন।—মনের মিলনে মনে থাকৃব দুজনা।
তুমি কেবা, আমি কেবা, চেনা যাবে না॥
ঘন, চাতকিনী প্রায়।
প্রেমে সমান দু'জনায়॥
মেঘে যেমন শশী ঢাকা
তেমনি সখা লুকায়ে থেকো॥

॥ ১৩ ॥

মহড়া।—প্রাণ, তুমি এ পথে আর এসো না।
শুধু দেখা দিবে সখা
সে তো তা মনেতে বুঝবে না॥
তুমি যার এখন তার পূরাও বাসনা॥
তোমা হোতে সুখো যা হবার।
প্রাণ্ তা হোয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার॥
দেখা হ'লে, মরি জ্ব'লে, এ দেখা দিও না॥
চিতেন।—আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা
হোতো পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখলে
ঘটে হরিষে বিষাদ॥
এসো, বসো বলা হলো দায়।
কি জানি কি গিয়ে সখা
বলে দিবে তায়॥
সে তোমাকে আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা
অন্তরা।—তা বলা নয় উচিত হয় না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমার করিবে ভৎর্সন॥
চিতেন।—আমায় বরং সখা, দিও দেখা
যুগ-যুগান্তে।
অনাদর, নাই কোরো,
সেই নূতন পীরিতে॥

নবরসের সে যে রঙ্গিণী।
প্রাণ হয়েছে তোমার প্রেমের অধিনী ॥
আমায় যেমন জ্বালিয়েছিলে
তারে জ্বালা দিও না ॥

॥ ১৪ ॥

মহড়া।—বধু কার কখন্ মন্ রাখ্‌বে।
তোমার এক্ জ্বালা নয় দুদিক রাখা
বল প্রাণ্, কিসে প্রাণ্ বাঁচবে
সমভাবে কেমন রবে ॥
সবে তোমার একো মন্।
তায় কোরেছ প্রেমাধীন
দুঠেঁয়ে দুজন ॥
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ,
হাসাবে কায় কাঁদাবে ॥
চিতেন।—একোভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ
সে ভাব তোমার নাই।
পেয়েছ যে নূতন নারী
মনো তারি ঠাঁই ॥
রাখতে আমার অনুরোধ
প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে
সে করিবে ক্রোধ্ ॥
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব কোবে কি
দেশান্তরী করিবে ॥[১]

মহড়া।—ওগো কৃষ্ণ-কথা কবে যদি, ধীরে ধীরে কও
কেউ যেন না শোনে।
ও নামে বিপক্ষ বহু আছে এখানে ॥

১ মোহন সরকারের মৃত্যুর পর বসুজ ঠাকুরদাস সিংহকে এই গীত প্রদান করে।

সং — সং প্রঃ

কহিতে বাসনা, বোলো আমার কাণে কাণে।

চিতেন।—আলস্যক্রমেতে ভ্রমেতে করি কৃষ্ণ রব্।

ও নামেতে খড়্গহস্ত আমার প্রতি সব্॥

হিরণ্যকশিপুর রাজ্য হয়েছে এই বৃন্দাবনে।[১]

॥ ১৬ ॥

মহড়া।—দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুল না।

আমি কালো ভালবাসি বোলে,

আমায় ভাল কেউ বাসে না।

আমারে শ্রীচরণে ঠেল না।

নাহি কোন সম্পদ আমার,

কেবল দিবা-নিশি ঐ ভাবনা॥

চিতেন।—আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগী হোলেম্ কালাচাঁদ।

রটালে গোকুলে, কালা পরীবাদ্॥

আমারে যে আমার বলে শ্যাম্,

এমন্ দুখের দোসর কেউ মেলে না।

॥ ১৭ ॥

মহড়া।—মথুরার বিকিতে যেতে গো বড়াই।

ভালো আর কি পথ নাই॥

জানতো ঐ পথের দানী লম্পটো কানাই।

যারে ডরাই তাই ঘটে।

আনিলে তারি নিকটে॥

আপন জোরে যৌবন লোটে, না মানে দোহাই॥

চিতেন।—কি করিলে, কি করিলে, আনিলে কোথায়।

দাঁড়ায়ে কে গো, কদম্বতলায়॥

দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ছাঁদে॥

না জানি কি বাদ্ সাধে॥

মরি যায় পরীবাদে, ঘটে পাছে তাই॥[২]

---

১ নীল ঠাকুর গান করেন, রাম বসুর সখী সংবাদ গান। সঃ প্রঃ

২ রাম বসুর গান এই সখী সংবাদ মোহন সরকার গাহেন।

॥ ১৮ ॥

মহড়া।—কেন আজ্ কেঁদে গেল বংশীধারী
বুঝি অভিপ্রায় বঁধু ফিরে যায়, সাধেরই
কালাচাঁদকে কি বোলেছ ব্রজকিশোরী ॥

চিতেন।—রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই,
সুধাই গো তোমায় ॥
মণিহারা ফণী প্রায় মাধব তোমার।
প্রিয়দাসী বোলে বদন তুলে চাইলো না একবার।
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখ ফাটে বুক ফাটে, আমরি মরি ॥[1]

॥ ১৯ ॥

মহড়া।—এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি,
এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণ্ গুণ্ স্বরে কেন,
অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে ॥
কৃষ্ণ বই, কে আর্ বসতে পারে সই,
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন্, শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ॥
আর পতঙ্গেরি মধ্যে তিনি কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে।

চিতেন।—বসন্ত আসিতে গোপিকার কেন প্রাণ জুড়ালো।
জ্ঞান হয় ঋতু নয়, দয়াময় মাধব এলো ॥

১ "অনেকে বলেন, এই গীত রাম বসু রচনা করেন, কিন্তু এই নিজ দলে গান করেন কি দল করিবার পূর্বে অন্য কোন দলে—কিছুই নির্ণয় হয় না।
অনুমান হয়, রাম বসু দল করিবার পূর্বে নীলু ঠাকুর বা ঠাকুরদাস সিংহ গাহিয়াছিলেন।"
সং-সং প্রঃ

দেখ তমালে কোকিল বসে ঐ।
মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে ডাকিতেছে সই ॥
আর কমলিনীর কমল্, চরণ ধ'রে
সুখে গান করে অলিপুঞ্জে।
(নিজ দলে এই গান করেন।)

॥ ২০ ॥

মহড়া।—ওহে, হে কালো উজ্জ্বল বরণ,
তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে ॥
যে বলে, সে বলে, বলুক্ কালো।
আমার নয়নে লেগেছে ভালো ॥
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম্ তোমায়
পূজিতাম্ জবা বিল্বদলে ॥
চিতেন।—আরো তো আছে হে, অনেকে কালো
এ কালো নহে তেমন্।
জগতের্ মনোরঞ্জন্ ॥
না মেনে গোকুলে কুলের বাধা
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা ॥
জনমের মত ঐ কালো চরণে,
বিকায়েছি যে বিনিমূলে ॥
অন্তরা।—ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো
আমার এই তো জ্ঞান ছিলো।
সে কালের কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো ॥
চিতেন।—এখনো বুঝিলাম্ কালোরো বাড়া
সুন্দর নাহিকো আর।
কালরূপ্ জগতের সার ॥
ত্রিলোকে এমন্ আর্, নাহিক হেরি।
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি ॥

কালোরূপে আলো করেছে সদা,
মোহিত হয়েছে সকলে ॥

অন্তরা ।—একো কালো জানি কোকিল,
আরো ভ্রমরার্ কালো বরণ ।
আর কালো আছে, জল কালিন্দীর
কালো তো তমাল বন্ ॥

চিতেন ।—আর কালো দেখো, নবীন নীরদ্ ;
ছিল হে দৃষ্টান্ত স্থল্ ।
কালো তো নীলকমল্ ॥
সে কালোর কালত্ব দেখেছ সবে ।
প্রেমোদয় অশ্রু হয়, কারে বা ভাবে ॥
তোমার মতন চিকণ কালো না দেখি ভুবনমণ্ডলে ॥

॥ ২১ ॥

মহড়া ।—জলে জলে, কেগো সখি ।
অপরূপো রূপো দেখি ॥
দেখো সই নিরখি ॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাবভঙ্গি প্রায় ।
মায়ারূপে ছায়ারূপে
সে কালা এসেছে কি ॥

চিতেন ।—আচম্বিতে আলো কেন যমুনারি জল
দেখ সখি, কূলে থাকি
কে করে কি ছল ॥
তীরের ছায়া নীরে লেগে
হোলো বা এমন !
চকিতে দেখিতে আমার
জুড়ালো দুটি আঁখি ॥

অন্তরা ।—নিতি নিতি আসি সবে,
জল আনিতে,
ওগো ললিতে ।

না দেখি এমনো রূপ
বারি মাঝেতে ॥

চিতেন।—আজু সখি একি রূপ
নিরখিলাম্ হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির
সৌদামিনী প্রায় ॥
ঢেউ দিও না কেউ
এ জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে
হইবে সই পাতকী ॥

অন্তরা।—বিশেষ বুঝিতে নারি
নারী বইতো নই,
ওগো প্রাণসই।
নিরখি নির্ম্মল জলে
অনিমেষ রই ॥

চিতেন।—কতশত অনুভব হয় ভাবিয়ে
শশী কি ডুবিল জলে রাহুরো ভয়ে ॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব
হৃদয় কমলো কেমন তা দেখে হবে সুখী ॥[১]

॥ ২২ ॥

মহড়া।—নটবর কে গো সখি।
তার নাম জানি নে কালোবরণ,
ভঙ্গী বাঁকা, বাঁকা আঁখি ॥
যাই যদি যমুনার জলে
সে কালা কদম্বের তলে

---

১ রাম বসুর প্রণীত এই গীতের সাট গান করিয়া নীলু ঠাকুর অনেক সদ্বিদ্বান ব্রাহ্মণকে মোহিত করিয়াছিলেন। উক্ত কবিতা রচনার সময় কবির বয়স বিংশতি বৎসর হইবেক। সঃ প্রঃ

প্রীঃ গীঃ, দাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ—প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে এই পদটী হরুঠাকুরের নামে প্রচলিত।

গুপ্তঃ ও সঃ প্রঃ এ রাম বসুর বলিয়া প্রকাশিত আছে।

হাসি হাসি বাজায় বাঁশী
বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন।—ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার!
সে যে মদন মন্মথরূপ
ত্রিভঙ্কিম আকার॥
চাইলে সে চাঁদ্ বদন্ পানে
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে
একবার হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে তুটি আঁখি॥

॥ ২৩ ॥

মহড়া।—হোয়েছি তোমার বাঁশীর দাসী,
তাই আসি বনে।
কুলবধূ, বধ বধুঁ, সুমধুর তানে॥
মুরারী স্বয়ং গায়ক।
মুরলী উত্তরসাধক॥
না মানে কুলকীলক গুরুভয় না গণে॥

চিতেন।—রাধা, রাধা, রাধা বোলে, বাঁশী করে রব।
বাঁশী আমার নাশিলেকো, সতীত্ব গৌরব॥
অমনি অরণ্যে আনে।
মুরলী কি মন্ত্র জানে।
অঞ্জনো কোরেছি নয়নে গুরুরো গঞ্জনে।

॥ ২৪ ॥

মহড়া।—রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যাম্ সাগরে, কালোনীরে
কিশোরী ডুবিলো॥

চিতেন।—জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী,
দিলে কালো জলে ঝাঁপ।
পরিতাপ্ ঘুচাতে, পেলেন মনস্তাপ্॥

কিসে হবে পরিত্রাণ্।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান্॥
কুলবতী হোয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো।
(এই গীতের বয়স পূর্ব্বোক্ত গীতের অপেক্ষা বেশী)

॥ ২৫ ॥

মহড়া।—লোয়ে দুগ্ধ, দধি পশরাতে সাজায়ে সকল।
ভাব্‌তেছি তাই সখি॥
যাব কিনা যাব আজ, মথুরার্ বিকি।
বসেছে নৃতনো দানী,
নন্দের নন্দনো নাকি।
চিতেন।—বড়ায়েরো মুখে একি, গো সখি,
শুনি পরমাদ্।
ঘুচিলো আমাদের্ সবো,
বিকিকিনি সাধ॥
যে শুনি দানীরো কথা, গিয়ে কুল হারাবো কি॥
অন্তরা।—নিতি নিতি বিকিকিনি করি দধি-সর্।
গোপজাতি ধর্ম্ম এই, ইহাতে দিই রাজকর্।
চিতেন।—এ বড়ো বিষমো হোলো,
বসিলো দানী এ পথে।
কি দানো তাহারে সখি, হবে গো দিতে॥
শুনেছি রসিকো দানী,
না জানি সে চায়ো বা কি॥
[৫০ বৎসর পূর্বে রাম বসু নীলু ঠাকুরকে এই গান দান করে]

॥ ২৬ ॥

সখী সংবাদ

মহড়া।—এমন্ ভাবিক্ নাবিক্ দেখি নাই।
না হোতে পার যমুনার
মাঝ্‌খানে বা কূল হারাই॥

কি হবে মনে ভাবি তাই।
একি জ্বালা কালা কর্ণধার
হোলো প্রাণ বাঁচানো ভার!
কাঁপে তরঙ্গে অঙ্গ, ও করে রঙ্গ,
আমায় বলে ধর রাই ॥

চিতেন।—তুলে তরণীর্ উপর, নটবর্, করে কত ছল্।
বলে দেখিছ কি রাই, যমুনা প্রবল ॥
তুমি পোরেছ রাই নীল্বসন্।
মেঘ ভারে বাড়ে পবন্ ॥
বলে তরঙ্গের্ মাঝে, উলঙ্গ হোতে,
একি লজ্জা পাইগো রাই ॥

চিতেন।—তরী করে টলোমল্, উঠে জল্,
হেরে হারাই জ্ঞান।
এ সময় বলে সই; কই পশরা দান্।
আছি ভেবে হোয়েছি আকুল্।
অকূলে বুঝি যায় কুল্।
পেয়ে ঘোর শঙ্কটে, যৌবন লোটে
না মানে কংসের দোহাই।

চিতেন।—সুখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বল কিসে হোলো
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে, কেঁদে উঠে প্রাণ্ ॥
যখন নবভাব ছিলো, সে এক্ মন্।
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন ॥
কোন কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ্,
তারো মায়ামেঘের আড়ে কায়া লুকালো ॥

॥ ২৭ ॥

মহড়া।—ওগো প্রাণ্ সখি আমার্
মনের্ খেদ্ আর ঘুচলো না।
এলে বসন্ত, থাকে প্রবাসে কান্ত,
আবার কান্ত এলে বসন্ত থাকে না ॥

॥ ২৮ ॥

মহড়া।—অনেকেতো প্রেম্ করে,
আমার কেন এমন্ হয়।
বিনি যন্ত্রণায় যদি দু'দিন যায় ॥
যেন তিন্ দিনের দিন্ একটা ঘটেছে প্রলয় ॥

॥ ২৯ ॥

মহড়া।—তুমি হও মহাজন্ অবলার ॥
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেম ধন,
আমার যৌবন্ হবে জামিন্‌দার।
পীরিতেরি খাতক্, আমি হবহে তোমার ॥
পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন্ বাঁধা থাকিবে আমার্,
প্রাণ যতদিন রয় ॥
সুদে সুখো ভুঞ্জ চিরদিন্,
মোলে এ ধারে হবে উদ্ধার।
চিতেন।—এসেছি পীরিতের দেশে প্রাণ্, প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি, প্রাণো, সঁপে প্রাণ্ জুড়াই ॥
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বঞ্চিতো কোরো না বঁধু, কিঞ্চিতো আমায় ॥
আপনার কোরে,
লও আমারে প্রেমনিধি দিয়ে ধার।

মহড়া।— মান কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই
সজল আঁখি জলধর বরণে ॥
অতএব অভিমান্ মনে করিনে ॥
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা।
কৃষ্ণপ্রেম ডোরে প্রাণ্ বাধা।

হেরি ঐ কালো রূপ্ সদা ॥
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেম্‌ধারা দুনয়নে ॥
চিতেন ।—যদি ওগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে করি মান্ ।
রাখি মন্‌কে বেঁধে, শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ ।
শ্যামকে হেরব না আর সখী ।
বোলে চক্ষু মুদে থাকি ॥
সে রূপ অন্তরেতে দেখি ॥
কৃতাঞ্জলি, বনমালী বলে স্থান্ দিও রাই চরণে ।[১]
(আর পদ পাওয়া যায় নাই)

॥ ৩১ ॥

মহড়া ।—কর্ত্তে রাধার মানো রক্ষে,
উভয় পক্ষে যেন মান রয় ।
কি করে এ পক্ষে পক্ষপাত,
যে পক্ষে যাক্ রাধানাথ,
জানি প্রেম-পক্ষে শ্যাম, আমার বিপক্ষ নয় ॥
শ্যামের আদর-মাখা অঙ্গ ।
সে ত্রিভঙ্গ গো আদর বাড়ায়
মান্-তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ ॥
আমরা যখন সে মান করি,
আছে তায় পায় ধরাধরি,
সখি, আজ কি রাধার আদর নূতন নয় ॥
চিতেন ।—সাধে কি সাধতে বলি মাধবে,
তার সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ ।
এমন হয় গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সয়, আপমান ।
সখি, আমার মান গেলো গেলো,
জানা গেলো গো ।
বংশীধারীর মান থাকে তাহলেই ভালো ॥[১]

রাম বসু এই গীত রচনার একমাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন । (সঃ প্রঃ)

॥ ৩২ ॥

মহড়া।—এসো নূতন্ প্রেম্ করি, প্রাণে বাঁধা রেখে প্রাণ
রাখ্‌বো হৃদয় মন্দিরে বেঁধে প্রেমডোরে,
প্রেমের্ প্রহরী থাকৃবে আমার দুনয়ান ॥
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান,
হও প্রাণের প্রাণ ॥
হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখ্‌বো অন্তরে,
প্রাণ্ বোলে ডাক্‌লেও আনন্দ ॥
যাতে মন্ দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই,
যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে বিচ্ছেদ্ বাণ ॥

চিতেন।—না হোতে মনে মনে ঐক্যতা সখ্যতা,
না হয় সুখোদয়।
বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে,
দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয় ॥
যেন এবার আর তা না হয়,
একভাবে ভাব রয়,
শেষেতে দেশে না হই অপমান ॥

॥ ৩৩ ॥

মহড়া।—তোরা বল দেখি সই পুরুষের মান্ যায় কেমন কোরে।
আমার মান সমাধান কর্‌লে যে সই পায়ে ধোরে।
আমি নারী হোয়ে কোন্ সুখে তায় সাধব
পায়ে ধোরে ॥

চিতেন।—ভেবে ছিলাম মনে, মোজে মানে আপনার মান বাড়াই
তাহে একদিকে মান, রাখতে গো সই, দুদিক বা হারাই ॥
যখন মান করে মানিনী হোয়ে, রই গো মনের দুখে।
কতবার্ তখন্ প্রাণনাথ আমার মানের দায়ে
ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ দিয়ে মান রাখে ॥

এখন্ আমার মান্ ভেঙ্গে দিয়ে উল্‌টে মান্ করলে সই
এবার তার মানের মান্ থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥
(নিজ দলে গাহেন)

॥ ৩৪ ॥

মহড়া।—ওগো সুধাংশুমুখি প্রাণ, কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশীমুখে, কান্নাও আছে ॥
চোখে, বদনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে।
কোরে মান্ প্রেমের দুই পক্ষ সমান জানালে।
আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা।
এক চক্ষে নিদ্রা যাও, আর চক্ষে জেগে রও,
সাপক্ষে দুই পক্ষশীলতা ॥
তোমার মানেতে নাই কৌশল, না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়ন জলে।
চিতেন।—মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে, প্রাণ তা ভেঙ্গে বল্লে না।
আকার-ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে, বুঝলাম্ যেমন মন্ত্রণা ॥
আমায় নিগ্রহ করবে নাকি নির্দ্ধার্য্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কোল্লে প্রাণ,
আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য ॥
ওলো পূর্ণাচন্দ্রাননে, আধো-আধো পানে,
আধ চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে।
অন্তরা।—তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্;
আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখলে সে মান, মলেও রাগ যায় না প্রাণ,
অথচ আমার প্রাণে সুদৃষ্টি, আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি ॥

॥ ৩৫ ॥

(পূর্বোক্ত গানের পালটা গীত)

মহড়া।—তোমার মানের উপরে মান্, কোরে আজ্ মান্ বাড়াবো।
আমায় কাল্ যেমন্ কাঁদালে পায়্ ধোরে সাধালে,
আমি আজ্ তেমনি কোরে কাঁদাবো ॥

চিতেন।—প্রাণ্ যে কোরেছ নিদারুণ্ মান্,
সাধতে গেল আমার প্রাণ।
কোন দুষী নই, তবু সকল সই,
প্রেম সম্বন্ধে মান্তবান্॥
কেমন্ কোরেছ পীরিতে পদানত।
সঁপিলাম ধন প্রাণ্, তবু মন্ পাইনে প্রাণ্
অপমান্ প্রাণে সব কত॥
কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন্ কপাল-মন্দ,
গোবিন্দ জুড়ান্ তো প্রাণ্ জুড়াবো॥

॥ ৩৬ ॥

মহড়া।—এতদিনে সই, প্রাণ্নাথের আমার মান ভঙ্গ হয়েছে।
কদিন কথা ছিল না, ডাক্‌লে দেখা দিত না,
সে আজ হাসি মুখে আসি বোলে গিয়েছে॥
ছিল যে সন্দ, সে সব দ্বন্দ্ব, ঘুচেছে।
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।
কোন ছল পেয়ে প্রাণ্, কর্ব্বে যে মান্ বাঁকা-বাঁকির
দফা রফা করেছি।
গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতো মনে
এখন্ সে দোষে নির্দ্দোষী, বিধি কোরেছে।
চিতেন।—ভালবাসি বোলে, ছলে-কৌশলে প্রাণ্নাথের হোতো মান
যারে তিলেক, না দেখ্‌লে মরি।
তারে একলা রেখে, একলা থেকে, ত্রিরাত্রি কি প্রাণো
ধরিতে পারি॥
যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই,
সে আজ্ আপন সাধে এসে সেধে গিয়েছে।
অন্তরা।—আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়, কুটিল হৃদয়,
যেন বিষধর নিজ রসাভাসে,
দংশে এসে যদি সই, জ্বোলে মোরব নিরন্তর।

॥ ৩৭ ॥

মহড়া।—মান্ ভিক্ষে দাও আমারে প্রিয়ে এখন।
ধনি, আজকের মত মান করি সমাধান
একবার বদন তুলে কর বিবাদ ভঞ্জন ॥

॥ ৩৮ ॥

মহড়া।—শ্যাম কাল মান করে গেছে, কেমন আছে,
দূতী দেখে আয়।
করে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি-প্রেমের দায় ॥
খাদ।—ছলে আমার মন ছলেছে,
আগে বুঝাবে মন দূরে থেকে, চক্ষে দেখে গো,
কয় কি, না কয় কথা ডেকে ॥
মেলতা।—যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
অম্নি সেধো গো ধরে দুটি রাঙ্গা পায়।
১ চিতেন।—সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হলো অপমান,
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
কথা কইলেম না, রেখে মান।
পাড়ন।—কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে চন্দ্রাবলীর নব রাগে।
মেলতা।—ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ,
আবার এ কি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে, রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায় ॥
অন্তরা।—যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি করবে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥
২ চিতেন।—যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখিতে হয় সম্মান ॥

পাড়ন।—রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান, অপমান !
ফুঁকা।—এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জ্বলে জ্বলে গো,
জুড়াবে কি অঙ্গ জলধরের জলে !
মেলতা।—আমার সেই কালো জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥

॥ ৬৯ ॥

মহড়া।—প্রাণরে প্রাণ।
নইলে হৃদে হানো বিচ্ছেদ্ বাণ ॥
বুঝি মানের অভিপ্রায়,
মানচণ্ডীর তলায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে নর-বলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ,
প্রাণ চাতকী সন্ধান ॥
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ।
রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে খড়্গ হস্ত হোয়েছ ॥
ধোরে মিছে ছলে ছল্,
কোরে কৌশল,
করে ছুতায় লতায় কথায় কথায় অপমান।
চিতেন।—তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান্।
যখন কোরেছ বাড়াবাড়ি।
তখন জেনেছি আজ হোতে
প্রেম ছাড়াছাড়ি ॥
তোমার ভালবাসা এতো নয়।
আমার প্রাণ জ্বালাবে,
দেশ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশায় ॥
আমি সর্বত্যাগী হই
তোমার বাঞ্ছা ঐ

তাইতো কোরেছো আজ
এমন সর্ব্বনেশে মান।
(ঐ গানের পালটা)

মহড়া।—এই খেদে কয়॥
তবু বল পুরুষ ভাল নয়॥
যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী
ত্যজেছিলেন প্রাণ
তখন মৃতদেহ গলায়
গেঁথে রাখলেন মৃত্যুঞ্জয়।

চিতেন।—কথায় কথায় কোরে অভিমান
তিলে তাল্।
ও ধনি না জানি, কেমন পুরুষের কপাল!
যদি পুরুষ পাতকী হবে।
তবে পাণ্ডবেরা নারীর সঙ্গে
বনে কেন বেড়াবে॥
দেখ তারা একা নয়
হরি দয়াময়!
মানে ধরেছিলেন ব্রজে
রাধার পদদ্বয়॥

॥ ৪৩ ॥

মহড়া।—ব্যাথো আজ্ আমার পীরিতের ব্রত উদ্‌যাপন।
আনো বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন॥
দক্ষিণান্ত হোলে ক্ষান্ত হয়ো পাপো মন্।
অঘটো ঘটনা ঘটে
কোরে যাই আজ প্রাণ বিসর্জ্জন।

চিতেন।—আমি প্রেমব্রত করেছিলাম্ যারো কামনায়।
কর্ম্মদোষে সখা হে, না পেলামো তায়॥
খণ্ড ব্রতী হই হে যদি, হাসিবে হে শত্রুগণ॥

(রাম বসুর এই গান মোহন সরকার গাহিলে, বলাই দাস বৈরাগী অত্যাশ্চর্য্য উত্তর করিয়াছিলেন। সঃ-সঃ প্রঃ)

॥ ৪১ ॥

মহড়া ।—হবে অপযশো সার ।
কোরোনা প্রেম্ উদ্যাপনো আর ॥
যে করে প্রেম্ উদ্যাপনো নানা বিঘ্ন তার্ ।
যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলিলে আগুন
হবে প্রাণ্, যন্ত্রণা দ্বিগুণ্ ॥
রতিপতির্ হোমের ধূমে, প্রাণে বাঁচা ভার্ ॥
চিতেন ।—অনুরাগে, তনুত্যাগে, তাই দেখি তোমার্ ।
বল প্রাণ্, এ মন্ত্রনা কাহার্ ॥
প্রেম যোগ কল্লে, অসংযোগ্ ।
নাহি ভার্, স্বর্গে সুখোভোগ্ ॥
আমারে মজাবে মিছে হাসাবে সংসার ।

॥ ৪২ ॥

মহড়া ।—কে তুমি তা বলো ।
এলে প্রেম বাজারে, যৌবন ভরে,
হোয়ে ঢলো-ঢলো ।
চিতেন ।—শশিমুখি তোমায় দেখি, মৃগনয়নি ।
কোরে পদার্পণ্ পরের মন্, হরো
ইঙ্গিতে ধনি ॥
প্রিয়ে, চেয়ে চিতো হরিলে আমার্,
ঢেকে বদনে অঞ্চলো ।
(রাম বসু এই গীতের কর্ত্তা, গাহনের কর্ত্তা মোহন সরকার)

॥ ৪৩ ॥

মহড়া ।—তারে বোলোগো সখি, সে যেন, এ পথে আসে না ।
পোড়া লোকে মন্ দুষে দেয় গঞ্জনা ॥
চিতেন ।—আকিঞ্চন সুতে, গলেতে গেঁথে,
পোরেছিলাম প্রেমো হার ।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে,
বিড়ম্বনা বিধাতার ॥

সখি সে কোথা, আমি কোথা।
না জেনে, না শুনে লোকে কয় নানা কথা॥
আমি পীরিতি করিতাম্, প্রাণে প্রাণ সঁপিতাম্,
তা বুঝি কপালে হে

(কোন দলে গাহনা হয়, জানা নাই। গানটী মধ্যম।)

॥ ৪৪ ॥

মহড়া।—এমন্ প্রেম্ কোরে এক্‌দিন্,
চিরদিন কে বিচ্ছেদের বোঝা ব'বে।
জানি যত সরল্ ভাব্,
তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ,
ওরে প্রাণ্ কুটিল্ স্বভাব গুণে অভাব ঘটাবে॥
চিতেন।—দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি,
ক্ষান্ত আছি পীরিতে।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ্,
বিচ্ছেদের সঙ্গেতে॥
মনে ঐক্য আছে, ঝক্ক গেছে মিটে।
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়,
যাইনে তার নিকটে॥
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গ-রস,
মিছে ধোরে বেঁধে পীরিত ঘটাবে॥

॥ ৪৫ ॥

মহড়া।—ওগো ললিতেগো, তোরা দেখে যাগো,
রাই, কেন এমন হোলো।
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা,
এলো ধোলো স্বর্ণলতা।
কোথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বোলে আছে কি মোলো

॥ ৪৬ ॥

ইহার পাল্টা গীত

মহড়া।—ডুবে শ্যাম-সাগরে, যদি প্যারী মরে
রাইবধের ভাগী কে হবে।
ধরাধরি কোরে তোলো,
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
হরি ধ্বনি, শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে ॥

॥ ৪৭ ॥

মহড়া।—এমন ভাব্‌, রাখা ভাব্‌ কোথায় শিখিলে।
সে ভাব্‌ কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে ॥
ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাবে কোরে ভাবান্তর,
এখন তার অভাবে ভাবালে ॥

চিতেন।—স্বভাবে অভাব আজ দেখিহে তোমার।
একি ভাবের দেখা, কও সখা আবার ॥
অনুরোধে প্রবোধিতে মন,
ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

অন্তরা।—মরি, মরি! তোমার ভাবে বুঝি, জান কত ছল।
মুখে বঁধু যেন মধু, হৃদে হলাহল ॥

চিতেন।—অঙ্গ-সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন্‌ সে পাপ।
মন্‌ ভেঙ্গেছে, আছে, লোক্‌ দেখা আলাপ ॥
দেখে আঁখি হইত সুখী, তাকি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে।

(এই গীত মোহন সরকার গাহেন)

॥ ৪৮ ॥

মহড়া।—সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি
সুখের আশে, দুখে ভাসে,
বঁধু তোমারো প্রাণ-প্রেয়সী ॥
বল কেমন পেয়েছিলে, নবরূপসী ?

সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময়।
আশা দিয়ে আমারে যাওয়া উচিত নয়॥
আসাপথ চেয়ে আমি, নয়নো নীরে ভাসি॥
চিতেন।—এসো, এসো, এসো দেখি, প্রাণ একি, দেখি চমৎকার।
অপরূপ আগমন হইল তোমার॥
শশী সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন॥
আমারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহাইলে নিশি।[১]

॥ ৪৯ ॥

(ঐ গীতের পাল্‌টা)

মহড়া।—প্রাণ, তুমি আমার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুনে, আমি জ্বলব বই আর বল্‌ব কি॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন্‌ আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ্‌, তোমায় বলিনে
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদলে ফল্‌বে কি॥
চিতেন।—আমায় বোলে আমায় ছোলে,
প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্দি হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে।
বিরলে পেয়ে তুমি তার মধু খেয়েছ।
আপনি এখন রসহীন হোয়ে এসেছ।
বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী॥
অন্তরা।—তুমি ছিলে যখন্‌ আত্মবশে রসে জুড়াতে।
পরের হোয়ে আর কি এখন্‌ পার ভুলাতে॥
চিতেন।—আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছে।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন্‌ তেম্‌নি হয়েছ।

১ "মোহন সরকারের মৃত্যুর পর, ঠাকুরদাস সিংহ সেই দলের অধ্যক্ষ হইয়া এই গীত এবং ইহার নিম্নে ভাগের প্রকাশিত গীত গাইয়া অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েন। ইহাতে তাহার নাম প্রকাশিত হয়। রাম বসুর কৃত সকল বিরহের গীতের মধ্যে এই দুই বিরহ গীত অনেকেরি মনোরঞ্জক হইয়াছিল।" সঃ-সঃ প্রঃ

সন্ধিযোগে সে শশীর স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥
সারানিশি সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদমুখ দেখি॥

॥ ৫০ ॥

মহড়া।—পোড়া প্রেম্ কোরে তোর্ পোড়ায়্
আমার জন্মটা গেলো।
যতদিন হোয়েছে মিলন্,
একদিন্ নাই তার্ কান্না বারণ্,
পোড়া শিবের দশা যেমন্,
তাই আমারে হোলো॥
ভেবে ভেবে হৃদের মধু হৃদে শুখালো।
আর্ তো দৃষ্টি পোড়ায়্ পুড়্তে পারিনে।
সোনার বর্ণ ছিলো, কালি হোলো,
চোখের মাথা খেয়ে চেয়ে দেখিস্ নে॥
অনল্ নেবালে নিবে না সদাই উঠে জ্বলিয়ে,
বুঝি তোমা হোতে প্রেমের্ সাধ্ ফুরালো॥
চিতেন।—অনেকেতো অনেক্ পীরিত করে,
এমন দশা বলো কার।
কর্ম্মভোগের যেমন্ কপাল্ আমার্,
এমন খুঁজে মেলা ভার॥
অস্থি ভাজা ভাজা-হোলো প্রেমের দায়্।
ভেবে তোর গুণাগুণ্ মনের আগুন্
জ্বলছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায়॥
কেবল্ ঘরে দিলে দেখা, করিস মুখ বাঁকা,
গিয়ে আর্ আর্ লোকের কাছে থাকিস্ ভালো।

॥ ৫১ ॥

মহড়া।—আমি প্রেম্ কোরে কি এত জ্বালা সই!
কেউ বলে না ভাল, কলঙ্কিনী বই॥

আমিতো কখনো কারো, মন্দকারী নই,
তবে কেন বলে গো লোক
কুলকলঙ্কিনী এলো ঐ ॥
চিতেন ।—যে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্ছন ।
প্রাণ জুড়াব কোথা স্থান নাহি এমন,
ঘরে পরে করে গঞ্জনা
আমি মরমেতে মরে রই ।
[এই গীত মোহন সরকার গাহেন]

॥ ৫২

(ঐ গীতের পাল্‌টা)

মহড়া ।—ওরে পীরিত তুই আমার মন থেকে ছেড়ে যা
হবে নিবৃত্তি এ সব প্রবৃত্তি
আপনার মন হবে আপনি সোজা ॥
[ইহার আর অংশ পাওয়া যায় নাই]

॥ ৫৩ ॥

মহড়া ।—ওরে পীরিত তোর জ্বালা ঘুচাতে পারি ।
ত্যজে সুখ সাধ্, লোক পরীবাদ,
যদি পরের মরণে আপনি না মরি ॥
ত্যজে খল্, এ সব ছল চাতুরী ।
তোরে ভেবে পরের মত পর ।
সোয়ে দুখ্, বেঁধে বুক,
একবার দেখব হয়ে স্বতন্তর ॥
হোয়ে আত্মসুখে সুখী;
আত্মকুশল দেখি,
পর উপকারো জন্মে না করি ॥
চিতেন ।—তব অদর্শনে প্রাণ যদি, ধ্যানে না থাকে ।
পথে দেখা হোলে যদি আর,
সখী বোলে না ডাকে ॥

যদি ভুলি পরদত্ত সুখ্।
নয়নে. হেরিলে, কোন লম্পট শঠের মুখ ॥
যদি পরের করে মনো,
না দিয়ে কখনো,
আপনার যৌবনো,
আপনি সম্বরি ॥

অন্তরা।—না হই পরাধীন, যদি চিরদিন,
আপনারে ভেবে আপনা মনে প্রাণে,
এক ঐক্যতা কোরে,
দূরে ত্যজি পরের ভাবনা ॥

চিতেন।—পরকাতরা কেমন কুস্বভাব,
পরের দায়ে বাঁধা রই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়,
তারি পিছু পিছু ধাই ॥
জানি প্রাণের অরি তুইরে প্রাণ।
দুখে দই, তবু সই, কথা কই, রেখে সম্মান ॥
তুইতো পালাস্ আমায় ফেলে,
আমি তোরে ভুলে, উল্‌টে গিয়ে
যদি পায়ে না ধরি ॥
[এই গীত নিজদলে গাহনা করেন]

॥ ৫৪ ॥

মহড়া।—তুমি কার প্রাণ। হান কার পানে নয়নবাণ।
তোমার নূতন যে প্রিয়তম, হয়নি তার কোন ব্যতিক্রম,
কেন পরের দেহে থেকে বধ পরের প্রাণ ॥

॥ ৫৫ ॥

মহড়া।—তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন হলেম্ তুষ্ট এখন্
উষ্ণ জলে করে যেমন অনল নির্ব্বাণ।
হেরি চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ মাসের পথ।
কথা শুনে প্রাণ জুড়াবে দেখায় দণ্ডবৎ ॥

॥ ৫৬ ॥

মহড়া।—আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।
আমি যে পর ভজিলাম্ সখি, পর সুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী,
সে পরেপর ভেবেছে ॥
অতঃপর না জানি কি কপালে আছে।
যার লাগি ঘরে হলেম পর—সে ভাবিল পর।
পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর ॥
পরম ভাজন, ছিল যে জন, পরোক্ষে সে হাসিছে ॥
চিতেন।—না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্‌লাম একবার।
সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে, মন ছিল আমার ॥
সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন।
তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে, দিলাম্ মন ॥
আবার্ তারে, অন্য পরে, পর কোরে রেখেছে।
[ইহার অন্তরা পাওয়া যায় নাই, নিজদলে গাহনা করেন।]

॥ ৫৭ ॥

মহড়া।—পতি বিনে সই, সতীর মান কই আর থাকে।
হায় আমি যেন হলেম সতী
বিপক্ষ তায় রতিপতি !
নারী হ'য়ে কি কর্ব্বো তার
শিব ডরাতেন যাকে ॥
আমার হোলো যার মানে মান
সেই কই মান রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আই গো আই।
অন্যদিনের কথা দূরে থাক্ !
সর্ব্বনাশের পর্ব্ব কটা মনে নাই ॥
হোলেম পতির পরিত্যাজ্যা
থাকতে দেয় না রাজ্যে সই।
আমার রাজার মসিল
কালো কোকিল ডাকে ॥

চিতেন।—পতির পরহস্তা ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়
একাঙ্ক হোলে দু'জনার তবেই ধর্ম্ম রয়।
হোলো তায় আমার সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যা কাজে ত্যজ্যা সই
লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ ॥
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার
দয়া হবে বল কার ;
আমার পতিদত্ত জ্বালা জুড়াবে কে।

অন্তরা।—হায় আমার এ কথা অকথ্য
সতীবাদী পতি আমার।
আসি আশা দিয়ে
গেল মন ছোলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার ॥

চিতেন।—ফুলে বন্দী হোয়ে ওগো সই,
মূলে হারা
কত হব গো রমণী হোয়ে
অনঙ্গবিজয়ী ॥
আমার ধিক, ধিক যৌবনে।
কাননের কুসুম যেমন সই,
ফুটে আবার শুখায়ে রয় কাননে।
আমায় পেয়ে কুলনারী
বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরুসৈন্য বেড়া চারিদিকে ॥

॥ ৫৮ ॥

মহড়া।—থাকো প্রাণ, অভিমান্ লইয়ে।
আমি দেশে যাই মনো দাও ফিরায়ে ॥

চিতেন।—মধুর প্রয়াসে আমি আইলাম তব স্থানে।
নলিনী কেন মগ্না হোলে মানে ॥
আশা না পূরায়ে দিলে মধু,
কেতকী কলঙ্ক কর শুধু।

মিছে দ্বন্দ্ব কোরে জ্বালাও হে আমারে,
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে।

[রাম বসু অতি অল্প বয়সে এই গান রচনা করেন, নীলু ঠাকুর এই গীত গাইয়াছিলেন। সঃ—সঃ প্রঃ]

॥ ৫৯ ॥

মহড়া।—তোরে ভালবেসেছিলাম্, বোলে কিরে প্রেম্
আমার দুকূল মজালি।
দু'মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি তাই বলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রোয়েছি।
কোরে না বুঝে লোভ্, শেষে পেয়ে ক্ষোভ্,
বলি কাকে, চোখে দেখে ঠেকেছি॥
আমি মৎস্য মাংসভোগী, হোয়েছি জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি।
চিতেন।—পীরিতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তোরি জন্যে হলেম পরের বশ্।
আগে মান্ খোয়ালেম, কুল মজালেম্,
দেশবিদেশে অপমান আর অপযশ॥
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করলি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি।

[এই গীত নিজ দলে গাহনা করেন, ইহার অন্তরা ও পাণ্টা পাওয়া যায় নাই]

॥ ৬০ ॥

মহড়া।—মান্ যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে।
কুলবালা এ অবলা শেষে ভেবে কি প্রাণ যাবে॥
চিতেন।—পীরিতে মজাতে সখা, দাও হে দেখা দিনে শতবার।
কোরে প্রাণোপণ, দিয়ে মন্, মন্ যোগাচ্ছ আমার॥

জানি পুরুষ পাষাণ অতি নিদয়।
প্রাণ, রমণী আমি করি অতি ভয় ॥
আমার এ প্রাণ তোমায় দিলে প্রাণ,
শেষে আমারো কি হবে ॥

॥ ৬১ ॥

মহড়া।—যে কোরেছে যাহার সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ॥
পরেতে পরের মনো কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষগুণ, না করে বিচার ॥
চিতেন।—কামিনী, পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যার মন, কোরেছে হরণ ॥
মান অপমান দেখ না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার।
অন্তরা।—ওরে প্রাণরে! গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ॥
চিতেন।—গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না দেয় দুখি।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি ॥
দিনান্তরে দেখা না হোলে, মন-প্রাণ দহে দোঁহাকার
(এ গীত মোহন সরকার গান করেন)

॥ ৬২ ॥

মহড়া।—আমার প্রেম্ ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে সঁপেছ।
এমন্ রসিকা নারী কোথা পেয়েছ ॥
বদন তুলে কথা কও হেসে। প্রাণ বুঝি আভাসে।
তুমি ভালবাস কি, সে ভালবাসে ॥
তুমি যেমন্ সে কি তেমন্, দুই দুজনে মিলেছ ॥

॥ ৬৩ ॥

মহড়া।—ঘরের ধন্ ফেলে প্রাণ,
পরের ধনকে আগ্‌লে বেড়াও।
নাহি জানি ঘরবাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীত্ব কোরে নিরাশা অসতীর আশা পূরাও ॥

রাজ্য পেয়ে ভার্য্যের প্রতি কর্ম্মেতে লুকাও।
যেমন্ প্রাণ হে সত্যবাদী।
আমি তেমনি কর্ম্মনাশা নদী।
ছুঁলে পরে কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি॥
আমি সতী হোয়ে করি পতির মান্যবান্,
তুমি অন্যকুলে গিয়ে জীবন জুড়াও।

চিতেন।—দৈবযোগে যদি এ পথে,
প্রাণ করেছ আজ্ অধিষ্ঠান।
গেলো দুখ, হোলো সুখ,
দুটো দুখের কথা বলি প্রাণ্॥
তোমার্ মন্ হোলো কার বাগে।
গেল চিরকাল ঐ পোড়া রোগে।
আমার সঙ্গে দেখা দৈবযোগাযোগে
কথা কইছ হে আমার সনে মন্ আছে সেখানে,
মনে কর সখা, পাখা মেলে উড়ে যাও।

মহড়া।—যার ধন তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে সখি।
হোয়ে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষে দিতে
যেমন অনলে পোড়ালে রাম জানকী॥
যে কণ্টক আমার পাড়ার লোক্,
কবে কে কবে কলঙ্কী।
আসার আশায় প্রাণ রেখে এতকাল্।
মানে না কালাকাল্,
জীবনের যৌবন কাল,
আজ্ আমার অকালেতে সকাল্॥
আমার অঙ্গে কাল্ সঙ্গে কাল্, তায় কাল্ এ
বসন্ত কাল্, হোলো তিন্ কালে নারী সারা চারা কি

চিতেন।—পেয়েছি পতিদত্ত নিধি, তায় বিবাদী বিপক্ষ ছজন
মন্মথ, না হয় সম্মত, সদাই সে আকুল করে মন॥

হোলো এই তো সুখ, সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্ম্মহীন, স্বপতি পরাধীন,
যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায়,
এই উভয় সঙ্কটে সই, দুই দিকে সারা হই,
পতি ভাব্‌লে না সতীর দশা হবে কি॥

॥ ৬৫ ॥

মহড়া।—আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ
তোমার মন বুঝে দেখবো সই।
যদি তোমার মন খাঁটি হয়,
বিচ্ছেদ জ্বালা স'য়ে রয়
তবে দুটি মন
একটী হ'য়ে থাকব হে সই॥

চিতেন।—পিরীতের দায়ে ঠেকে বারে বার
জ্বল্‌ছি বিচ্ছেদ আগুনে।
এবার করবো নূতন প্রেমের
ব্যবস্থা করেছি মনে।
প্রেমের ভাবান্তর ভাব প্রেমের মতান্তর
এই এক মত,
আগে জলবে শেষে প্রাণ জুড়াবে হে
যদি তায় না হয় মতান্তর।
যেমন পতঙ্গ জেনে আগুনে পোড়ায় প্রাণ,
তেমনি সাধ করে সাধের কাজল পরবো সই॥

অন্তরা।—ওহে প্রাণনাথ হে,
বিচ্ছেদের পরে মিলন হ'লে পর
সেই যে বাড়ে সুখোদয়।
গ্রহণ অন্তে যেমন রবির কিরণ
সুবর্ণ দহনে সুবর্ণ হয়॥[১]

---

১ পদটি 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

॥ ৬৬ ॥

মহড়া—তবে, কি হবে সজনি
নাথো মান্ কোরে গেলো।
প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণ্ জ্বালায়্ জ্বলতে হোলো ॥
চিতেন।—বিধিমতে প্রাণোনাথেরে, করিলাম্ বারণ
কোরো না, কোরো না বঁধু, প্রবাসে গমন
সে কথা শুনে প্রাণনাথ্।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত
নারী হোয়ে, করে ধোরে,
সাধলাম তারে তবু না রহিলো ॥

॥ ৬৭ ॥

মহড়া।—আজ শুনলাম সই
প্রাণনাথের প্রাণনাথ আছে একজন্।
সময়ের দোষে হোলো কর্ত্রী
হোয়ে কর্ত্তা সে,
এখন্ সেই ফাঁদে পড়েছেন
আমার সাধের ধন।
সদা তারি, আজ্ঞা করি
প্রাণনাথ এখন।
সে যে সিংহবেশে সর্ব্বনাশী।
কল্লে গ্রাস প্রাণনাথকে যেমন, রাহুতে গ্রাসে শশী।
নূতন কুমুদ পেয়ে সুখে
আমোদ করেন তিনি
আমার প্রাণ চকোরের হোলো হুতাসে মরণ ॥
চিতেন।—আমি জানি আমার প্রাণনাথ,
আমারি বশীভূতো।
এখন কেমন কেমন দেখি সই,
আগে জানিনে এতো ॥

যখন নূতন পীরিত আমার সনে।
এ পথে বঁধু আসতো যেতো
চেত না কারো পানে।
এখন সে পথ পেয়ে সখা
এ পথ গ্যাছেন ভুলে,
আমি মাসান্তরে ঘরে
পাইনে দরশন।

॥ ৬৮ ॥

মহড়া।—মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি, বলি
আর বলা হোল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না॥[১]

চিতেন।—একে আবার যৌবনকাল
তাহে কাল[২] বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো॥
যখন হাসি, হাসি সে আসি বলে।
সে হাসি দেখিয়ে[৩] ভাসি নয়নের জলে॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি, ছি ধোরো না॥

---

১ পাঠান্তর পুঁথির—তখন তাড়িলাম অপমান
এখন যায় প্রাণ
অন্য অন্য নারী দেয় গঞ্জনা
২ ,, হল বসন্ত কাল
৩ ,, হেরিয়ে

অন্তরা।—তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি।
অনায়াসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ॥
একি সখি হোলো বিপরীত
রেখে লজ্জার সম্মান
মদন দহিছে এখন অবলার প্রাণ ॥
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণে বাঁচা ভার।
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার।
কারে এ দুখ কব সই,
কত আর প্রাণে সই
হল গো এ কি সখি যন্ত্রণা[১] ॥

॥ ৬৯ ॥

মহড়া।—নবযৌবন্ জ্বালায়, মলেম গো সহচরি।
নাথো নিবাসে এলো না, কি করি ॥
চিতেন।—বয়সো প্রথমে, সপ্তমে, অষ্টমে
বালিকা ছিলাম যখন্।
তখনো বলিতাম্ সজনি,
ভালো মদনো সেই কেমন্ ॥
এখন্ প্রাণনাথো বিহনে
জানিলাম্ সজনি, দহে বটে মদনে ॥
হোলো কলিকা কদম্ব, এ কুচো ডাড়িম্ব,
দিনে দিনে দ্বিগুণো ভারী।

---

১ পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—ও বলি কার কাছে কে আর
দিবানিশি মন আগুনে দহিছে প্রাণ
এ কি সঙ্গ হল বিপরীত দেখি নাহি পরিত্রাণ
মদনের বাণে গেল অবলার প্রাণ
ও তখন না সাধিলাম গমনকালে
এখন মরি সহচরি বিরহানলে
আমরা..................
সই গো কি করি প্রাণনাথ ॥

পদটী 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

অন্তরা।—যদি অনলো, হোতো প্রবলো,
জলে করিতাম্ নির্ব্বাণ্।
নৈলে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিতো এ অঙ্গ,
মন্ত্রেতে বাঁচিতো প্রাণ্॥

(রাম বসুর গান মোহন সরকার গাহেন)

॥ ৭০ ॥

মহড়া।—সেই তুমি, আমিও সেই॥
প্রেম গেল কোথায়।
ইহার কি অভিপ্রায়॥
কোনরূপে ত্রুটি দেখিতে না পাই,
দেখা হোলে তোষো কথায়॥
চিতেন।—তখন্ হোতে এখন্ অধিক আদর,
দেখি প্রিয় তুমি কর আমায়।
অদ্যাপি আমারো, দোষো করি গুণো
গাও, শুনি যথা তথায়॥

॥ ৭১ ॥

মহড়া।—এই অবলার মান থাকে কিসে,
প্রাণ্ তাতো বুঝ না।
তুমি জান না সোহাগ্,
কথায় কথায় কর রাগ,
পীরিত ভাঙতে শিখেছিলে
গড়তে জান না।
চিতেন।—কামিনী কলহ নির্ব্বাহে
পুরুষ যদি রসিক হয়।
ধৈর্য্য গুণে, পূজা কোরে আনে
যে জানে প্রণয়॥
তুমি আপনি প্রাণ হোলে অধৈর্য্য।
বোলে কর্ব্ব কি আর্, কপাল আমার।
তুমি যে হোয়েছ আমার অত্যাজ্য॥

তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি,
তবু সুখী নই ;
দিয়ে ঘরে আগুন্
শুনে পরের মন্ত্রণা ॥

॥ ৭২ ॥

(দ্বিতীয় গান)

পরের মন্ত্রণায় বাদ কোরে
প্রেমের সাধ কেন ঘুচালে।
ছিলো নয়নের দেখা,
তাতে ক্ষতি কি সখা,
কেন সে প্রবৃত্তি পথে কণ্টকো দিলে ॥
সেধে আপন কাজ,
কেবল্ আমারে মজালে।
পীরিত ভাঙ্গলে কি বঁধু এমনি হয়।
এখন ডাকলে সখা
না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছ যেন বাঘের ভয় ॥
তোমায় এ পথো ভুলায়ে
সে পথে নিয়ে গেল যে,
এমন বশীকরণ বিদ্যা সে কোথা পেল ॥

॥ ৭৩ ॥

মহড়া।—প্রাণ রে প্রাণ,
এমন পীরিত থাকা আর না থাকা।
তোমার পরের কাছে পরম্ সুখ্,
পথে যেতে হাস্য মুখ
আমার সঙ্গে দেখা হোলে বদন বাঁকা ॥
দায় পোড়ে প্রাণনাথ হে
দিয়েছ দেখা ॥

দেখা হোলে
সখা বোলে
আদরে ডাকি।
তুমি বল ভালো জ্বালা,
এ পাপ আমার কি ॥
পথে দেখে, নয়ন ঢেকে
পলাও ছুটে যেন পিঠে
বেঁধেছ পাখা ॥

॥ ৭৩ক ॥

(উহার পাল্টা)

মহড়া।—এ ভাবের ভাব রবে কতদিন।
তুমি প্রাণপণে মন যোগাও না ;
পরিত্যাগ কর না।
আমি যেন হোয়ে আছি
জালে গাঁথা মীন্ ॥
চিতেন।—যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে
প্রাণ, সে ভাব দেখিনে।
তোমার অভাব দেখে স্বভাব দোষে
আমি ভুলিতে পারিনে ॥
দেখা হলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি ॥
তুমি বল ভাল ত জ্বালা, এ পাপ আবার কি।
আপন বোলে সাধ্তে গেলে, তুমি ভাবো ভিন্।

॥ ৭৪ ॥

যৌবন রথে কে তুষিবে প্রাণ
পীরিত-শূন্য যুবতী।
রূপে থমকে থমকে, চপলা চমকে
কেন পাগল কোরে বেড়াও পুরুষ জাতি ॥
প্রেমিকার প্রতি তুমি কর ডাকাতি ॥

---

১ এই গানের চিতেন অংশটুকু 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

কুচগিরি উচ্চপেয়ে, মদন করে কেলি।
কোথা আছে করিকুম্ভ প্রাণ
দাড়িম্ব কি কদম্ব কলি ॥
হেরে মুখ মনোহর,
লজ্জা পেয়ে শারদ শশধর,
কেন কমল বনে নাহি ভ্রমরের গতি ॥

॥ ৭৫ ॥

মহড়া।—ভাব্ দেখে করি অনুভাব্,
ভাব্ বুঝি ফুরালো।
দিনের দিন্, রসহীন্, হোলে প্রাণ,
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো ॥
একি ভাব্, গেছে পূর্ব্বের সে সব ভাব্
অভাবে ভাব্ মিশালো ॥
তোমায় লোকে কয়, রসময়।
মিথ্যা নয়, সে রস্ পরের কাছে হয় ॥
ঘরে এলে মুখ্ যেন সে মুখ্ নয়।
তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি,
হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শতকেতে পাঠ এগুলো ॥
চিতেন।—সেই তুমি ,সেই আমি,
সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়।
তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান,
বিরস বদন কেন হয় ॥
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে।
ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে ॥
চক্ষে রেখে চাও না পোড়া চক্ষে।
এখন্ সদাই বদন্ বাঁকা, হোলে পর দেখা,
সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেলো।[১]

পাঠান্তর,—
ছিল নবরস, ছিলে বশ, কত বশ করতে তুমি প্রাণধন
দেখা হ'লে এখন ভুলে চাও না ও বদন।

অন্তরা।—প্রাণ যে মনে ভুলালে এ মনো আমার,
কই আর সে মন, কেমন্
দেখতে পাই।
কোন্ পথে হারালে মন্, ওরে প্রাণ,
আমিও সেই পথে যাই॥
নাই তোমার এখন সে সুহাস্য,
সুদৃশ্য সুবচন।
কথা হয়, যেন কে কারে কি, কয়,
প্রাণ সদাই অন্য মন॥
তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ্।
ওরে প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান্॥
কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ॥
আমি হাজা প্রজা বোলে, জলে জলালে
আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো।

॥ ৭৬ ॥

মহড়া।—প্রাণ বাঁধতে কি করে প্রাণ-মন বাঁধায় মজালে।
আমার প্রাণ্, এক সমান আছে প্রাণ
তুমি রাগ ক'রে পীরিতে ভাগ্ বসালে

(তাঁহার শেষ সময়ে এই দুই ভাবের গীতে ভাবের শেষ হইয়াছে। ইহাতে ভাব, রস, প্রেম, কৌশল, কবিত্ব, পাণ্ডিত্যে কোন বিষয়েরি অভাব নাই।)

॥ ৭৭ ॥

মহড়া।—হায়রে পীরিতি তোর্ গুণের বালাই নে মরি।
যখন্ যারে পাও, তার্ কি সুখো দুখো সব ঘুচাও
তুল সিংহাসনে কর পথের ভিখারী॥
তোমার তরে, সদা ঝরে হে, কি পুরুষ্, কি নারী
একবার যার সঙ্গে যার পীরিত হয়।
সে তার নয়ন্তারা, আর কিছুই কিছু নয়।

তখন হাসি হাসি ভুষিতে প্রেয়সী প্রাণ
সে সব শশীমুখের হাসি কোথায় গেল।

(গুপ্তঃ, ২৯৬, বাঃ গা—১৭৫)

ভাবি জন্মে যারো মুখো না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি ॥
চিতেন।—কি ক্ষণে এ প্রেম লাগ্‌লো প্রেম, আমি
জন্মে ভুল্‌তে পারিনে।
দুখোভোগ্, অনুযোগ, তবু না দেখ্‌লে তো বাঁচিনে ॥
কেমন্ কোরে রেখেছিস আমায়।
তারে না দেখ্‌লে প্রাণ, আর কোথাও না জুড়ায় ॥
মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে না, আমি
চতুর্ব্বর্গ ফল সেই চাঁদ্‌বদন হেরি।'
অন্তরা।—হায় প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেকো না হেরে, বিরহ বিকার
পলকে পলকে প্রলয় দেখি ॥
চিতেন।—প্রেমসুধা পানো, যে করে তারো
নাহি থাকে কোন খেদ্।
সপক্ষ, বিপক্ষ, প্রেমে শত্রু নাহি ভেদ্ ॥
নাই উঠ্‌তে বস্‌তে শক্তি যার,
শুনে প্রেমের্ কথা, যায় সাত্ সমুদ্র পার ॥
প্রেমে বোবায় কথা শুনে কানায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি ॥

॥ ৭৮ ॥

মহড়া।—বল কার্ অনুরোধে ছিলে প্রাণ্।
ছিলে আমার বশ্, কি যৌবনের বশ,
কি সেই প্রেমের বশে প্রেমীর সে
তুষতে প্রাণ ॥
রাখিতে হে অধীনীর সম্মান্।[১]
অভিমানী হোতাম হে তোমায়।

[১] তখন রাখিতে হে বিধিমতে মানিনীর সম্মান।

প্রাণোনাথ্ কার সোহাগে অনুরাগে
ধরতে আমার্ পায় ॥
তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কিসে
গেলো সে সম্মান ॥

চিতেন।—আবাহনো কোরে প্রেম্, দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন্ হোক, হোয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন্ ॥
রঙ্গরসে ছিলেম এতদিন্।
প্রাণোনাথ্, প্রেমের পথে, দুজনাতে
কে কারো অধীন ॥
শেষে যদি করিবে এমন, কেন আগে
বাড়াইলে মান্ ॥

অন্তরা।—ওরে প্রাণরে, কথা কবার্ নয়,
কইতে ফাটে হিয়ে।
পূজ্য ছিলেম্, ত্যজ্য হোলেম্,
যৌবনো গিয়ে ॥

চিতেন।—দৈব দেখা প্রাণোনাথ্ হোতো হে পথে।
আপনা আপনি ভুলিতে,
হাতে আকাশের চন্দ্র পাইতে।
এখন্ তো সেই পথে দেখা হয়।
প্রাণোনাথ, লজ্জাতে মুখ ঢাকো যেন
ঠেকোছো কি দায় ॥
প্রেমো গেছে, যৌবন গেছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥
(ঠাকুরদাস সিংহ এই গান করেন)

॥ ৭৯ ॥

[ইহার পাল্টা]

মহড়া।—কেবল কই কথা লোক লজ্জাতে
আমার যৌবন, ধন গিয়েছে যখন,
সখা তুমিও গিয়েছ আমার সেই পথে।

॥ ৮০ ॥

মহড়া।—করবে উত্তম পীরিত প্রাণরে,
সে প্রেম কি সামান্সতে হয়।
তুমি নবীনা যুবতী
পীরিতে নূতন ব্রতী,
পীরিত হবে কি মন্ তোমার তেমন্ নয় ॥
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়
দেখো ভগীরথ্ মোক্ষ প্রেমের আশাতে।
কোরে মন্ত্রের সাধন
কিম্বা শরীর পাতন
আনিলেন্ গঙ্গা ভারতে ॥
দেখো প্রহ্লাদের যন্ত্রণা
হরিনাম তবু ছাড়লে না,
তার সইতে হোলো শেষে সুখোদয় ॥
চিতেন।—শ্রীহরি প্রেমেতে মোক্ষ আশাতে
ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী।
দুর্গার ভাবেতে মুখ্য প্রেমেতে
সদাশিব হয়েছেন যোগী ॥
তোমার মনেতে তেমন্
নিষ্ঠা আছে কই।
একবার চাও পীরিতকে
আবার চাও বিচ্ছেদকে
দ্বিধা মনে কর রসময়ী ॥
যে জন্ পীরিতে রত হয়,
প্রেমধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখো প্রেমের দায়ে
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥

॥ ৮১ ॥

মহড়া।—আগে মন ভেঙ্গে শেষ্ যতন।
আর কি এ প্রেম্ গড়ে ॥

চিতেন।—প্রাণ্, দেখো এক বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফলায় প্রায়, কোরে তায় কত যতন
তুমি খল-স্বভাবী, প্রেম্তরুরো,
মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে॥
[মোহন সরকার গাহেন]

॥ ৮২ ॥

মহড়া।—হর নইহে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদ লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি।
চিতেন।—ক্ষীণ দেহে অঙ্গ, আজ্ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ
বারে বার॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেতনা পুরুষো-প্রকৃতি॥
অন্তরা।—হায়, শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরি হওনা আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে নহে এতো জটাভার॥
চিতেন।—কণ্ঠে কালকূট নহে,
দেখ পোরেছি নীল রতন।
অরুণো হোলো নয়ন্,
কোরে পতি বিরহে রোদন॥
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥[১]

১ এই গীত ভবানী বেনে গাহিয়াছিলেন, রাম বসু যখন প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ না হইতেও পারে। দেখুন এতদ্রূপ বাল্যাবস্থার গান পর্য্যন্ত উত্তম হইয়াছে। সঃ সঃ প্রঃ।

॥ ৮৩ ॥

মহড়া ।—পূর্ব্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে ।
নিজে বিপক্ষেরে দিয়ে পতির মৃত্যুবাণ,
দেখো মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে ।
নারীর্ হাতে সঁপে ধনপ্রাণ্, প্রাণ্ যেতে বোসেছ ।
আমি সাধ্ কোরে কি করি খেদ্ ।
নারী মন্ত্রণাতে, দিতে পারে,
ভাই ভেয়ে কোরে বিচ্ছেদ্ ।
ধোরে তিলোত্তমা নারী মোহিনীরো বেশ্ ।
দেখো সুন্দ উপসুন্দ প্রাণে মেরেছে ॥

চিতেন ।—ঘুণাক্ষরে যদি করি দোষ,
তিলে কোরে বোসো তাল ।
না জানি কারণো কও প্রিয়ে,
কেমন্ পুরুষের্ কপাল্ ।
তুমি আত্মছিদ্র লুকায়ে ।
পেলে পরের ছিদ্র, পাড়ায়্ পাড়ায়্
বেড়াও ঢেঁড়রা পিটায়ে ॥
নারীর নাই কিছু মমতা. দারুণ
বিধাতা, কেবল্ পুরুষে বধিতে যৌবন্ দিয়েছে ॥

অন্তরা ।—যদি অবলা অবলা, বল তবে প্রাণ্,
সবলা কে আছে আর ।
বলে চতুর্গুণ্, ছলে, অষ্ট গুণ্,
ভাবের অন্ত পাওয়া ভার ॥

চিতেন ।—কাম্নিী কোমল কে কহেরে প্রাণ,
হৃদয় অতি কঠিন্ ।
এক ঐক্যে, এক বাক্যে, এক পক্ষে,
থাকে না এক দিন্ ॥
যেমন্ সসর্পে গৃহেতে বাস্ ।
হোলে দুষ্টা ভার্য্যা, বেড়ায় গর্জ্জে,
খেলে খেলে এমনি ত্রাস্ ॥

ধনি তা নৈলেরে প্রাণ্, বোধে পতির প্রাণ্,
দেখো রাজকুমারী সতী কোটাল ভজেছে ॥

॥ ৮৪ ॥

মহড়া ।—গেল তিন দিন প্রেমে, চিরদিনের
বিচ্ছেদ গেলো না ।
রসাভাসে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে,
পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হোলো না ॥
... ...
হোলো তিন দিনে ছাড়াছড়ি
পোড়া বিচ্ছেদের কি, হয়গো সখি,
অবলারি সঙ্গেতে এত আড়ি ।

॥ ৮৫ ॥

মহড়া ।—দাঁড়াও, দাঁড়াও প্রাণ্নাথ,
বদন ঢেকে যেও না ।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখ্তে চাই, কিছু থাকো, থাকো বোলে
ধোরে রাখ্বো না ।
আমি কোন দুখের কথা,
তোমায় বল্ব না ॥
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো ।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ,
আমারি গেলো ॥
সদা রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনে পর,[১]
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না ॥
চিতেন ।—দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হোলে এ পথে আগমন ।
কও কথা, এক্বার্ কও কথা,
তোলো ও বিধুবদন ॥

১ । তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমি ত ভাবি না পর । সং প্রঃ

পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন্ তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেকের দেখি ॥
আমার কপালে নাই-সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর্ সেঁচে কিছু মাণিক পাব না ॥

॥ ৮৬ ॥

মহড়া ।—আর নারীরে করিনে প্রত্যয় ।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম-ভয় ॥
অন্তরা ।—নারী মিল্‌তে যেমন, ভুল্‌তে তেমন্
দুই দিকে তৎপর ।
মজায় পরে, চায়না ফিরে,
আপ্‌নি হয় অন্তর ॥
চিতেন ।—উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন ।
নারী বারি, দুই জনারি,
নীচ পথে গমন ॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী তপনে তেজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে
মধু বিতরয়্ ॥

॥ ৮৭ ॥

(পাঁলটী গান)

মহড়া ।—দেখি দেখি তোর্ খেদে,
বাঁচে কিনা বাঁচে প্রাণ ।
তুই তো যা এখন ; ফিরে দিয়ে মন,
তোরে সাধতে যাইতো তখন্ করিস্ অপমান ।

॥ ৮৮ ॥

মহড়া ।—প্রেমের কথা, যেথা সেথা,
কারো কাছে বোলো না ।
আছি ভাল দুজনায়, অনেকে বিবাদী তায়,
জান না যে পরের ভাল,
পরে দেখ্‌তে পারে না ॥

॥ ৮৯ ॥

মহড়া ।—এবার আমি পণ কোরেছি,
মন্‌কে পীরিত ছাড়াবো ।
ঘুচ্‌লো আশাপথ এমন ভণ্ড প্রেমে
দণ্ডবৎ, বরণ, বিচ্ছেদেরে নিয়ে প্রাণ্‌ জুড়াবো ॥

॥ ৯০ ॥

মহড়া ।—আহা মরি কিবে ভালবাসো আমারে ।
বল্‌তে তোমার গুণ, লোহায় লাগে ঘুণ
জলে আগুন জলে আবার পাষাণ বিদরে ॥

॥ ৯১ ॥

মহড়া ।—ছেড়েছি পীরিতের আশা,
পীরিত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও ।
যার সঙ্গেতে এসেছিলে আমার অঙ্গেতে,
সে গেল আর তুমি কেন,
দুখিনীর মুখ্‌ দেখতে চাও ॥
চিতেন ।—তাইতে বলি পীরিত আমি ছেড়ে যাও তুমি
এক্ষণে, তোমার সনে, থাক্‌বো কেমনে আমি ॥
তুমি পীরিত আত্ম-সুখে সুখী ।
অনাথিনী, বিরহিণীর, কাছে তোমার্‌ কার্য্য কি ॥
তুমি পর, আমি পর, সেও তো পর,
পর্‌ মজানে পীরিৎ তুমি,
মিছে কেন অঙ্গ জ্বালাও ॥

॥ ৯২ ॥

মহড়া ।—যদি বেঁধে থাকি, ওগো সখি, শঠের সঙ্গে
আর পীরিত কোর্ব্ব না ।
না কোরে প্রেম ছিলাম্‌ ভালো,
কোরে একি জ্বালা হোলো,
লজ্জা সরম্‌ সকল গেলো,
কেউত' ভাল বলে না ॥

পীরিতের বাজারে সই, আর যাব না।
মিছে ছল্ কোরে বলো কিবে ফল।
মনের মিলন্ ছিলো, বিচ্ছেদ্ হোলো,
হংসমুখে পীরিত যেন দুগ্ধ-জল ॥
চিতেন।—পীরিতে জীবন জুড়াতে,
সখি, পরের হাতে সঁপেছিলাম প্রাণ।
আমার কুল্ গেলো, কলঙ্ক হোলো ঘরে
পরে সবাই করে অপমান ॥
পীরিত সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ।
যেমন খলের মিলন জলের লিখন,
সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক ॥
দেখে কুতর্ক, কুব্যবহাব সতর্কে আছি এবার
পরের্ পরকীয় রসে ভুল্‌ব না ॥

মহড়া।—কও দেখিহে নূতন্ নাগর, এ কি নূতন ভাব রাখা।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
ছ' মাসে ন' মাসে তোমার পাইনেকো দেখা ॥
এমন্ নূতন ভাব্, কে তোমায় শিখালে সখা ॥
কেবল্ পর মজাতে জানো।
থাকো আপন সুখে,
পরের দুখে দুখী হও না কখনো ॥
তোমার তাদৃশী পীরিতি দেখি ওরে প্রাণ,
যেমন্ খলের পীরিত বলে জলের্ রেখা ॥
চিতেন।—নূতন প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন আকিঞ্চন।
নূতন ভাব, ধোরে নূতন্ স্বভাব, হোরে নিলে মন ॥
নূতন্ প্রেম বাড়াবার্ লেগে।
এসে নিত্যি সখা, দিতে দেখা, নূতন্-নূতন্ সোহাগে।
এখন্ কোথা রৈলো তোমার সে সব নূতন্ ভাব,
পেলে ছুতো-লতা কর বদনো বাঁকা ॥

অন্তরা।—প্রাণ্ এত ছিল মনে,
তবে কেনে, মজালে আমায়।
আমি অবলা, কুলেরো বালা, এত জ্বালা
কি সহা যায়॥
চিতেন।—শীলতা, শমতা, কোথা ওরে প্রাণ;
কোথা নূতন্ আলাপন।
নূতন ছল, এমন্ নূতন কৌশল, কোথা
তুমি শিখেছ প্রাণ ধন॥

॥ ৯৪ ॥

মহড়া।—তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে
প্রাণ, জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হোলেম্ তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল্ নির্ব্বাণ॥
বিষকৃমি, সম আমি,
করি বিষ খেয়ে অমৃত জ্ঞান।
চিতেন।—গেল গেল পীরিত, গেল প্রাণ,
ভাল বাঁচিল জীবন।
দরশন, পরশন, ঘুচ্‌লো প্রাণ্, এখন॥
হোলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ' মাসের পথ।
কানে শুনে প্রাণ্ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবৎ॥
পাষাণ্ হোয়ে, থাক্‌বো সয়ে
পারো যত কর অপমান॥

॥ ৯৫ ॥

মহড়া।—এই বড় ভয়্ আমারো মনে।
পাছে কুল যায়্, না পাই প্রেমধন্,
শেষে হাস্‌বে শত্রুগণে॥
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে॥

প্রেম সুধা আস্বাদন্।
সদা করিতে চাহে পোড়া মন্॥
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো,
দিব হাতো, ফণীর্ বদনে॥

চিতেন।—সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আসে, মোজে শেষে, কুল বা হারাই॥
একে তরুণো তরি।
তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী॥
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো,
দেখো যেন ডুবে মরিনে॥

॥ ৯৬ ॥

১ চিতান।—প্রেমবৃক্ষে দিয়ে আশা নীর, কর্‌তেছ সৃজন;
১ পরচিতান।—দেখ লো যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।
১ ফুকা।—বেড়া দাও সই, প্রবৃত্তিকণ্টক
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এম্‌নি পোড়া লোক।
১ মেল্‌তা।—যদি থাকে ফলের বাসনা,
বেশি জল দিয়ে জালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে।
মহড়া।—প্রেম-তরুতে সখি চার্‌টি ফল ফলে।
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম,
সুজনের স্থ, কলঙ্ক কঠিনের কপালে॥
খাদ।—গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢালে॥
২ ফুকা।—চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেমতরুতে হাতে-হাতে ফল;
২ মেল্‌তা।—তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়,
বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখ-দেখ যত্নে রেখ, ফল্‌বে না মূল শুখালে।[২]

প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ৯৭ ॥

(পূর্ব্বোক্ত গানের পালটা)

মহড়া ।—বাঁচ্‌লাম প্রাণ্ ।
বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয় ॥
আগে ভেবেছিলাম পীরিত,
ভাঙ্গলে যাবে প্রাণ,
এখন্ বাঞ্ছা করি যেন নিত্যি এম্‌নি হয় ।
এক্‌বার্ পোড়ে যে পতঙ্গ হে,
তার আতঙ্ক কি রয় ॥
যখন আখণ্ড ছিল পীরিত ।
ও আতঙ্গ হোতো,
ভঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিত্ ।
দেখ ভাঙ্গা শঙ্কা যার,
ভেঙ্গে গেছে তার
আমি এক্ আঁচড়ে পেলেম্
প্রেমের পরিচয় ।

চিতেন ।—যে অনলে আমায় পোড়ালে
তুমি কি তায় পুড়বে না ।
যার দোষে প্রেমো যাক্ ভেঙ্গে, তাতো গড়ে না ।
প্রেমের ধাঁধাঁ থাকে যতদিন ।
বাঁধা থাকতে হবে,
সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন ॥
সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব,
আমার কোমল প্রাণে এখন্ সকল জ্বালা সয় ।

অন্তরা ।—আমি দেখিছি, শিখেছি, সতর্কে আছি,
আর্‌তো ভোগায় ভুল্‌ব না ।
না এলে তুমি, এখন্ আর আমি,
পায়ে ধোরে সাধ্‌ব না ।

চিতেন ।—আভাঙ্গা পীরিতের যত ভয়, ভাঙ্গলে তত থাকেনা
তালি দেখে কলির ত্রাস ধরে, ফুট্‌লে ছাড়ে না

এখন নই আমি সেই কলিকে।
সকল দেখে শিখে,
হোয়েছি হে প্রেমে বড় রসিকে ॥
পারি সাঁতারে সাগর পার হোতে নাগর,
কাণ্ডারী যদি হে মনের মত হয় ॥

॥ ৯৮ ॥

মহড়া।—যাক্‌রে প্রাণ,
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল, গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীত যন্ত্রণায়,
সাধের পীরিত ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল ॥
দেখা শুনা পুন হবে হে, তার আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্যেরে হাস্য-কৌতুক।
পথে দেখা হোলে যাব চলে, অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ ॥
ধোরে ভালবাসার ভাব্, হোলো ভাল লাভ্,
সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল ॥
চিতেন।—পীরিতেরো সাধ ঘুচালে, দুখে জ্বালালে জীবন
না জানি কারণো, কও কেন, ভাঙ্‌লো তোমার মন
যা হোক্ ভাল ভালবাসিলে।
খেয়ে আমার মাথা,
পরের কথায় পীরিত ভেঙ্গে পালালে।
কোরে আমার উপর রাগ্, রাখ্‌লে যার সোহাগ্
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল ॥
অন্তরা।—তোমার পীরিতি কি রীতি, হোল হে যে মন,
হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পালায় ॥
চিতেন।—বিধিমতে আমায় মজালে, দুখে জ্বালালে হৃদয়।
বুঝি দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥

তোমার অন্তরে নাই একটু টান্।
বল ভালবাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি, হাস প্রাণ,
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান, পেলেম্ ভাল জ্ঞান,
এখন্ ঘরে পরে সকল শক্র হাসিল ॥

[নিজ দলে গাহেন]

॥ ৯৯ ॥

মহড়া।—সখি বল্‌ব কি এ ছুখিনীর জ্বালা বারোমাস।
গেল চিরকাল্ কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হোয়েছে যেন সীতের বনবাস ॥
যদি কই, তবেই সই সর্ব্বনাশ!

চিতেন।—ভাল শুভক্ষণে, তাতে আমাতে,
এক রজনী দেখা সই।
তারপর্ আমিই বা কে, সেই বা কে,
কর্ম্মে পাওয়া গেল কই ॥
কেমন্ হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার।
চক্ষে দেখ্‌তে পাই, দুঃখে মোরে বাই,
করে না সাপক্ষ ব্যাভার ॥
আমি লজ্জা খেয়ে যদি, করি সাধাসাধি,
উল্‌টে সে করে আমায় উপহাস ॥

অন্তরা।—সই, আগে ছিলাম্ সুখে, নব বালিকে,
এখন্ সে কলিকে ফুট্‌লো।
মধুব্রতী হেরে বঁধু বিগুণ্,
দ্বিগুণ আগুন জ্বোলে উঠ্‌লো ॥

চিতেন।—পূর্ণ ষোলকলা, ষোড়শী বালা, যৌবন ধরা নাহি যায়
কৃষ্ণপক্ষে যেন দিনের দিন, হোচ্ছে কলানিধি ক্ষয় ॥
আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন্
কল্লে না রক্ষে, সঁপে বিপক্ষে
আগলে বেড়ায় পরের ধন্।[১]

১ পাঠান্তর—দেখিলা বিপক্ষে রক্ষা করি যখের ধন। গুপ্তঃ, ২৯৭

রেখে একলা অবলারে, বিরহ-বাসরে,
করে সে পরের সঙ্গে সহবাস ॥

॥ ১০০ ॥

ঐ গীতের পাল্‌টা

মহড়া।—প্রাণনাথেরে প্রাণসখি, তোমরা কেউ বুঝাও ॥
আমি বললে তো শুনবে না, স্বভাব-দোষ ছাড়্‌বে না,
বল্‌বো না কোথা যেতে চাও যাও।
যৌবন যায়্‌, একবার তায় শুনাও ॥
কেমন্‌ পোড়েছি বিষ নয়নে তার্‌।
ফুটল এ মুকুল, হয় না অনুকূল,
ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার্‌ ॥
থাকতে বর্ত্তমানে পতি, সতীর এ দুর্গতি
পারতো সকল জ্বালা ঘুচাও।
চিতেন।—বুঝলাম্‌ মনে-মনে, কোকিলের গানে,
ডুবলাম কলঙ্কে এবার।
ত্যজলাম্‌ সকল সুখো ভজে যায়,
মোজলাম বিচ্ছেদে তাহার ॥
আমি সাধে কি সাধিনে গো তায়।
দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়,[১]
সে যেন চোখের মাথা খায়!
হোলো কি গুণে পরের বশ্‌, ছেড়ে ঘরের রস
গোপনে দুটো কথা সুধাও ॥

১ জানলেম ভাগ্যে সই পূর্ণ হল না অভিলাষ।
আমি সাধে কি সাধি না সই তায়;
দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়.
সে যেন চোখের মাথা খায়।
রেগে বিরহ বাসরে, যুবতী নারীরে
প্রাণনাথ সুখেতে কর্‌লে নিরাশ। গুপ্তঃ, ২৯৭

॥ ১০১ ॥

১ চিতান ।—প্রেমে সুখী হব বলে সখী গো,
সঁপিলাম পরে প্রাণ মন ।
১ পরচিতান ।—ভাগ্যগুণে সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো
আমার সই এখন ।
১ ফুকা ।—প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার,
জান্‌তাম না আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার ।
১ মেল্‌তা ।—আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বল না ।
আমায় বল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে ।
মহড়া ।—সঁপিলাম এই ভেবে তায় আগে মন ;
কে জানে সে মন না দিবে ।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে, পরের ধন পেলেম না পরে
স্বপ্নে জানি না সে এই শত্রু হাসাবে ।
খাদ ।—আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে, কে জানে শেষে কাঁদাবে
২ ফুকা ।—ভাব্‌লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ ;
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান ।
২ মেল্‌তা ।—মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না ;
তাতেই মজে গে পুরুষের শঠভাবে ।[১]

॥ ১০২ ॥

১ চিতান ।—যতনে মন প্রাণ প্রেয়সী, করেছি তোমায় সমর্পণ
১ পরচিতান ।—তোমারি প্রেমে আমি বিক্রীত,
অন্যের নহি কদাচন ।
১ ফকা ।—কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
নিরন্তর তুষি মন তবু যশ করে না নারী ।
১ মেল্‌তা ।—তোমার নারী জাতির স্বভাব,
কেবল অভাব করা প্রাণ,
এভাব শিখালে বল শুনি কে তোমায় ।

---

১ প্রাঃ কঃ গাঃ

মহড়া।—অন্য কার নই, শুন লো রসময়ী ;
মিছে দোষ দাও কেন আমায়,
অন্যের যদি হতাম, তবে তোমায় নাহি তুষিতাম,
হরি লয়ে মন যশ কর না একি দায়।
খাদ।—নারীর স্বভাব—দোষে নাগরকে,
নিবৃত্তি না মানে কথায় ;
২ ফুকা।—তার প্রত্যক্ষ দেখ সীতা সুন্দরী
রামকে বলিলেন মৃগ দাও আমারে ধরি।
২ মেল্‌তা।—গেলেন কুটীর ত্যজে সীতার কথায় রঘুনাথ,
তবু লক্ষ্মণে দুষ্‌লেন সীতা পুনরায়।[১]

॥ ১০৩ ॥

১ চিতান।—বল্‌সনে সখী প্রেমে মজ্‌তে আর,
ও সুখে নাহি প্রয়োজন।
১ পরচিতান।—শঠের প্রণয় হতে বিচ্ছেদে ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন।
১ ফুকা।—প্রাণে জ্বলিলাম চিরদিনই সখী গো করে পিরীতি,
ঘটলো না তার সুখ, চির দিন ভুগ্‌লাম দুখ,
হল লাভ কেবল অখ্যাতি।
১ মেল্‌তা।—তাতেই পিরীতের সাধ করে বিসর্জ্জন,
বৈরাগ্য-ধর্ম্মে মন মজেছে।
মহড়া।—প্রাণ বেঁধেছে গো সই, পিরীতি গেছে—পাপ গেছে,
হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহক বেনে এতদিনে, গায় বাতাস লেগেছে।
খাদ।—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘামদে জ্বর ছেড়েছে।
২ ফুকা।—এখন নই গো সই, কাহার আমি অধীনী,
স্বয়ং স্বাধীনী,
ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার
আপ্ত মানে মানিনী।

---

১ প্রাঃ কঃ গঃ

২ মেল্‌তা।—পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা; সে
জ্বালার দায়ে ত প্রাণ এড়িয়েছে।[১]

॥ ১০৪ ॥

১ চিতান।—পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ;
১ পরচিতান।—কোন সুখ দেখি না শঠের প্রেমে দুঃখ বার মাস।
১ ফুকা।—কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বলায়;
আজ্ নেতোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।
১ মেল্‌তা।—পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই
হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর;
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে।
মহড়া।—তোমার প্রেম হতে প্রাণ
বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।
প্রেম হল আর ফুরাল, চখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।
খাদ।—কলহ নির্ব্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।
২ ফুকা।—তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান,
সুখ হবে কি বল দেখি সাধ্‌তে গেল প্রাণ।
২ মেল্‌তা।—এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে![২]

॥ ১০৫ ॥

১ চিতান।—নবীন বয়সে রঙ্গ রসে দিনে দেখা হ'ত শতবার;
১ পরচিতান।—নীরস নলিনী এখন ভ্রমর—চাইবে কেন ফিরে আর।
১ ফুকা।—আগে প্রাণ হল, তার পরে হল যৌবন ঘটনা;
বিধাতার এ কি বিবেচনা,
যৌবন গেল প্রাণ ত গেল না।
১ মেল্‌তা।—আমি কি ছিলাম, কি হ'লাম, আর বা কি হই;
সেই অনুতাপে আমার তনু শুখাল।

১ প্রাঃ কঃ গাঃ

২ প্রাঃ কঃ সঃ

মহড়া।—কোথারে যুবতীর যৌবন
তোমা বিনা নারীর মান গেল।
নবীন কালে দেহে ছিলে,
প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হল।[১]

॥ ১০৬ ॥

১ চিতান।—নূতন যারা তোমার তারা নয়নের তারা,
১ পরচিতান।—একি স্থলে ভুল, যে জন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।
১ ফুকা।—কোথা শিখ্‌লে প্রাণ এমন মন রাখা ;
বুঝ্‌তে নারি ভাব, এ কি ভাব তোমার আজ সখা।
১ মেল্‌তা।—ত্যাজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান,
কর পূজ্য ধনের অপমান।
মহড়া।—ছি ছি প্রাণ, বলো না প্রাণ।
ইথে হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে।
শেষে হবে কি হে অপমান।
খাদ।—যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ।
২ ফুকা।—আমায় বল্‌লে প্রাণ প্রাণ জুড়াবে না।
শুন্‌লে সে আবার, পাবে প্রাণ প্রাণে যাতনা।
২ মেল্‌তা।—আমায় করে অন্তরের অন্তর,
পরে অন্তরে দিয়েছ স্থান।
অন্তরা।—যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ বলগে—
হবে তার সুখ ;
আমায় কেন বলে প্রাণ বাড়াও দ্বিগুণ দুখ।
২ চিতেন।—ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন,
২ পরচিতান।—এখন হলাম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

৩ ফুকা।—তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার,
করব অনাদর কি দোষে বল হে তাহার।
৩ মেল্তা।—চখের দেখা মুখের আলাপন,
এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।[১]

॥ ১০৭ ॥

মহড়া।—কে সাজালে হেন যোগির বেশ।
বল অলিরাজ সবিশেষ॥
কেতকী সৌরভ অঙ্গ তব অশেষ।
রজ লেগেছে কালো গায়,
হোয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুলি ঢুলি ছুটি আঁখি রূপেরো না দেখি শেষ।
চিতেন।—ধুতূরা পীযূষ বঁধু করেছ হে পান।
হেরিয়ে তোমারো মুখো, করি অনুমান॥
তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন,
আঁখিছুটি উর্দ্ধে উন্মীলন।
মধুভিক্ষা করে বঁধু ভ্রমিতেছো নানা দেশ॥

॥ ১০৮ ॥

মহড়া।—পরেরো মন্ত্রণায় বাদ কোরে প্রেমের
সাধ কেন ঘুচালে।
সেধে আপনার কায,
কেবল আমায় মজালে॥
যখন নবভাব ছিল সে এক মন,
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলো যেন শরতের মেঘের গর্জ্জন।
ছিল নয়নের দেখা, তাহে ক্ষতি কি সখা
কেন সে প্রবৃত্তির পথে কণ্টক দিলে॥

---

১ প্রাঃ কঃ গাঃ

চিতেন।—এ সুখেরো প্রবৃত্তি কিসে নিবৃত্তি হোলো
বলো দেখি প্রাণ।
মনের খেদে, মরি সেই বিষাদে,
ঝরে দুনয়ান॥
পরে ভাঙ্গলে মন তার কি এম্‌নি হয়।
এখন ডাক্‌লে সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥
তোমায় এ পথ ভুলায়ে
সে পথে নে গেলো যে,
এমন্ বশীকরণ বিদ্যা সে কোথায় পেলে॥
অন্তরা।—আমার আশা বৃক্ষে, অনেক দুঃখে,
ফল পরীক্ষে করা হোলো না।
আজন্মকালাবধি, সাধনের নিধি,
দিয়ে বিধি দিলে না॥
চিতেন।—এ বড় তিতিক্ষে, আমার এ পক্ষে,
ব্যথার ব্যথি কে হোলো।
দিয়ে প্রেমের শিক্ষা পড়া;
হরে নে গেলো॥
ভালো গোপনে দিয়ে দীক্ষে, সদা
সদা সেই পক্ষে টান, তোমাররে প্রাণ
কৃষ্ণপক্ষ হোয়েছো আমার পক্ষে।
আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যে পক্ষে
উদয় চাঁদ্, কেন মায়ামেঘের আড়ে
কায়া লুকালে॥

॥ ১০৯ ॥

পুরুষ পক্ষ হইতে

চিতেন।—রমণী অমৃত মাখা বিষ, ভাবে অহর্নিশ ভাবায়।
নারী ভাব্‌বো না আর, করবো এবার, নমস্কার
তোমার ঐ মিষ্টি কথায় পায়।

যার তুলনা না পাই, নারী তাই
(যখন) যার কাছে রয়, তার মত হয়,
মরণ বাঁচন ছুটি কাটি নারীর ঠাঁই
মরণ কাটি মারে যারে, জন্মের মত সারে তারে
জীবন কাটি ছোঁয়াবে যারে,
সে পায় উপায় যোগেযাগে ॥

মহড়া।—নারীর কতগুণ, জ্বালায় মনের আগুন, শতগুণ।
তবু নারী ভাল লাগে
কাঁদিয়ে যদি একবার হাসে, বোধ হয় কত ভালবাসে
হাজার যদি রোষ প্রকাশে, রাগ থাকে না অনুরাগে।
এই তো বিদ্যে, তবু সে বিদ্যেয়, মহাবিদ্যে তুল্য জ্ঞান ;
কি মোহিনী বিদ্যে, কত কৃতবিদ্যে বিদ্যাবাগীশ গড়াগড়ি যান

(পরচিতেন)।—গণি, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এমনি ভান করে।
(ভিজে) মার্জ্জারের প্রায়, ভ্রমে সদায়, অন্য চিন্তা অন্তরে ;
জানায় এমনি সরল আচরণ মজায় মন,
(মৃণাল) সূত্রের ছাঁদে হস্তী বাঁধে—
নারীর ফাঁদে পড়ে কাঁদে কতজন।
সমুদ্র বা'ছ করায় সরায়, রাজাকে ডোর-কপনী পরায়
কোটালকে রাজছত্র ধরায় অচল চালায় তাকে বাকে ॥

॥ ১১০ ॥

মহড়া।—দেশ্ ঢলালেম প্রেম্ কোরে সই,
প্রাণ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ্ বিষে, লোকের্ রিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জ্বল্‌তেছি ॥

চিতেন।—না বুঝে মজেছি প্রেমে,
কপালক্রমে, একে হোলো আর।
আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম্,
শেষ প্রাণ্ বাঁচানো ভার ॥

একে নব ভাব্, অনুরাগ্ পড়ে মনে।
প্রাণ সঁপিলাম্ তারে
আমি না জেনে শুনে ॥
চোরেরো রমণী যেমন সই,
তেমনি মর্ম্মে মোরে আছি ॥

॥ ১১১ ॥

মহড়া।—ওহে প্রাণনাথো, পীরিৎ হোলো
বিচ্ছেদের্ প্রজা।
শুনেছি প্রেমনগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে,
রসিকেরে প্রাণে মারে,
সেই দুরন্ত রাজা ॥
প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা।
প্রেমের্ দেশে প্রাণনাথো হে, বিচ্ছেদ্ ভূপতি।
তার আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি,
কেমন কোরে কর্ব্ব পীরিতি ॥
চিতেন।—তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেম করিতে।
মনে সাধ হয় আবার্ করি ভয়,
প্রাণরে তোমায় প্রাণ দিতে।
নূতন প্রেম্ বাজার্, বিচ্ছেদ্ রাজার,
অধিকার।
নবীনা যুবতী, করিলে পীরিতি,
বিচ্ছেদ তো কর্ লবে আমার ॥
শেষে আমাকে পাবে না, হবে হে লাঞ্ছনা
কেবল কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক-ধ্বজা ॥

॥ ১১২ ॥

মহড়া।—যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ্ একোবার
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ হানে গো
তায় বিচ্ছেদ্ বাণ, যদি জ্বালায়
জ্বোলে আমায় বোলে মনে পড়ে তার ॥

রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার ॥
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুহৃতো ভঙ্গ ॥
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে,
রবে না সে আর ॥

চিতেন।—বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার
যৌবন কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার ॥
ওহে বিচ্ছেদ্ তোমার বিচ্ছেদ্ দায়,
নাথো না জানে।
অন্য নারীর্ প্রেমোস্নুখে আছে সেখানে।
তারে জ্বলাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছিছি, অবলা বধিলে নাহি পৌরুষো তোমার ॥

অন্তরা।—সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ্ করি তোরে বিনতি
কামিনীরো প্রাণো রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

চিতেন।—হোয়ে আমার অন্তরের্ অন্তর্
নাথের অন্তরেতে যাও।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়্, প্রণয় গে' ঘটাও ॥
বিচ্ছেদ্ ব্যথার ব্যথা কিছু তায়, দিও বিশেষ।
নারীর্ প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থূলে ভুল,
ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার ॥

॥ ১১৩ ॥

মহড়া।—আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়;
এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমারো এদেশে, অনেক আছে,
তারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী ॥
কেবল মিছে ভ্রমে, ভ্রমি মরি ॥

অরসিক্ গ্রাহকে এ রস চায়্।
মূল্য শুনে কানে মাথা নোওয়ায়্॥
পশরা নামাতে আসে অনেকে,
আগে তুই বাহু পশারি॥
চিতেন।—মদন রাজার প্রেমেরো বাজার,
এলে প্রেম লাভ হয়্।
রসিকে রমণী, এলেম্ আমি, সেই আশায়্॥
আগে কে জানে সই এ বিবরণ্
কপট মহাজন্ হেথায় এমন্॥
নূতন ব্যবসায় রমণী পেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী॥
অন্তরা।—এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা,
ভার হয়্ আপনার সহিতে।
যৌবন রসের, ভার অতি ভার,
নারী নারি আর বহিতে॥
চিতেন।—গোপেতে গোরস, লোয়ে দেশে দেশে,
ভ্রমণো করে যেমন্।
এত নয়্ তাদৃশ গছাবার ধন্,
রসিক গ্রাহক যত্তপি পাই।
বিরলে বিক্রয় করি তার্ ঠাঁই
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব
আমি তাহারি॥

॥ ১১৪ ॥

মহড়া।—তোমার প্রেম্ গেছে তবু প্রাণের প্রাণ্,
মান্ রেখে কথা কই।
কত পুরুষ্ তুমি পাবে,
সবাই তোমার মন্ যোগাবে,
আমার প্রাণ কে জুড়াবে, প্রাণ্ তুমি বই॥
গেছে রস্, তবু আছি তোমার বস্
ভগ্নভাবে মগ্ন রই॥

চিতেন—কল্পতরু যদি কৃপণ্ হয়, তবু রয় মহত্ত্ব।
কত জন সুখের ফলের প্রয়াসে,
প'ড়ে থাকে নিয়ত ॥
তোমার তেম্‌নি ভাব হয়েছে।
ওরে প্রাণ্‌রে আর কি সাধ্ আছে ॥
কেবল লুব্ধ আশায়্ প্রাণ পড়ে আছে ॥
প্রিয়ে সাধিলে মনের্ সাধ্,
আর এখন চায়া কি
হব দত্তহারী যদি মন ফিরে লই ॥

॥ ১১৫ ॥

মহড়া।—নৈলে কিছুই নয়।
বটে সুখনিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয় ॥
সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়।
উভয়ে উত্তম, পরিশ্রম, যদি করে।
তবে যতনে, এধনে, রাখিতে পারে ॥
সুখের সুখী, দুখের দুখী, দোঁহে
দোঁহার হোয়ে রয় ॥
(নীলু ঠাকুর এই গীত গান করেন)

॥ ১১৬ ॥

মহড়া।—বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন্ ॥
কত দিনে প্রাণ তুমি, হোয়েছ এমন।
প্রিয় বাক্যে প্রেয়সী বলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায় ॥
ভুজঙ্গের মুখে যেন, সুধা বরিষণ ॥
(নীলু ঠাকুর এই গীত গান করেন)

॥ ১১৭ ॥

মহড়া।—আগে মন্ ভেঙ্গে শেষে যতন্ ॥
আর কি এ প্রেম্ গড়ে।

সেধোনো এখন প্রাণ, কেবল
কেবল রাগ বাড়ে ॥
মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণ,
বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে ॥

চিতেন।—প্রাণ যদি এক বৃক্ষে কেউ করয়ে রোপণ।
ফল পায়, কোরে তায় কত যতন ॥
তুমি খল্ স্বভাবি প্রেম তরুর,
মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে ॥

(মোহন সরকার এই গীত গান করেন)

॥ ১১৮ ॥

মহড়া।—যা ভাবো তা নয়।
মনের্ সাধ গেলে কি, বল দেখি,
অনুরোধে প্রেম্ কি রয় ॥
মিছে আর্ কোরোনা বিনয়।
বিনে ঐক্যে, বিনয় বাক্যে প্রাণ,
বল পর কি আপনার হয় ॥

চিতেন।—মিছে কেন আকিঞ্চন কর ওরে প্রাণ।
মন ভুলবে না, আর খুল্‌বে না
সেই বিচ্ছেদের বাণ।
দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে আর্ বল
নিত্যি কে যাতনা সয় ॥

অন্তরা।—জাগা ঘরে যায় চুরি,
এমন তো ভেব না প্রাণ।
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে,
হোয়েছি সাবধান ॥

চিতেন।—কুতর্কে লওয়াব কি আর্ সতর্কে আছি।
হব খলের বশ, এখন নাই সে রস
নিজ মনকে বেঁধেছি।
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি,
এখন তত্ত্ব কর নগর্ময় ॥

॥ ১১৯ ॥

বসন্ত

মহড়া।—রমণী হোয়ে রমণীরে রতি মজালে।
তারো মৃত পতি, কেন বাঁচালে ॥
বিরহিণীর দুখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা।
আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা সে অদেখা,
শত্রু বুঝাব কি বোলে ॥

চিতেন।—অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।
একবার মনে করি, ভয়ে ভজ্‌ব মৃত্যুঞ্জয়।
আবার ভাবি তায় কি হবে।
রতি তো পতি বাঁচাবে।
একবার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন পেলে ॥

অন্তরা।—মরি কি তার গুণের পতি।
কি গুণে বাঁচালে রতি।
অসতীরে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি ॥
(মোহন সরকার এই গীত গাহেন)

॥ ১১৯ক ॥

(ঐ গীতের পাল্‌টা)

মহড়া।—রতি কি, তারো নিজ পতি, করে না দমন্।
পেয়ে পরনারী, মজালে মদন্ ॥
নির্ব্বিবেকী নারী সে কেমন্।
আমরা নিজ পতি জনে।
চাইতে না দিই কারো প্রাণে ॥
সে কেমনে, পতি ধনে, পরে সোঁপে, ধরে জীবন

চিতেন।—বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহী যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ ॥

যত কোকিলে কুহরে।
তত হানে পঞ্চশরে ॥
অবলারে প্রাণে মারে, স্মর-শরে, করে দাহন ॥
অন্তরা।—রতি যদি পতিব্রতা, সে কোথা তার পতি কোথা
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরেগো আমাদের হেথা ॥

॥ ১২০ ॥

বিরহ

মহড়া।—কও বসন্ত রাজা। তোমার কোথায় সে প্রবাসী প্রজা।
একা গেলে একা এলে, দুখিনীর কি কোরে এলে,
তোমায় কি সে পাঠ্‌য়ে দিলে, আমায়্‌ কর্‌তে ভাজা ভাজা ॥
আন্‌লে তারে, যে যার ধারেছে, সব্‌ যেতো বোঝা সোঝা।
তুমি নারীর বেদন জান না।
ঋতুরাজ হে, কেন তারে সঙ্গে কোরে আনলে না।
কর অবলার উপরে বল্‌, ভাল খল্‌,
দিলে পুরুষের বদলে নারীর সাজা ॥
চিতেন।—গ্রীষ্মে, বরিষে, আশার আশ্বাসে প্রাণ রহেছে।
তার্‌ পর্‌ শরদ শিশির্‌, বিরহিণীর্‌ প্রাণে সয়েছে ॥
আমার প্রাণকান্ত না আসায়।
ঋতুরাজ্‌ হে। তুমি হোলে শীতান্ত কৃতান্ত প্রায় ॥
যে জন ধারে তোমার রাজকর, দেশান্তর
তারে আস্তেতো পাল্লে না কোরে সোজা ॥
অন্তরা।—আজি বিরহ বাসরে, নাথেরে ভেবে অন্তরে,
শর শয্যায় করিয়া শয়ন্‌।
সংগ্রামে পাণ্ডবের হাতে, ভীষ্মদেবের দশা যেমন ॥
চিতেন।—দেখ্‌লে না সে চক্ষে, যত বিপক্ষে, প্রাণ্‌ জ্বালালে।
দেখ বনের পক্ষ, সে বিপক্ষ, বসন্ত কালে ॥
তুমি উল্‌টা বিচার করো না। ঋতুরাজ হে, রাজাতে
কি হাজা শুকো ধরে না ॥

কোরে তোমার এ রাজ্যেতে বাস, সর্ব্বনাশ হোলো
দুখিনীর ভাগ্যেতে দুকুল হাজা ॥
(এই গীত নিজ দলে গাহেন, পশ্চাতে তাহার পাল্টা লিখিত হইল)

॥ ১২০ক ॥

মহড়া ।—ঘর আমার নাই ঘরে ।
মদন কর দিব কি তোমার করে ॥
ভূমিশূন্য রাজা তুমি, পতি শূন্য সতী আমি,
আমার স্বামি গৃহ শূন্য, কাল কাটালেন্ পরে পরে ।
সর সর পঞ্চশর হে, ডর করিনে ও ডরে ॥
আমার জীবন শূন্য এ জীবন ।
ঋতু রাজ হে, শূন্য গৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ ॥

॥ ১২০খ ॥

মহড়া ।—সব জ্বালা জুড়ালো ।
আমার প্রবাসী নিবাসে এলো ।
তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলাম
আমার রাজা, এখন্ তুমি মদন রাজা
কার্ কাছে কর লব বলো ॥
(আর পাওয়া যায় নাই)

॥ ১২১ ॥

মহড়া ।—আমার পতিকে বোলো, দেশের ভূপতি বসন্ত ।
যদি সে রৈল দেশান্তর, কে দিবে রাজার কর,
হবে কি কোকিল রবে প্রাণান্ত ॥
সে তো জানে না, ঋতু বসন্ত কেমন দুরন্ত ।
অঙ্গে দে কর, বলে দে কর ।
বলি সর, ওরে পঞ্চশর,
আমাদের ঘরেতে নাহি ঘর ।

মদন যে করে করের তরে, এমন্ আর কে করে,
ওরে সাধে কি কোরেছে শিব শাঁপান্ত ॥
চিতেন।—ভার্য্যা রেখে মদন রাজ্যে সই কান্ত গেল দেশান্তর।
সজনি, কিবা রজনী, বিরহে দহে কলেবর ॥
যেমন আমার কপাল পোড়া।
তেম্নি, সই পোড়ার ভয়েতে পুরুষ্কে ধরে না সই,
এসে কামিনীর কাছে হোলো কৃতান্ত ॥
(এই গীত নিজ দলে গাহেন)

॥ ১২১ক ॥

ঐ গীতের পাল্টা

মহড়া।—যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোভে চায়।
আমায় সঁপিয়ে মদনে, সে রইল সেখানে
এখানে সতী মরে পতির দায় ॥

॥ ১২২ ॥

মহড়া।—যৌবন জনমেরি মত চায়।
সে তো আশাপথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণসখি, রাখিব উহার।
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাই আসে পুনর্ব্বার।
বাঁচিতো বসন্ত পাবো, কান্ত পাব পুনরায় ॥
চিতেন।—গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হোলো কাল এ যৌবনকাল।
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তারো আসার আশায় ॥
অন্তরা।—হায় ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায় ॥
অন্তরা।—কৃষ্ণপ্রতি প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষ হয়, পুন পূর্ণোদয়।

যুবতীর যৌবন হোচ্চে ক্ষয়।
কোটি কল্পে পুন নাই হয়।
যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্যগমন প্রায়॥
(এই গীত মোহন সরকার গাহেন)

॥ ১২৩ ॥

মহড়া—ঘরে ঘর্ করা ভার হোলো সখি,
আরতো বাঁচিনে।
একে মদন্ সর্ব্বনেশে, নারীর প্রাণ্ জ্বলায় গো এসে।
পতি হোলো কন্যা রেসে
চায় না সতীর পানে॥
ইচ্ছা হয় ত্যজে লোকালয়, বাস করি বনে॥
মদন্ শর্ হানে সই যত,
সে যে কর দিতে নয় রত।
কেবল্ ঘর্ আগুনে পোড়ে থাকে,
পাণ্ডু রাজার মত॥
চিতেন।—বসন্ত থাকিতে পতি সতীর হয় প্রমাদ।
ভাল আমার্ বেনে, ভাগ্য গুণে, হয়েছে
সই হরিষে বিষাদ॥
কোথা সঙ্গ দোষে পোড়ে,
রতিরঙ্গ আলাপ ছেড়ে।
আমার্ প্রাণপতি এসেছে এবার্,
শান্তিশতক পোড়ে॥
নাথের্ রঙ্গ দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে সই
সদা দাহন করে আমায় অনঙ্গ বাণে॥

॥ ১২৪ ॥

মহড়া।—ঋতুরাজ নিলাজ্ ভূপতি।
যে ধারে কর, দেশান্তর, রৈল সে,
তার দায়ে বধে সতী॥

চিতেন।—অন্যায় দেশে রেখে সই, গেছে প্রাণনাথ।
সে পেলে কি ধন, এখানে মদন,
দেয় তার্ স্ত্রীধনে আঘাত ॥
অশান্ত বসন্তরাজা, প্রাণনাথ পলাতক প্রজা,
না ধরে সে নিষ্ঠুরেরে,
আমায় দেয় দুর্গতি ॥

॥ ১২৫ ॥

মহড়া।—কোকিলে কি সময়ো পেলে।
তুমি এতদিন কোথা ছিলে ॥
কাল্‌গুণে কাল্, তুমিও হোলে ॥
একেতো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী ॥
হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ,
নারী বধিতে এলে ॥

॥ ১২৬ ॥

মহড়া।—রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর্ হিতকারী নয় ॥
পাণ্ডব খাণ্ডব বন, দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন ॥
কোকিলে মরিত যদি তায়।
তবে কি কুরবে প্রাণো যায় ॥
বিরহিণী বধিবারে বাঁচাইল ধনঞ্জয় ॥

॥ ১২৭ ॥

মহড়া।—বসন্তেরে সুধাও ও সখি।
আমার্ নাথেরো মঙ্গল কি ॥
নিবাসে নিদয় নাথো, আসিবে নাকি ॥
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
দিনে শতবার গণি দিন্ ॥
আসারো আশয়ে আছি আশাপথো নিরখি ॥

চিতেন।—প্রাণনাথো যে দেশে আমার্, করিছে বিহার্।
এ ঋতুরাজার্, তথা অধিকার্॥
তার শুভ সংবাদ যত, সকলি তা জানে বসন্ত॥
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হবে সুখি॥
অন্তরা।—হায়! কাল্ আসিব বোলে নাথো করেছে গমন।
ভাগ্যে গুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদী চারা কি এখন
চিতেন।—সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে।
আমি কেমনে, ভুলিব তারে॥
পতি, গতি মুক্তি অবলার্,
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার্।
তাহারো কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি॥

॥ ১২৭ক ॥

উক্ত গীতের পাণ্টা ২য় সংখ্যা

মহড়া।—অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন্।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন্॥
হর কোপে যার তনু হয়েছে দাহন্।
সে দহিছে বিনে প্রাণনাথ্।
কর হীনে করে করাঘাত্॥
এ সব লাঞ্ছনা হোতে বরঞ্চ ভালো মরণ্॥
চিতেন।—প্রাণনাথো বিদেশে গমন, করিল যখন্।
পিছে পিছে তার্, গ্যাছে আমার মন্॥
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ্।
বসন্ত হোতেছে অপমান্
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছি গো জালাতন্॥

॥ ১২৭খ ॥

উক্ত গীতের পাণ্টা ৩য় সংখ্যা

মহড়া।—যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আশা পথো নাহি চায়॥
কি দিয়ে প্রাণ্ সখি, রাখিব উহায়॥

জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার॥
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।—গেল গেল এ বসন্ত কাল্, আসিবে তৎকাল্।
কালে হোলো কাল্, এ যৌবন কাল্॥
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না॥
আমি যেন রহিলাম, তারো আসারো আশায়॥

অন্তরা।—হায়! ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায়॥

অন্তরা।—কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয়, শশিকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষে হয়, পুন পূর্ণোদয়॥
যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়।
যে যাবে, সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায়॥

॥ ১২৮ ॥

মহড়া।—কোকিল কর এই উপকার্।
যাও নাথেরো নিকটে একবার্॥
ব্যথায় ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুরো নাগরো আছে যথায়।
পঞ্চস্বরে গানো শুনাওগে তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী,
অবশ্য মনে হইবে তার॥

চিতেন।—বিরহী জনারো, অন্তরে হানো কুহুকুহু স্বর্।
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর্॥
একলা অবলা আমি বালা।
আমারে যেরূপ দিলে জ্বালা॥
তাহারে তেমতি পারহে জ্বালাতে,
প্রশংসা তবে করি তোমার॥

অন্তরা।—হায় যে দেশে আমার প্রাণনাথো,
কোকিলে বুঝি নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত,
বসন্ত সময়ে নিবাসে॥
চিতেন।—কিম্বা কোকিল্ আছে, নাই তারো,
সুস্বর তব সমান্।
কুরবে বুঝি হানতে পারে না বাণ্॥
অতএব বিনতি করি এখন।
কোকিলে তথায়ে কর গমন॥
তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে নাথ আমার॥

॥ ১২৯ ॥

ঐ গীতের পালটা

মহড়া।—সে যেন এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা॥
চিতেন।—শশির কিরণে প্রাণো জ্বলে,
জলেতে নাহি জুড়ায়।
বিষ প্রায়, যদি চন্দন্ মাখি গায়॥
শেল সম হোলো, কোকিলের গান্।
মলয় মারুত অগ্নি সমান্॥
এ দেশের্ এ বিচার্, শুনিলে নাথের্ আর,
পুন পদার্পণ হবে না॥
(রাম বসুর এই গীত নীলু ঠাকুর, কি মোহন সরকার
একজনে গাহিয়াছিলেন)

॥ ১৩০ ॥

মহড়া।—হায় বিধাতা, এই ছিল কি
আমার কপালে।
একি প্রেম্ ঘটনা, কি লাঞ্ছনা,
ভেকের বাসা কমলে॥

অন্তরা।—আমি জন্মে জানিনে প্রেম যাতনা
মনে পড়ে না।
সই, তুমি মজালে আমায়
তোমার, ধর্ম্মে সবে না॥
স্বর্ণ-পিঞ্জর আছে সজনি,
কেন বায়স এনে বসালে॥

॥ ১৩১ ॥

মহড়া।—সখি প্রেম্ কোরে অনেকের এই দশা হয়।
শুধু তুমি, আমি বোলে নয়॥
চিতেন।—যা বলিলে প্রাণ সই, সকলি স্বরূপ।
মজেছি পীরিতে, তেজিবে কি রূপ॥
দেখো দেখো সজনি, থেকো সাবধান।
রেখো আপনি, আপনারো মান॥
সুখে কর দুঃখ জ্ঞান, কোরো না সংশয়॥

॥ ১৩২ ॥

মহড়া।—শুনি, নাম বসন্ত, তার আকার কেমন।
তারে দেখ্‌লে পরে সই মনের বেদনা কই,
মনে মনে এসে কেন করে মন্ হরণ॥
যার জ্বালাতে জ্বলি তার পাইনে দরশন।
অদর্শনে অবলার দহিছে পরাণ্।
না জানি কি প্রমাদ্ ঘটে, দেখলে সে বয়ান্॥
কি দুরন্ত সে বসন্ত সই, অশান্ত কোরেছে,
আমায় বিনে আলাপন্॥
চিতেন।—বসন্ত করি রাজ্যে যার জন্মে তার
দেখা পেলাম না।
ভূপতি সতীর দুঃখ ভাব্‌লে না॥
কার করেতে যোগাই কর ভাবি নিরন্তর।
সদা স্মর হেনে শর, করে জর জর॥
সেনাপতি সঙ্গে ফেরে তার,
দুরন্ত কৃতান্ত সম অনঙ্গ মদন॥

অন্তরা।—সখি যার প্রতাপে অঙ্গ কাঁপে মনে কত ভয়।
এলো এলো, দেখা হোলো, এমনি জ্ঞান হয়॥
চিতেন।—ছিল যে রাবণ সুতো ইন্দ্রজিতো ছিল যারো নাম
লুকায়ে সখি, করিত সংগ্রাম॥
সেই মত ঋতুরাজ শিখিছে সন্ধান্।
মায়া মেঘে কায়া ঢেকে, হৃদে হানে বাণ্।
লুকিয়ে যুদ্ধ কোরে কেন সে বিরহিনী নারীর
প্রাণো কর বিমোচন।

॥ ১৩৩ ॥

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে।
পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
করি পঞ্চামৃত পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ,
হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ।
দেহ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন্ যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে॥
পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ, বিরহীরাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন।
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর।
রাজা পঞ্চশর, অঙ্গে হানে পঞ্চশর
তাহে উনপঞ্চাশত, মলয়মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনুপঞ্চযোগেতে॥
সই, গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,
তার কিরণেও দহে প্রাণ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের প্রধান।
তার চিতাসম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুঃখেতে প্রাণ।

যদি দ্বি-পঞ্চ দিকেতে চাই,
পঞ্চ রিপু নাই, পঞ্চ সহকারী নাই।
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চরিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি, পঞ্চতপেতে ॥
সই, পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডব কানন,
জ্বালায়েছিলো যেমন।
তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি
বসন্তের চর পঞ্চজন।
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে,
করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদী হয় গো আসি,
প্রতিবাসী পঞ্চজন ॥
বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, সোয়েছে
এ পঞ্চ ক'দিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা প্রাণে আর সহে না সই,
এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥[1]

॥ ১৩৪ ॥

মহড়া।—কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব সৌরভ।
যে ধন দিয়ে গেলেন্ প্রাণনাথ তায় বা করেগো আঘাত।
কত সইগো সই মুহু, মুহু কুহু রব ॥
চিতেন।—শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলোতো ভালো।
বসন্ত হোয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো ॥
মনের কথা কই এমন কে আছে।
দেশের রাজা যিনি, নারী বধেন্ তিনি
তবে আর দাঁড়াব কার্ কাছে।
আসি সপ্তরথী মেলে, আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব।
(নিজ দলে গাহেন)

১ বাঃ গাঃ

॥ ১৩৫ ॥

মহড়া।—ধিক সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥
সে যে গিয়েছে দূরদেশ।
আমি কি মরেছি, করে না উদ্দেশ ॥
পতি হোয়ে সঁপে গেল মদন দুরন্তে !

চিতেন।—একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ ॥
জানে না কমল্ কলি, ফুটিবে মাসান্তে ॥

অন্তরা।—প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন আছে কেমনে।
হোলো নাকি তার দয়া রমণী রতনে ॥

চিতেন।—কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন্ দান, দেখিয়া সুলোক ॥
করে করে কোরে সমর্পণ,
তারে বল্লেন্ সুখে কোরোহে পালন ;
কথা না হোলো পালন,
স'পিলেন কৃতান্তে ॥

॥ ১৩৬ ॥

মহড়া।—কও দেখি প্রেম্ কোরে প্রেমীর প্রাণ থাকে কিসে।
তুমিতো, প্রেমে পণ্ডিত, কত প্রেম্ কোরেছ এই বয়সে

চিতেন।—বাসনা করেছি মনে হে, করিব পীরিত।
অপমানের ভয়ে প্রাণ, সদা সশঙ্কিত।
সাধে পাছে রটে পরিবাদ্।
ডুবিবে অবলার কুল এ বড় প্রমাদ্।
হোয়ে প্রেমাধিনী অপমানী না হই যেন শেষে ॥
(ঠাকুরদাস সিংহ এই গীত গাহেন)

॥ ১৩৭ ॥

কার্ দোষ দিব কপালেরি দোষ আমার।
যেমন প্রাণনাথ্, প্রাণে দেয় আঘাত
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার ॥
কে আছে সপক্ষেরে, বিরহীজনার ॥
করে অনঙ্গ, যে রঙ্গ, প্রকাশিতে লজ্জা পাই।
অঙ্গে কর্ দিয়ে কর্ সাধেগো সদাই ॥
ভয়ে পুরুষে না ধরে, নারীবধ করে সই।
এমন মেয়েমুখো রাজার রাজ্যে নমস্কার ॥

চিতেন।—সময়েরি গুণে সখিরে, করে হীন জনে অপমান।
কোথাগে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান।
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কাল্গুণে কাল্ বসন্ত উদয় ॥
এসে সপ্তরথী মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার

অন্তরা।—সই, আমি যার সে আমার ভেবে, দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন মলয় পবন সে আমার কাল্ হোলো ॥
তবে মরণ্ ভালো।

চিতেন।—প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার ॥
হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল্।
আছি পথ্ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল ॥
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো সই,
কালা কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
(রাম বসু স্বয়ং দল করিয়া প্রথমেই এই গান গাহেন)

॥ ১৩৭ ক ॥

উক্ত গীতের পাল্টা

মহড়া।—যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর
তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দে হয়।

আমি মরি সহচরি, করিনে সে ভয়।
দেখ আমি মোলে, কত শত নারী মিল্‌বে তার।
সখি সে বিনে কে আছে গো আমার।
আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পারে, কে দুষিবে তারে সই,
আমার পূজ্যধন বইতো ত্যজ্য ধন-নয়॥

চিতেন।—গেল, গেল কুলো, কুলো যাক্ কুল্, তাহে নহি আকুল
লোয়েছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন্ আমার।
অকূলের তরী, কুল পাব পুনরায়॥
এখন্ ব্যাকুলো হোয়ে কি দুকুলো হারাব সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥

॥ ১৩৭ খ ॥

(তেসরা পাল্টা)

মহড়া।—এই খেদ্ তারে দেখে মরতে পেলাম্ না।
আমায় চা'ক্ না চা'ক্, সদা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না॥

চিতেন।—জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে॥
আমি সেই আশা বৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল
সৃজিলাম সই, কই হোলো সুখফল।
তরু সমূলে শুখালো, শেষে এই হোলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না।

॥ ১৩৮ ॥

মহড়া।—ছিলে প্রাণ যে দেশে, সে দেশে কি বসন্ত আছে।
যত এদেশের কোকিলে, আমায় স্থির হোতে না দিলে,
সেখানে কি তেম্‌নি কোরে, ডাক্‌তো তোমায় কাছে॥

॥ ১৩৯ ॥

অক্রূর সম্বাদ

মহড়া।—গোপাল বল রে বল শুনি নয়ন ছল ছল
কেন চক্ষের জল পড়ে কি দুঃখে।
যাবি মথুরায় কংস যজ্ঞে জানি, নীলমণি,
তোমায় নিতে এসেছে অক্রুর মুনি,
ওরে গিয়ে সেই মথুরায় পুনরায়
বুঝি আস্‌বিনে বজ্রাঘাত হান্‌বি চক্ষে॥

খাদ।—আজ তোর মনের কথা বল রে আমাকে॥

ফ্‌কা।—ও তোর ভাব দেখে ভাবি মনেতে,
এলি কৃষ্ণ বিদায় নিতে, মা বলে কেঁদে নীলমণি।
চেয়ে রইলি মুখপানে, ব্যথা পাই প্রাণে,
গোপাল, সবে ধন তুই রতনমণি, লয়ে যাবে অক্রূর মুনি,
মা বলে কি দুঃখিনীরে চাঁদমুখে আর ডাকবিনে॥

মেলতা।—শোকে জীবন অধৈর্য্য হয়, হেরি দিক্ শূন্যময়,
কেন দিবসে অন্ধকার হেরি চক্ষে॥

১ চিতেন।—মথুরায় যাবেন কৃষ্ণ, ধনুক্ষয় কংস যজ্ঞেতে।

পাড়ন।—চিত্র বিচিত্র সুচিত্রে অক্রূর রথ সাজালেন রাজপথে॥

ফ্‌কা।—জগত ভুলে যার মায়াতে,
গোপাল বেশে গোকুলেতে,
কেঁদে কেঁদে বিদায় নিতে,
ধরলেন যশোমতীর পায়, বস্‌বেন অভিপ্রায়,
হায় হায় হায় রে,
ফিরে আস্‌বো না আর গোকুলেতে।
পারেন না মা যে বলিতে।
পড়ে রাণীর পদতলে নয়ন-জলে ভেসে যায়॥

মেলতা।—রাণী গোপাল লয়ে কোলে, কেঁদে কেঁদে বলে,
হায় হায় হায় রে।
কেন প্রাণ কাঁদে কৃষ্ণ তোর চাঁদমুখ দেখে॥

অন্তরা।—থাকি ঘুমায়ে তোর বক্ষে ধরে,
প্রাণ ধরে, তোরে কি বলে,
বল্‌বো যাও মধুপুরে, গোপাল বল রে
দিবস না হতে থাকিতে যামিনী,
দে মা দে মা বলে খাও রে নবনী,
ওরে রতনমণি, মরি তাই ভেবে রে,
ওরে রতনমণি যাবি মধুপুরে, ক্ষুধা হলে পরে
কে দেবে নবনী তোরে, গোপাল রে বলরে॥
২ চিতেন।—ধনুক্ষয় যজ্ঞ ছলে, কংস তোরে নিতে পাঠালে।
পাড়ন।—সে যে যজ্ঞ নয়, সন্দ হয়,
গোপাল যেও না মধুমণ্ডলে॥
ফুঁকা—সে যে নিষ্ঠুর কংস নৃপমণি,
পাঠায়েছে অক্রূর মুনি, লয়ে যাবে রতনমণি,
দুঃখী করে আমায়,
দুঃখ বলবো কায়, হায় হায় হায় গোপাল।
এক দিন স্তনে বিষ মাখায়ে, পুতনা তোর মুখে দিয়ে,
বিনাশ করতে তোরে গোপাল, কালী রক্ষা কল্লেন তায়
মেলতা।—সেথা আপনার কে আছে, ভেবে মন সচঞ্চল,
হায় হায় হায় রে।
কংস বিপক্ষ সকলে তো তার পক্ষে॥[১]

॥ ১৪০ ॥

মাথুর

মহড়া।—দ্বারী একবার্ বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে
গোপিনী, কৃষ্ণ তাপে তাপিনী,
তোমায় দেখ্‌বে বোলে আছে বোসে রাজপথে॥
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে॥
তোদের রাজা নাকি দয়াময়।
দুঃখিনীর্ দুখ্ দেখ্‌লে,
দেখবো কেমন দয়া হয়॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর সাক্ষাতে ॥

চিতেন।—বৃন্দে বিরহ-কাতরা, হইয়ে সত্বরা,
রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুর্ রাজ্যের্ অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয় ॥
মনে অন্য অভিলাষো নাই।
রাখাল্ রাজার্ বেশ কেমন্ শোভা দেখে যাই ॥
কোথা ভূপতি জানাও শীঘ্রগতি
বিনতি করি ধরি করেতে ॥

অন্তরা।—তাই এত তোয় বিনতি কোরে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী ॥
তাই এত তোয় বিনতি কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালোবরণ ফণী,
আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি ॥

চিতেন।—বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার,
আর তো না দেখি উপায়।
ফণিমন্ত্র জানে তোদের্ রাজা দ্বারী,
তাইতে এলেম্ মথুরায় ॥
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়।
রাজার দৃষ্টি মাত্রেই, সে বিষো নির্ব্বিষো হয় ॥
কৃষ্ণপ্রেমের বিষে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিষে
ব্রহ্মাণ্ডো ঔষধো নাই জুড়াতে ॥[১]

॥ ১৪১ ॥

মহড়া।—ওহে বাঁকা বংশীধারি।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা কুব্জা নারী
বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী।

১ এই গানটী পুস্তক বিশেষে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রাধা সে সরলা রমণী।
তুমি নিজে বাঁকা আপনি॥
মথুরা নাগরী পেয়ে,
হরি ফিরিছ চক্র করি।

(ভবানী বেনে এই গীত গান করেন, রাম বসু ইহার রচয়িতা।
কবির বয়স তখন প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইবেক সং-সঃ প্রঃ)

॥ ১৪২ ॥

চিতান।—হয়ো না সকাতরা প্রেয়সী, শুন তোমায় কই;—
১ পরচিতান।—আমায় বেদে কয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্যাম,
ভক্তাধীন আমি রসময়ী।
১ ফুকা।—ভক্তের বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে,
ব্রজে ত্যজে প্যারী, করে তোমায় সুন্দরী,
মজেছি তোমার প্রেমেতে।
১ মেল্‌তা।—আমি যাব না ব্রজে আর, ভাবনা নাই তোমার,
দিব না তোমার মনোবেদনা।
মহড়া।—রাজসভাতে যেতে কুবুজা নিষেধ কর না;
যদি না যাই রাজসভাতে, এ মধুপুরেতে,
দয়াময় বলে কেউ আর ডাক্‌বে না।
খাদ।—আমার অনন্ত ভাব তুমি ভেব না।
২ ফুকা।—আমি কখন্ কারে হই সদয়,
দেব ব্রহ্মাদি নাহি পারে বুঝিতে;
এজন্য অনন্ত নাম কয়।
২ মেল্‌তা।—আছে পুণ্য যার যতদিন, বাঁধা তার থাকি ততদিন;
যেন জোর করে নে যেতে কেউ পারবে না।[১]

॥ ১৪৩ ॥

১ চিতেন।—বৃন্দাবন ছাড়া কৃষ্ণ তিলেক নয়;
গোপীগণ তাও কি জাননা?
১ পরচিতান।—রাধার শ্যাম, নহে রাধায় বাম,
কেন করিছ বৃথা ভাবনা।

১ প্রঃ কঃ সঃ

১ ফুকা ।—মাধবের বিরহ, মাধবীর কভু নাই ;
রাধা কৃষ্ণের একাঙ্গ, রাধারই ত্রিভঙ্গ,
তাহে পরমারাধ্যা ব্রজের রাই ।
১ মেল্‌তা ।—কোকিল ভ্রমর কি বসন্ত, বিহনে শ্রীকান্ত,
প্রাণান্ত করিতে নারে শ্রীরাধার ।
মহড়া ।—রাই নয় সামান্যে, ত্রিজগত ধন্যে,
ভয় কি বসন্তে তাহার,
প্যারীর্ শ্রীপদ নলিনী, চিন্তে যত মুনি
আবার বাঁধা তায় চিন্তামণি সারাৎসার ।
খাদ ।—সেই রাধার কুঞ্জ বই বসন্ত যাবে কোথা আর ?
২ ফুকা ।—রাধার অভয়-পদ করিতে দরশন
সখি, কি ছার বসন্ত, দেবাদি অনন্ত,
সদা বাঞ্ছিত পেতে শ্রীচরণ ।
২ মেল্‌তা ।—আমি সেই রাধার শ্রীচরণ করিয়া দরশন,
পবিত্র হব বাসনা আমার ।[১]

॥ ১৪৪ ॥

১ চিতান ।—অষ্টমে বৃহস্পতি আমার সই,
তাই এলাম ত্যজে বৃন্দাবন ।
১ পরচিতান ।—কৃষ্ণ বিচ্ছেদে তাতেই রাধে কাতরা,
অনুক্ষণ তাপিত জীবন ।
১ ফুকা ।—আহা কি বলিলে ওগো বৃন্দে সখি,
কাল মেঘের বরণ, করে দরশন,
ধর্‌তে যায় রাই চন্দ্রমুখী ;
১ মেল্‌তা ।—সখি বিরহ যন্ত্রণায়, বাহজ্ঞান থাকা দায়,
নইলে পদাঙ্কে সুধায় ভেবে শ্যামরায় ।
মহড়া ।—করি বিনতি, ও বৃন্দে দূতি, বুঝায়ে রাখগে রাধায় ।
এ দিন শ্রীমতীর রবে না, ঘুচিবে যন্ত্রণা,
কালেতে পাবেন ব্রজের রাই আমায় ।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

খাদ।—ভক্ত-বৎসলা রাজবালা শ্রীমতী—এ দায়
তাঁর কেবল ভক্তের দায়।
২ ফুকা।—দিলেন গোলকেতে শ্রীদাম অভিশাপ,
শত বৎসর রাধে শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে,
পাবেন সই রাই মনস্তাপ।
২ মেল্‌তা।—সেই জন্য সহচরী জ্ঞানহীনা কিশোরী,
তাই কাল মেঘ দেখে সই ধর্‌তে যায়।[১]

॥ ১৪৫ ॥

১ চিতান।—নিরখি মধুপুরে একি আজ্ অপরূপ।
১ পরচিতান।—মধুরাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নট ভূপ।
১ ফুকা।—খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়;
কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।
১ মেল্‌তা।—ব্রজের মনচোরা যে হরি রাজা সে আ মরি,
বিধির বিচারের্ পায়ে নমস্কার।
মহড়া।—ছি! ছি! এই কি দশা এখন দেখ্‌তে হল মথুরার।
যে নাগর গোপীর বসন চোর,
চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার।
খাদ।—ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার।
২ ফুকা।—ছিল কোটালি ব্রজে যার,
ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ হল তার,
২ মেল্‌তা।—যদি হলে হে ভূপতি তুমি যদুপতি,
গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর।[২]

॥ ১৪৬ ॥

১ চিতান।—কি কথা শুনালে গো বৃন্দে,
গোপিকায় আমি প্রতিকূল;
১ পরচিতান।—জানিলাম সখি আমি নিতান্ত হয়েছে
তোমার স্থূলে ভুল।

১ প্রাঃ কঃ সঃ
২ প্রাঃ কঃ সঃ

১ ফুকা—তিলেক ছাড়া নই, আমি সখি বৃন্দাবন,
গোপগোপিকা প্রাণ আমার,
আমি সেই গোপিকার প্রেমেতে বাঁধা আছি অনুক্ষণ।
১ মেল্‌তা।—কেবল শ্রীদামের শাপেতে এসেছি মধুপুরেতে,
শত বৎসরের পরে পাবে গোপীগণ।
মহড়া।—আমি কাহার কেনা নই ভক্তাধীন রসময়ী,
ভক্ত-প্রেম-ডোরে বাঁধা মন,
ছিল রাবণের সহোদরা
এই কুবুজা কল্পান্তরে সই
করলে বাসনা পেতে আমায়,
দিয়াছিলাম বর তায়।
হয়ে কৃষ্ণরূপ জুড়াব তার জীবন।
খাদ।—শুনিলে সখী ত সকল বিবরণ।
২ ফুকা।—প্রতিশ্রুত সই আমি ছিলাম কুবুজায়,
সেই প্রতিজ্ঞা পুরাতে সাধের ব্রজ হতে
আসিতে হইয়াছে মথুরায়।
২ মেল্‌তা।—তুমি তা বলে বৃন্দে সখি, হয়োনা অন্তরে দুখী,
আমি রাধার বই কারুর নইত কখন॥[১]

॥ ১৪৭ ॥

১ চিতান।—ত্যজে সুখের বৃন্দাবন বৃন্দে সই,
তিলেক আমি ছাড়া নই।
পরচিতান।—কেবল ভক্তের মনোরথ পুরাতে,
মথুরায় এলেম রসময়ী।
১ ফুকা।—মরি সুধাও কি সখি আমায় আশ্চর্য্য?
রাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেন এই মধুর মধুরাজ্য;
১ মেল্‌তা।—এলাম অপার্য্যে মধুপুরে ত্যজে গোপিকারে,
কেবল সই কংস ধ্বংস কারণে।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

মহড়া।—তিলেক গো বৃন্দাবন ছাড়া নই,
আমি বাঁধা সেই রাধার চরণে ;
বাজাই বাঁশীতে রাধার নাম, আমি সেই রাধার শ্যাম,
রাধা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে।[১]

॥ ১৪৮ ॥

১ চিতান।—প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই ব্রজনগরে ;
১ পরচিতান।—তারি নিমন্ত্রণের পত্র দূতী দিলে আমারে।
১ ফুকা।—বৃন্দে, তুমি জানত সন্ধান, ত্যজে কুল মান,
কৃষ্ণ-প্রেমে ব্রজধামে রাই সঁপেছেন প্রাণ ;
১ মেল্‌তা।—এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী, জেনে আয়গো সহচরী,
তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পারব না।
মহড়া।—যজ্ঞ করিবেন রাই কিন্তু সিদ্ধ হবে না ;
দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ্, এমন যজ্ঞে কিবা সুখ,
যজ্ঞ করিবেন যজ্ঞেশ্বরের দিয়ে মর্ম্মে বেদনা।[১]

॥ ১৪৯ ॥

১ চিতান।—জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন বিক্রীত রাধার প্রেমেতে।
১ পর চিতান।—গিয়া দেখ্‌লাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই,
রাইকে নাহি মনেতে।
১ ফুকা।—মধু রাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন ;
রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার,
গোপিকায় নাহিক স্মরণ।
১ মেল্‌তা।—তিনি নন এখন রাধাকান্ত হয়েছেন কুব্জাকান্ত
রাধার প্রাণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বল না ?
মহড়া।—গিয়াছিলাম আশা করে, আনতে মাধবেরে,
সে আশা পূর্ণ হল না।
ব্রজে এল না কালাচাঁদ, হ'ল হরিষে বিষাদ,
কৃষ্ণের আর আসার আশা কোর না।

১ প্রাঃ কঃ সঃ
১ প্রাঃ কঃ সঃ

খাদ।—যাতে বাঁচে রাই কর সেই মন্ত্রণা।

২ ফুকা।—রাধায় বুঝায়ে চল সই রাখি সকলে,
হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত,
আসিবেন এই গোকুলে।

২ মেল্‌তা।—মনে অধৈর্য্যা হয়োনা, ওগো ব্রজাঙ্গনা,
কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না।[১]

॥ ১৫০ ॥

মহড়া।—দেখব কেমন সুন্দরী কুবুজা
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা

॥ ১৫১ ॥

মহড়া।—রাধার মান-তরঙ্গে কি রঙ্গ।
কমল ভাসে, কুমুদ ভাসে,
প্রমোদ রসে, ডুবেছে শ্যাম্ ত্রিভঙ্গ॥

॥ ১৫২ ॥

মহড়া।—ভঙ্গি বাঁকা যার্, সেই বাঁকা শ্যামে পায়।
আমরা সোজা মন পেয়ে সই,
কৃষ্ণের মন্ পেলেম কই,
মিল্লো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায়॥

॥ ১৫৩ ॥

মহড়া।—কেহে সে জন্, নারী দ্বারে করিছে রোদন্।
কোথা হোতে এসেছে তার কিবে প্রয়োজন্॥
আ মরি মরি! কি রূপের মাধুরী।
সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন্॥

চিতেন।—দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়,
শুন ওহে যদুরায়।
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদই তোমায়॥

১ প্রাঃ কঃ সঃ

দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার ॥
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ-দরশন্ ॥

(নীলু ঠাকুর এই সখী সংবাদ গান করেন)

॥ ১৫৪ ॥*

মহড়া।—আছে খৎ নে পথে বসে, কে রমণী সে?
শ্যাম কি ধার কিছু তার?
হয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালী করেছিলে কোন্ রাজার?
প্রেমধার ধার তুমি কার?
খতে লেখা আছে ওহে শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন ব্রজকিশোরী[১]
মনে আতঙ্ক করি ওই, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই ঢেরা সই আর হবে কার!
চিতেন।—[কুবুজা কহিছে তুমি রাজা এই মধু ভুবনে,
রাজার উপরে রাজা আছে আগে জানিনে।][২]
ওগো গোবিন্দ বড় সন্দ হতেছে,
করেছ প্রেমধার তুমি কোন রমণীর কাছে?
[তুমি ক'রে কার দাসত্ব পেয়েছ রাজত্ব,
সে তত্ত্ব জানতে এসেছে তোমার ॥][২]

॥ ১৫৫ ॥

মহড়া—সময় গুণে এই দশা হোয়েছে।
ছিলো দাসী যে হোলো রাণী সে,
রাধা রাজ্‌নন্দিনীর্ এখন্ কপাল্ ভেঙ্গেছে ॥
সরমে মরমে মরি, কব কার্ কাছে।
যে জন আঁখির আড় হোতো না।
তারে দেখ্‌তে এসে, এত লাঞ্ছনা ॥

* ইহা প্রীঃ গীঃ হইতে সংগৃহীত

১ সঃ প্রঃ—শ্রীরাধাপ্যারী

২-২ বন্ধনীযুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি 'সঃ প্রঃ'-এ নাই

আমরা পথে বোসে কাঁদি আজ্,
এমন কত কান্না তোদের্ রাজা কেঁদেছে।
চিতেন।—কপাল্ মন্দ দ্বারী হে, কৃষ্ণের্ নিন্দে করা উচিত নয়।
দশা যখন্ দ্বিগুণ্ হয়,
বন্ধুলোকে মন্দ কয়্॥
রাধার চরণে যার লেখা নাম্।
এখন তোদের পায়ে ধরালে সে শ্যাম্॥
ভাব্তে বোল্‌গে যা তোদের রাজাকে,
এমন্ অভিমান্ কতবার ভিক্ষে লয়েছে।
অন্তরা।—কথা কইতে গেলে, নয়ন্ জলে
অঙ্গ ভেসে যায়।
রাধা রাজার দাসী,
এ রাজ্যে আসি, কাঁদিতেছে দরজায়।
এমন্ নিষ্ঠুর্ ভূপতি আমাদের শ্রীমতি যে নয়।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়,
অন্তঃপুরে গিয়ে রয়।
আমরা দয়াল রাজ্যে বাস্ করি।
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি॥
মনে করতে বল্ তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার দীনতা ভুলে গিয়েছে।

॥ ১৫৬ ॥

কবির লহর

মহড়া।—ও ময়রার ঝি মাসি গো আমার,
আমি স্পষ্ট কথা কই তোমার কাছে।
ওগো বংশ-রক্ষা করবে ব'লে,
আরে পাণ্ডু রাজা আজ্ঞা দিলে, সে কথা জানে সকলে।
তাতেই ভক্তিভাবে এনেছিল ধর্ম্মকে ডেকে।
সে পতির আজ্ঞা বজায় রেখে সতীর ধর্ম্ম রেখেছে॥
খাদ।—উচিত কথা বলতে আজ লজ্জা কি আছে॥

ফুঁকা।—সেই কুন্তী-নারী আমার পিসী,
তুমি তায় নিন্দে করো না, মনে বুঝে দেখ না।
দেবতা সব সদয় যারে, তার নিন্দে কেবা ধরে,
সে যে মান্য হবে ত্রিসংসারে, নিন্দে হবে না॥
মেলতা।—কুরু পাণ্ডুকুলে যে ব্যাভার, অতি চমৎকার,
এখন পঞ্চ দেবতা সদয় হয়ে পাণ্ডুকুল দিয়েছে॥
১ চিতেন।—সেই জরাসিন্ধুর কন্যা তুমি,
জেনে আমার অন্যে নও।
মনোমধ্যে ভিন্ন তোমার কভু ভাবিনে,
তোমায় কই এক্ষণে, সুবাদে মামী আমার হও॥
পাড়ন।—আমি ভূভার হরণের কারণ ভূতলে হলেম অবতার।
তোমায় বলি সমাচার॥
যেখানে যখন থাকি, স্বধর্ম্ম বজায় রাখি,
নইলে কে পিতে কে পুত্র আমি কেবা হয় আমার॥
মেলতা।—অনন্ত রূপ অন্ত কেবা পায়, শুন কই তোমায়।
সেই কুন্তী নারীর তুল্য নারী ভারতভূমে কে আছে॥[১]

॥ ১৫৭ ॥

মহড়া।—ও পাপিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার, এ কি বল্লে বল কল্লে সর্ব্বনাশ।
সেই সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করা, ওরে তার প্রতিফল যেমন ধারা,
জানে সেই ইন্দ্র মহাশয়।
সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করে রাজার যে দুর্দ্দশা হয়।
আছে ধর্ম্ম সূক্ষ্ম, ওরে মূর্খ, সদ্য ঘোটে যক্ষ্মাকাস॥
খাদ।—শুনে অঙ্গ কাঁপতেছে এমনি হচ্ছে ত্রাস॥
ফুঁকা।—দেখ পরদারা হরণ করা,
কত পাপ বলতে পারা ভার আছে শাস্ত্র অনুসার।
হরে সব পরের নারী মজেছে লঙ্কাপুরী,
হলো সেই পাপেতে রামের হাতে সবংশে সংহার॥
মেলতা।—শঙ্খাসুরের সাধ্যা রমণী হলো কামিনী,
তারে হরণ করি আপনি হরি, গণ্ডকীতে কল্লে বাস॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

১ চিতেন ।—তুমি ব্যস্ত হয়ে লজ্জা খেয়ে,
সম্মুখে কল্লে যে উত্তর ।
লোক-লজ্জা চক্ষু-লজ্জা কিছুই কল্লিনে,
তোর কথা শুনে শিউরে উঠলো কলেবর ॥
পাড়ন ।—সেই যে প্রিয়-দাসী আমার ॥
ফুঁকা ।—করি তায় কন্যা সম্বোধন, আমায় বলে মাঠাকরুণ,
এ কর্ম্ম কল্লে পরে, লোকে কি বলবে তোরে,
ওরে কোন লাজেতে রাজসভাতে, দেখাবি বদন ॥
মেলতা ।—আমি ভগ্নী কুট্‌নী হব তোর, ওরে ও বর্ব্বর,
দেখ শুন্‌লে পরে ঘরে পরে,
করবে তোরে উপহাস ॥
অন্তরা ।—কত বলবো বল ধর্ম্ম ভেবে, নিষেধ কত্তে হলো ।
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে সমান বলিষ্ঠ,
পর-নারীর জন্যে হলো উভয়ে নষ্ট,
শেষে গজ-কচ্ছপ হয়ে তারা, অধোগামী হলো ॥
২ চিতেন ।—ওরে পরনারী দেখলে পরে
যে করে মাতৃ সম্বোধন ।
রাজ্য সুখে ভার্য্যা সুখে পরিবার সুখে,
অতি পরম সুখে সংসারে করে কালযাপন ॥
পাড়ন ।—দেখ ধর্ম্মপথে সধর্ম্মতে থাকলে পর, বাড়ে মান্যমান,
হয়ে সর্ব্বত্র কল্যাণ ;
হলে পরে কুপথগামী ভগবান অন্তর্য্যামী,
ফেলে ঘোর বিপদে পদে পদে পদে করে অপমান ॥
মেলতা ।—সঙ্গোপনে কল্লে কুকার্য্য আছে নির্দ্ধার্য্য,
আবার ধর্ম্মেতে ঢাক বাজিয়ে দিবে,
জগতে করে প্রকাশ ॥ [১]

॥ ১৫৮ ॥

মহড়া ।—অহঙ্কার বশে দুর্য্যোধন,
তুমি একশত ভায়ের দর্প করে ধর্ম্ম ভাবলে না ।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

সগরবংশ হায়, মুনির শাপে যেমন ভস্ম হয়,
দ্রৌপদীর অভিশাপ ফলবে তদ্রূপ প্রায়।
হবে অন্ধের বংশ ধ্বংস কেও আর পিণ্ড দিতে থাকবে না ॥

খাদ।—আমার কথা শুনে মনে ব্যঙ্গ করো না ॥

ফুঁকা।—দ্রৌপদীর যখন কেশে ধরে আন্‌লে দুঃশাসন।
তখন সে ঋতুবতী তোমার হলো দুর্ম্মতি,
তাই তখন তারে কুরুপতি কল্লি দরশন ॥

মেলতা।—যদি ঋতুবতী পরনারী,
তারে পুরুষেতে দেখলে পরে ঘটে মন্দ ঘটনা ॥

১ চিতেন।—তুমি ঐ কথা বই বলবে কি আর রাজা দুর্য্যোধন ॥

পাড়ন।—পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা যখন চাইলে যুধিষ্ঠির।
তুমি দিতে তায় পাল্লে না তখন ॥

ফুঁকা।—মৃত্যুকাল সময় রোগী যেমন ঔষধ না খায়,
তদ্রূপ প্রায় তুমি হয়ে দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়ে,
তোমার মামার মন্ত্রণা পেয়ে মজিলে পাশা খেলায় ॥

মেলতা।—তোমার মামার মনে যাহা বেশ জানি,
সে অন্ধবংশ ধ্বংস করবে এইটে তাহার বাসনা ॥

অন্তরা।—স্পষ্ট বল তাই।
এ পাশা কে গড়েছে স্পষ্ট শুন্তে চাই।
মড়ার হাড়ের পাশায়, যখন যা বলে তাই হয়,
যেমন পরশ পাথর যাতে ঠেকায় তাই ত সোণা হয়,
এ হাড়ের গুণ দেখে আমি বলিহারি যাই।
যদি যুদ্ধ করে মরবে তুমি হলো বাসনা।
তবে কেন ভাদ্রবৌয়ের কল্লে অপমান,
কেন এ যুদ্ধ আগে কল্লে না ॥[১]

॥ ১৫৯ ॥

১ চিতান।—সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষাণ্ড নচ্ছার।
১ পরচিতান।—ভজিস ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর-অবতার।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

১ ফুকা।—কি সে করিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ, দিস কোন ঠাকুরের ঠেস্?
মেল্‌তা।—তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্ পচা ভুর
মহড়া।—সেই হরি কি তোর হক্ক ঠাকুর।
যিনি বাম করতে গিরি ধরে রক্ষা করেন ব্রজপুর,
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্চেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন করে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর।
(ইহার ধরতা পাওয়া যায় নাই)

॥ ১৬০ ॥

১ চিতান।—এখন বুঝলিত এই হক্ক নয় সেই হরি সারাৎসার;
১ পরচিতান।—পূর্ণ ব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার।
১ ফুকা।—শুনরে বলি মূঢ়, এর খুঁজে পাই না কুড়।
তোর ঠাকুরকে বল্‌তে বল ভেঙ্গে এর নিগুঢ়।
১ মেলতা।—হরির সকল ভক্তে সমান দয়া,
এর সে বিষয়ে অনেক খাম।
মহড়া।—বুঝব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা শিন্নির গোঁসাই,
আমার প্রতি কেন বাম।
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির, কি মুসলমানের পীর,
তাই বল্ দেখি জিগীর,
পূজা পঞ্চ উপচারে,
খান কি এক পীড়িঁতে পাঁচ মোকাম,
হক্ক দৈবকীর নন্দন কি আবার ফতমা বিবির হন এমাম।

॥ ১৬১ ॥

১ চিতান।—যেমন ঠাকুর গুরুর শিষ্য ভাই,
সেই গৌর আর নিতাই।
১ পরচিতান।—দুটি ভাই, রামপ্রসাদ নীলু এক যুড়ি
তেমনি দেখ্‌তে পাই।

১ ফুকা।—যাত্রাওয়ালার দুটি ভাই, শ্রীদাম আর সুবোল,
কীর্ত্তনেতে বাঙ্গা বলাই, দুটি ভাই দিচ্চে হরিবোল
১ মেলতা।—সং তামাসার মধ্যে দুটি ভাই—'চোরা
নবো, খোঁড়া নবো' চুচুড়াতে;
মহড়া।—তেমনি রামপ্রসাদ নীলু দুটি ভাই মান্য জগতে।
দেখ ভাই কি কলি-অবতার,
যেমন বৃন্দাবনের কানাই বলাই
এমাম হোসেন মক্কাতে।

যজ্ঞেশ্বরী

॥ ১ ॥

বিরহ

১ চিতান।—কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান;
১ পরচিতান।—হেরে মুখ, গেল দুখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
১ ফুকা।—আমায় বন্দী করে প্রেমে,
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে,
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
১ মেল্‌তা।—আমি কুলবতী নারী,
পতি বই আর জানি নে,
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও;
মহড়া।—ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও
খাদ।—রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও।

২ ফুকা ।—তোমার মন হল বায় বাগে,
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে ।
২ মেল্‌তা ।—কথা কইছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ—মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও ॥[১]

॥ ২ ॥

১ চিতেন ।—অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,
দেখতে পেলেম চখেতে ।
১ পরচিতান ।--ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভাল ত আছেন প্রাণেতে ।
১ ফকা ।—তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখ-সাগরে ।
১ মেল্‌তা ।—ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে ।
মহড়া ।—বলো বলো প্রাণনাথেরে,
বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে ।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌ব তার ,
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে ।
খাদ ।—আমার হল উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে ।
২ ফ্‌কা ।—তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্‌লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর ।
২ মেল্‌তা ।—দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার
সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহু স্বরেতে ॥[২]

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ
২ গুপ্তঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

নীলমণি পাটুনী

॥ ১ ॥

ভবানী-বিষয়ক

চিতান।—মা হরারাধ্যাতারা,
তোমার নাম, মোক্ষধাম তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।
তাইতে তারা, তোমায় তারা,
তারা তারা তারা বোলে, ডাক্‌ছি মা সদাই।
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা-
তোমায় ধরা সে ও বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল-সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়—
মেলতা।—এবার বেঁধেছি মন আঁটাআটি,
কোরেছি মন খুব খাঁটি,
তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটী,
আর পালাতে পার্‌বিনে।
মহড়া।—তারা গো, আজ তারা ধরা ফাঁদ পেতিছি মা,
হৃদয় কাননে॥
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরু মহামন্ত্র-জাল,
সাধন পথে সেই জাল পেতে ;
থাক্‌বো কিছু কাল,—
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,
তারা যদি যাস্‌ সে পথে,
ধোর্‌বো মা তোর হাতেনাতে বাঁধবো দুটি চরণে॥
খাদ।—মন-কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো মা অতি যতনে।
দোলন।—তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা,
ষোড়শোপচারে পূজা

তেমন পূজা কোথা পাব বল্,
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি ক'রে
মানকে নৈবেদ্য করে,
দিব মা তোর চরণে ধ'রে নির্ম্মল গঙ্গাজল।
মেলতা।—আমি কোথা পাব অন্য বলি মহিষাদি অজাবলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে।
অন্তরা।—মা এবার পালাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই সন্ধান নাই।
তারা ধোর্‌বো বোলে তারা
মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই॥
পরচিতেন।—মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও;
কোরে যতন, বহু যতন,
ধনধান্য নানা রতন দিলেও তুষ্ট নও।
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে,
অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।
তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে,
মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কোর্‌লি তায়।
মেলতা।—এখন পরমার্থ পরম ধনে,
আছিস্ মা তুই পরম ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে
সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে॥[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

মহড়া।—দূতি বল্ গো বল আমায় বল্ গো বল।
কালাচাঁদ কোন্ পথে গেল।

১ বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ-এ নীলমণি পাটুনীর দলে গীত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মানে কই না কথা, প্রাণে পাই গো ব্যথা,
সই, শ্যাম কোথা।
দাসীর মান দেখে কার কুঞ্জে শ্যাম লুকালো।
চিতেন।—কৃষ্ণপ্রেমে আহ্লাদিনী রাধা বিনোদিনী,
প্রভাতে কুমুদিনীর প্রায়
মান উন্মাদে শ্যামকে বিদায় দিয়ে,
আবার রাই এলোকেশে ধায়।
কুঞ্জের বাহির হ'য়ে, পথ নিরখিয়ে
কেঁদে অধীরা—আ—আ
নয়নতারা হ'য়ে কৃষ্ণহারা বহে ছল ছল
চক্ষে শতধারা।
শুধায় সখীগণ সমাজে দেখেছ কেউ কেউ সেই রসরাজে,
আমার নিকুঞ্জের দ্বারে কৃষ্ণ এই ছিল ॥[১]

॥ ৩ ॥

মহড়া।—মান কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই
সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই,
সজল আঁখি জলধর বরণে
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণের প্রেমডোরে (প্রাণসই) প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা,
হৃদয় মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা দু'নয়নে।
চিতেন।—যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে করি মান
রাখি মনকে বেঁধে শ্যামের খেদে
কেঁদে উঠে প্রাণ।

---

১ ইহা 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

শ্যামকে হেরব না আর সখি,
বোলে চক্ষু মুদে থাকি,
সেরূপ অন্তরেতে দেখি,
কৃতাঞ্জলি বনমালী বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥ [১]

॥ ৪ ॥

বিরহ

মহড়া।—সহে না কুহুস্বর, ক্ষেমা দে পিকবর
ডাকিস্ নে শ্রীকৃষ্ণ বলে।
শুনেছ[২] নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়,
প্রাণে মরবে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নের জলে।
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল
কি গোপগোপীকুল,
পশুপক্ষিকুল বিরহে সকলি ব্যাকুল ॥
ত্যজে বকুল মুকুল অধৈর্য্য অলিকুল সব,
কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে।
চিতেন।—বসন্ত ঋতু এসে[৩] সসৈন্যে
ব্রজে হইলে উদয়।
বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে বৃন্দে,
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয় ॥
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণ-বিরহিণী, কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী
ধূলাতে পোড়ে রয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে
শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে
রাই, তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে।

১ ইহা প্রীঃ গীঃ হইতে সংগৃহীত
২ প্রীঃ গীঃ শুন বলিছে
৩ প্রীঃ গীঃ আসি

অন্তরা।—এমন দুঃখের সময় কোকিল পক্ষীরে
কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই কাতরা হইয়ে
কি সুখ ভুঞ্জে ॥

চিতেন।—অধরা ধরাসনে পোড়ে রাই
চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় ॥
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বধিস্‌নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা;
দুঃখিনীর কথা রক্ষা কর ॥
কোকিল দেখলি তো স্বচক্ষে
মরণের অপেক্ষা আর নাই,
হোয়ে রয়েছি জীবন্মৃত সকলে ॥[১]

॥ ৫ ॥

সখী সংবাদ

মেলতা।—কোথা যাও হে বঁধু আজ কেন জলধারা দু'নয়নে।
এলে শ্রীরাধার কুঞ্জ হতে রজনী প্রভাতে,
শ্যাম হে যাচ্ছ রাগভরেতে,
তোমার মুখ দেখে বাঁচিনে প্রাণে ॥

খাদ।—দেখিয়ে বিরস মন ভাবি মনে ॥

ফুঁকা।—আজ কেন হে কালশশী শ্রীমুখে নাই মধুর হাসি,
মন উদাসী সদাই দেখতে পাই ভাবি তাই শ্যাম হে,
বিরস বদন দেখতে নারি, এও কি প্রাণে সইতে পারি,
মানের ভরে শ্যাম তোমারে কি বলেছেন রাই ॥

মেলতা।—প্যারী অবোধ নারী কল্লেন মান কমলিনী,
মানের দায় কল্লেন ত্যাজ্য পূজ্যধনে ॥

১ গুপ্তঃ, সঃ প্রঃ—১২৬১ ফাঃ, নীলমণি পাটুনী ইহা রচনা করেন, প্রীঃ গীঃ—গ্রন্থে এই গীতের পদকর্তার নাম দেওয়া হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; প্রাঃ কঃ সঃ গ্রন্থে ইহা রাম বসুর রচনা বলা হইয়াছে।

১ চিতেন ।—না ভেঙ্গে রাধার মান
মানের দায়ে কেঁদে শ্যাম ফিরে যায় ॥
পাড়ন ।—দেখে ললিতে বলেন দ্বারে থেকে,
দাঁড়াও শ্যাম হে নিরদয় ॥
ফুঁকা ।—ধূলায় অঙ্গ ঢেকে গেছে, বদনকমল শুকায়েছে,
সে ভাব গেছে এ কি দেখতে পাই ভাবি তাই শ্যাম হে,
গেছে তোমার সুখের দশা গেছে রাধার ভালবাসা,
নীলকমল হে, এ কি দশা আহা মরে যাই ॥
মেলতা ।—ভাবের অভাব দেখে, মনে ভাবি তাই,
কালো শশী কালো শশী,
নিরন্তর জ্বলবে জীবন মনাগুনে ॥
অন্তরা ।—যাও কোথা হে বংশীধারী
হলো শ্রীরাধার মান এতই ভারি,
তুচ্ছ মানে কাতর হলে বঁধু সেধে কেন ফিরে এলে,
গোকুল ভাসালে গোকুল ভাসালে ।
জানি গোকুল রক্ষে করেছিলে বাম করেতে ধরে গিরি ॥
২ চিতেন ।—হয়েছ কাতর প্রাণে রাধার মানে নীরদ বরণ ॥
পাড়ন ।—এখন ধৈর্য্য হও শ্যাম-চিন্তামণি, বলি শ্যাম হে,
তোল চাঁদ-বদন ॥
ফুঁকা ।—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে প্রভাতে নিকুঞ্জে এলে,
মানিনী মান কত্তে পারে বল্লে দুটো বলতে পারে,
সেই কথা কি কৃষ্ণ তোমার সইলো না প্রাণে ॥
মেলতা ।—হয়ে কৃষ্ণ-হারা আমরা কোথা যাই বল বল,
কৃষ্ণ বই ব্রজাঙ্গনা বাঁচিনে ॥[১]

॥ ৬ ॥

মাথুর

মহড়া ।—গোপীর পূরাও মনস্কাম, ত্যজে মধুধাম,
একবার চল শ্যাম বিচ্ছেদ-ব্রজেতে ।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

আমি এসেছি মনের দুঃখে হরি, আ মরি
তোমার বিচ্ছেদে মরে ব্রজে প্যারি,
ব্রজে নাই হে সে সুখের কাল,
বিচ্ছেদ কাল রাধার মৃত্যুকাল,
এসেছি তোমায় নিতে ॥

খাদ।—দেখবে রাধার দশা আপন চক্ষেতে ॥

ফুঁকা।—রূপে প্যারি তোমার চাঁপাকালি,
হুতাশে তার অঙ্গ কালি,
চল একবার বনমালী, দেখে এস শ্রীরাধায়,
এস পুনরায় হায় হায় হায় হে শ্যাম।
কাঁদে প্যারি কৃষ্ণ বলে বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে,
চক্ষের জল শ্যাম প্রবল হয়ে, গোকুল বুঝি ভেসে যায় ॥

মেলতা।—হলো শোকাকুল সকলে যাও যদি গোকুলে,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
বিচ্ছেদ শেষদশায় বাঁচে প্যারি প্রাণেতে ॥

১ চিতেন।—বিচ্ছেদে কাতরা অধীরা দেখে শ্রীরাধায় ॥

পাড়ন।—বৃন্দে ধেয়ে যায় মথুরায়,
গিয়ে নিবেদন করে কৃষ্ণের পায় ॥

ফুঁকা।—প্যারি কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমী হয়ে,
ছিল প্যারি মনের সুখে।
সে সুখ রাধার ঘুচেছে, বিচ্ছেদ ঘটেছে,
তোমায় এনেছে সেই অক্রূর মুনি, হারায়ে রাই চিন্তামণি,
মণিহারা যেমন ফণি, ধরায় রাই পড়ে আছে ॥

মেলতা।—দশম দশাতে প্যারি, হায় হায় কি করি,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
মনে ভেবে তাই এলেম শ্যাম গোকুল হতে ॥

অন্তরা।—আছে ধরা-শয্যায় দশম দশায়, শেষদশায় প্যারি
জীবন পাবে হরি দেখলে তোমায় কালাচাঁদ হে।
নয়ন মুদে প্যারি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
রেখেছে রাধারে তুলসী-তলে,

আসন্নকাল বলে ওহে শ্যাম হে ও শ্যাম
আসন্নকাল বলে সবাই বলে হরি, ব্রজে চল হরি,
দেখে এস তোমার শ্রীরাধায়, কাঁলাচাঁদ হে ॥
২ চিতেন।—বলেছি আন্‌তে হরি, কিশোরী বধূর রাজ্যে যাই ॥
পাড়ন।—আছেন সে আশায় প্রেমাশায়,
বধূ-জীবন রেখেছে তোমার রাই ॥
ফুঁকা।—ব্রজে কমলিনী প্রাণে মলে,
বাঁচবে না কেও গোপীকুলে,
নারী হত্যা গোপের কুলে, হবে কৃষ্ণপ্রেমের দায়,
বিচ্ছেদ-বেদনায় হায় হায় হায় হে শ্যাম।
এলে গোকুল পরিহরি আজ মরে কি কাল মরে প্যারি,
এখন শ্যাম ব্রজে গেলে রাধার জীবন রক্ষা পায় ॥
মেলতা।—আমি জানলেম রাঙ্গা পায় কর হে তার উপায়,,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে।
কিসে রক্ষা পায় প্রেমাধিনী প্রাণেতে।[১]

নীলু ঠাকুর

ভবানী-বন্দনা

চিতেন।—বাঞ্ছাফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।
পরচিতেন।—ব্রহ্মরূপিণী ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।
ফুঁকা।—হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,
তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
তারা কি মর্ম্ম জানে তার ;
মেলতা।—হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

মহড়া ।—যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই ॥
আমি শুনেছি শিব উক্তি, সেবিব শিবশক্তি,
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই ।
খাদ ।—ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,
যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই
২য় ফুকা ।—চন্দনাক্তরক্তজবা ল'য়ে,
কোরে শ্রীমন্ত্রে অভিষিক্ত, জাহ্নবীজলযুক্ত,
দিব আরও পদদ্বয়ে ।
২য় মেলতা ।—বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে,
বিজ্ঞান দেহি যে শিবে,
সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই ।
অন্তরা ।—ওমা অলসনয়না, রসনার বাসনা,
ঘোষণায় ঘুষি তব নাম ;
ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ।
২য় চিতেন ।—ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গানাম উপলক্ষ যার ।
২য় পরচিতেন ।—নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ-পর্য্যটন কি কার্য্য তার ।
৩য় ফুকা ।—গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী
হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
ঐ পদে যত তীর্থরাশি ।
৩য় মেলতা ।—স্মরণ করিয়ে তারা মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তারা তারা গুণ গাই ।[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

মহড়া ।—ও মাধবচাঁদ কৃষ্ণ রসময়, তুমি ধৈর্য্য হতে বলিছ আমারে ।
তোমায় নির্জ্জনেতে লয়ে হরি, আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করি,
আছে এই বাঞ্ছা মনেতে ।

১ গুপ্তঃ, বাঃ গাঃ

খাদ।—তুমি আসিবে ফিরে শ্রীমন্দিরে আমার জন্যেতে।
তোমায় দেখিলে পরে, মজিবে মানে, কমলিনী রাগভরে।
পূর্ব্বকথা এখন কি ভুল্লে অন্তরে ॥
ফুকা।—ছিল গোলকে বিরজা নারী, তুমি তার বাঞ্ছা পূরালে।
তা তো জানে সকলে, শ্রীমতী রাধায় বলে,
তুমি তার কুঞ্জে ছিলে।
দেখ অবশেষে কি করে এলে জানে সকলে ॥
মেলতা।—কারে হাসাও কারে কাঁদাও কারো বাধ্য নও,
তোমার প্রেমের কথা বেদে গাঁথা ব্যক্ত আছে সংসারে ॥
১ চিতেন।—তুমি ভক্তের অধীন কৃষ্ণ বলে,
আমি তাই ভক্তিভাবেতে।
কাম সাধনা করে তোমায় ছলিতে আসিনে,
বুঝে দেখ মনে, করবো আজ পরীক্ষা তাতে।
তুমি লীলাকারী, বংশীধারী, গোকুলে লীলে করেছ।
রাধায় আশা দিয়েছ ॥
মেলতা।—আমারে ত্যজ্য করে যাবে তার শ্রীমন্দিরে,
তোমার কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক তায় থাকিবে এবারে ॥
অনেকেরে সদয় হয়েছ সুখে রেখেছ,
দিয়ে পদধূলা মানব কল্লে পাষাণী অহল্যারে ॥[১]

॥ ৩ ॥

মাথুর

মহড়া।—অমনি ভাল শ্যাম হে তুমি রাধার নাম
আর কোরো না এই মধুপুরে।
শুনে কুব্জা মরে রবে, সেই দশা আবার হবে,
বোঝ মনে, যেমন রাজার দুর্জ্জয় মানে,
আবার কুব্জার মান ভাঙ্গতে হবে তেমনি করে
খাদ।—শুন বনমালী বলি বিনয় করে ॥

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

ফুঁকা।—যদি ভালবাসিতে শ্রীরাধারে,
আসিতে না যমুনা পারে, ওহে বাঁকা শ্যাম,
ওহে বাঁকা শ্যাম, কোরো না আর রাধার নাম।
কুব্জার নাম কর সাধন, জুড়াবে শ্যাম তাপিত জীবন,
সুখী হবে সুখে রবে পাবে মোক্ষধাম॥

মেলতা।—যেমন তুমি হে বাঁকা রাজা মথুরায়,
ওহে শ্যামরায় হে শ্যামরায় হে,
তেমনি পেয়েছ রাণী কুব্জারে॥

১ চিতেন।—বল্লে যাও রাধা রাজার রাজ্যে বাস কর সকলে॥

পাড়ন।—তোমার কথা শুনে, ভাবি মনে মনে,
কি করে যাব গোকুলে॥

ফুঁকা।—রাধার সর্ব্বস্ব ধন চিন্তামণি,
তুমি হে শ্যাম গুণমণি, ফণির মণি প্রায়,
বলবো কি তোমায়, শুন ওহে শ্যামরায়,
তুমি রইলে মধুপুরে আমরা যাব কেমন করে,
ব্রজে গেলে রাই শুধালে বলবো কি রাধায়॥

মেলতা।—তোমার কুব্জা যায় ভাল থাকে সেই ভাল,
ভাল ভাল হে শ্যাম, বেঁধেছে কুব্জা তোমায় প্রেমডোরে॥

অন্তরা।—যেমন সাধ করে সেই রাধার নাম
আদরিণী নাম রেখেছিলে শ্যাম।
সে আদর সব কোথায় এখন,
ওহে বংশীধারী শ্যাম, বল শ্যাম শ্যাম হে,
রাধার সে নাম এখন দিয়ে বিসর্জ্জন,
সার ভেবেছে মনে কুব্জার নাম॥

২ চিতেন।—তেমনি শ্যাম আদর করে কুব্জার মান রাখ মথুরায়॥

পাড়ন।—তবে সমাদরে, অতি আদর করে, তোমারে রাখিবে শ্যামরায়

ফুঁকা।—কৃষ্ণ ত্রিজগতে সবাই শুনেছি নাম বিপদকালে,
রাধাকৃষ্ণ কয়, ওহে রসময়, শুন হে শ্যাম দয়াময়,
বুঝে দেখ মনে মনে, শয়নে আর স্বপনে,
কুব্জাকৃষ্ণ কে বলে শ্যাম বিপদ সময়॥

মেলতা।—এখন বল হে বল কৃষ্ণ বল হে প্রাণকৃষ্ণ হে
তাই কি দোষে এলে রাধায় ত্যাজ্য করে ॥[১]

॥ ৪ ॥

কবির লহর

মহড়া।—ও মাধব অযোধ্যার পতি আমায় অন্ধ বলে ঠাট্টা করিস্‌নে।
আমি যোগবলে দেখিলাম ধ্যান করে,
আপনি পরমব্রহ্ম রামরূপ ধরে,
জন্মিবেন তোমার ঘরেতে।
তুমি মাগের কথায় বনে দিবে প্রাণের সীতে।
শোকে মরবি বালীর পিণ্ডি খাবি কলার পিণ্ডি পাবিনে।
খাদ।—কিসে ভাল মন্দ হয় কিছুই ভাবিস্‌নে ॥
ফুঁকা।—যে জন বিদ্যাশূন্য ভট্টচার্য্য হয়,
তারে কেও করে না বিশ্বাস।
তুই তো রাজার বেটা, জন্মেছিস্ * * *
কেন তোরে রেখেছে যম বেটা রে করে উপবাস ॥
মেল্‌তা।—দশ হাজার বৎসর প্রমাই তোমার ক্ষয় হলো এবার
যম-ভবনে তোমার নামে, খাতা উঠবে কোন দিনে ॥
১ চিতেন।—এখন বল্লে এসে সূর্য্যবংশে
সুপুত্র জন্মে না একজন ॥
পাড়ন।—কায়মনেতে অভিশাপ দিতেছি তোরে
রাজা দশরথ রে, মুনির বাক্য নয় অলঙ্ঘন ॥
ফুঁকা।—বাল্মীকি ষাট হাজার বৎসর অগ্রেতে,
করেছেন পুরাণ রচনা, আমার আছে সব জানা।
চন্দ্র সূর্য্য আকাশে যদি সব পড়ে খসে,
তবু মুনির বাক্য কোন অংশে মিথ্যা হবে না ॥
মেল্‌তা।—সাধ করে কি কল্লেম অভিশাপ পেলেম মনস্তাপ,
এবার কালসাপে দংশিল তোরে,
তাগা বাঁধবি কোনখানে ॥ ॥[২]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

২ প্রাঃ ওঃ কঃ

এণ্টনী সাহেব

॥ ১ ॥

আগমনী

মহড়া।—জয় যোগেন্দ্রজায়া মহামায়া,
মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
মা তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা!
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?

খাদ।—অতি কুমতি কুপুত্র বলে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে,
তোমার জন্ম যেম্‌নি পাষাণ কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ,

ফুঁকা।—দয়াময়ি! আজ আমায় দয়া করবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ।

মেলতা।—জানি তোমার চরণ সাধন করি,
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী,
দেখ সকল ফেলে ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি
আবার শূন্য করে সোণার কাশী,
ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী,
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছে।

১ চিতেন।—নাম কেবল করুণাময়ী করুণাশূন্য হ'য়েছ।
মা, তুমি দক্ষরাজকুমারী দক্ষযজ্ঞে গমন করি,

যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে শিব অপমানে,
মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি,
দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—
আপনি মলি তাকেও মেলি,
পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে।

পাড়ন।—তখন যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ তেজেছে বিষাদ মনে দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে,
তার বুকে গা দিয়েছ।

ফুঁকা।—তুমি তার, তার, তার, না তার, না তার,
আপনার গুণে তোরবো,
দুর্গা নাম তরি মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো,
আমার অন্তে শমন এলে অজপা ফুরালে

মেলতা।—দুর্গা দুর্গা বলে ডাক্‌বো।

২ চিত্তেন।—মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোর্‌লে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

পাড়ন।—একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা, তোমার ধারাত, মায়ের ধারা নয়!

ফুঁকা।—মা রাবণ রাজা অন্তিমকালে রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা বলে ডেকেছিল বদনে,

মেলতা।—তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাব্‌লিনে,
তারে ধ্বংস করে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখলিনে।

অন্তরা।—আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাত জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল কর, তার সোনার লঙ্কা
দগ্ধ কোরে এসেছ।
মেলতা।—দয়াময়ি মা গো,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ ?[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

মহড়া।—ফিরে এস হে রাধার মান দেখে মান করে
শ্যাম আজ যেও না।
তুচ্ছ নারীর মান ক'দিন রবে,
তোমার রাই তোমার হবে,
শ্যাম হে কেবল কথাই রবে,
রাগের ভরেতে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বধো না॥
খাদ।—চল হে নিকুঞ্জে মান যাবে না॥
ফু'কা।—শ্যাম তুমি হে রসিকমণি,
জানি তোমায় চিন্তামণি,
গুণমণি বলি শ্যাম তোমায় তুচ্ছতায়, শ্যাম হে,
থাক বঁধু ধৈর্য্য ধরে পাবে তোমার শ্রীরাধারে,
কালবরণ না দেখে রাই অমনি মূর্চ্ছা যায়॥
মেলতা।—এতই চিন্তা কেন, গুণমণি শ্যাম,
নিরোদ-বরণ নীরদ-বরণ,
মানের দায় বংশীবদন আর কেঁদো না॥
১ চিতেন।—শ্রীমতী মানের দায়ে বিদায় তুমি বল্লে এখন॥
পাড়ন।—রাধার মান দেখে তোমার প্রাণ কাতরা অধীরা হে
দুঃখে দহে জীবন॥

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ হইতে সংগৃহীত, এই গানটী এণ্টনির দলে গীত হইত, এবং সেই হেতু ইহা এণ্টনীর রচনা—এই মতে অনেকে আস্থা রাখেন না, কাহারও মতে গানটী ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর রচিত।

ফুঁকা।—রাই তোমারে বিদায় দিয়ে, কুঞ্জে কাঁদেন ব্যাকুল হয়ে,
আকুল হয়ে ধৈর্য্য ধরে না ধরে না শ্যাম হে।
আমরা উভয় পক্ষের দাসী, উভয় পক্ষে ভালবাসি,
রাধা শ্যাম বিচ্ছেদ হলে প্রাণে সহে না॥
মেলতা।—প্যারী কাল ভালবাসে জানি হে কালশশী,
শ্রীরাধার মানের দায়ে আর ভেব না॥
অন্তরা।—বলবো কি হে শ্যাম তোমাকে,
গিয়ে রাধার দশা দেখ চোখে॥
পড়েছেন রাই ধরাতলে, সদাই ডাকেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
কৃষ্ণ কই বোলে বোলে,
হয়ে কৃষ্ণ-হারা প্রাণ-কাতরা সবাই কাঁদে মনের দুঃখে॥
২ চিতেন।—কাতরে বল্লেম তোমায়,
তাতেই হরি আমরা সব গোপীকায়॥
পাড়ন।—চল চল শ্যাম হে, সেই রাধার কুঞ্জে,
বলি তাই হে, ধরি রাঙ্গা পায়॥
কৃষ্ণপ্রাণা রাই, বলি তাই শ্যাম হে,
আমরা সবে ব্রজনারী, কৃষ্ণ বিনে রইতে নারি,
চরণ বিনে গোপীগণের অন্য উপায় নাই॥
মেলতা।—তোমার অভয় পদে আছি সঁপে মন……[১]

বিরহ

মহড়া।—প্রেমে ক্ষান্ত হলেম প্রাণ,
আর আমার পিরীতের পথে যেতে মন সরে না।
যা হবার তা হয়ে গেছে, সে আলাপে কাজ কি আছে,
ওরে আমার প্রাণ।
মিছে বেগার দিতে আমার কাছে আর তুমি এসো না॥
খাদ।—তোমার যত ভালবাসা গিয়েছে জানা।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

ফুঁকা ।—যে দিন শয়নকালে প্রাণ তোমারে ভাবি মনে মনে ।
মরি মনের আগুনে, প্রাণ রে ।
তুমি থাক দেশান্তরে আমি থাকি শূন্য ঘরে,
বুক ফেটে যায় চিন্তাজ্বরে মুখ ফুটে বলিনে ॥

মেলতা ।—আমায় যে দেখে একবার,
বলে রক্ষা রক্ষে পাওয়া ভার,
একটা মিষ্টিকথা বলে কেও তো সুধায় না ॥

১ চিতেন ।—অবলা নারী আমি ছিলেম প্রাণ-কুলেতে ॥

পাড়ন ।—ছিল বিধির লিখন চক্ষের মিলন,
তোমায় আমায় দেখা পিরীতের পথে ॥

ফুঁকা ।—তখন নূতন নূতন দিন কতক কাল প্রাণ জুড়ালে এসে ।
তাইতে মজলেম প্রেমরসে, প্রাণ রে ।
যেমন ধারা মাণিকযোড়ে, তেমনি ছিলেম যোড়ে যোড়ে,
এখন তুমি আমায় ছেড়ে লুকিয়ে রও বিদেশে ॥

মেলতা ।—দৈবাৎ হয়েছে মনে তাইতে এলে এখানে,
বঁধু আজ বাদে কাল তোমার দেখা পাব না ॥

অন্তরা ।—এই কি রসিকের প্রেমের ধারা, প্রাণ রে ।
আমার হলো কেমন যেমন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা,
তোমার হলো দুটো মন ভাব ছাড়া ছাড়া,
প্রেম করা নয় কেবল কুলের রমণী খুন করা ॥

২ চিতেন ।—প্রেমেতে যত সুখ জেনেছি পরিচয়, প্রাণ রে ॥

পাড়ন ।—রমণীর মন সরল যেমন,
পুরুষের মন সরল তেমন নয় ॥

ফুঁকা ।—তার সাক্ষী বলি উত্তমে অধমের তুলনা,
সেটা মিথ্যা বলবো না, প্রাণ রে ।
সীতা সতী বিনা দোষে রাম দিলেন তায় বনবাসে,
ভালবাসার এই সুখ শেষে, ঘটে তায় যন্ত্রণা ॥

মেলতা ।—আর দময়ন্তী সতী নল রাজা হয়ে পতি,
বনে ফেলে গেল একবার ফিরে চাইলে না ॥[১]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

॥ ৪ ॥

গোষ্ঠবিহার

মহড়া ।—ওরে গোপাল, লয়ে গোপাল গোষ্ঠে
গোচারণে যাস্‌নে বনে ।
গোপাল গোষ্ঠেতে গেলে পরে,
পায়ে পায়ে শত্রু ফেরে,
সঙ্কটে তোরে পাঠাইতে শঙ্কা করে,
ননী খাওরে আর মা বল রে চাঁদবদনে ॥

খাদ ।—মা হেরে গোপাল তোরে মরি প্রাণে ॥

ফুঁকা ।—আমায় মা বলে আর এমন কেহ নাই ।
সবই তুইরে প্রাণ কানাই ॥
লাগে যদি রবির কিরণ,
মলিন হয় ঐ চন্দ্র-বদন,
গোষ্ঠে লয়ে যেতে গোধন, মানা করি তাই ॥

মেলতা ।—আছে কি অভাব নন্দের ঘরে,
যাবি যমুনার তীরে,
ক'রে হরে রে ব'লে ।
খাস্ না কি ভিক্ষা করে রাখালগণে ॥

১ চিতেন ।—গোকুলের গোপাল যত আনন্দে
গোষ্ঠের পথে ধায় ॥

পাড়ন ।—প্রভাত রজনী, শুনে শিঙ্গের ধ্বনি,
নীলমণি বলে যশোদায় ॥

ফুঁকা ।—সাজায়ে গোষ্ঠের সজ্জা দে আমারে,
বলি বিনয়ে তোরে ।
বেঁধে দে মা পীতধড়া, গলায় দে মা গুঞ্জাছড়া,
মস্তকে দাও মোহন চূড়া, বাঁশী দাও করে ॥

মেলতা ।—শুনে গোপালের নিষ্ঠুর বাণী,
কেঁদে কয় নন্দরাণী, ওরে নীলমণি, ওরে নীলমণি,
যেতে দিব না প্রাণ থাকিতে তোর গোচারণে ॥[১]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

গোরক্ষনাথ

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

প্রাণ তুমি আর পথে এসো না।
শুধু দেখা দিবে সখা সে তো তা মনেতে বুঝে না
তুমি যার এখন তার পূরাও বাসনা।
তোমা হতে সুখ যা হবার
প্রাণ তো হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার।
দেখা হোলে মরি জ্বলে, এমন দেখা সখা আর দিও না
আগে তোমায় দেখলে সখা, হোতো পরম আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ।
এসো বসো বলো হলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে আমার পাকে করিবে লাঞ্ছনা॥
উচিত নয় রসময় হেথা আসা এখন।
নূতন রঙ্গিণী তোমার করিবে ভৎর্সন।
আমায় বরং সখা দিও দেখা যুগ-যুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরে নব্য প্রেমেতে।
নবরসে সে যে রঙ্গিণী।
প্রাণ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী
আমায় যেমন জ্বলিয়ে ছিলে,
প্রাণ তারে এমন জ্বালা দিও না॥[১]

মাথুর

১ চিতান।—গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ
ত্যজিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য।

১ বাঃ গাঃ

১ পরচিতান।—কারে বল সই শুন্‌তে রাধার যন্ত্রণা
ও যে শ্যামচরণচিহ্ন।
১ ফুকা।—সখি ঐ যার পদচিহ্ন,
সেই মাধব যখন দুখ বুঝলে না;
অরণ্যে রোদন এখন
ঘুচ্‌বে না মনের বেদনা।
১ মেলতা।—রাধার সুখের ত কপাল নয়,
তা হলে কি এমন দশা হয়?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধে,
পড়ে ভূতলে।
মহড়া।—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই;
কি হবে ব্যাকুলা হ'লে,
এখন ভ্রান্তি পরিহরি
বাঁচাও সই কিশোরি
হরি মন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।
খাদ।—কেন ব্রজধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম
রাধার দুঃখের কপাল না হ'লে।
২ ফুকা।—মনে জ্ঞান হয় জন্মান্তরে
আমরা কৃষ্ণ হরি সখি নিছিলাম কার।
বুঝি সেই পাপে এ মনস্তাপে
দহিল প্রাণ গোপিকার।
২ মেলতা।—নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়:
রাধার প্রাণ যায়
গোকুল ভাসে দুখ সলিলে ॥[১]

॥ ৩ ॥

১ চিতান।—সকলে জানে সই রসময়ী আমি ইচ্ছাময়।
১ পরচিতান।—জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে আমা হতে হয়।

১ বাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ

১ ফুকা।—কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব,
করি কখন ঘাটেলি কখন রাধার দাসত্ব।
১ মেল্‌তা।—কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করিহে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায়।
মহড়া।—আমি অনন্ত আমার অন্ত কেবা পায় ;
কভু কুবুজায় সুন্দরী, করিহে সুন্দরী,
কখন ধরি রাধার রাঙ্গা পায়।
খাদ।—কভু ভিক্ষা করি মান মানিনী রাধার মানের দায়
২ ফুকা।—কভু করে ধরি গিরিগোবৰ্দ্ধন,
ইন্দ্রদেবের ভয়েতে রক্ষা করি গোপীগণ।
২ মেল্‌তা।—কভু পুতনা করি নিধন,
কভু করি গো সখি কালীয় দমন,
কভু উদূখলে বাঁধেন্ যশোদা আমায়॥[১]

॥ ৪ ॥

গোষ্ঠ

মহড়া।—এই নে ধর হলধর, অধর-চাঁদেরে ধর,
আমার নীলমণি সঁপে দিলাম তোর করে।
বাছা, যাস্‌নে সেই কালিদহে,
এখন জীবন দহে,
মনে হলো অধরের শঙ্কা নাই রে।
জল অনলে, তাই বলি গোপাল রে।
রাখিস্ বাপ যত্ন ক'রে আবার না গিরিধরে,
গিরি ধরে॥
খাদ।—আমার নিরন্তর কত ভয় অন্তরে॥
ফুঁকা।—গোষ্ঠেতে গোপাল বিদায় দিতে আচম্বিতে,
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়,
জলি বনদগ্ধা হরিণীর প্রায় রে,

১ প্রাঃ কঃ সঃ

আমার গোপাল দুধের গোপাল,
যায় গোপাল লয়ে গোপাল,
ব্রজগোপাল দেখিলে গোপাল,
গোপালের না ঘটে দায় ॥

মেলতা ।—গায় না লাগে তাপ, সেখানে যাস্‌নে বাপ,
যেখানে প্রভাকরে প্রভা করে ॥

১ চিতেন ।—যাইয়া রাখাল সবে শ্রীনন্দের ধাম ।
নিশি প্রভাতকালে, আয় রে ব'লে,
কৃষ্ণকে ডাকেন বলরাম ॥

পাড়ন ।—উঠ রে গোপাল, প্রভাতকালে,
মায়ের কোলে আর কি নিদ্রা শোভা পায়,
ওরে কোকিলে ঐ ললিতে গায় ।
আয় রে কানু, ও নীলতনু,
উদয় ভানু বাজা রে বেণু,
বাজিলে নূপুর রুণুঝুণু,
ধেনু তবে গোষ্ঠে যায় ॥

মেলতা ।—ল'য়ে কৃষ্ণধন, চক্ষের জল বরিষণ,
যশোদা কহে তখন মধুস্বরে ॥

অন্তরা ।—হৃদিনিধি স'পে দিলাম তোর করে করে।
আমার চক্ষে নাহি জল ধরে রে ।
গোপাল বিনে আমি নারী,
গৃহে রইতে নারি,
সইতে নারি, প্রাণ যে কেমন করে ॥
প্রাণ-গোপালের তরে,
ওরে কানুর গান নিশায় যেন দান সুধাকরে ॥

২ চিতেন ।—যতনে নীল-রতনে রাখিস্ বলাই ।
এই নে নবনী ধর, চাইলে রাখালেশ্বর,
চাঁদমুখে দিও রে সদাই ॥

পাড়ন ।—গোকুলের মাণিক যতনের ধন,
আমার জীবন ধন,

এমন ধন আর কার নাই,
আহা মরি মরি মরে যাই রে ॥
গোপাল বিনে ক্ষণে ক্ষণে,
কত দুঃখ মনে মনে,
পথে সুধাই জনে জনে,
বনে বনে খুঁজি তাই ॥
মেলতা ।—বিনে গোপাল আমার,
কে আছে কুলে আর,
না দেখলে সুধাই আবার ঘরে ঘরে ॥

ভোলা ময়রা

সখীসংবাদ

চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ,
ঘুচিল এত দিনের পর ।
অন্তরে জুড়াও গো কিশোরী,
হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর ॥
যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকণ কাল, হৃদে উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর ।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ উদয় হ'ল রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল ।
বুঝি নিবলো রাধে,
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল ।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

হেরে অন্তরে কালাচাঁদ অন্তরের পূরাও সাধ,
অন্তর করো না আর নীলকমল ॥
এ সময় পরশিতে বলো না, হয় পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন, ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ
রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার ॥
রাধে, তোমার দুঃখ আর নাই সহে গোপিকার।
গোপিকার করিলেন মাধব আজি
বিরহানল বুঝি সুশীতল ॥[১]

॥ ২ ॥

মাথুর

মহড়া।—কংসের রাজ্যেতে সই করিলে মধুর-লীলে,
এ মথুরায়।
ছিল কুব্জা কুৎসিত কংসের দাসী,
চন্দন-দান করে হ'লো সুরূপসী,
মধুর প্রেম বৃন্দাবনে মন বাঁধা রাই-চরণে,
দিলেন কুব্জার ভক্তির গুণে চরণ আশ্রয় ॥
খাদ।—ব্রজাঙ্গনা বিনে আমার মন অন্যেতে কি পায় ॥
ফুঁকা।—আছে ব্রজেতে রাইরঙ্গিণী, রূপে সৌদামিনী,
প্রেমের অধীন আমি তার, ব্যক্ত ত্রিসংসার।
হায় হায় গো!
সবাই জানে রাধা কানু বিভিন্ন নয় একই তনু,
আমার এ মন করে হরণ এমন সাধ্য কার ॥
মেলতা।—আমি তিলার্দ্ধ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া তো নই,
মনের কথা কই, মনের কথা কই,
বাসুদেব রূপে আছি কংসের আলয় ॥

---

১ বাঃ গাঃ

১ চিতেন ।—শ্রীবৃন্দের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কয় ।
আমার মনের কথা সকল লীলের কথা,
যথার্থ বলি পরিচয় ॥
পাড়ন ।—আমি ছিলেম গোলোকবিহারী ক্ষীরোদশায়ী হরি,
লীলাকারী কৃষ্ণধন ।
গোপীর মনের ধন হায় হায় গো !
বৃন্দাবনে গোপের কুলে করেছিলেম মধুর লীলে,
ছিদাম-শাপে সে সব লীলে দিলেম বিসর্জ্জন ॥
মেলতা ।--ছিল কুব্জার প্রেম-বাসনা, মনে মনে ।
মধুর ভুবনে গো, মধুর ভুবনে গো !
ভক্তে সই, ভক্তিগুণে বাঁধে আমায় ॥
অন্তরা ।—আমি জগতের লীলাকারী হরি ।
বৈকুণ্ঠধাম ত্যজ্য করে মানবরূপে লীলে করি ॥
গোকুলে সেই গোপীর কুলে,
আমি করেছিলেম মধুর লীলে,
জানে সকলে জানে সকলে,
রাধার প্রেমের দায়, থেকে নন্দালয়,
রাধা-নামে বাজাতেম বাঁশরী ॥
১ চিতেন ।—বধেছি কংসাসুরে এই মথুরায় ।
আমি শ্রীরাধার দাস সে সব আছে প্রকাশ,
জানে সব গোপীসমুদয় ॥
পাড়ন ।—তোমরা কুলের ভাবনা করো না,
গোপির কুল যাবে না, শুন ওহে বৃন্দে কই ।
মনের কথা কই গো, মনের কথা কই গো !
কুলে যার কুল রক্ষে করি অকুলেতে হই কাণ্ডারী,
প্রেমের গুরু রাই-কিশোরী তারে ছাড়া নই ॥
মেলতা ।—করি রাধার নাম সুধাপান নিশিদিনে,
শয়নে স্বপনে হে, শয়নে স্বপনে হে !
ভুলিতে কি পারি আমি সেই শ্রীরাধায় ॥[১]

---
১ প্রাঃ ওঃ কঃ ।

॥ ৩ ॥

কবির লহর

মহড়া।—দুর্য্যোধন কুরুপতি হে,
তোমার মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘটালে।
দেখিল সকলে কপট ছলে পাশা খেলালে,
পঞ্চপাণ্ডবের রাজধানী সব জিতে নিলে।
তাদের রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলে,
মুখ চাইলে না ভাই বলে ॥

খাদ।—পরের কথায় এককালে বুদ্ধি হারালে ॥

ফুঁকা।—দ্রুপদ রাজকন্যে,
তোমার ভাদ্রবধূ ছিল হস্তিনে,
তুমি নেংট করেছ তারে সভার মাঝখানে ॥

মেলতা।—সে যে কুলবধূ ভাদ্রবধূ তোমার,
তার আবরু সরম কল্লে হরণ বাম উরুতে বসালে ॥

১ চিতেন।—আমি দ্রোণাচার্য্য নামটী ধরি হস্তিনাতে রই ॥

পাড়ন।—আমার প্রধান শিষ্য তুমি রাজা দুর্য্যোধন,
আমি তোমাদের শিক্ষাগুরু হই ॥

ফুঁকা।—এ কি শুন্‌তে পাই আমি জান্তে এলেম তাই।
যুধিষ্ঠির পাশায় হেরে রাজ্যধন ত্যজ্য করে,
গেল বার বৎসরের তরে বনে পঞ্চ ভাই ॥

মেলতা।—যেমন কেকই দিলে রামকে বনবাস,
তুমি তেম্নি করে পাঁচজনারে বনবাসে পাঠালে ॥

অন্তরা।—ভাল মন্ত্রণা।
শকুনি হতে তোমার ঘটবে যন্ত্রণা।
শম্ভু দৈত্যের মন্ত্রী ছিল সে ধূম্রলোচন,
তেমনি লঙ্কায় ছিল রাবণ-রাজার মন্ত্রী শুক শারণ,
এখন তোমার মন্ত্রী হ'লো দেখি শকুনি এক জনা ॥

২ চিতেন।—ভাল মন্ত্রী নাই যে রাজার রাজ্যের অমঙ্গল ॥

পাড়ন।—যে মন্ত্রণা দিলে তোমার মামা শকুনি,
তোমার সকলি হবে বিফল ॥

ফুঁকা।—নলরাজা যেমন এমনি পাশা খেলে গেল বন।
শনির মন্ত্রণায় পড়ে রাজ্যধন গেল উড়ে,
আবার কতকদিন পরে হ'লো গৃহে আগমন॥
মেলতা।—তোমার মাতামহের হাড়ে পাশা হয়।
যখন যেটা ব'লে পাশা ফেলে তখনি সেইটে ফলে॥[১]

॥ ৪ ॥

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা,
(ওগো) সর্দ্দি গর্ম্মি নাহি মানি।
ফুরাইল বারমাস, ষড়্ ঋতুর হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥
শীত এলে লেপ লই গর্ম্মী এল ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি॥
শরতে হেমন্তে বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি॥
কালো-মেঘে বর্ষাকালে, বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের পেকমের বাহার।
ষড়্-ঋতুর বার মাসে, মাঘের মেঘের শেষে,
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার॥
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পূজো এলে পুরি মিঠাই ভাজি।
বসন্তের 'কুহু' শুনে ভক্তি-চন্দন সনে
মনফুল রামচরণে করি রাজি॥
তবে যদি কবি পাই হটে কভু নাহি যাই,
হোক্ বেটা যতই মন্দ
জাহাজ, ডোঙ্গা, সোলা, নাও, যাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ।[২]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ
২ সাহিত্য সংহিতা, ১৩১১ বৈশাখ

সীতানাথ মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ভবানী বন্দনা

তারা গো আমার প্রাণ যদি যায়
তবু তোমায় ডাকবো না মা বলে।
মা হ'য়ে বিমাতা হ'লে,
(আমার) পৈতৃক ধন শিবকে দিলে,
জীবকে ফাঁকি দিয়ে,
জানি তো পাষাণের মেয়ে,
আছ পাষাণ হ'য়ে,
পিতা আমার শিয়ান পাগল
আপন চিন্তায় সদাই বিকল,
তাইতে তোমার চরণকমল
রেখেছেন শিব হৃদ্‌কমলে[১]।

সখীসংবাদ

মহড়া।—এ কি ভাব উদয় আজ কেন
কৈলাস এলো কুঞ্জকাননে।
সুখের কৈলাস দেশ,
তব স্বদেশ শুনি মহেশ,
সে দেশ ত্যজেছ হে বল হলো কি দ্বেষ।
দেখতে পাই শীর্ণ অতি,
কি অভাব পশুপতি,
তোমার বামে নাই হৈমবতী, কি কারণে॥
খাদ।—কোথা হলো বিবাদ, কি বিষাদ হয়েছে মনে॥
ফুঁকা।—জাতি সতী ছাড়া নয় তুমি হর,
সতী বিনে আজ একেশ্বর, করতেছ ভ্রমণ।
এ কি অঘটন, হায় হায় হে!

---
১ বিশ্বকোষ

এলে মধুর বৃন্দাবনে, কি অভিলাষ আছে মনে,
কেন আকুল হ'লে প্রাণে, বল বিবরণ ॥

মেলতা ।—তোমার অন্ত জানে কে, ভাবি তব ভাব দেখে,
মরি হে দুঃখে বল কি দুঃখে বহে বারি নয়নে ॥

১ চিতেন ।—রয়েছে মানে মুগ্ধ রাজনন্দিনী ॥
দেখে রসরাজ, ত্যাজ্য করে নটবর সাজ,
সদাশিবের সাজ সাজলেন আপনি ॥

পাড়ন ।—রূপে শোভা রজতগিরি, চিতাভস্ম গায় ।
বাঘাম্বর তায় কটিদেশে দিয়ে ঢাকা,
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র-রেখা, বোবো ব্যোম, বোবো ব্যোম,
গালবাজায়ে কুঞ্জের দ্বারে যায় ॥

মেলতা ।—হেরে রঙ্গিণী, স্থচিত্রে,
হয়ে চিত্তে বিনয় বাক্যেতে,
তাহে কহিছে প্রণাম ক'রে শ্রীচরণে ।

অন্তরা ।—ব্রজে এসেছ কি মনে ভেবে,
কি ধন অভাবে,
ভেবে পাইনে কিছু মরি ভেবে ।
ভাব দেখে ভাব করতে নারি,
নারি আমি অবোধ নারী,
মরি আ-মরি ! ভবরাণী কই, ওহে বিশ্বজয়ী,
ভবের কর্ত্তা তুমি ভবার্ণবে ॥

২ চিতেন ।—কীর্ত্তিবাস কি অভিলাষ হলো মনে ।
হলো অসন্তোষ, ওহে তুমি দেব আশুতোষ,
দেখি বিরস ভাব কি অভিমানে ॥

পাড়ন ।—ভেবে যোগিগণে পায় না অন্ত,
করেছ জয় সে কৃতান্ত, গৌরীকান্ত হর ।
কৈলাসেশ্বর ঈশ্বর, হায় হায় হে !
দাঁড়িয়ে আছ কুঞ্জের দ্বারে,
প্যারী আছে মানের ভরে,
ভিক্ষা কে আর দিবে তোমারে ওহে গঙ্গাধর ॥

মেলতা।—জটায় ধর সুরধনী,
নাম তোমার শূলপাণি,
আগমে শুনি।
কেন করতেছ শিঙ্গাধ্বনি, কি কারণে ॥[১]

॥ ৩ ॥

বিরহ

হারিয়েছি নীলকান্তমণি,
অনাথিনীর বেশ সাজিয়ে দেগো বৃন্দে সখি
গেছেন যে পথে আমার বনমালী,
দূতী, এনে দেগো,
সেই পথের ধূলি ;
অঙ্গে মাখিয়ে দে ;
প্রাণ জুড়াই তার বিচ্ছেদে,
নয়ন মুদে হৃৎপদ্মে কালরূপ নিরখি।
আমি সদাই থাকি গো বৃন্দে মুদে আঁখি,
আর লোকের কাছে
এ মুখ দেখাব না সই
দূতি, গো (ওগো)
যদি এলো শ্যাম কালরতন,
কাজ কি আর সামান্য রতন,
প্রিয় বিনে কি প্রয়োজন
অঙ্গের আভরণ।
যেমন হারায়ে মাথার মণি
আকুল হ'য় ফণিনী।
তেমনি প্রাণের নীলমণি বিনে
গোকুল শূন্য দেখি।[২]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ
২ বিশ্বকোষ

॥ ৪ ॥

যশোদার খেদ

মহড়া ।—কাল মাণিক কোথারে,
একবার আয় আয় আয়রে
এ দুখিনী মায়ের কাছে ।
গেল যে হ'তে অক্রূরের রথে
আমি দাঁড়ায়ে ব্রজের পথে,
ক্ষীর-সর-ননী ল'য়ে হাতে
তোরে দেখবো বলেরে
মরিনি আশাতে প্রাণ বেঁচে আছে
খাদ ।—গণি দিন দিন দিন
কতদিন আর তাপীর প্রাণ বাঁচে ।
অন্তরা ।—আঁখির পলকে যায় হারা হই ;
আশাতে মন বুঝে কই,
তোমা বই কি ধন আছে,
কৃষ্ণ বলরে,
যেমন অন্ধের পক্ষে নয়নধন,
দরিদ্রের রত্নধন,
আমার সাধের ধন
নীলমণি ব্রজে প্রাণকৃষ্ণ তুই রে ।
মিল ।—নারীর সকল সুখ অনিত্য সুখ
কি ধন লয়ে আজ বাধবো বুক
নীলমণিরে,
আমার সকল সুখ কৃষ্ণ রে
তোর সঙ্গে গেছে ॥[১]

১ বিশ্বকোষ

পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ভবানী-বন্দনা

১ চিতান ।—কর্ম্মদোষে জন্মভূমে এসে
বিষয়-বিষে অঙ্গ জর, জর
১ পরচিতান ।—মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে
দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর ।
১ ফুকা ।—ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী ।
এ মা গৌরীরূপা গিরিপুত্রী,
জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী
সাবিত্রী গায়ত্রী
গীতা গণেশজননী ।
১ মেলতা ।—অর্পণা পার্ব্বতী দুর্গা
এ মা, আপদ উদ্ধারিণী
শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে
দুর্গা বই কে রাখ্‌তে পারে ।
মহড়া ।—দুর্গে তোর দুর্গা নামে দুখ নিবারে
তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে ।
খাদ ।—এ মা কৃপা কর কাতরে ।
২ ফুকা ।—ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব
ভ্রমণ করে নানা তীর্থ
তব তত্ত্ব ভুলে,
এমা দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এমা,
জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে,
কা চিন্তা মরণে রণে
দুর্গা নাম নিলে ।
২ মেলতা ।—শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র,
অঞ্জলি দেয় চরণ পরে ।

জগতে আছে বিখ্যাত,
বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ
ক্ষীরোদ-সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে,
দারুণ বিষের জ্বালায় বাঁচল
ভোলা দুর্গা মন্ত্র সাধন করে ॥[১]

গুরুদয়াল চৌধুরী

মাথুর

১ চিতান।—রাধা-মন্ত্রে দীক্ষা আমি সই, শুন কই
আমার শ্রীরাধা মূলাধার।
১ পরচিতান।—রাধার প্রেমেতে বাঁধা রাধা প্রাণ-আধা
জপি নাম সদা শ্রীরাধার।
১ ফুকা।—রাধা ব্রহ্মময়ী, আদ্যা সনাতনী,
সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী, কমলিনী সইরে—
প্রধানা গোপিকা গোলকবাসিনী,
১ মেল্‌তা।—সেই শ্রীরাধার সঙ্গিনী, ওই বৃন্দে রমণী
এসেছেন এই মধুভুবনে।
মহড়া।—আছেন প্রাণেশ্বরী রাধে রাসেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবনে।
আমি সেই রাধার মানের দায়, ধরে সেই রাধার পায়
বিক্রীত হয়েছি রাই-চরণে।[২]

প্রভাস

১ চিতান।—অচিন্ত্যরূপিণী কমলিনী, ওই শুন রসময়ী।
১ পরচিতান।—উহায় চেনা না ও যে গোপীপ্রধানা
আমি ওই রাধার কোটাল হই।

১ প্রাঃ কঃ সঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ

১ ফুকা।—শ্রীদামেরই শাপে পেয়ে মনস্তাপ কিশোরী,
ঘুচে স্বর্ণবর্ণ হয়েছেন বিবর্ণ, সইরে—
তাই মলিনা প্রাণের প্যারী।
১ ডবল ফুকা।—সেই দুরূহ বিরহ হইল ভঞ্জন।
প্রভাসে এসেছেন তাই, প্রাণ ত্যজিবারে রাই,
সই সই সইরে—গোলোকে গোলোকময়ী
করিবেন গমন।
২ মেল্‌তা।—শ্রীরাধার হল শাপান্ত এখন।
মহড়া।—ব্রজের ঈশ্বরী ওই রাসেশ্বরী চিন্তি ও রাধার শ্রীচরণ।
কেবল রাখিতে ভক্তের মান হানি বিরহ-বাণ,
অপার্য্যে এলেম মথুরায়,
আজি ঘুচিল সে দুখ জুড়াল জীবন॥[১]

ঢুম্বা

গোষ্ঠ

মহড়া।—ব্রজের গোপাল রে, আজ তোরা সব গোষ্ঠে যা রে,
আমার প্রাণ গোপাল গোষ্ঠে যাবে না রে।
দেখলেম কুস্বপন নিশি-শেষে কে যেন বল্লে এসে,
বলাই সঙ্গেতে॥
খাদ।—গোপাল আমার নাই গোষ্ঠেতে॥
ফুঁকা।—অমঙ্গল দেখে তখন করেছি কতই রোদন,
যেন কালো ধন, ডুবেছে কালীদয় কালো নীরে।
আমার দুগ্ধের গোপাল রাখতে গো-পাল,
পাঠাই কেমন করে॥

১ প্রাঃ কঃ সঃ

তোদের মধুর মধুর ধ্বনি শুনে,
গোপাল আমার গহন বনে,
গোচারণে যেতে চায়,
বনে যেতে চায় রে ॥
অবোধ ছেলের অভিপ্রায়।
তোরা লয়ে যাবি গোঠে,
শুনে যে প্রাণ কেঁদে উঠে,
এমন সন্তান বন সঙ্কটে মা হ'য়ে বল কে পাঠায় ॥

মেলতা।—কত শত্রু আছে পায় পায়,
দুঃখিনীর ধন যদি বনে যায়, হরে লয়ে যায়,
আর তো ফিরে গোপাল পাব না রে ॥

১ চিতেন।—সুনিশি সুপ্রভাতে রাখাল সব গিয়ে নন্দালয় ॥

পাড়ন।—বলে হা রে রে রে, রে রে,
কত ঘুমাও ভাই কানাই রে ॥

ফুঁকা।—গহন বনে ভাই গোষ্ঠে আয়।
করে রাখালগণ সব মঙ্গলধ্বনি,
বলরামের শৃঙ্গের ধ্বনি,
শুনে নন্দরাণী ধায়,
আস্তে আস্তে ধায় গো !
ও যেন পাগলিনীর প্রায় ॥
গহন বনের কথা শুনে,
রাম বনবাস হলো মনে,
কৌশল্যার প্রায়, ধরাসনে নন্দরাণী মূর্চ্ছা যায় ॥

মেলতা।—ক্ষণেক পরে চৈতন্য পায়,
মনের দুঃখে কেঁদে কয়,
তোরা এসময় ডেকে নিদ্রাভঙ্গ করিস্‌নে রে ॥

অন্তরা।—গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না।
গোষ্ঠে যাবে না, যেতে দিব না দিব না দিব না।
গোপাল আমার ঘুমায়েছে, নিদ্রাভঙ্গ করো না করো না,
শৃঙ্গের রবেতে ডেক না।

যদি এমন সন্তানে, পাঠাই আজ বনে,
মনের দুঃখে প্রাণে আর বাঁচবো না ॥
২ চিতেন।—তোরা সব নিত্য নিত্য ধেনু চরাতে যাস্ বনে।
পাড়ন।—সদাই গোঠে মাঠে, বেড়াস্ কালিদয়ের তটে,
সঙ্কটের শঙ্কা নাই বনে ॥
ফুঁকা।—আমার পঞ্চম বৎসরের ছেলে,
গোচারণে পাঠিয়ে দিলে।
গোকুলের লোক বলবে কি,
আমায় বলবে কি রে,
নন্দ শুনলে বলবে কি।
কাত্যায়নীর পূজে চরণ,
পেয়েছি রে ঐ নীলরতন,
তাইতে আমি অঞ্চলের ধন,
অঞ্চলে ঢেকে রাখি ॥
মেলতা।—যখন নন্দ যায় বাথানে,
গোপাল তখন আমার অঙ্গনে,
সদাই নৃত্য করে,
নন্দের বাধা মাথায় ক'রে ॥[১]

মাধব ময়রা

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ

মহড়া।—ওমা যশোদে, দে মা গোষ্ঠের বেশ,
যাব আমি গোষ্ঠেতে।
আমায় বেঁধে পীতধড়া
দে মা দে মোহন চূড়া,

প্রাঃ ওঃ কঃ

করে বাঁশী দে,
দে মা আমায় নবনী দে।
ডাকছে ঐ রাখালগণে,
গাভী সব যায় না বনে,
দে মা বেঁধে দে ননী ধড়ার অঞ্চলেতে ॥

খাদ।—ধেনু বৎস লয়ে, আমার বদন চেয়ে
আছে সকলেতে ॥

ফুঁকা।—লয়ে নব বৎস সঙ্গেতে,
চরাবো মা গোষ্ঠেতে,
গহন বনে যাব না, যাব না,
কালিন্দীর জল খাব না।
ভেব না মা দুঃখ মনে,
আস্‌বো বেলা অবসানে,
বিনে বেণু, ব্রজের ধেনু গোষ্ঠে যাবে না ॥

মেলতা।—করে গাভী সব হাম্বা-রব,
রাখালের হৈ হৈ রব, ওমা যশোদে,
হলো প্রাণাকুল নব বৎসের রবেতে ॥

১ চিতেন।—রাখাল সব প্রভাতকালে যায় গোষ্ঠেতে।
ডাকে কোথায় কানাই,
বেলা হয়েছে ভাই,
কত নিদ্রা যাও রে মায়ের কোলেতে ॥

পাড়ন।—ওরে আমাদের তো মা আছে,
ছিলেম রে মায়ের কাছে,
নিদ্রা ভেঙ্গে উঠেছি, উঠি রে,
গোষ্ঠের পথে বেরিয়েছি।
গোচারণে যাবি বলে, তাতেই রে ডাকি সকলে,
আয় রে কানাই, তোর গুণে ভাই বাঁধা রয়েছি

মেলতা।—শুনে রাখালের কাতর স্বর,
চক্ষের জল জলধর, ধরতে পারে না,
বলেন যশোদারে মধুর বিনয় বাক্যেতে ॥

১ চিতেন ।—গিয়ে গোষ্ঠের খেলা খেলবো গোষ্ঠে সবাই মিলে ।
রবির কিরণ লাগবে যখন বস্‌বো গিয়ে বৃক্ষমূলে ॥
যাবো বলাই দাদার সঙ্গে,
রব সঙ্গে সঙ্গে রাখাল সঙ্গে,
যাব না আর কার সঙ্গে,
থাকবো স্থখেতে কথার প্রসঙ্গে,
মনে বাঞ্ছা সকলারি খেলবো লুকোচুরি,
ননী মাখন খাবো ক্ষুধা পেলে ॥

পাড়ন ।—গোচারণে করবো মিলে সকলেতে ।
বনের কুসুম তুলে মালা গাঁথবো ফুলে,
মনের আনন্দে মা পর্‌বো গলাতে ॥

ফুঁকা ।—তুমি করেছ যা নিবারণ,
ভুলিনে আছে স্মরণ,
অন্ন ভিক্ষা করবো না খাব না,
ভিক্ষার অন্ন খাব না ।
বসে সবাই সারি সারি,
বাজাবো মোহন বাঁশরী,
বেণুর রবে রবে ধেনু দূরে যাবে না ॥

মেলতা ।—গোষ্ঠের বেলা হয় দাও বিদায়,
ঘটবে না কোন দায়, ওমা যশোদে,
এমন শত্রু কে আমার বিপদ ঘটাতে ॥[১]

॥ ২ ॥

গোষ্ঠ

বলাই বলি শুন
গোপালকে গোষ্ঠে যেত দিব না ।
বাছা ! তোর সঙ্গে কাল গিয়ে
গোপাল ডুবেছিল কালীদয়ে
কৃষ্ণ আজ গেলে
দুখিনীর প্রাণ বাঁচবে না ॥

---

[১] প্রাঃ ওঃ কঃ

মনেতে সন্দ হয়
তোমারে তাই করিহে মানা।
আমার অঞ্চলের ধন কৃষ্ণধন
এ দুখিনীর দুখের ধন
গোপাল লইয়ে আছি নন্দালয়
বলাইরে, কপাল ভাল নয়
আছে কত ভয় সে গাহন বনে,
মনে শঙ্কা হয় যদি বিপদ হয়
কৃষ্ণে রক্ষে করবে কে
তাই ভেবে আমার এখন মন বুঝে না।[১]

কবির লহর—রামায়ণ

মহড়া।—ও দশরথ মূর্খ মহারাজ আর তোর মত কাজ
করে কে কোথায়।
তুমি অযোধ্যার অজ রাজার ছেলে,
ভাল ধনুর্ব্বিদ্যা শিখেছিলে,
বধ করলে ব্রাহ্মণের সন্তান।
এক সিন্ধুশোকে অন্ধ অন্ধীর যায় দু'জনার প্রাণ।
তুই এমনি ধারা বাসি মরা হবি পুত্রশোকের দায়॥
খাদ।—রাজার সুখে অরণ্যে প্রজা কাল কাটায়॥
ফুঁকা।—বল কোন রাজাতে রাত্রিযোগে মৃগ বধে কাননে।
মারলে বাণ শব্দভেদী করলি কেন অবিধি,
আমার সোণার পুত্র সিন্ধুনিধি, বধলি এক বাণে॥
মেলতা।—সূর্য্যবংশে রাজা যে জন হয় তার এ ব্যভার নয়।
শুনি পরশুরামের ধনু বয়ে টাক পড়েছে তোর মাথায়॥
১ চিতেন।—তুমি নাম ধর দশরথ রাজা আমারে দিলে পরিচয়
পাড়ন।—তোমার কথা শুনে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।
রাজা দশরথ হে তুই আমার সোণার সিন্ধু নয়॥

১ বান্ধব, ১২৮২—পৌষ, কবিগান

ফুঁকা—আমায় পুত্র বোধে কাননেতে

বাক্যেতে ভুলাবি আমায় আমি বুঝলেম অভিপ্রায়।

হৃদের ধন দিয়ে জলে তুই ডাকবি বাবা বলে,

ওরে পরের ছেলে বাপ বল্লে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

মেলতা।—পরের ধনে সুখী হলে পর হতো পরাশর,

এমন ঢেম্না ছেলে কাজ কি আমার,

আপন ছেলে ছেড়ে যায়॥

অন্তরা।—তোমার বিদ্যা যত,

এরূপে মুনির সন্তান বধ করেছ কত।

মাগ সোহাগে মাগের ভেড়া এসে কাননে,

করলি অন্ধবংশ ধ্বংস মৃগমাংসের কারণে,

এবার তুই মলে তোর দশ হাজার মাগ কেঁদে মরবে কত॥

২ চিতেন।—আর পঞ্চ পাপের প্রধান পাপী

ব্রহ্মবধ করলি জগতে।

পাড়ন।—আর তুষানল কল্লে এ পাপ খণ্ডান না যায়।

তুই তো জানিস্ না কে পারে মূর্খ বুঝাতে॥

ফুঁকা।—যারা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে, তারা সর্ব্বদা সাবধান,

মেলতা।—একটী বধে বধলি তিন জনা, করে মন্ত্রণা,

যেমন জল বিনে সব চাতক মরে,

আমার ঘটলো তেমনি দায়॥[১]

কৃষ্ণলাল

॥ ১ ॥

বিজয়া

মহড়া।—আমার প্রাণ উমা,

আজ কি তুই যাবি গো মা,

কৈলাসপুরে।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিন দিন সুখে ছিলেম তোর চাঁদমুখে দেখে,
আজ কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শূন্য করে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে ॥

খাদ ।—তোমার যাই কথা সহে না আমার অন্তরে ।
আমি ইচ্ছা করি মা তোমায়,
রাখি এই হিমালয় করিয়ে স্থাপন ॥

অন্তরা ।—সদা সর্ব্বক্ষণ হায় হায় গো,
শিবকে পূজবো বিল্বদলে,
তোমায় পূজবো গঙ্গাজলে,
এইকালে পরকালে হবে কাল বরণ ।

মেলতা ।—আমার এমন সুখের দিন,
বল আর কবে হবে,
জীবন জুড়াবে,
যেও না হরিষে বিষাদ করে ॥

১ চিতেন ।—বিজয়া দশমী কাল হ'লো উদয় ।
নিতে উমাধনে বৃষ আরোহণে,
গঙ্গাধর এলেন হিমালয় ॥

পাড়ন ।—উমা গঙ্গাধরকে হেরিয়ে মনোতুঃখেতে
মায়ের কাছে যায় ।

ফুঁকা ।—কেঁদে কেঁদে কয় হায় গো,
দে মা আমায় সজ্জা কোরে,
করবি বেঁধে দাও শিরে
যাই মা আমি কৈলাসপুরে,
প্রণাম হই তোর পায় ॥

মেলতা ।—এই কথা শুনে রাণী,
উমার মুখে, মরি তুঃখে,
বক্ষেতে ভাসে তুটী চক্ষের নীরে ॥[১]

---

১ প্রাঃ শুঃ কঃ

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য

॥ ১ ॥

বিরহ

[সজনি গো, আমায় ধর গো ধর
বুঝি কি হ'ল আমারে।
নিবিড় মেঘের বরণ দলিত অঞ্জন
কে আসি প্রবেশিলে অন্তরে ॥
দারুণ বসন্ত তাপে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে
কৃষ্ণরূপ ভাবতে ভাবতে রাই
হলেন অচেতন ধরে সখীগণ
রাইতে রাই যেন আর নাই।
তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়,
এ কি দায়, বিশ্বম্ভরের প্রায়
কে আমার হৃদয়ে উদয় ?
হেন জ্ঞান হয় আমার ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার
পশিল আমার হৃদিপিঞ্জরে।][১]
সই, ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহরে !
একে শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে দেহ শূন্য,
এতে অন্য ভার কি সয় গো সই !
এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে,
কে আসি হ'ল অবতীর্ণ।
একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে
বিরহ-বিষেতে জরা ;
আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার
বহিতে দুঃখের পসরা ॥
আমার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এখন
যেন এ দেহের সঙ্গেতে, করিছে প্রাণ আকর্ষণ

১ প্রাঃ কঃ সঃ-তে এই অংশটুকু কেবলমাত্র পাওয়া যায়।

মনে ভাবি গো একবার, অন্তরে কি আমার
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ কোরে ॥[১]

॥ ২ ॥

১ চিতান।—করিয়ে পিরীতি যুবতী সকলের না হয় সুখোদয়।
১ পরিচিতান।—কেউ বা করে প্রেমে সুখলাভ,
কারো বা দুখে অঙ্গ দয়।
১ ফুকা।—তা বলে সই মনে দুখ ভেব না;
পাইবে সে কান্ত হবে দুখ-অন্ত
চিরদিন দুখ থাক্‌বে না।
১ মেল্‌তা।—দেখ শ্রীরাম বিহনে জানকী বনে
যে দুখ পেয়েছিলেন সই,
পুন পেয়ে রাম—সে দুখ তাঁর রইল না।
মহড়া।—পতির বিচ্ছেদে ওগো প্রাণসই, বিষাদ মনে ভেব না,
পাবে সময়ে সে পতি, জুড়াবে যুবতী,
ঘুচিবে রতিপতির যন্ত্রণা।
খাদ।—প্রেমের দুঃখ অনেক সখী সইতে হয়
তাকি জান না?
২ ফুকা।—দেখ দময়ন্তী নলের তরে,
কত দুখ সহিয়ে পুন নাথে পেয়ে
জুড়ালেন তাপিত অন্তরে।
২ মেল্‌তা।—আর পাণ্ডবের মোহিনী যাজ্ঞসেনী,
হইয়া বিপিনবাসিনী,
পুন রাজ্যধন পেলেন পাণ্ডব-অঙ্গনা।[২]

॥ ৩ ॥

১ চিতান।—অধৈর্য্যে আকুল হয়ে অন্তরে,
অকূলে দুকুল ডুবাবে।
১ পরচিতান।—ধৈর্য্য ধর দুখ সওগো সই
দু'দিন বই জ্বালা জুড়াবে।

১ বাঃ গাঃ হইতে সংগৃহীত
২ প্রাঃ কঃ সঃ

১ ফুঁকা।—সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়।
সুখান্তে দুখ হয় দুখান্তে সুখের উদয়।
১ মেল্‌তা।—এ দিন রবে না, ভেব না,
যাবে সই যন্ত্রণা সময়ে পাবে প্রাণবল্লভে,
মহড়া।—পতির বিচ্ছেদে প্রাণসই,
অধৈর্য্য হলে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে আশাপথ চাহিয়ে,
আসি সার জ্বালা সেই তোমার জুড়াবে।
খাদ।—কি সাধ্য রতিপতির বল গো, সতীর অঙ্গ দহিবে!
২ ফুঁকা।—পূজ বিল্বদলে সতীশঙ্করে,
ঘুচিবে পতির দুখ, হেরিবে পতির মুখ,
জুড়াবে তাপিত অন্তরে।
২ মেল্‌তা।—পাবে সময়ে প্রাণধন,
জুড়াবে প্রাণধন, দুরূহ বিরহ দায় ঘুচিবে।[১]

॥ ৪ ॥

বসন্ত

কৃষ্ণ, দেখ হে, একবার দেখ হে
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।
ব্রজের দুঃখানল রাধার শোকানল
প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে মোলো॥
বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ,
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ,
তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।
শুকসারী ডাকে না হে কৃষ্ণ বলে,
মধুকরের মধু মধু রব সে রব নাই হে;
কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে।

হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন শুন মধুসূদন !
এ মধুর কাল ফুলে শুকাল ॥
কেন শ্যাম, তায় গোকুলে পাঠালে বল।
ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব, তরুলতা সব,
সুখে মঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে
তাহে মলয় সমীরণ জ্বালায়ে হুতাশন
বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল ॥[১]

॥ ৫ ॥

১ চিতান।—বসন্তে ভ্রমররূপী হ'য়ে শ্যাম
শ্রীরাধার কুঞ্জেতে উদয়।
১ পরচিতান।—দেখিয়া রঙ্গদেবী আদি সব
বিশাখা সখী প্রতি কয় ;
১ ফুকা।—প্রাণের কৃষ্ণ নিদয় যে দিন হ'তে
সে দিন হ'তে মধুকর
করে না কুহুস্বর
আছে নীরবে বসে কুসুম বনেতে।
১ মেল্‌তা।—আজি কি হেরি আচম্বিত
মধুকর উপনীত
আনন্দে মত্ত মধুর গানে।
মহড়া।—আসি কুঞ্জবনে ভ্রমরা
গুণ্ গুণ্ স্বর করে কি কারণে ;
কুঞ্জে প্রস্ফুটিত কত ফুল
তাতে যায় না অলিকুল,
কেবল ঝঙ্কারে রাধার কমলচরণে।
খাদ।—একি-ভাব—অনুভাব কর সব গোপিকাগণে
২ ফুকা।—প্রাণের কৃষ্ণ বিনে সবে দুখী,
এখন বসন্ত সুখের দিন কোকিলের স্বরহীন
দেখ নীরবে আছে সই শুকপাখী

১ গুপ্তঃ, বাঃ গাঃ

২ মেল্‌তা।—নাহি সুখের প্রসঙ্গ
দুখ দহে অঙ্গ
ভ্রমরার রঙ্গ দেখে বাঁচিনে।
অন্তরা।—যখন কৃষ্ণ ছিলেন ব্রজধামে,
তখন ভ্রমরা ঝঙ্কারিত কুসুমে,
নানা ফুল হ'ত প্রফুল্ল
ব্রজে মধুময় হ'ত শ্রীকৃষ্ণ নামে।
২ চিতান।—সলিলে সরোজিনী বিকশিত
ভূতলে পলাশ কাঞ্চন।
২ পরচিতান।—সৌরভে প্রেমানন্দে পূর্ণিত হত
এই মধুর বৃন্দাবন।
৩ ফুকা।—এখন নাই সে সুখ ব্রজপুরে ;
তবে কি সুখে এ অলি
করে নানা কেলি
আবার কেন বা রাধার চরণ ধরে।
৩ মেল্‌তা।—কৃষ্ণের রূপ চিকণ কাল,
অলির বরণ কাল,
এরূপ হেরিয়ে কৃষ্ণ পড়িল মনে॥

১ চিতান।—বসন্ত আগমনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আগমন হ'ল না।
১ পরচিতান।—গিয়ে কংসধামে শ্যামে সম্ভ্রমে
বৃন্দে কয় করি করুণা ;—
১ ফুকা।—প্রণাম করিহে কৃষ্ণ প্রণাম করি
আমি মথুরাবাসী নই
শ্রীরাধার দাসী হই
বৃন্দাবনবাসী নারী ;
১ মেলতা।—বৃন্দাদূতী নাম ধরি
বিধুবদন তোল বংশীধারি
কিছু নিবেদন করি চরণকমলে।

মহড়া ।—শ্যাম হে বসন্তের রাজ্য দিয়ে কি,
নারীবধ করলে গোকুলে ?
আছে ব্রজেতে বিচ্ছেদ রাজা
এসে তায় বসন্ত রাজা,
মিলে দুই রাজায় রাই রাজার প্রাণ বধিল
খাদ ।—বলিতে তোমারে দহি দুখের অনলে ।
২ ফুকা ।—ধনুর্যজ্ঞতে এলে মধুপুরে
যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর
হ'লে হে রাজ্যেশ্বর
বধিলে কংস অসুরে ।
২ মেল্‌তা ।—ব্রজের শ্রী হরি শ্রীহরি
রাধার প্রাণ মন হরি
শেষে রাধারে ভাসাইলে অকূলে ।[১]

॥ ৭ ॥

১ চিতান ।—শ্রীমুখে করলে উক্তি আদ্যাশক্তি
শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনে ;
১ পরচিতান ।—তোমায় আজ্ঞায় দাসী বৃন্দে জিজ্ঞাসে
শক্তির হয় মুক্তি কার গুণে ?
১ ফুকা ।—তোমার ভক্তিতে ছিল রাধার শক্তি
এখন তোমার সে ভক্তি নাই,
রাধার সে শক্তি নাই ;
কিসে পাবেন্‌ প্যারী মুক্তি ?
১ মেল্‌তা ।—হ'য়ে শক্তিহীন শ্রীরাধিকে
কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ বলে ডাকে
আমরা তাই দেখে বলতে এলাম হে কানাই ;
মহড়া ।—থাকৃত রাধায় যদি শ্যাম হে রাধাত্ব
তবে কি বসন্তে ডরাই ?

---

[১] গুপ্তঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

নাহি ব্রজে রাধাকান্ত,
দেখে দারুণ বসন্ত,
হ'য়ে কৃতান্ত স্বরূপ প্রাণে বধে রাই।[১]

॥ ৮ ॥

১ চিতান।—রাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আসি কংসধাম ;
১ পরচিতান।—শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
১ ফুকা।—ব্রজে শ্যামবিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে,—
ব্রজনাথ হে—বলে হৃদপদ্মের নীলপদ্ম আজ্ নিলে কে ?
১ মেল্‌তা।—প্যারী কখন মোহ যায় কভু চৈতন্য পায়,
আমরা তাই দেখে বলতে এলাম মথুরায়।
মহড়া।—তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ বলে ধর্‌তে যায়,
আমরা তায় বলিলাম করে ধরি,
রাই ধর না গো ও নয় শ্রীহরি ;
অম্‌নি কই কৃষ্ণ বলে পড়ে রাই ধরায়।
খাদ।—এই দশা শ্রীরাধার হ'ল শ্যামরায়।
ফুঁকা।—দেখে বিদ্যুল্লতা কাল মেঘের সঙ্গে, কালাচাঁদ হে—
বলে পীতবসন, ওই সখি শ্যাম—শ্রীঅঙ্গে ;
২ মেল্‌তা।—যত গরজে জলধর, রাই বলে ধর্ গো ধর্,
আমার বংশীধর, মোহন মুরলী বাজায়।[২]

॥ ৯ ॥

১ চিতান।—বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন,—
কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম।
১ পরচিতান।—এলাম বৃন্দাবন-ধাম হ'তে,
রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম।
১ ফুঁকা।—দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা,
আমি আজি তাই কর্‌ব হে পরীক্ষা।

১ প্রাঃ কঃ সঃ
২ গুপ্তঃ, প্রঃ কঃ সঃ

১ মেল্‌তা।—তুমি রাজ্য কর ভাল শুন হে ভূপাল,
সুখ্যাতি শুনি তোমার সর্ব্ব ঠাঁই ;
মহড়া।—কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই ;
আমায় জানতে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই।
খাদ।—শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।
২ ফুঁকা।—ধন প্রাণ মন সঁপে হে যে যায়,
পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়।
২ মেল্‌তা।—দেখ্‌ব রাখালের রাজবিচার ন্যায্য কি অবিচার
করলে সুবিচার সুযশ করিব কানাই।[১]

॥ ১০ ॥

১ চিতান।—শ্রীমধুমণ্ডলে আসি বৃন্দে—খেদে গোবিন্দের
পদারবিন্দে কয় ;
১ পরচিতান।—আমায় দেখে অধোমুখে কেন রহিলে বল দয়াময়।
ফুকা।—থাক থাক হে স্বচ্ছন্দে,
তোমার কুবুজা সুখে থাক্‌,
রাধা মরে যাক্‌,
হবে না তোমার নিন্দে।
১ মেল্‌তা।—তোমায় লইতে আসি নাই হে
জান্তে এসেছি চিন্তামণির তাতে চিন্তা নাই।
মহড়া।—শ্যাম, কথা কও শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই ;
প্যারী হয়েছেন অধৈর্য্যে,
তাই আসা অপার্য্যে,
তোমার ঐশ্বর্য্যের অংশ ল'তে আসি নাই।
খাদ।—শুন হে ত্রিভঙ্গ কানাই ;
২ ফুকা।—সে যে স্বর্ণলতা রাজকন্যে কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায়,
মর্ম্মবেদনায়, ভ্রমে অরণ্যে শরণ্যে ;
২ মেল্‌তা।—প্রবোধ না মানে মানে ভ্রান্তে শ্রীমতী
উপায় কি করি বল শুনে যাই।[২]

---

১ গুপ্তঃ, প্রাঃ কঃ সঃ
২ গুপ্তঃ, প্রঃ কঃ সঃ

॥ ৭ ॥

মহড়া।—আজ কৃষ্ণ, চলহে নিকুঞ্জবন
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই
লহ তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই,
চাহিয়ে[১] তোমার ওই চন্দ্র-বদন[১]।
[তুমি হে যজ্ঞেশ্বর, দয়াময়
তোমা বিনে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়।
অতএব হে শ্রীপতি, তাই সে শ্রীমতীর
হয়েছে তোমায় আজি প্রয়োজন।][২]
চিতেন।—তুমি যে ছলে হে শ্যাম রায়, এলে হে মথুরায়।
হইয়ে যজ্ঞের নিমন্ত্রিত,
করিলে সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ
আছে তা জগতে বিদিত।
আরও এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম,
শীঘ্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর শ্যাম।
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে করেছি সব যজ্ঞের আয়োজন।
অন্তরা।—[আছেন যজ্ঞবেদিতে বসিয়ে প্যারী
ক'রে যজ্ঞের সংকল্প।
সজল জলধর করিছেন ধ্যান,
তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।
ধর ধর হে হৃষীকেশ
ব্রজের সেই মনোহর বেশ;
মস্তকে দেহ শিখিপুচ্ছ।
করেতে লও মোহন বংশী
গলে দাও গুঞ্জের গুচ্ছ।

পাঠান্তর—
১-১ বাঃ গাঃ ও চন্দবদন
২ বাঃ গাঃ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নাই।

ত্রিভঙ্গ রসকূপ, ব্রজনারীর মন ভুলালে যেইরূপে
সেই রূপে সখা, দেখা দিয়ে,
একবার তৃপ্ত কর রাধার তাপিত মন।

পরচিতেন।—তোমা নইলে হবে না সমাধা
তোমার গরবিনীর যজ্ঞ, শ্যাম।
তুমি হে মূলাধার, সর্ব্ব আধার
তোমা বিনে জানে না সেই শ্রীরাধা।
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, করিয়ে সংস্থাপন
সমিধ আপনার অঙ্গ।
যোগিনী প্রায় আছে, মনেতে ত্যজিয়ে
সব সুখের সঙ্গ।][1]
করেছেন আত্ম মনেতে সংযোগ
অপেক্ষা নাই সব হয়েছে ত্রিযোগ।
আপনি কর্ত্তা হ'য়ে, সম্মুখে দাঁড়াইয়ে
দুঃখিনীর কর্ম্ম করা সমাপন ॥[2]

॥ ৮ ॥

১ চিতান।—শুন গো সখি, আশ্চর্য্য রাজসভার বিবরণ;
১ পরচিতান।—রুষ্ট হ'য়ে ব্রজের নারী এক
কৃষ্ণে কহিছে গর্ব্বিত বচন।

---

১ বাঃ গাঃ—

তুমি হে যজ্ঞেশ্বর দয়াময়
তোমা বিনে যজ্ঞ নাহি পূর্ণ হয়।
মানসে মানসে রাই করিবেন সে যজ্ঞ
তোমার ঐ চরণে সমর্পণ।
ক'রে যজ্ঞের সঙ্কল্প প্যারী
আছেন যজ্ঞ-বেদিতে বসিয়ে
সজল জলধরে করিয়ে ধ্যান
তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন করে সংস্থাপন
সমিধ আপনারি অঙ্গ,
যোগিনীর প্রায় আছেন মৌনে ত্যজিয়ে সখীর সঙ্গ ॥

২ পদটী 'প্রাঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

১ ফুকা।—সে যে মুখরা প্রখরা নব যুবতী ;
হানচে বাক্যবাণ
কুপিত দু'নয়ান,
তাহে শ্যাম কাতর অতি।
১ মেলতা।—তোরা ঘর থেকে বেরুস নে,
কেউ কিছুই জানিস্ নে,
এ মধুমণ্ডলে কি হতেছে।
মহড়া।—বৃন্দা নামে কে এক রমণী
রাজসভাতে এসেছে ;
আমি দেখিলাম স্বচক্ষে,
আমাদের রাজাকে
রাই রাজার প্রজা বলে বেঁধেছে।

॥ ৯ ॥

মহড়া।—বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে।
সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি,
কি দুঃখের দুঃখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত 'রাই' ব'লে।
বৃন্দাবনবাসিনী আজি কি প্রমাদ ঘটালে ॥
দোলন।—শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কোন ক্ষণে, পত্র দৃষ্টিমাত্র চিত্ত চমৎকার,
যেন ছিন্নমূলবৃক্ষ প্রায়
পড়লেন এই রাজসভায় হরি,
যেন শক্তিশেল বিঁধলো হৃৎকমলে।
চিতান।—শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়—ওহে কৃষ্ণ-সখা,
দেখ দেখহে কৃষ্ণের কি ভাব উদয়।
যেন কি ধন হ'য়েছেন হারা,
কি মনের দুঃখে, চক্ষের বারি বক্ষে বহিছে ধারা
হ'য়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত,
হরি ত্যজে রত্নাসন কালবরণ ভূতলে

অন্তরা।—দুখী তাপী কত দেখতে পাই,
এই মধুরাজ্যধামে এসে থায় হে।
এমন কাঙ্গালিনী, শ্যামমনমোহিনী
কখন ত দেখি নাই।

পরচিতান।—কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে,
নারীর বুঝতে নারি কি লীলে,
সে কোন মনোমোহিনী দিয়ে মোহিনী,
দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে
মায়া করে এসে মথুরায়, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কৃষ্ণধন কাঙ্গালের পাছে ল'য়ে যায়।
নারী মায়াবী, জানে ছল, নয়নে বহে অশ্রুজল,
আগে আপনি কেঁদে শ্যামকে কাঁদালে॥[১]

॥ ১০ ॥

১ চিতান।—কাতর অন্তরে কৃষ্ণপদে ধরে
কুবুজা করে নিবেদন।

১ পরচিতান।—শুন শ্যাম ওহে গুণধাম,
তুমি ব্রজগোপীর প্রাণ মন।

১ ফুকা।—দেখ দেখ কৃষ্ণ হ'য়ো সাবধান, কাঁদে প্রাণ,
হারাই হারাই কৃষ্ণ হারাই হয় হেন জ্ঞান;

১ মেল্‌তা—কে এক এসেছে অবলা, সে নাকি অতি প্রবলা,
হরি না জানি আজি কি দ্বন্দ্ব ঘটায়;

মহড়া।—কৃষ্ণহে যেও না আজ রাজসভায়।
এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্‌তে তোমাকে,
ধরলে রাখ্‌তে পারবে না কেউ মথুরায়।

খাদ।—শুনেছি তাদের তুমি বাঁধা শ্যামরায়।

২ ফুকা।—কত পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়,
দয়াময় দেখ যেন দাসী বলে ত্যজ না আমায়।

২ মেল্‌তা।—কৃষ্ণ কব কি অধিক আর, জানি না তুমি কখন কার
পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়।[২]

---

১ গুপ্তঃ, বাঃ গাঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ

॥ ১১ ॥

১ চিতান ।—ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তি ভাব,
তুই ভাবের যে ভাবে হয় মন ;
১ পরচিতান ।—বুঝে ভাব কৃষ্ণ রাখ ভাব,
তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ।
১ ফুকা ।—যদি তোমার দেখে ব্রজাঙ্গনা, ছাড়বে না ;
কৃষ্ণ বলে ডাকলে পরে রইতে পারবে না ।
১ মেল্‌তা ।—যদি না যাও হে কালাচাঁদ গোপীসব প্রাণে বাঁচবে না ;
আবার আমারেও বধে যাওয়া উচিত নয় ।
মহড়া ।—কৃষ্ণ যেমন তোমার স্বেচ্ছা হয় ;
তুমি না গেলে নে যায় কে, যাওত রাখে কে ;
যা কর কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময় ॥[১]

॥ ১২ ॥

১ চিতান ।—ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের আসার সই আশাতে ।
আশা-বৃক্ষ করিয়া আশ্রয় ।
১ পরচিতান ।—বুঝিলাম, এত দিনের পর
আজি তা হ'ল নিরাশ্রয় ।
১ ফুকা ।—সখি, এল না কি ব্রজে বংশীধারী ;
কৃষ্ণ-বিরহজ্বালা আর কেমনে নিবারণ করি ।
১ মেল্‌তা ।—কই তোমার সঙ্গে ত্রিভঙ্গ এল,
কৃষ্ণে না হেরে দহে হৃদয়কমল ।
মহড়া ।—বৃন্দে বলগো, মাধব কি বলেছেন বল্,
বুঝি করেছেন অপমান, তাই এত অভিমান্,
করিছে দুটি আঁখি ছল ছল ।
খাদ ।—অঙ্গ কাঁপে সখী, আতঙ্কে, তব চক্ষে দেখে দুখ-জল ।
২ ফুকা ।—এস বস বস ওগো সহচরী ;
বুঝি এল না হৃষীকেশ বৃথা ক্লেশ হল, মরি মরি ।
২ মেল্‌তা ।—বুঝি নিষ্ঠুর কথায়, বিদায় করেছেন তোমায় ।
জানি নিষ্ঠুর অতিশয় নীলকমল ।[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ

গদাধর মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ভবানী-বিষয়ক

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ঐ !
শুনে পাগলিনীর প্রায়
অমনি রাণী ধায়
বলে—'কৈ মা উমা কৈ ?'
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে !
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে
অমনি দু'বাহু পসারি,
মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে।
কৈ মেয়ে বলে
আনতে গিয়েছিলে !
তোমার পাষাণ প্রাণ,
আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপ্না হ'তে
গেলে নাকো নিতে
রব না গো, যাব দু'দিন গেলে ॥
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা,
মায়া কি পাসরি।
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই
"তোর কি মা নাই ?   তোর কি মা নাই ?"
অমনি সরমে মরে যাই ॥
তাদের বলি, আমার পিতে
এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে ॥

আমার মনের ব্যাথা,
আছে মনে গাঁথা,
মা, কি বলিবে অন্যে,
পিতৃদত্তা কন্যে ;
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী
সকলি জান তুমি,
এ কি ক'বার কথা !
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো তাও ত শুনেছ সব
শিব সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায়
সদাই কল কল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না,
আমার সয় না,
আমার হয় না স'ঙ্কতা।
আমি ভাবি কোথা যাব
কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি ব'সি বিল্ববৃক্ষমূলে ॥
হিমালয় আর কৈলাস শিখর
নহে দূর যাতায়াত ;—
মনে হ'লে মা ! দিনে শতবার
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে।
বাৎসল্য ভাবেতে তাচ্ছল্য
কি সে শুনি, কহ মা।
আমি হ'তেম তোমার মা,
জানাইতাম মা,
মায়ের কত স্নেহ মা !
তোমার কঠিন হৃদয়,
পিতা ও নিদয় ;
হোক্ মা, ও হোক্ মা !
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয় !

আমি এ সুখ শরদে
মরি মনের খেদে
কথায় কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে ॥[১]

সখীসংবাদ

১ চিতান।—তব অঙ্গ হেরে জ্ঞান হয়
ভূতলে উদয় যেন সুধাকর।

১ পরচিতান।—সুনির্ম্মল শ্রীপদকমল, শতদল মনোহর

১ ফুকা।—বাঁকা ত্রিভঙ্গ শ্রীঅঙ্গ শোভা ;
নব রমণীরঞ্জন দলিত-অঞ্জন রূপ হে,
তাহে জগজ্জনার প্রাণমনলোভা ; শ্যাম হে,

১ মেল্‌তা।—কিবা পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে,
থেকে থেকে কটাক্ষে ভুলাও নবনাগরী।

মহড়া।—কাল অঙ্গ কে তুমি আমরি !
অপরূপ রূপ এমন দেখি নাই।
পবা কটিতে ধড়া
শিরে মোহন চূড়া,
অধরে ধরা মোহন বাঁশরী।

খাদ।—নব জলধর জিনি কাল মাধুরী।

২ ফুকা।—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শ্রীচরণে
সদা চিন্তামণি গণে,
নির্ব্বাণ কারণে শ্যাম হে,
করে বাঞ্ছা পেতে ঐ ধনে।

২ মেল্‌তা।—নাহি দেখি এর স্বরূপ, কিবা অপরূপ,
মরি মরি নারি হে নারী চিনিতে নারি।[২]

॥ ৩ ॥

১ চিতান ।—ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দেখে
রঙ্গদেবী ডেকে কয় ।
১ পরচিতান ।—তুই কি গো কুলের গোপিনী
কি উদাসিনী
নিকুঞ্জের নিকট উদয় ।
১ ফুকা ।—একে সুরঙ্গ অঙ্গ তাহে কুরঙ্গনয়নী
অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই,
সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই
চলিস্‌ চলিস্‌ যেন গজকামিনী ।
১ মেলতা ।—হয়ে কন্দর্পপীড়িতা
রাগস্খলিতা
চলিতে বাজে চরণকমলে ।
মহড়া ।—কে গো তুই কাদের কুলের বউ
কুল ত্যজে ভ্রমিস্‌ গোকুলে ।
তুই কি অনাথা
নাকি বিচ্ছেদে উন্মত্তা
আয়, আয়, কাছে আয়,
মনের কথা যা ব'লে ।
খাদ ।—হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিরহানলে ।
২ ফুকা ।—যেমন আমাদের রাইয়ের দশা
কালিয়ে করেছে,
ওগো সেই দশা তোর কি,
তাই সুধাই ও সখী,
হোক মেনে বল আমার কাছে ।
২ মেলতা ।—হ'লি কি দুখে দুখিনী
ওগো সজনি,
চক্ষের জল মুছিস্‌ কেন অঞ্চলে ।
অন্তরা ।—একে নবীন বয়স, ..

মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য তাতে দাম্ভির্য্য নাই,
আর আর বৌ যেমন ধারা ব্যাপিকে।

২ চিতান।—অধৈর্য্য হেরে তোরে সজনি
ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।

২ পরচিতান।—যদি সাধ্য হয় সেই কার্য্য
করব সাহায্য
বলি তা বলে যা আমায়।

২ ফুকা।—একে রমণী জাতীয় আমিও রমণী।
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি
কোথায় প্রাণ জুড়াইবি
বল্‌বি কায় দুখের কাহিনী।

২ মেলতা।—আমায় বল্‌গো বল মনের ভাব
কি দুঃখে এ ভাব
তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়ন সলিলে

॥ ৪ ॥

১ চিতান।—তুমি চিন্তামণি তোমায় চিন্‌তে কে পারে
তুমি হে ত্রিজগতের নাথ,

১ পরচিতান।—কি ছল করি দীনবন্ধু হরি
দিলে দরশন অকস্মাৎ

১ ফুকা।—ও যে অবোধ কালিয় ফণী,
উহায় বধ বধ না
যাতনা দিও না শ্যাম হে
আমায় ক'র না হে কৃষ্ণ-অনাথিনী।

১ মেলতা।—যদি না বুঝে অপরাধ
বধ হে কালাচাঁদ
তবে তোমায় দয়াময় কৃষ্ণ
কেউ আর বলবে না।

---

১ প্রীঃ গীঃ, প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ

মহড়া।—বিনা দোষে প্রাণদণ্ড কর না।
সবিশেষ হৃষীকেশ জান ত।
আমরা পতিপ্রাণা সতী
পতি গতি মতি
পতির যন্ত্রণায় প্রাণে বাঁচব না।
খাদ।—পতি-দুখ হে সতীর প্রাণে সহে না।
২ ফুকা।—জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত ভরে;
কৃষ্ণ তুমি বিশ্বম্ভর,
তব পদভর;
শ্যাম হে—অবোধ কালিয়
ফণী কি তা সইতে পারে।
২ মেলতা।—প্রাণে বধ না অবোধে
ধরি রাঙ্গা পদে,
এ বিপদে
দেখ কালিয় প্রাণে যেন মরে না।[১]

॥ ৫ ॥

১ চিতান।—চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল এতদিনের পর।
১ পরচিতান।—অন্তর যুড়াও ওগো কিশোরি,
হেরে অন্তরে বংশীধর।
১ ফুকা।—যে শ্যাম বিরহেতে দিলে কাতরা নিরন্তর
সেই চিকণ কাল হৃদে উদয় হল
এখন সুশীতল কর গো অন্তর্।
১ মেলতা।—যদি অন্তরে অকস্মাৎ
উদয় হ'ল রাধানাথ
আছে এর্ চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল।
মহড়া।—বুঝি নিব্‌ল রাধে
তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

হেরে অন্তরে কালাচাঁদ
অন্তরে পুরাও সাধ
অন্তর কর না আর নীলকমল।

খাদ।—এ সময়ে পরশিতে বল না
হয় পাছে অমঙ্গল।

২ ফুকা।—বিধি এই করুন
ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ্ রাই তোমার।
ওগো চন্দ্রমুখি,
কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার।

২ মেলতা।—রাধে তোমার দুখ আর
নাহি সহে গোপীকার,
করিলেন্ মাধব আজ বিরহানল বুঝি সুশীতল।[১]

॥ ৬ ॥

মহড়া।—দেখো কালাচাঁদকে হে শুকসারি।
রেখে প্রাণের কৃষ্ণ তোদের ঠাঁই।
প্রভাত কালে গৃহে যাই,
দেখো দেখো কুঞ্জে
একলা রইলেন কুঞ্জবিহারী।
কুলবতী আর ত রইতে না পারি।
তোমরা কৃষ্ণপক্ষের পক্ষ জানি,
হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে কোরো হে রক্ষে—
আজ আমার গলার হার নীলকান্তমণি।
কুঞ্জে থেকো থেকো নিরন্তর যেয়ো নাকো স্থানান্তর,
কুঞ্জে রেখো নয়নপ্রহরী।

চিতেন।—নিকুঞ্জেতে রাধা শ্যাম ছিলেন উভয়,
নিশি অবসান গাত্রোত্থানে করিয়ে প্যারী
সারিশুকে কয়।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ, প্রীঃ গীঃ—গ্রন্থে গদাধর মুখোপাধ্যায় এই পদের রচয়িতা; গুপ্তঃ-গ্রন্থে কিন্তু কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে এই পদ চলিয়া আসিতেছে।

দেখ গগনের চাঁদ অস্তে গেছে,
আমার মন-কুমুদের চাঁদ, সাধের কালাচাঁদ হে ;
কুঞ্জে নিদ্রাগত হ'য়ে আছে,
শ্যামকে না বোলে ত যাওয়া নয়,
ডাকলে নিদ্রাভঙ্গ হয়,
নিদ্রাভঙ্গ কর্ত্তে না পারি।

অন্তরা।—তোমরা বিনে আর রাধার অন্য সখা সখী নাই
হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে আজ করহে রক্ষে,
শ্যাম-দুঃখিনীর এই উপকার করি।

পরচিতেন।—যদি বল না গেলে নয়, যাওয়া অনুচিত হয় ;
কুলকামিনী যামিনী প্রভাতে থাকা অসম্ভব হয়।
থেকো বংশীবটে ব'সে এখন ;
যখন ধ'রে রাধার নাম, ডাকবে আমার শ্যাম হে,
তখন দাঁড়াইয়ে গো কুঞ্জের দ্বারে,
শ্যামকে বোলে ক'য়ে বুঝায়ে রাখিবে প্রবোধ দিয়ে,
যেন ব্যাকুল হ'ন না শ্রীহরি ॥[১]

॥ ৭ ॥

১ চিতান।—নিশিতে এনে আমায় নিকুঞ্জে—
ভুঞ্জিলে চন্দ্রার কুঞ্জেতে।

১ পরচিতান।—এত বাদ ছিল কালাচাঁদ,
কিসে হে তোমার সঙ্গেতে।

১ ফুকা।—আমি কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ বিহনে হে জানি না।
ত্যজলাম কুল লাজ, ব্রজরাজ, তোমার জন্য,
তাই কি দাসীরে করিলে বঞ্চনা।

১ মেল্‌তা।—কৃষ্ণ তোমায় না দয়াময়, বেদে কয়,
এই কি সেই দয়া প্রকাশিলে দাসীর প্রতি।

মহড়া।—যাহ'ক জানিলাম করুণাময় তুমি হে—
বড় শ্রীপতি।

---

১ পদটী 'প্রী: গী:' হইতে সংগৃহীত

আজ করেছি মনে সার,
কালরূপ চক্ষে আর,
নাহি হেরিব।
কাল কোকিলের ধ্বনি নাহি শুনিব ॥
কাল ভাল আর বাসিব না,
কুঞ্জে কালসখী রাখ্‌ব না,
হেরব না মলেও কাল মূর্‌তি ॥[১]

॥ ৮ ॥

১ চিতান।—রাধার মাধব, রাধার প্রেমে সদা গো
বাঁধা আছি সই।
১ পরচিতান।—নাহি অন্য জনে, জানি মনে সই,
একান্ত প্রাণের রাধা বই ॥
১ ফুকা।—ব্রহ্ম সনাতনী, চিন্তাস্বরূপিণী শ্রীমতী—
কৃষ্ণবিরহে কি ভয় তার,
বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার।
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তাঁর দুর্গতি।
১ মেল্‌তা।—ইচ্ছাময়ী নাম শ্রীরাধার,
রাই কৃষ্ণের মূলাধার,
ভিখারী—আমি রাধার প্রেমের দায়।
মহড়া।—নাহি একান্তে জানি বিনা শ্রীরাধায়।
যতনে চরণে শরণ লয়েছি রাধার ;
এ দায় রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায় ; মানের দায়,
সখি ! আমার প্রাণ যায় ॥[২]

॥ ৯ ॥

১ চিতান।—শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানে
জানি না রাধা বিহনে ;

১ প্রাঃ কঃ সঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ

১ পরচিতান।—রাধা পরমা প্রকৃতি, শক্তিরূপা,
মোক্ষধাম রাধার চরণে।
ফুকা।—রাধে! রাসেশ্বরী, আমার প্রাণেশ্বরী, কিশোরী;
রাধা প্রাণের আধা সই, জানি না রাধা বই,
রাধা নাম করে বাজাই বাঁশরী।
১ মেল্‌তা।—আমি রাধামন্ত্রে দীক্ষা, রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যা,
রাধা নাম শিরে ধরি যতনে।
মহড়া।—সখি! ক্ষতি কি ধরায় রাধার চরণে;
অতুল, অমূল্য, কৈবল্য রাধার রাঙ্গা পায়।
সখি! ব্রহ্মাদি দেবতায়,
যে পদ না ধ্যানে পায়,
মোক্ষোপায় ও পায় বলে পুরাণে।
খাদ।—রাধার মানানল দগ্ধ করে জীবনে।
২ ফুকা।—সাধে সাধি ধারে, সখি! সকাতরে রাধার পায়;
রাধার মানরূপ দাবানল,
দহিল হৃদ্‌-কমল,
বাক্য জল পেলে জীবন জুড়ায়।
২ মেল্‌তা।—হবে মানেরি অবসান, ত্যজিবেন রাধা মান
কৃপা দান দিবেন অধীন জনে॥[1]

॥ ১০ ॥

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে ছিলাম শ্যাম সহিতে ললিতে গো!
প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল॥
দিবসে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ মনে ভাবিয়ে,
নিশিতে নিকুঞ্জে ছিলাম নিদ্রিত হ'য়ে।
আমি দেখিলাম ওগো সখি,
মৃদু সহাস্য বদন, রমণীরঞ্জন,
কালবরণ বাঁকা আঁখি।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

যুগল করে কর ধরি, বলে,—"প্যারি,
কেমন আছ বল বল ॥"
কি ছলে শ্যাম ছলিতে এল।
বলে,—"উঠ গো রাই চন্দ্রমুখি
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে, শ্যামাঙ্গ দিয়ে
একাঙ্গ হ'য়ে থাকি।"
ক'রে আমার নিদ্রাভঙ্গ দিয়ে ভঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ অদেখা হ'ল ॥
কুসুমশয্যা করে শ্রীমন্দিরে
আমি করেছি শয়ন ;
ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর,
যেন দিল দরশন।
মস্তকে মোহন চূড়া র'য়েছে হেলে ;
বনমালা, গুঞ্জমালা দুলিছে গলে।
বঁধুর অধরে মধুর হাসি :—
করে মুরলী ল'য়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
দাঁড়াল সম্মুখে আসি।
মনে হ'ল হেন কুঞ্জে যেন
কোটি চন্দ্র প্রকাশিল ॥
সখি ! ব্রজপুরী পরিহরি
গেছে সেই যে মাধব ;
শুনি নাই আর, সেই হ'তে বঁধুর
শ্রীমুখের রব।
আজি একি দেখি সখি, অঘট ঘটন !
স্বপনে শ্যাম কহে—'প্যারি, আজ হে কেমন ?'
আমার ধ'রে সই যুগল-পদে ;
বলে—"হয়েছি দোষী, বিনয়ে তুমি
অপরাধ ক্ষম শ্রীরাধে !"
ক্ষণে ভাসে নয়ন-জলে ক্ষণে বলে,
"শ্রীমতী ত আছ ভাল ॥"

এ যে স্বপ্ন কথা, প্রাণের ব্যথা,
ভয়ে করিনে প্রকাশ ;—
কি জানি কি হয় ভাগ্যে, সদা ঐ মনে ত্রাস।
বলিতে ললিতে, তোমায় শিহরে হৃদয় ;
কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ জানেন, আমার বলা নয়।
আমি গো সই, রাজনন্দিনী ;—
কৃষ্ণ-প্রেমে মজিয়ে, কৃষ্ণ ভজিয়ে
ছিলেম কৃষ্ণ-আদরিণী।
সে সুখে বঞ্চিল বিধি কৃষ্ণ-নিধি
পেয়ে পুন হারাইল।[১]

॥ ১১ ॥

বিরহ

মহড়া।—যত বল সখি কেবল কাণে শুনি,
অবোধ মন, কথায় প্রবোধ মানে না।
যখন যাবার বেলা, কেঁদে গেছে কালা,
তখন আর গো, পাওয়া ভার গো,
রাধার প্রাণ থাক্‌তে কৃষ্ণ ব্রজে আসবে না।
চিতেন।—বচনে আশ্বাসিয়ে রাধারে বুঝাইয়ে
রাখিবো কত বার।
কৃষ্ণ পাবে প্রাণ জুড়াবে,
ও কথা ভোলে না রাই আর।
যখন চূড়া বাঁশী ল'য়ে নন্দরায় ফিরে এসেছে,
জেনেছে, কপাল ভেঙেছে,
কৃষ্ণ রাধার প্রেম যমুনায় ভাসিয়েছে।
এখন রাধারে বোল্‌বো কি, ওগো প্রাণসখি,
খেদে প্রাণ বাঁচে কি,
শুধু কথাতে কত করবো সান্ত্বনা ॥[২]

১ বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ
২ পদটী 'শ্রীঃ, গীঃ' হইতে সংগৃহীত

॥ ১২ ॥

মহড়া।—প্রাণের কৃষ্ণ বিনে একি হ'ল লো সই,
বসন্তে বসন্ত নাই গোকুলে।
দেখি কোকিল নীরব, নাহি সে মধুর রব
হাহা রব গো, শুনি সব গো,
আর ভ্রমরা গুঞ্জরে না কমলে।
ব্রজের ভাব, সে সুরব, সকলি হরি হরিলে।
প্রতি তরুলতা, রাধাকৃষ্ণের রূপের আভাতে
প্রভাতে কুঞ্জের শোভাতে গো,
ময়ূর নাচিত উচ্চপুচ্ছ ভাবেতে,
হ'ত গগনে উদয় চাঁদ, এখন গোকুল-চাঁদ,
গোকুল আঁধার করিল।

চিতেন।—বিশাখা শোকাকুলা চঞ্চলা হইয়ে
ললিতার প্রতি কয়।
জানি মনে বৃন্দাবনে, হ'ত নিত্য নিত্য
নিকুঞ্জে বসন্ত উদয়।
গেঁথে মালতীর হার, মাধবের গলায়
আমরা দিতাম সই, সে দিন কই,
সে ভাব কই, প্রাণের কৃষ্ণ কই গো।
সখি, কই গো সে বৃন্দাবনের শোভা কই,
দেখি সামান্য অরণ্য হ'ল বৃন্দারণ্য
বিচ্ছেদে বিবর্ণ হেরি শূন্যময় শীর্ণ ব্রজমণ্ডলী।

অন্তরা।—ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ফুরাল।
মাধব অভাবে গো।
অশোক, কিংশুক, পলাশ, কাঞ্চন
কুঞ্জে প্রফুল্ল হ'ত নানা ফুল।

পরচিতেন।—বহিত মন্দ মন্দ মলয়া সমীরণ
জুড়া'ত গোপীর প্রাণ।
সে হিল্লোলে, কাল জলে
সুখে বহিত সই তপন-তনয়া উজান।

গত হেমন্ত কাল, সুখের বসন্ত কাল
এতো সময় কাল, ঋতু কাল,
এবার হ'ল সই কাল বসন্তের অন্তকাল।
একে কৃষ্ণ বিচ্ছেদের কাল, না মানে কালাকাল,
কবে হয় পূর্ণকাল,
আছে কত কাল, দুঃখ গোপীর কপালে ॥[১]

॥ ১৩ ॥

১ চিতান।—শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত কাল;
১ পরচিতান।—পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে কাল।
১ ফুকা। সে কাল যেন সুখের—যে কাল পতিসুখে যায়।
সুখের মূলাধার, প্রাণপতি অবলার
পুরুষে অবলা জুড়ায় ॥
১ মেলতা।—পতির সুখে সতীর সুখ,
পতিদুখে দুখ নারীর সই
পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়।
মহড়া।—ধৈর্য্য ধর সই, অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়।
আস্‌বে নিবাসে প্রাণকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
সুশীতল করো তাপিত হৃদয়।
খাদ।—কমল ত্যজিয়া মধুকর স্বতন্তর কভু নাহি রয়।
২ ফুকা।—কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে;
ঘুচিল দুখের কাল,
হইল সুখের কাল
জুড়ালেন শ্রীরামে লয়ে।
২ মেলতা।—নাথ-বিরহে সাবিত্রী ত বিষাদিত হয়ে ছিল সই;
আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়।[২]

১ পদটী 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত
২ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ

॥ ১৪ ॥

মাথুর

১ চিতান।—শ্রীরাধার মনোহর নটবর ভ্রমররূপে উদয় ঐ।

১ পরচিতান।—ভাবে হয় গো মনে হেন অনুভব,
উহায় চিন্তে পার নাই গো সই।

১ ফুকা।—তিলেক বৃন্দাবন ছাড়া কৃষ্ণ নয়;
কেবল শ্রীদামের বাক্য জন্য,
ত্যজিয়া বৃন্দারণ্য,
মথুরায় গেছেন দয়াময়।

১ মেল্‌তা।—রাধা কৃষ্ণেরি একাঙ্গ,
শ্রীরাধার বাঁধা ত্রিভঙ্গ,
রাধা ছাড়া ত নহে মদনমোহন।
ও ত ভ্রমররূপে ষট্‌পদ, নিকুঞ্জে দেছেন দরশন;
ও ত যাবে না অন্য ফুলে
কেশরাদি বকুলে
কেবল মত্ত পেতে রাধার শ্রীচরণ।[১]

॥ ১৫ ॥

মহড়া।—তোমার কমলিনী কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ ব'লে ধরতে যায়।
আমরা তাই বলি করে ধরি, ও রাই
ধোরো না গো ও নয় শ্রীহরি।
তখন কই কৃষ্ণ বলে প্যারী মূর্চ্ছা যায়।
একি প্রাপ্তি হলো শ্রীরাধার, কও শ্যামরায়।
দেখে বিদ্যুৎ-লতা কালমেঘের সঙ্গে, রাধানাথ হে,
বলে ঐ যে সই পীত বসন শ্যামের অঙ্গে।
যখন গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর,
আমার কালাচাঁদ মোহন মুরলী বাজায়।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

চিতেন।—রাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আসি কংসধাম,
শ্রীগোবিন্দে, কহে বৃন্দে,
পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম।
ব্রজে শ্যাম-বিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে,
রাধানাথ হে, তোমার রাই বলে,
হৃদ্‌পদ্মের নীলপদ্ম আজ নিল কে ?
কেন এমন হ'ল প্যারী, নারী বুঝতে নারি,
ও তাই সমাচার দিতে এলেম মথুরায় ॥[১]

॥ ১৬ ॥

১ চিতান।—কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী রাধার মথুরায় গমন,
১ পরচিতান।—হেরে বৃন্দে, শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
করে নিবেদন।
ফুকা।—রাজতনয়া রাই তুমি ব্রজে ;
প্যারী গো অলক্তযুক্তপদে,
কুশাঙ্কুর যদি বেঁধে,
বিপদ ঘটিবে পথ মাঝে।
১ মেলতা।—ব্রজের কঠিন মাটিতে,
ঝটিতে হাঁটিতে, কটিতে
কঠিন ব্যথা হয় পাছে।
মহড়া।—প্যারী আয় গো আয়, ধীরে ধীরে আয়,
মধুপুর নিকট হয়েছে।
রাধে, রাধে, মরিগো রাধে,
পথশ্রমে শ্রীমুখ তোমার ঘেমেছে।[২]

॥ ১৭ ॥

১ চিতান।—বৃন্দে নাম ধরে ও নারী
বৃন্দাবনবাসিনী।

---

১ পদটী 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

২ প্রাঃ কঃ সঃ, এই গীতের খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, মেলতাদি পাওয়া যায় নাই

পরচিতান।—রাসেশ্বরী আমার প্রাণেশ্বরী
শ্রীমতির প্রিয়সঙ্গিনী ॥
১ ফুকা।—তুমি চেন না সখি ওই বৃন্দে।
বিরহে ব্যাকুলা
হ'য়ে কুলবালা
এসেছে দেখিতে গোবিন্দে ॥
১ মেল্‌তা।—মনে অনুমান করি সই,
রাধার প্রেরিতা হ'বে বুঝি ওই,
নাহি সুধালে কিছুই বুঝিতে নারি ;
মহড়া।—আছে বৃন্দাবনে আমার প্রেমের মহাজন,
ব্রহ্মময়ী কিশোরী ;
রাধা মূলাধার আমার সই
জানি না রাধা বই
আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী ;
খাদ।—দাসত্ব করেছি আমি গো তাঁরি,
২ ফুকা।—রাধার প্রেম-ঋণে আছি বদ্ধ সই।
দাসখত দিছি তায়,
এ কথা মিছে নয়
খাতক আমি রসময়ী।
২ মেলতা।—করে রাজার প্রেমধার
মথুরায় আসা গো আমার
সে ধার শুধিতে সাধ্য নাই সহচরী ॥[1]

॥ ১৮ ॥

মহড়া।—তোদের মধুপুরে আছে—
শ্রীরাধার প্রাণের বৈরী কোন্ নারী।
কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো,
একবার দেখি গো,
শুনেছি গো, তারি প্রেমে,
বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

চিতেন।—যত মথুরা-নগরী, মধুর রাজ্য হেরি,
বৃন্দে কয় বিনয় বচন।
দাঁড়া গো, একবার দাঁড়া গো,
তোরা দুখিনীর দুটো কথা শোন্।
বড় বিপদে প'ড়ে তোদের রাজ্যে আমার আসা।
আমরা গোকুলের গোপিনী, শ্যাম তাপের তাপিনী,
গোবিন্দ ক'রেছেন এই দশা॥
এই মথুরা নগরে, কুব্জা নাম্ কে ধরে,
এখন যারে, কৃষ্ণ ক'রেছেন নূতন সুন্দরী
খাদ।—বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।
দোলন।—তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এলাম শুনি
সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, রাধার সর্ব্বস্ব ধন,
সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী।
বড় রসিকা সেই ধনী, রসিক মনোমোহিনী,
প্রেমের ফাঁদে প'ড়েছেন রসিকচাঁদ বংশীধারী।
অন্তরা।—তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা,
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা,
দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার,
ওগো ভাগ্যক্রমে আজ এখন,
পেলাম যদি দরশন, শুধাই সমাচার,
তোরা যাস্‌নে গো, যাস্‌নে গো
বোস্‌গো একবার।
পরচিতেন।—দেখে গোপিকা সামান্যে করিস্‌নে অমান্যে
যে জন্যে এলাম তাই শোন্;
পরধন নাহি প্রয়োজন,
সদা নিজধন করি অন্বেষণ॥
একজন তোদের দেশে ছিল,
আগে কংসের দাসী;
এখন কংসের আর রাজ্য নাই দাসীর দাসীত্ব নাই,
সেই দাসী হ'ল রাজমহিষী।

তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে,
রাধার গলার নীলকান্তমণি ক'রেছে চুরি ॥[১]

॥ ১৯ ॥

মহড়া।—ওগো কুব্জা গো, আমায় ব'লে, দে গো,
মনচোরের বাসা কার ঘরে।
এসেছেন মধুপুরে সেই চোর—এই চোর,
ব্রজের মাখন-চোর, এমন চোরের
মন চুরি কল্লে কোন্ চোরে।
চিতেন।—এই ব্রজের ব্রজনাথ,
বলিয়ে ধরে হাত, বৃন্দের আনন্দ হৃদয়
ঈষৎ ভঙ্গি ছলে, কথার কৌশলে,
গিয়ে দূতী কুব্জার প্রতি কয়।
ও কি কর গো রাজমহিষী, বেরো গো,
আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেম কাঙালিনী,
ব্রজের আমার বৃন্দে নাম, কমলিনীর দাসী।
তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী
এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে।
খাদ।—হ'রে মন আছে কে এমন, বল গো, বল গো আমারে।
দোলন—তাই ভাবি গো, ভাবি মনে,
কুব্জা গো, যার রূপে জগৎ ভোলে
কার রূপে সে জন ভোলে, বল গো
সে কি মনচুরির মন্ত্র কিছু জানে।
তারে দেখ্‌বো গো একবার, কি আকার,
কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্যামে, প্রেমডোরে ॥
ব্রজনারী বুঝতে নারি, মনচোরের মন করে হরণ
এমন্ মোহিনী বিদ্যাসিদ্ধ কোন নারী।
শুনেছি পুরাণে, সমুদ্রমন্থনে,
সুধা করিলেন বিতরণ; গিয়ে মনোমোহিনীর বেশে নারায়ণ,
ভুলাইলেন মহাদেবের মন।

---

১ বাঃ গাঃ

ও কার কাছে গো এমন সাধ্য, যে নহে জগদ্বাধ্য,
জগতের দুরারাধ্য ধন গো,
এমন কে আছে তারে করে বাধ্য !
সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে,
কি গুণে বেঁধেছে নটবরে ॥[১]

॥ ২০ ॥

চিতেন।—এসে মাধবের মধুধাম,
কৃষ্ণপদে প্রণাম করিয়ে দূতী কয়
বংশীধর, বহুদিনের পর,
ও চাঁদবদন দেখ্‌লাম দয়াময়।
ফিরে চাও, চাও, চাও, হে কালশশী,—
সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।
১ মেলতা।—তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্ব ধন,
হরি শুনি বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায়।
মহড়া।—কি ধন দিয়ে শ্যাম, কুব্জা কিনেছে তোমায়।
আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন,
দিয়ে সব গোপীগণ, শ্যাম, ল'য়েছি শরণ
তবু রাধানাথ, স্থান দিলে না রাঙা পায়।
খাদ।—এমন ধন, কও হে পেলে সে কোথায় ॥
দোলন।—আমরা ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন,
তোমার রাঙা চরণে আছি বিকায়।
২ মেলতা।—তুমি হ'লে না সানুকূল, মজালে গোপীকুল,
এমন অকূল পাথারে গোকুল ডুবে যায় ॥
অন্তরা।—আমরা আহিরিণী, মনে জানি সার,
শ্যামধনের তুল্য মূল্য, ত্রিজগতে নাই।
হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্যনিধি,
মূল্য দিতে সাধ্য কার।

---

[১] বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ

পরচিতান।—তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ,
আছ হে কুব্জার ঠাঁই!
সেই ধন, দুর্লভ রতন,
পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত এলেন তাই।
এমন ধন আর কি হে কারো আছে।
৩ মেলতা।—দ্রব্যগুণে তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুব্জার অঙ্গ মিশেছে
তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন
সেই ধন এখন, কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায়॥[১]

॥ ২১ ॥

চিতেন।—তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,
কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধন, হ'য়েছ একবার।
সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার॥
শুনি, কও কও কও হে চিন্তামণি,
মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাকৃতে রাই কাঙ্গালিনী॥
১ মেলতা।—ক'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে কুব্জার নাথ,
হরি, মোলো দুঃখে রাই, একবার চক্ষে দেখলে না
মহড়া।—হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের বাসনা॥
কুব্জা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান।
কিন্তু, রাধার বই কুব্জার শ্যাম, কেউ বোল্‌বে না।
খাদ।—বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার করুণা॥
দোলন।—যথা রও, তার হও হে, দেখ বুঝে;
অগ্রে রাধা, নামের পর,
তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে।
২ মেলতা।—আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম,
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতে তো পারবে না।
ষোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্য,
তার মধ্যে রাধা, গোপীপ্রধানা,
ধন্য মান্য রাজকন্যে।

১ বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ

১ পরচিতেন ।—সবে দাস্তক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুব্জার ফল্লো ফল ;—স্বপনে তাও ত জানিনে
ওহে চন্দনদানের এত ফল ॥
আমরা ত ফুল তুলসী দিতাম সখা,—
ওহে হরি, ভাল, তাতেও ত ছিলহে চন্দন মাখা,
বুঝি কৃষ্ণ সাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল,
সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফোল্লো না ।
অন্তরা ।—নিভৃতে নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী,
সাথে বিনোদিনী রাই ।
২ পরচিতেন ।—লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতির শ্রীহস্তে,
দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তা'ত মনে হয়,
সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে ॥
তোমার সেই দাসখত লও হে হরি,
খাতক গেল, মিছে খত রেখে,
কি করিবেন রাইকিশোরী ।
মেলতা—নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,
তোমার দোষ কিছুই নাই,
হরি, কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ ক'ল্লে ধর্ম্ম সবে না ॥[১]

॥ ২২ ॥

মহড়া ।—দেখ কৃষ্ণ হে, এলেন কৃষ্ণকাঙালিনী রাই
সেই গেলে, আর না এলে গোকুলে,
রাইকে সঙ্গে করে ল'য়ে এলাম তাই ।
জানত পদ আশ্রিত, গোপিকা সবাই ।
রাধানাথ হে, যা হবার তা হ'ল ;
এনে দিলাম হে, তোমার রাই, তোমার ঠাঁই
আমাদের ব্রজের খেলা ফুরাল ।
দেহ যৌবন মন প্রাণ কুল মান,
প্যারী সব সঁপেছেন, কৃষ্ণ তোমার ঠাঁই ।

---
১ বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ

চিতেন।—শ্যাম এলেন সমস্তপঞ্চকে নারদমুখে,
শুনিয়া সংবাদ।
সহচরী সঙ্গে করি এলেন প্যারী
দেখতে কালাচাঁদ।
কেঁদে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
দুটি নয়ন ছল ছল অশ্রুজল,
বহিছে ধারা বদনকমলে।
কেঁদে ললিতে কৃষ্ণে কয়, দয়াময়,
পার চিনতে, বহুদিন আজ দেখা নাই।
অন্তরা।—প্রণাম করি নাথ—
আমরা ব্রজের আহিরিণী নারী সব,
দিলাম হে পরিচয়, মনে হয় কি না হয়,
শ্যাম হে, দুঃখিনীদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
পরচিতেন।—শ্রীবৃন্দাবনে যে সব লীলে, ক'রেছিলে,
আছে ত মনে?
সে গুণ যত, মুখে কব ক'ত,
শেলের মত র'য়েছে প্রাণে।
দেখ সেই, এই বৃকভানুসুতা—
তোমার কালরূপ ভাবিয়ে, কালিয়ে,
কালী হ'য়েছেন রাই স্বর্ণলতা।
একবার বঙ্কিম নয়নে, রাই পানে, ফিরে চাও হে,
দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥[১]

॥ ২৩ ॥

দুই রাজ্যে দু'জন রাজা,
বল প্রজা হ'ব কা'র।
তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা,
কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন রাজার

---

১ পদটী 'প্রীঃ গীঃ' হইতে সংগৃহীত

ললিতা, বিশাখা, বৃন্দে, চিত্ররেখা,
আসি মধুধাম রাজসভায় রাজসম্বোধনে কয়,
রাজা কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম।
শুন শুন ওহে বনমালী, বলি বলি,
সব মনের দুঃখের কথা তোমায় বলি।
আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই,
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার।
জানতে এলাম তাই শ্যাম হে যমুনার পার।
থাকি ব্রজে, একবার মনে করি ;
তা কি পারি শ্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে মরি
এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,
প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই রাধার।
যখন কুঞ্জে ছিলে হৃষীকেশ,
প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে শ্রীরাধার হে
ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়,
নাহি ছিল দুঃখের লেশ।
পরমসুখেতে গোপিকাগণ হে করিত সুখে বাস
উঠ্‌তো নিত্য রসের লহরী,
রাধাকৃষ্ণে করিত বিলাস !
এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা,
কোন রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে মনের ব্যথা।
একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন,
যাতায়াত পরিশ্রম সহে না আর ॥[১]

॥ ২৪ ॥

রাই শত্রু রেখো না হে শ্যাম রায়,
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর ল'য়ে কুব্জায় ॥

[১] বাঃ গাঃ, প্রীঃ গীঃ

বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়
ক'লে ত সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস ॥
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে, সেও হে প্রাণেতে বাঁচে ;
রাজার নন্দিনী, হ'ল বিরহিণী,
বল হে, কত দুঃখ সবে আর ॥
ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায় ॥
তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,
তায় কর্‌লে কাঙালিনী,
তোমার ও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান,
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায় ॥[১]

॥ ২৫ ॥

১ চিতান।—শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী,
যা বল সকলি সম্ভব।
১ পরচিতান।—হে মাধব, রাধার সে গৌরব,
গিয়াছে তোমা হতে সব।
১ ফুকা।—ছিলেন ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী,
হরি রাজত্ব তুমি তার,
করেছ রাজ—পথের ভিখারী।
১ মেলতা।—আমরা কথায় ত ভুলবনা,
শ্রীরাধার যন্ত্রণা,
এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি ;
মহড়া।—প্যারীর রাজত্ব সুখেতে আর কাজ নাই,
বাঁচলে প্রাণেতে বাঁচি।

১ বাঃ গাঃ, গুপ্তঃ ৫

বিচ্ছেদ জ্বালা রাই যুড়াত,
যমুনায় ঝাঁপ দিত,
কেবল আমরা তাঁয় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি।
খাদ।—কব কি যে সুখে গোকুলে আছি।
২ ফুকা।—রাধার দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা,
রাধার চরণ বই জানে না,
রাই মন্ত্র করে উপাসনা।
২ মেল্‌তা।—কৃষ্ণ তোমারে হারায়ে,
রাধার পানে চেয়ে,
আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি।[১]

॥ ২৬ ॥

১ চিতান।—বৃন্দাবন হতে অক্রূরের সঙ্গেতে,
কংসযজ্ঞে যখন এসেছি ;
১ পরচিতান।—শ্রীরাধার আজ্ঞা লয়ে সই যাত্রা করেছি।
১ ফুকা।—হাস্যমুখে রাধা আমায় দিয়াছেন বিদায়,
আমি কি ভুলিতে পারি সেই শ্রীরাধায় ?
১ মেল্‌তা।—বলিলে গোকুলে বিচ্ছেদ রাজা হয়েছে ;
সে কি কথা ব্রজেতে সই রাই রাজা আছে ;
শুন সখি গো তোমায় কই, রাধা ছাড়া নই,
আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী।
মহড়া।—ব্রজধামে রাই নহে সামান্য নারী,
রাধার রাজ্য ল'তে সাধ্য কি সই বসন্ত রাজার ;
রাধা পরমা সতী ত্রিলোক-ঈশ্বরী।
খাদ।—ভ্রমে কি ভুলেছ তুমি ও সহচরী ;
২ ফুকা।—বৃন্দাবন নিত্যধাম জান তদন্ত—
সেখানে ত বিরাজিত চির বসন্ত ;

[১] প্রাঃ কঃ সঃ, নূঃ, সাঃ পাঃ

২ মেল্‌তা।—রাধায় করিতে দরশন,
গেছে বসন্ত মদন,
তাদের সাধ্য কি বধিবারে কিশোরী

॥ ২৭ ॥

প্রভাস

মহড়া।—কথায় ভুল্‌বো না, কৃষ্ণ আমরা কথার কাঙাল নই।
রাধারে বসাও বামে, তীর্থ ধামে,
দেখে ঐ চরণে, সবাই তৃপ্ত হই।
শুন শ্যাম এই করি নিবেদন।
রাধানাথ হে, তব দরশনে—
ছিল শ্রীদামের অভিশাপ, মনস্তাপ—
বুঝিহে ঘুচিল এত দিনে।
ভাগ্যে এসেছেন আপনি রাই, দেখা তাই,
নইলে রাইকে তোমার মনে ছিল কই।
চিতেন। -করিতে রাধার মান রক্ষে,
বিনয়বাক্যে কল্লে সম্ভাষণ।
মরি মরি, ও বাক্যমাধুরী,
শুনে হরি জুড়াল জীবন॥
দেখে রাইকে ভাবের উদয় হ'ল—
ভাল বল দেখি মাধব এ গৌরব,
এ প্রেম এতদিন কোথায় ছিল।
অনেক যাতনা, পেয়েছে, জেনেছে,
গোপীর নাই হে গতি কৃষ্ণ তোমা বই
অন্তরা।—পূরাই মনসাধ, একবার যদি ঐ
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই।
যেখানে রাধাশ্যাম্, সেইখানে ব্রজধাম,
ভাবগ্রাহী আপনি তুমি জনার্দ্দন

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

পরচিতেন—এইখানে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন,

নিধুবন নিকুঞ্জকানন

সেই কিশোরী, সেই তুমি শ্রীহরি, সেই সব নারী,

আমরা গোপীগণ।

বসায়ে হে রত্নসিংহাসনে—

কৃষ্ণ তুমি নীলরত্ন, রাইরত্ন,

দুই রত্ন হেরি দুটি নয়নে।

আমরা গেঁথে মালতীর হার,

দু'জনার অঙ্গে পরিয়ে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রই ॥[১]

ঠাকুরদাস

সখীসংবাদ

১ চিতান।—প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে

হেরিয়ে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়।

পরচিতান।—রাধা কেঁদেছ যার আশাতে, নিশিতে

সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

১ ফুকা—কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জা-ভয়

মুখে আধ আধ ভাষা

গললগ্নবাসা

কাতর মাধব অতিশয়।

১ মেলতা।—দেখে রূপের ছাঁদ

পাছে রাগ হয় উন্মাদ

কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

১ পদটী প্রীঃ গীঃ হইতে সংগৃহীত

মহড়া।—একবার বলিস্‌ ত আস্‌তে বলি মাধবকে
প্যারি তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বল্‌তেছে "দয়া কর রাধিকে।"
খাদ।—যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গো প্রধানা গোপিকে।
২ ফুকা।—কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত
যেন গ্রহণান্তে শশী
উদয় হ'ল আসি
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।
২ মেলতা।—নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ
হৃদে কলঙ্কেরি দাগ
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে॥[১]

॥ ২ ॥

বিরহ

শ্রীমতি, এই মিনতি রাখ[২] গো আমার।
পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ,
সও গো সও অল্প দিন আর দুখের ভার॥
হবি কি পাগলিনী, কমলিনি,
কৃষ্ণবিরহের দায়?
ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ্য কর দুখ,
সময়ে পাবে শ্যাম রায়।
আছে প্রমাদিনী ঐ যে কুটিলে;—
সাধে কৃষ্ণসাধে বাদ, পরিবাদ
ঘটালে এই গোকুলে।
দুঃখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কায নাই,
ঘটাস্‌নে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
জেনো সকলি কপালে হয়,
রাধে গো, দোষ নাই কা'র।

১ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ-শুন

বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ, কিশোরি,
ভাব কৃষ্ণের অভয়-পদ, ঘুচিবে এ বিপদ,
বিপদের কাণ্ডারী হরি।
ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুখ অন্ত,
হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার ॥[১]

নাহি একান্ত জানি বিনা শ্রীরাধায়।
যতনে চরণে শরণ পেয়েছি রাধার;
এ দায়ে রাখেন রাই যদি পায়,
নতুবা নিরুপায়, মানের দায় সখি,
আমার প্রাণ যায় ॥
রাধার মাধব রাধার প্রেমে,
সদা গো বাঁধা আছি সই!
নাহি অন্য জনে জানি মনে সই,
একান্ত প্রাণের রাধা বই।
ব্রহ্ম-সনাতনী, চিন্তা-স্বরূপিণী শ্রীমতী;
কৃষ্ণ বিরহে কি ভয় তার, বিচ্ছেদ নাই শ্রীরাধার
তুচ্ছ অনঙ্গে কি হবে তার দুর্গতি ॥
ইচ্ছাময়ী নাম রাধার, রাই কৃষ্ণের মূলাধার।
ভিখারী আমি রাধার প্রেমের দায় ॥[২]

॥ ৪ ॥

১ চিতান।—পুরুষ সরল সুজন অতিশয়,
নাহি কঠিনতার লেশ।
১ পরচিতান।—আগে প্রাণ সঁপে পরের করে অনাসে-
সহজে সরলেরি শেষ।

'দাঃ গাঃ' হইতে সংগৃহীত
কাহারও মতে এই গানটি গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত

১ ফুকা।—কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে,
পতি তার দিবাকর,
জেনেও ত মধুকর
ভুলেও ত্যজে না পদ্মেরে।
১ মেল্‌তা।—নাহি হয় তার মনক্লেশ,
ভাবে সে সুখ অশেষ,
আমি পরের নই, তোমা বই আর জানি না।
মহড়া।—কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
প্রাণ লয়ে ও সুযশ কর না।
হয়ে তোমারই প্রেমাধীন্ তুষি মন নিশি দিন,
তবু ভুলেও ত আমায় 'আমার' বল না॥[১]

॥ ৫ ॥

১ চিতান।—বল সই কি কথা ভাবের অন্যথা নাহিক আমার।
১ পরচিতান।—তবে কর্ম্মান্তরে হ'লে স্বতন্তর,
তুষ্‌তে নারি প্রাণ তোমার।
১ ফুকা।—তা' বলে ভেব না প্রিয়ে আমায় পর।
আমি নহি ত পরের প্রাণ,
তুমি না পরের প্রাণ
তোমারি বাঁধা নিরন্তর।
১ মেল্‌তা।—পরের নিন্দা করা কেমন স্বভাব রমণীর,
পুরুষ প্রাণ দিলেও নারী সুযশ করে না।
মহড়া।—কও কে শিখালে হে তোমারে
এমন ঘরভাঙ্গা মন্ত্রণা।
বিনা দোষেতে দুষো না,
সুখের প্রেমে দুখ দিও না,
মিছে অপযশ কর্‌লে ধর্ম্মে সবে না।[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ
২ প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ৬ ॥

১ চিতান।—বৃন্দে শ্রীবৃন্দাবনে বসন্তে হেরে,
কাতরা হ'য়ে খেদে কয়,

১ পরচিতান।—একে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণ দহিছে
তাতে আর কি এত জ্বালা সয়।

১ ফুকা।—এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্রতনয়,
হত তাতে হে বসন্তে, নিত্যসুখোদয়।

১ মেল্‌তা।—এখন সে সুখ হরি—হরি, ব্রজধাম পরিহরি,
ব্রজনাথ গেছেন যমুনার পার।

মহড়া।—দেখ কৃষ্ণ বিহনে, হে ঋতুরাজ,
এই দশা গোপিকার।
কেন এ সময় বসন্ত, কোত্তে গোপীর প্রাণান্ত,
এলে গোকুলে;
তোমার কোকিলের স্বরে প্রাণে বাঁচা ভার।

খাদ।—মাধবে, মাধব-অভাবে, সবে শবাকার।

২ ফুকা।—দেখ এই সেই ব্রজেশ্বরী, স্বর্ণলতা রাই,
ধূলায় লুণ্ঠিতা শ্রীমতী সে সু-বর্ণ নাই!

২ মেল্‌তা।—কৃষ্ণ-বিরহে অনিবার, নয়নে শতধার,
বহিছে সদা ঐ শ্রীরাধার।[১]

মাথুর

১ চিতান।—দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো বৃন্দে,
রাজারে জানাই সবিশেষ;

১ পরচিতান।—নাহি পারবে যেতে রাজসভাতে
আজ্ঞা না দিলে হৃষীকেশ।

১ ফুকা।—আছে ভূপতির এই অনুমতি জেন
কেহ পারিবে না যেতে, রাজার সভাতে
না হ'লে রাজ-আবাহন।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

১ মেলতা।—যদি যাইতে অনুমতি,
করেন যদুপতি,
তবে করিবে শ্রীপতিরে দরশন।
মহড়া।—রাজ আজ্ঞা বিনা যাবে রাজসভায়
বাসনা তোমার এ কেমন ;
আগে জানাই গে রাজাকে,
যদি আজ্ঞা করেন যেতে তোমাকে,
তবে যেওগো দেখ মথুরার রাজন্।
খাদ।—সামান্য ভূপতি নহে মদনমোহন।
ফুকা।—যোগী ঋষিগণ রাজদরশনে আসে
রাজ-অনুমতি ল'য়ে হৃষ্টমতি
দেখে গে রাজার শ্রীনিবাসে।
২ মেলতা।—তুমি সহজে রমণী,
তাতে কাঙ্গালিনী,
ছেড়ে দিতে গো নারি তোমায় কদাচন

॥ ৮ ॥

চিতান।—আসি মাধবের মধুধাম,
কৃষ্ণপদে প্রণাম,
করিয়ে বৃন্দে দূতী কয়—
১ পরচিতান।—বংশীধর, অনেক দিনের পর
ও চাঁদবদন দেখ্‌লাম দয়াময়।
১ ফুকা।—কথা কও কও কও হে চিন্তামণি
কেন কৃষ্ণধন থাকিতে রাই কাঙ্গালিনী।
১ মেল্‌তা।—করি রাই পক্ষে পক্ষপাত
হ'লে হে কুবুজার নাথ
মরিল রাই, চক্ষে একবার দেখলে না।
মহড়া।—হক্ হক্ পূর্ণ হক্ কুবুজার মনোবাসনা
কুবুজা দিয়েছেন চন্দনদান,
বাড়ালে দাসীর মান

১ প্রাঃ কঃ সঃ

আবার তায় বামে দিলে স্থান,
তবু রাধার বই কুবুজার শ্যাম কেহ বল্‌বে না।[১]
(এই গীতের খাদ, দ্বিতীয় মেলতা ও ফুকা পাওয়া যায় নাই।)

॥ ৯ ॥

১ চিতান।—আসিয়া কংসধামে বৃন্দে,
গোবিন্দের পদে ধরি কয়।
পরচিতান।—বহুদিনের পর দরশন পেলাম দয়াময়।
১ ফুকা।—ভাল ভাল ভাল ওহে কালশশী,
একবার দাসীর পানে ফিরে চাও হে,
কিছু মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।
১ মেল্‌তা—তুমি ব্রজের ধন কৃষ্ণধন
গোপীর সর্ব্বস্বধন
বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায়;
মহড়া।—আমরা ভক্তিধন,
আর প্রেম-ধন
দিয়ে তোমার শ্রীপদে ল'য়েছিলাম হে স্মরণ;
তবু রাধানাথ, রাখিলে না রাঙ্গাপায়,
খাদ।—বল শ্রীপদে দোষী হ'ল গোপীকায়?
২ ফুকা।—ধন মন দেহ যৌবন তোমায় দিয়ে,
তোমার রাঙ্গাপায়ে রাধানাথ হে,
আমরা জনমের মত আছি বিকায়ে।
২ মেল্‌তা।—তুমি হ'লে না অনুকূল
মজালে গোপীর কুল,
অকূল সাগরে বুঝি গোকুল ভেসে যায়॥[২]

॥ ১০ ॥

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়।
কভু কুবুজায় সুন্দরী, করি হে সুন্দরি,
কখনো ধরি রাধার রাঙ্গা পায়॥

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ

সকলে জানে সই রসময়ই, আমি ইচ্ছাময় ;
জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সই রে, আমা হ'তে হ'য় ।
কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব ;—
করি কখনো ঘাটালি, কখনো রাধার দাসত্ব ।
কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন,
কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপিকায় ।
কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী রাধার মানের দায় ।
কভু করে ধরি গিরিগোবর্দ্ধন ;—
ইন্দ্রদেবের ভয় হ'তে রক্ষা করি গোপীগণ,
কভু পুতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি
কালীয় দমন, কভু উদূখলে বাঁধেন যশোদা ।[১]

কানাই

মালসী

দিনে দিনে দিন গেল দয়াময়ি ।
(আমি) দীনহীন অজ্ঞানে চরণ চাই ।
চরণে দেও যদি মা, নিজ গুণে,
সাধনের জোর নাই ॥
মনে করি সাধ্‌ব চরণ ;
করি না সেই ভাবাচরণ ॥
কু-আচরণে করে দিন কাটাই,—
রেখো অন্তকালে চরণতলে, বলে রাম কানাই

১ ইহা বাঃ গাঃ হইতে সংগৃহীত

॥ ২ ॥

লহর মালসী

চিতান।—তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে শুনতে পাই।

পারাণ।—তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ
মা গো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই।

লহর।—তুমি আদ্যাশক্তি তারা, তোমায় ধর্‌তে দেও না ধরা,
জীবকে সারা, করলে মায়াজালে
তোমার মায়াতে, মা হয়ে মুগ্ধ
বিষয়-বিষে হ'লেম দগ্ধ
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে

মিল।—পাপ পুণ্য মা তোমার কার্য্য
দোষের ভাগী আমি,—ঠিক বাজীকরের মেয়ের মত,
দেখাও ভোজের বাজী ভূমণ্ডলে॥

মহড়া।—এমা দুর্গে! পাপ পুণ্যের বিচার কর তুমি মা,
আমি সে ভার দিয়াছি তোমার চরণকমলে॥

ধুয়া।—এ দেহে মা তুমি রাজা
দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে,
তারা প্রজা হ'য়ে, রাজার হুকুম আমলে না আনে,
ছয় জনা মা, প্রতিবাদী, সূক্ষ্ম বিচার কর যদি
হ'য়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদী,
আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে॥

খাদ।—সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণ তারা,—আপনি সৃজিলে।

লহর।—আমি তর্‌ব তম গুণে
এবার সার ভেবেছি মনে মনে,—
সত্ত্বগুণের গুণ কি আছে বল,—
সাক্ষী আছে মৈষাসুরে
তম গুণ সে প্রকাশ করে,
মা তোমার এই রাঙ্গা চরণ পেল॥

মিল।—তম গুণে সাধনসিদ্ধি, সত্য জানা গেল,
জানি তমগুণে তরে গেল,
কালকেতু ব্যাধের ছেলে ॥
(এমা দুর্গে গো—ইত্যাদি)

ঝুমুর।—সদা তাই ভাবি মা বসে নিশিদিন ;
কবে হবে আমার বিচারের দিন ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে, আমার সেদিন বা কিরূপে যাবে,
ভেবে হৈল এই তনু ক্ষীণ ॥
গীত মনোশিক্ষার ভাবে
ও ভোলো মন, আছে কি সুখে ?
তোমার দিন গেল, কাল সম্মুখে
মনরে, ভবের মায়া দূরে রেখে ভজ ব্রহ্মময়ীকে
মনরে, কি ধন লোভে এসেছ ভবে, কি ধন লয়ে যাবে
যখন সরকারী তলব আসিবে, কি বলে দাঁড়াবে ?
এ দেহ মাটীর ভাণ্ড, ভেঙ্গে যাবে ঠুকে।
শমন দূতে হাসবে তখন ধিক্ দিয়ে তোর মুখে ॥
মনরে, বিষয় গোলে দিন কাটালে, খাট হৈল বেলা,
আর কিরে মন, খুঁজলে পাবে সে ধন সন্ধ্যাবেলা
শেষে কানাই বলে, ও পাগল মন ঠেক্‌লে মায়া পাশে
তরবে যদি, ভবনদী দুর্গা বল সুখে ॥[১]

বলাই

মালসী

করুণাময়ী মা, আজ জানা যাবে তোর কেমন করুণা
দণ্ডহাতে শিয়রেতে বসিয়াছে রবির নন্দন গো মা,
রবির নন্দন, আমি ভয় পেয়ে মা বলে ডাকি, ঘন ঘন।

১ সৌরভ, ১৩২৩, ৫ম বর্ষ অগ্রহায়ণ, 'ভক্তকবি কানাই বলাই'—বিজয় নারায়ণ আচার্য্য

মাতাপিতা বর্ত্তমানে, যদি সন্তানে কষ্ট পায় গো।
সন্তানে কষ্ট পায়।—
রাগে কি সন্তান ত্যাগে গো, দয়াল বাপ মায়॥
আমি দীনহীন ক্ষীণ অতি, দুঃখ হর দুঃখহরা, গো
দুঃখহরা।
তোরা খেয়া ঘাটে বসে ডাকে বলাই কপাল-পোড়া।

॥ ২ ॥

তোরে বারে বারে মা বলে মা ডাকি কেন শুনছ না।
বুঝি দীনের প্রতি দয়া হৈল না।
মাগো, ভব ঘোরে, এনে মোরে দিলে কি জঠর-যন্ত্রণা
স্থতে এত বিপরীত, ক'রেও মায় কখন ধরে না,
পুরাণে কয়, শমনের ভয় দুর্গা নামে থাকে না,—
আমি ভেবে দেখি, যাবি ফাঁকি,
কর্ম্ম-নাশ আর কাটা যায় না।
জানলাম তত্ত্ব, কপাল সত্য,
কপাল বৈ আর কিছুই তো না।
পাগল বলাই বলে, দুর্গা বলে,
আর কেহ তোরে ডাকবে না।[১]

রমাপতি ঠাকুর

॥ ১ ॥

বিরহ

সখি, শ্যাম না এলো।
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী আজি অমনি পোহা'ল
ঐ দেখ সখি, শশাঙ্ক কিরণ
ঊষায় প্রভায় হলো সঙ্কীরণ

---

১ সৌরভ ১৩২৩, অগ্রহায়ণ

পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃসমীরণ
কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল ॥
সখি! শ্যাম না এলো।
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ ধনি তোমা বোলে নয়;
নিশা গতে যেন প্রভাত নিশ্চয়,
রজনীর সুখ-বিলাস ফুরাল ॥
সখি! শ্যাম না এলো।[১]

রামকমল

কবির লহর—মহাভারত-শিশুপাল

মহড়া।—তোরে ধিক ধিক আজ ওরে মাধব শিশুপাল,
আর কি তোর মরিতে জায়গা নাই।
রামকমল ভীষ্মক নন্দিনী, জানি নারায়ণের লক্ষ্মী তিনি,
গেলি তুই করিতে তায় বিয়ে।
মর্দ্দানি ভেঙ্গে দিব গর্দ্দানি দিয়ে।
এমন যার লক্ষ্মী সে গেল তোমার মুখে দিয়ে ছাই ॥
খাদ।—বিয়ের কাণ্ড শুনে আজ লজ্জায় মরে যাই ॥
ফুঁকা।—সে দর্পহারী বংশীধারী, আপনার দর্প রাখে না।
জেনেও জান না।

১ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী—বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ—প্রবাসী, ১৩০৮

মনে যে দর্প করে হরি তা জান্‌তে পারে,
অমনি তার দর্প চূর্ণ করে কালিয়ে সোণা ॥

মেলতা।—একদিন গরুড় দর্প করেছিল শ্রীহরির কাছে।
করলেন অনায়াসে তার দর্প চূর্ণ, পুষ্প আনতে শুনতে পাই ॥

১ চিতেন।—বল্লে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার বিয়ে দিতে দিলে না।
সেই জন্যে, ওরে, রামকমল ভীষ্মক রাজার কন্যে,
তোমার ভাগ্যেতে ঘটিল না ॥

পাড়ন।—যে বৈকুণ্ঠের কমলার পতি,
রুক্মিণী রমণী হয় তার
বলিব কি তোমায়।
টাটে আলোচাল দেখে, লাল পড়ে ভ্যাড়ার মুখে,
তেমনি রুক্মিণী দেখে তোমার মুখ চুল্কানি পায় ॥

মেলতা।—ওরে কুবেরের ধন কাকে হরে, আনতে কি পারে,
ভাগ্যে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তুমি প্রাণ বাঁচায়ে এলে তাই ॥

অন্তরা।—বুঝে দেখতে হয় অন্তরে,
স্বদেশে পূজিত রাজা প্রজায় মান্য করে।
অন্য দেশে রাজা তোমায় বাম দিকে মারে,
পাদারে গে আন রাজা তাই দেখি তোমারে ॥
ওরে উচিত কথা কল্লেম বলে কালি দিলে আমারে ॥
মাতাল যদি নেশার বশে বেতাল সে বলে,
পণ্ডিত কি রাজা তার কথায়।
শোন রে গুরু-নিন্দা নরকে বাস,
ব্রাহ্মণ-নিন্দাতে কুলক্ষয় ॥

মেলতা।—কুকুরে তুলসীডালে, মুতে ঢু-ঠ্যাং তুলে,
তবু সে তুলসীর পত্র হলে দেবতা পূজা হয়।
তুমি পায়ের কাছে কুনো বেড়াল, ঘরে বাজারে গ্রামে,
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই,
তেমনি তোমার বড়াই দেখতে পাই ॥[১]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

॥ ২ ॥

রামায়ণ-অন্ধমুনি

মহড়া।—আ-মরে যাই সিন্ধু সোণার চাঁদ
তুমি কও না কথা কিসের জন্যেতে।
আমি জল পিপাসায় কাতর হলেম,
তোরে জল আনতে পাঠায়ে দিলেম,
তাইতে কি করলি অভিমান।
পথে একলা পেয়ে কে তোমারে কল্লে অপমান।
আমার জল পিপাসায় যায় যাবে প্রাণ,
বাপ বলে আয় কোলেতে॥

খাদ।—মনের কথা ভেঙ্গে বল আমার সাক্ষাতে॥

ফুঁকা।—তুমি জলের ভাণ্ড ভূমে রেখে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
গলে বসন লয়েছ,
ভেবে তাই হলেম সারা, দেখে প্রাণ যায় না ধরা,
আবার ক্ষণে ক্ষণে ধরে ধরা, রোদন করতেছ॥

মেলতা।—দেখছি তোমায় কৃতাঞ্জলি প্রায় মনে সন্ধ হয়।
আবার চোরের মত কিসের কারণ রয়েছ সম্মুখেতে॥

১ চিতেন।—আমি অন্ধমুনি রামকমল হই
শ্যামবাজার তপোবনে বাস॥

পাড়ন।—হরি ভজন হরি সাধন, হরিপদে মন,
আমরা স্ত্রীপুরুষে হরিনাম করি বারমাস॥

ফুঁকা—সদা ধর্ম্মপথে দু'জনাতে চিরদিন কাননেতে রই।
কারো মন্দকারী নই।
সিন্ধু তোয় বুকে রেখে, কাল কাটাই পরম সুখে,
কেবল দিবা-রাত্র বলি মুখে, দীনবন্ধু কই॥

মেলতা।—তুমি পুত্র সেবায় নিযুক্ত, আছ প্রযুক্ত,
তোমার অসক্ত ভাব দেখে আমি মরি মনের দুঃখেতে॥

অন্তরা।—কেন বদন ভারি,
চন্দ্রমুখ সোণার সিন্ধু মলিন দেখতে নারি।
বিভাণ্ডকের একটা পুত্র বিশ্বশ্রবা নাম, মরি হায়!

আমার তেমনি ধারা পুত্র তুমি সিন্ধু গুণধাম,
এখন কি দোষে বাম হলি রে ধন, ঐ দুঃখেতে মরি ॥
২ চিতেন।—দেখ এত রেতে জলতৃষ্ণাতে
বনেতে বিয়োগ হলে প্রাণ ॥
পাড়ন।—আর একটী পুত্র রেখে যদি মরি দু'জনে,
যত মুনিগণে, আমাদের বলবে ভাগ্যবান ॥
ফুঁকা।—আমার অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের ধন,
সে ধন আজ কেমন দেখতে পাই।
এমন কখন দেখি নাই।
তোরে কোন রাজার ছেলে, রাজপথে একলা পেলে,
দুষ্টবুদ্ধি অপমান আজ তোমায় করলে, সন্দ ভাবি তাই ॥
মেলতা।—তোকে দেখে আকুল হচ্চে প্রাণ বল্ রে সন্তান।
শুন্‌লে তোমার কথা, ঘুচে ব্যথা কাজ কি সৌজন্য তাতে ॥[১]

পরাণচন্দ্র সিংহ

॥ ১ ॥

কলঙ্কভঞ্জন

মহড়া।—দেখ দেখ হে শ্যাম,
রাখ রাখ হে দাসীর সম্মান,
এ গোকুলে।
নারীর মধ্যে যে সতী আমি,
সকলি জান তুমি,
দীননাথ হে, জেনে কেন বঞ্চনা হে,
ছিদ্র কুম্ভেতে বারি,
যদি না নিতে পারি,
তবে যমুনায় মরিব হরি হরি বলে ॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

খাদ।—বারি আন্‌তে গিয়ে,
এলো লজ্জা পেয়ে,
জটিলে কুটিলে ॥

ফুঁকা।—জানি তাদের মতে ব্রজেতে,
কে পারে সতী হতে.
তারা হ'লো অপমান, গেছে মান,
শুনে আমার কাঁদে প্রাণ।
নিতে বারি ছিদ্র ঘটে,
এসে যমুনার ঘাটে,
কি জানি কি কর্ম্ম ঘটে,
ঘটাও ভগবান ॥

মেলতা।—তোমার এ কেমন চিন্তাজ্বর,
জ্বর জ্বর জ্বর বিষম জ্বর,
চিন্তামণি হে,
ভয়ে থর থর থর প্রাণ কাঁপে যেতে জলে ॥

১ চিতেন।—চিন্তাজ্বর চিন্তামণির গুণে রাধে ॥

পাড়ন।—সেই সংবাদমাত্রে, হয়ে ব্যাকুলচিত্তে,
ধারা যুগলনেত্রে, মনের বিষাদে ॥

ফুঁকা।—ল'য়ে ছিদ্রকুম্ভ কক্ষেতে,
বার হলো রাই রাজপথে,
যমুনাতে আন্‌তে জল ;
দেখে জল, কাঁপে হৃদ্‌কমল,
কলসী রাই রেখে কূলে,
কান্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
চক্ষের জলে, দুঃখের জলে, ভাসে বক্ষঃস্থল ॥

মেলতা।—বলে কৃষ্ণ কি কল্লে দায়,
দায় দায় দায় বিষম দায়, দয়াময় হে।
মরি হায় হায় হায়, কৃষ্ণ কি দায় ঘটালে ॥

অন্তরা।—একে আমি শ্যাম-কলঙ্কী আছি কূলে।
এসে যমুনার কূলে, ভাবি কূলে কূলে,

যাই কোন কূলে, হাসে পাছে শত্রুকুলে,
আমি কুলের বৌ ভাসি অকূলে ;
তুমি হয়ে অনুকূল, রাখ রাখ কুল,
নইলে দুকুল ডুবে যায় অকূলে ॥
২ চিতেন।—যারা সব সাধ্বী-সতী বৃন্দাবনে ॥
পাড়ন।—ছিদ্র কুম্ভেতে জল, নিতে যমুনার জল,
ফিরে এলো সকল, বিরস-বদনে ॥
ফুঁকা।—যদি একটী ছিদ্র ঘটে, তা' হলেও জল আনা যায়,
এ যে সহস্র ধারা, এ ধারা যেন বরিষণ ধারা।
জটিলে কুটিলে দুই মায়ে ঝিয়ে,
ঐ ঘটে জল আন্‌তে গিয়ে,
সতী হয়ে লজ্জা পেয়ে এসেছেন তাঁরা ॥
মেলতা।—আমি নিতে পারি কি জল,
জল জল জল বিষম জল, জলধর হে।
কেন ছল ছল ছল দু-আঁখি ভাসে জলে ॥[১]

॥ ২ ॥

বিরহ

দূতি, বল গো আমায়,
প্রাণের নীলকমল কোথায় ফুটেছে।
সে যে আমার প্রেম-সরোবরে
প্রফুল্ল হওয়ার তরে
কাননে এলেম সঙ্কেত-বাঁশরীর স্বরে
সুখের বাসরে।
কিশোর কে হরেছে।
বিহনে শ্যাম-নীলপদ্ম, হৃৎপদ্ম
বিচ্ছেদ-উত্তাপে জ্বলে যায়।
যেমন নলিনী সলিলে, শুকায় নিশাকালে
আমি গো হ'লেম তৎপ্রায়।

১ প্রাঃ ওঃ কঃ।

অঙ্গে চুয়াচন্দন দিয়ে
শীতল শয্যায় গিয়ে,
শয়নে যদি থাকি
শয্যায় শয্যা-কণ্টকী
হয় গো সখি ! কালায় না হেরিয়ে।
কৃষ্ণসুখের বাঞ্ছা করে
শুনে বাঁশী বনবাসী হ'য়ে
ঝাঁপ দিলেম সেই প্রেমসাগরে।
সে আশাতে নৈরাশ করি বল গো সহচরী,
আছে কার কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী।
আশাবাক্যেতে এসে বনেতে
প্রাণ গেল সই বিচ্ছেদ-শরে ॥[১]

কবির লহর

মহড়া।—তোমার বিবাহের পক্ষে কেন শিশুপাল,
নন্দলাল বিপদ ঘটালে।
পর নূতন জামা জোড়া,
সঙ্গে নাও তেজি ঘোড়া,
রেশালায় গেলে।
বিয়ের ধূম শুনে ভূমিকম্প হয়।
কেন চোরের বেশে ঘরে এসে,
খাটের পাশে লুকালে ॥
খাদ।—ব্যাওরা কথা বল আজ শুন্‌বো সকলে ॥
ফুঁকা।—যখন তোমার এ ঘটকালি করে।
যেয়ে নারদ মুনি, বল্লেন তখনি।
কেন বিদর্ভপুরে, যাবে ডঙ্কা মেরে,
তোমার ভাগ্যেতে ঘটবে না রে, লক্ষ্মী-রুক্মিণী

১ বান্ধব, ১২৮২ পৌষ, কবিগান, আনন্দচন্দ্র মিত্র।

১ মেলতা।—সে যে জন্মাবধি হরিপূজা করে রাত্র দিন।
যুগে যুগে বাঁধা আছে হরির চরণকমলে॥
১ চিতেন।—আমি পরাণচন্দ্র নামটী ধরি,
ফরাসডাঙ্গায় রই।
তুমি যে মাধব দামু ঘোষের বেটা শিশুপাল,
আমি তোমার পুরোহিত হই॥
পাড়ন।—শুনিলাম সেই ভীষ্ম রাজা,
রাজকুলে অতি মান্যবান, ক্ষত্রিয় সন্তান।
ছিলেন প্রতিজ্ঞা করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরে,
রাজা আজ্ঞা করলে তারে, করবে সম্প্রদান॥
২ মেলতা।—সেই বিয়ের খবর শুনে গেলে বিদর্ভনগর।
তুমি বামন হয়ে হাত বাড়ায়ে স্বর্গের চাঁদ ধরতে গেলে॥
অন্তরা।—ভাল করতে গেলে বিয়ে, গায়েতে হলুদ মেখে,
হাতে বর সুতা বেঁধে, গোঁপে কলপ দিয়ে।
চটক মেরে গেলে, ফটিক চাঁদ হয়ে,
কৃষ্ণের কাছে ঘাড় ঘুরানি দিয়ে॥
পাড়ন।—কিন্তু এমন ধারা বিয়ে কর্ত্তে যায় অনেক জনা।
যেমত করে তুমি সেজে গেলে যেন বিয়ের বর,
এমন আর কোথাও দেখবো না॥
ফুঁকা।—তোমার বিদ্যে যেমন বুদ্ধি তেমন,
এক সমান দেখলেম চিরকাল।
বলে নাই গোলমাল, জন্ম কুলীনের কুলে,
তায় যশ কপালে, কিন্তু একটী দোষ লোকে বলে,
ঘোষের বেটা পাল॥
৩ মেলতা।—ওরে লক্ষ্মীকান্ত না হইলে,
এ লক্ষ্মী সকলে কি পায়, সাধন গুণে পায়,
কুক্কের বাঞ্ছা মনেতে, চিত হয়ে শুতে,
ভাল মনে সাধ করলে কি তায়, শুতে পারা যায়॥[১]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

নবাই ঠাকুর

॥ ১ ॥

নৌকাবিলাস

মহড়া।—জানি জানি হে চেনা নাবিকের এমন ধর্ম্ম নয়।
অগ্রে পারাপার না হয়ে কে দান দেয় বল,
বাজারের বিকি কিনির সময় গেল,
ত্বরায় পার কর এখন, হাট করে আসবো যখন,
তোমায় বুঝে দান দিব তখন পারের সময়॥

খাদ।—যে জন বেতনভুগী, বঞ্চনা তার কি উচিত হয়॥

ফুঁকা।—যার নাই পারের সম্বল সঙ্গেতে,
তারে কি পারে নিতে তুমি পারবে না।
পার কি করবে না হায় হে!
অর্থবিহীন শত শত, ত্রিজগতে আছে কত,
তাদের পার না করলে, আর তো তোমায় ডাকবে না॥

১ মেলতা।—তুমি অনায়াসে কর্ত্তে পার অকূলে পার,
এ নয় তেমন পার হে।
তাইতে লোক বলে তোমায় দীন দয়াময়॥

১ চিতেন।—কি কথা বল্লে নাবিক পারের।

পাড়ন।—অগ্রে দান সাধিবে শেষে পারের।
তবে পার করবে যমুনায়॥

ফুঁকা।—একে তোমার ভগ্ন তরী, তাহে উঠে বারি,
দেখে লাগে ভয়, তরী ভাল নয়, হায় হে!
দেখে রাধায় কাঁচা সোণা
এ সব কথা কেলেসোনা, শুন্‌লে লজ্জা হয়॥

২ মেলতা।—তুমি বাঁশীতে উপাসনা কর যাকে,
সুমধুর স্বরে হে সুমধুর স্বরে হে,
চিন্তে পারলে না হে সেই শ্রীরাধায়॥[১]

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

ভীমদাস মালাকার

কৃষ্ণলীলা

মহড়া।—তোরা দেখ গো সই কালো বরণ কালো জলে
আমায় ধরেছে, রাখি হৃদকমলে।
ঐ দেখ মুরলী চন্দ্রাধরে,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গী ধরে,
আমায় ভুলালে, ধরতে গেলে লুকায় জলে,
কিরূপে ওরূপ ধরি,
অধীর চাঁদে ধরতে নারি,
ওরে ধরবো কি মন-প্রাণ হরি সকল হরে নিলে॥

খাদ।—ও রূপ দেখিলে সখি, কুলের বৌ কি,
যেতে পারে কুলে।
আমি ভেবেছিলেম ভবের কূলে,
থেকে ব্রজগোপীর কুলে
করিব কালার সাধনা।
ছিল বাসনা লো।
এ ভাগ্যে সে সব ঘটলো না;
ঘরেতে কাল ননদিনী,
সে দুরন্ত রায়বাঘিনী,
সে থাকিতে চিন্তামণির চরণ চিন্তা করতে পাল্লেম না॥

১ মেলতা।—আমি যে সুখে করি ঘর,
বন্ধু কেউ নাই সকলি যে পর,
আবার পরস্পর জ্বালায় কালা-কলঙ্কিনী বলে॥

১ চিতেন।—রাধার মন ছলিতে শ্যাম নিত্য যায় সেই যমুনার কূলে

পাড়ন।—কৃষ্ণ নীরদ-বরণ,
জলধর রূপ করে ধারণ,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে॥

ফুঁকা।—রাধে স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে করে,
সখীগণ সব সমভিব্যাহারে
যমুনায় জল আনতে যায়।
এমন সময় গো সেই জলে ছায়া দেখতে পায়॥
বলে তোরা দেখ লো সখি,
কি অপরূপ জলে দেখি,
দেখলে কালার কাল আঁখি,
মোহিনীর মন মোহ যায়॥
২ মেলতা।—নিত্য এই জলে আসি যাই,
এমন রূপ কখনো দেখি নাই,
আজ কি জলধর জলে স্থলে,
আমায় দেখা দিলে॥
অন্তরা।—জলে ঢেউ দিও না লো সখি,
কালরূপ দেখি, ও রূপ নিরখি।
নবীন মেঘ দেখলে যেমন চেয়ে রয় চাতক পাখী,
আমি তদ্রূপ প্রায় চাতকী।
যদি জলের হিল্লোলে, মিশায় রূপ জলে,
তা' হ'লে সব হবি পাতকী॥
২ চিতেন।—যতক্ষণ থাকিব জলে ততক্ষণ দেখিব কালাকে
পাড়ন।—জলে ঢেউ লাগিলে
জলধর লুকাবে জলে,
এখনি হারাব চোখে॥
ফুঁকা।—ও রূপ লাগে সই যার অন্তরে,
সে কি কখন ভুলিতে পারে,
ভুলে আছে জলময়, বলতে করি ভয় গো॥
ও এক আমি বলে নয়,
কালার দৃষ্টি হয় যার প্রতি
সাধ্বী-সতী কি অসতী
হৃদিপদ্মে করে স্থিতি
মনের সঙ্গে কথা কয়॥

৩ মেলতা।—আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি
ঐ কালরূপ দেখি,
সেই দিকে দেখি, উপায় করি কি,
আঁখি ছলে আমার মন ছলে ॥[১]

চিন্তামণি ময়রা

॥ ১ ॥

বিরহ

মহড়া।—প্রবোধ শুনে, প্রাণ কই প্রবোধ মানে,
কারে ল'য়ে প্রাণ জুড়াবো।
আমি যে দিকেতে ফিরাই আঁখি,
অন্ধকার সকল দেখি,
নাই তার উপায়,
শ্যাম বিহনে জুড়াবো কোথায়,
নাহি স্থান এ ব্রহ্মাণ্ডে,
অনিবার বিচ্ছেদ ভণ্ডে,
ত্যজিতে প্রাণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব ॥
খাদ।—বংশীরব গো আর কি শুনতে পাব ॥
ফুঁকা।—বিধি হয়ে বাদী, হরে নিল নিধি, কি সুখী হব
দেখ গো ও, তোমায় কি কব ॥
করিব মান কার উপরে,
কে সাধিবে চরণ ধরে,
আদর করে চক্ষে রাখিব ॥
মেলতা।—ছেড়ে গিয়েছে প্রাণ কালিয়ে নিদয় হয়ে।
দেখ গো ও গো।
কালো রূপ কাল হলো সই, কি আর কব ॥

১ প্রাঃ ওঃ কঃ, এই গ্রন্থের ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

১ চিতেন।—সখি দিলে বিধি,
ও নয় অবধি
বিধি হলো বাদী।
আমার নাই বিধি,
কাঁদি নিরবধি,
হারা হয়েছি শ্যামনিধি ॥

পাড়ন।—করলে কৃষ্ণ সাধন, শীতল হবে জীবন,
ঘুচিবে সই সব আঁধার, হেদে গো ও।
সাধন কই আমার ॥

ফুঁকা।—যে ছিল হৃদয়বাসী,
সে পেয়ে রাজমহিষী,
পাঠাইয়ে দিয়েছে বাঁশী শমন আমার ॥

মেলতা।—সখি যে বাঁশী বাজিয়ে জীবন হরে নিলে।
দেখ, গো ও গো।
সে বাঁশী এসেছে সই, কই মাধব ॥

অন্তরা।—ধৈর্য্য হব কিসে, জীবন হচ্ছে দাহন বিচ্ছেদ বিষে।
বিষ খেয়ে ক্ষীরোদের কূলে,
আপনি ত্রিলোচন পড়েছেন ঢলে,
নামটি যে তার মৃত্যুঞ্জয়।
আমি নিজে অকাল,
বিচ্ছেদ বিষ জ্বাল,
নির্ব্বাণ হব দেহের শেষে ॥

২ চিতেন।—চিত্রে প্রিয় দাসী, হয়ে হিতৈষী,
আমায় প্রবোধ দিলে।
জীবন উদাসী, বিনে কালোশশী,
দিবসে নিশি গোকুলে ॥

পাড়ন।—কৃষ্ণ বঁধু বিনে, মধুর কুঞ্জবনে,
ময়ূর লীলে নাই, দেখ গো ও গো।
মধুর সে ভাব নাই, মধুহীন সকল ফুলে ॥

ফুঁকা।—নিধুবন শাখামূলে, বিরহানলে, দগ্ধা বিনে কানাই ॥

মেলতা।—হ'লে বারি হীন মীনের জীবন হয় যে প্রকার॥
দেখ গো ও গো
কালা হীন তাই গোপীকার কি সুখ পাব [১]

মোহন সরকার

॥ ১ ॥

প্রভাস

মহড়া।—দুঃখে প্রাণ জ্বলে যায়,
কেন আন্‌লে হে আমায়,
ওহে নারদ প্রভাসকূলে।
হেথা রুক্মিণী শ্যামের বামে বসে আছে,
দেখে চক্ষেতে, দুঃখেতে আর কি আমার জীবন বাঁচে,
তোমার হে কথা শুনে,
এসে এই যজ্ঞস্থানে,
খেদে ভাসি কেবল নয়নজলে॥
খাদ।—হলো যন্ত্রণা মরি প্রেমানলে॥
ফুঁকা।—কৃষ্ণ ছিলেন যখন ব্রজপুরে,
অভিমান করলে পরে,
আদর করে,
রাখতেন আমার মান।
গেল সে সব মান,
হলেম এখন অপমান, হায়,
রুক্মিণীরে আদরিণী,
করেছেন শ্যাম গুণমণি
হারিয়ে মণি, কমলিনীর আর কি বাঁচে প্রাণ॥

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

১ মেলতা।—হলো আমার আজ মিছে আসা এখানে,
জানিলাম মনে,
আবার সেই বিয়ের বাতি উঠলো জলে॥
১ চিতেন।—সখি সমভিব্যাহারে কমলিনী রাই এসে প্রভাসকূলে
১ পাড়ন।—দেখে কৃষ্ণধনে, অতি বিরস-মনে,
শ্রীমতী নারদকে বলে॥
ফুঁকা।—আমি কৃষ্ণধন পাবার তরে,
এলেম কত আশা করে,
কপাল গুণে।
সে আশা গেল, ভাগ্যে এই ছিল,
এখন কোথা যাই বল, হায়!
ব্রজে আমি ছিলেম ভাল,
প্রাণ যেত যে সেও তো ভাল,
শ্যামকে হেরে প্রাণ বিদরে, অভিমান হ'লো॥
২ মেলতা।—এলেম সকলে জলধির তীরেতে,
তাপিত প্রাণ জুড়াতে,
শ্যামময় দেখি হেথায় এই সলিলে॥
অন্তরা।—কুল গেছে গোকুলে আমার নারদ মুনি।
সবাই জানে বৃন্দাবনে আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
অথবা যত গোপবালা,
এখন কত সব বিচ্ছেদ-জ্বালা,
দেখ কৃষ্ণ বিনে আর,
জীবন রাখা ভার,
আশা গেল হলেম অনাথিনী সব গোপিনী॥
২ চিতেন।—মজে কৃষ্ণপ্রেমে,
ছিলেন সুখে
সেই মধুর বৃন্দাবনে।
২ পাড়ন।—মধুর সে সব লীলে,
কৃষ্ণ গেছেন ভুলে,
আনন্দে আছেন এখানে॥

ফুঁকা।—আমরা কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি,
ভজেছিলেম বনমালী, তাইতে বলি।
তোমার বাক্যেতে এলেম যন্ত্রেতে,
বহু দিনের পরেতে হায়।
একি গোপীর কপাল মন্দ,
পেলেম না আর শ্রীগোবিন্দ,
হলেম এখন নিরানন্দ, গোপীগণেতে॥
৩ মেলতা—আর তো আমাদের সুখের কপাল হবে না,
শ্যামকে পাব না,
করিছেন তিনি দ্বারকাতে নূতন লীলে॥[১]

দর্পনারায়ণ কবিরাজ

ভবানী-বন্দনা

চিতান।—ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী।
পরচিতান।—কাতর কিঙ্করে হের হরমনোমোহিনী।
ফুকা।—কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী অয়ি,
গিরিজা গণেশজননী (মা গো)।
মেল্‌তা।—ত্বংহি শক্তি, ত্বংহি মুক্তি, কলুষনাশিনী।
মহড়া।—শিবসীমন্তিনী,
শিবাকার মঞ্চোপরে,
মহাকাল সমভিব্যাহারে,
আনন্দে বিহারিণী।
খাদ।—অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী।
২ ফুকা।—অকূল ভবসংসারে,
তার তারা কৃপা করে,

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

গতি নাহি তোমা বিনা আর (মা গো)
২ মেল্‌তা ।—পদতরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী ।[১]

॥ ২ ॥

বিরহ

১ চিতান ।—বল্‌লে যে কথা গো আমারে,
কৃষ্ণ এর্ দিবেন উত্তর ।
১ পরচিতান ।—আমি কিঞ্চিৎ বলি তোমায় বৃন্দে,
শুন অতঃপর ॥
১ ফুকা ।—বল কে পারে বল্‌তে কৃষ্ণ কখন কার ?
শুনি কখন ক্ষীরোদশায়ী,
কখন শুন্‌তে পাই,
বাঁধা শ্যাম ব্রজগোপীকার ।
১ মেল্‌তা ।—কারে সদয় শ্যাম কখন হন,
কারে নিদয় কখন নারায়ণ—
কৃষ্ণের অনন্ত ভাব বৃন্দে বোঝা দায় ।
মহড়া ।—সখী, সমভাবে লোকের চিরদিন নাহি যায়
সুখ হইলে অতিশয়, দুঃখ তার পরেই হয়,
এখন কি হবে কাঁদিলে আসি মথুরায় ।
খাদ ।—বুঝিলাম এই শ্যাম ধরেছিলেন রাধার পায় ॥
২ ফুকা ।—এখন সে রাধার দশম দশা ঘটেছে ;
ভাগ্যে একাদশ শশধর,
অতিশয় শুভকর,
কুবুজায় সুফল দিয়েছে ।
২ মেল্‌তা ।—করলে মাধবকে অনুযোগ,
নাহি যাবে রাধার দুখের ভোগ,
পাবে প্রভাসে শ্যামের দেখা পুনরায় ।[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ
২ প্রাঃ কঃ সঃ

রামসুন্দর রায়

সখীসংবাদ

১ চিতান ।—সখি, আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে
জ্বালাস্‌নে প্রাণ গো আমার ।

১ পরচিতান ।—কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর ।

১ ফুকা ।—কুল শীল লাজ পরিহরি,
যার বাঁশী শুনে দাসী হলাম চরণে,
কর্‌লে সেই হরি চাতুরী ।

১ মেল্‌তা ।—আর কাল রূপ হেরব্‌ না,
হেরিতে বল না,
কালার প্রেমে কাল আমার হইল ।

মহড়া ।—কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,
সেই খানে যাইতে বল ।
যদি আমারি হতেন শ্যাম,
হতেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম লয়ে চিকণ কাল ।

খাদ ।—মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল ।

২ ফুকা ।—সখি, জাগ্‌লেম নিশি যার আশাতে,
সেই প্রতিকূল যদি আমায় হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে ।

২ মেল্‌তা ।—কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক,
আমারই প্রাণে শোক,
কৃষ্ণবিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল ।[১]

[১]:, প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ২ ॥

বিরহ

১ চিতান ।—একা রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর ।
১ পরচিতান ।—তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর
১ ফুকা—সে বিনা এ যৌবনরতন
বল রক্ষক কে করিবে রক্ষণ ?
১ মেল্‌তা ।—কাহার শরণ লই, বিনা প্রাণকান্তে ?
মহড়া ।—ধিক্ সে প্রাণকান্তে এল না বসন্তে ;
খাদ ।—রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ।
২ ফুকা ।—সে যে গেছে সখী দূরদেশ,
আছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ;
২ মেল্‌তা ।—পতি হয়ে সঁপে গেল মদন দুরন্তে ।
অন্তরা ।—প্রিয় জনে ত্যজে প্রিয়জন আছে কেমনে—
হোল না কি তার দয়া রমণী-রতনে ?
২ চিতান ।—কন্যাকালের কথা মনে হলে বাড়ে শোক ;
২ পরচিতান ।—আমার জনক
তারে দিলেন দান দেখিয়া সুলোক ।
৩ ফুকা ।—করে করে করে সমর্পণ,
তারে বল্‌লেন সুখে করো হে পালন ।
৩ মেল্‌তা ।—কথা না হল পালন, সঁপিলেন মদনকৃতান্তে ।

॥ ৩ ॥

দৈবকীর খেদ

মহড়া ।—প্রাণের কৃষ্ণ রে যদি এলি বাপ,
এ দুঃখিনীর আয় কোলে ।
আমি যে হ'তে গোপাল তোরে গর্ভে ধরেছি,
সেই হতে রে কংসের কারাগারে ।
এক বেড়ী দুজনার পায়
মরি রে বন্ধন জালায়,
একবার এ সময় চাঁদমুখে ডাক মা বলে ॥

খাদ।—আমি তোর মা হয়ে এই দশা ছিল কপালে ॥

ফুঁকা।—দারুণ কংসের ভয়ে গোপাল তোরে।

লুকায়ে যমুনা পারে রাখলেম গোকুলে,

গোপের গোপকুলে রে ও ও রে।

করি নাই তোর লালন-পালন,

জানিনে রে মায়া কেমন,

হয়ে যশোদার নীলরতন,

তার সাধ পূরালে ॥

মেলতা।—গোপাল তেম্নি সাধ আজ আমার পুরাও এসময়,

দারুণ কংসের ভয়,

তুই রে দয়াময় বলে তোকে সকলে ॥

১ চিতেন।—রয়েছে মাতা-পিতে বন্ধন দশায় ॥

পাড়ন।—সে দায় ঘুচাতে, ধর্ম্ম যজ্ঞ ভঙ্গেতে,

হরি কংসারি গেলেন কংসালয় ॥

ফুঁকা।—যেমন দরিদ্র পায় অমূল্য ধন,

তার অধিক ধন প্রাণ-কৃষ্ণধন, দেবকি যে পায়।

বলে স্নেহের দায় গো ও ও গো।

অন্ধ যেমন সিন্ধু বিনে, পুত্রশোকে মরে প্রাণে,

তোমা বিনে নিশি-দিনে আছি মৃত প্রায় ॥

মেলতা।—দেখ রে তোর মায়ের এ দশা,

করেছে যে দশা, অতি দুর্দ্দশা,

গোপাল এই দশা করলে আমার শেষকালে ॥

অন্তরা।—আমার দশা দেখ নীলমণি,

ও রতন-মণি,

আমি দেবকী তোর মা দুঃখিনী।

গর্ভে বাস দিয়ে তোরে,

সদা কাঁদি কংস রাজার কারাগারে,

গোপাল রে গোপাল রে,

তাই রে নন্দালয়ে, ভুলেছিস্ আমায়,

মা পেয়ে নন্দরাণী ॥

২ চিতেন।—কত দিন এ কষ্ট আর রবে আমার ॥
পাড়ন।—এ বিপদ হতে,
কদ্দিনে তোর মাতা-পিতে
কারাগার হতে করবি রে উদ্ধার ॥
ফুঁকা।—গোপাল যে জন তোকে গর্ভে ধরে,
কেও সুখী নয় ত্রিসংসারে,
কথা মিথ্যে নয়, বলি পরিচয় রে ও ও রে।
ত্রেতাযুগে রামরূপ ধরে, বনবাসে গমন করে,
কাঁদিয়েছিলি কৌশল্যারে, তুই রে নিরদয় ॥
মেলতা।—আবার বুঝে দেখ নীলমণি,
ব্রজের নন্দরাণী তোমার জননী।
গোপাল এখন তায় কাঁদিয়ে এলি গোকুলে ॥[১]

গৌরীদাস

বিরহ

মহড়া।—কার দোষ দিব কপালের দোষ আমার।
যেমন প্রাণনাথ, প্রাণে দেয় আঘাত,
তেম্নি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার ॥
১ চিতেন।—সময়েরি সখি রে, করে হীন জনে অপমান।
কোথা গে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান ॥
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহি হয় ॥
তাহে কাল গুণে কাল বসন্ত উদয়।
এসে সপ্তরথী মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার ॥

১ প্রাঃ কঃ সঃ

অন্তরা।—সই, আমি যার, সে আমার ভেবে,
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন,
সে আমার কাল হলো॥
তবে মরণ ভালো॥

২ চিতেন।—প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন,
গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন কে আছে আমার॥
হ'য়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল।
আছি পথ চেয়ে রথ হয়েছে অচল॥
ভয়ে সারথী পলালো, শেষে এই হলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার॥[১]

লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী

॥ ১ ॥

প্রভাস

মহড়া।—কোথা নীলমণি রে একবার দেখা দে বাপ ধন,
আমার আয় কোলে।
এলেম তোর আশায় প্রভাস তীর্থে,
দুরন্ত দ্বারীর হাতে, প্রাণ যায় রে।
কাঙ্গাল বলে প্রহার করে, এ সময় নীলমণি রে,
দেখ এসে বহির্দ্বারে।
একবার মা বলে প্রাণ বাঁচাও রে, প্রভাসকূলে॥

খাদ।—আমি তোর জননী, পুত্র তুই নীলমণি,
জানুক সকলে॥

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

ফুঁকা।—আমি তোমার শোকে নীলমণি,
হয়েছি কাঙ্গালিনী, যেন পাগলিনীর প্রায়।
তোর আশায় বেঁচে আছি নন্দালয়ে।
কেঁদে দুটি নয়ন গেছে, শোকে তনু ক্ষীণ হয়েছে,
কেবল মাত্র প্রাণ রয়েছে, তাও বুঝি আজ যায়॥

মেলতা।—একবার অক্রূর মুনি তোরে, আন্‌লে হরণ করে,
ওরে নীলমণি রে, আবার দশা নারদ মুনি ঘটালে॥

১ চিতেন।—শ্রীকৃষ্ণ করবেন যজ্ঞ প্রভাসকূলে।

পাড়ন।—যজ্ঞের পত্র পেয়ে, পুলক-চিত্ত হয়ে,
অগ্নি বেগে ধেয়ে চল্লেন সকলে॥

ফুঁকা।—শুনে মুনির মুখে সুসংবাদ, পুরাইতে মনের সাধ।
যশোদা প্রভাসে যায়, স্নেহের দায়,
বৎস-হারা গাভীর প্রায়।
অশ্রুবারি পূর্ণ চক্ষে, রোদন করে কৃষ্ণ শোকে,
ধারা বহে মনোদুঃখে, বক্ষ ভেসে যায়॥

মেলতা।—করে দ্বারে বাৎসল্য ভাব,
শুনে তাই দ্বারী সব, প্রহার করে,
বলে কেশব রে এই কল্লি বাপ শেষকালে॥

অন্তরা।—তোর মা হয়ে এই দশা হলো কপালে।
মার খেয়ে প্রাণ গেল আমার এসে তোমার প্রভাসকূলে।
তুই রইলি বাপ যজ্ঞস্থলে,
আমি দ্বারে কাঁদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,
ভাসি দুটি চক্ষের জলে, এসে প্রভাসে আমায় কাঁদালে।
গোপাল তুই রে সুসন্তান, কল্লি অপমান,
এ অপমান আর যাবে না মলে॥

২ চিতেন।—পূর্ব্বেতে জান্‌লে এমন আর আস্‌তেম না।

পাড়ন।—তোমার সংবাদ পেয়ে, এলেম আকুল হয়ে।

ফুঁকা।—গোকুলবাসী লয়ে পেলেম যন্ত্রনা॥
একে প্রাণে ছিল পুত্রশোক, তার উপরে বিষম শোক,
হলো মৃত্যুশোকের প্রায়, প্রাণ যায়, ঘটলো এসে এ কি দায়

লোকের মুখে এ কি শুনি, তোর হলো দৈবকিনী,
তবে কেন রতনমণি, কাঁদালি আমায় ॥
মেলতা।—আমি যে তোর মা নই শুনে কি প্রাণ রয়।
ওরে গোপাল রে,
এখন কি বলে ফিরে যাব গোকুলে ॥[১]

রামকানাই ঠাকুর

বাসরসজ্জা

শ্যাম আসার আশা পেয়ে
সখীগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী।
যেমন চাতকী পিপাসায় তৃষিত জলাশায়
কুঞ্জ সাজায় কমলিনী ॥
তুলে জাতী যূথী কোটরাজ
বেলা গন্ধরাজ।
আর কৃষ্ণকলি নবকলি অর্দ্ধ বিকশিত
যাতে বনমালী হরষিত।
সাজায়ে রাই ফুলের আসর
আসবে বলে রসিক নাগর
আশাতে হয় যামিনী ভোর
হিতে হ'ল বিপরীত।
ফিরে যাও হে নাগর
প্যারী বিচ্ছেদে হ'য়ে কাতর
আছে ঘুমাইয়ে।

১ ওঃ কঃ গাঃ

প্যারী ভাগে প্রেম করবে না,
রাগে প্রাণ রাখবে না,
ঐ দুখেতে মরতে চায়
যমুনাতে প্রবেশিয়ে ॥[১]

মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

মাথুর

জানি চিন্তামণি চোরের শিরোমণি
জানি যতগুণ গুণমণি।
বৃন্দাবনে করলে রাধিকার মনচুরি।
বসন আর ভূষণ চুরি,
গোপিকার মন চুরি,
গোপিকার ননীচুরি,
গোকুলে নাম চোরা হরি ॥
তার স্বভাব আছে দেখা
দু'দিন হ'লে অদেখা,
আজ ত নয় নূতন দেখা
তোমার সনে।
চোরের দেশ
চোরের চোরের শেষ
এই মধু ভুবনে।
কেবল একা তুমি নও চোর,
চোরের আছে মনচোর

১ কবিগান—বান্ধব, ১২৮২—পৌষ

কুষ্মাণ্ড এথায়
চোরের শোভা তায়।
চোর-রাজ্যে নৃপমণি,
রাণীটি চোর হয় তেমনি,
মুনিতে চোর অক্রূরমুনি,
চোরের বাসা মথুরায়।
চোরে চোরে হয় মিলন,
সুখে বঁধু আছত এখন!
এখন সুখ হয় নাই সখা কোন স্থানে ॥[১]

রাসমোহন দাস

॥ ১ ॥

বংশী সাধন

চিতেন।—মথুরায় কংস বধে রাজত্ব করলেন কৃষ্ণধন।
চূড়াবাঁশী কালশশী নন্দের করেতে করলেন তাই অর্পণ ॥
দেখে কৃষ্ণধনে মথুরায়
শ্রীনন্দ হলেন বিদায়,
দুঃখে জীবন ফেটে যায় মরি হায়!
নন্দ এলেন নন্দালয়ে
পেয়ে রাধে সেই বাঁশরী
দুনয়নে বহে বারি
মোহন বাঁশী অঙ্কে ধরি
কেঁদে মূর্চ্ছা যায় ॥
ক্ষণেক চেতন পেয়ে
মনে ব্যাকুল হয়ে
অমনি বাঁশীকে শুধায় রাধে সুকৌশলে ॥

---

[১] বান্ধব, ১২৮২ পৌষ, কবিগান—আনন্দচন্দ্র মিত্র

মুখ।—ওরে মোহন বাঁশী
তোরে রাধার নাম কেবা শিখালে ?
তারকব্রহ্ম সেই কৃষ্ণ নাম রৈলি ভুলে ?
সর্ব্বদা বাজে বাঁশী 'রাধা' বলে।
যে নামে যোগে ঋষি
যোগে রয় দিবানিশি
একবার বাজরে বাজ মোহন বাঁশী কৃষ্ণ বলে
খোঁজ।—আমি অবোধ নারী
কেন বা আমায় কাঁদালে।
বাঁশী, কালশশী মথুরায়
রাজা হয়েছেন তথায়
শ্রবণে শুনছি তাই শ্রবণে।
থাকতে যখন শ্যামের করে
বাজতে বাঁশী উচ্চৈঃস্বরে
রাধা বলে বিনয় করে
মত্ত হ'তে সেই গানে।
এখন কৃষ্ণ বলে
বাজ সপ্ত স্বরে
ডাক কৃষ্ণ বলে।
আমি প্রাণ জুড়াই শ্রবণ করে
যাস না ভুলে॥

সখীসংবাদ

সখীর সঙ্গে পরমরঙ্গে যমুনাতে যায়
এমন সময় রাধা বলে
শ্যাম বাঁশরী বাজায়॥
শ্রীরাধের বাঁশীর গান শুনে
ধারা বহে দু'নয়নে।

খসে পড়ে নীলাম্বরী
হয়েছে তাই দিগম্বরী
মন ভ্রান্তে যায় কিশোরী
শ্যাম অন্বেষণে ॥

মুখ।—কার বাঁশরী রাই কিশোরী শুণে শ্রবণে
কুললজ্জা ত্যজ্য করে
চললি ওগো রাই।
বনপোড়া হরিণের মত
তোমায় দেখতে পাই ॥
কার প্রেমেতে প্রেম অধরা
প্রেম ধারা বহে দু'নয়নে

খোঁজ।—ঘরে ও কাল ননদিনী
তা কি জানিস নি।

২য় ফুকর।—ওগো রাই, চৈতন্য জ্ঞান নাই
অনুভাবে বুঝলাম তাই
শুনে একটা বাঁশের বাঁশী
অঙ্গের ভূষণ পড়ল খসি
কার ভাবেতে মন উদাসী
আহা মরে যাই !
রাজার মেয়ে তুই লো ধনি
আর কুলনারী কুল দিয়ে জলাঞ্জলি
অমন কর্ম্ম করিস নে ॥

অন্তরা।—কোন রাখাল বাজায় বাঁশী
শুনে ধেয়ে চললি বনে রাই কিশোরি।
যমুনাতে আনতে জীবন
মনে হ'ল নীরদবরণ
কেন উচাটন
একে কলঙ্কিনী রাই
লোকে বলে তাই
লজ্জা কি নাই ওগো রাজকুমারি ॥

পরচিতান।—শুনে বাঁশী রাই কিশোরি যাবি বনেতে আর
কাল ননদী সদাই বাদী কৃষ্ণপ্রেমেতে
ওগো রাই নাই তোর মনে
বুঝে কি তা দেখলি নে
একদিন সেই নিধুবনে
গিয়াছিলি সেই কালার সনে
প্রমাদ ঘটায় কালকুটিলে
কুটিল মনে আয়ান দেখে
ধেয়ে এল সেই যে কুটিলে
সেদিন কেবল বেঁচেছিলে
কালী মায়ের চরণ গুণে॥

॥ ৩ ॥

অভিমন্যুর খেদ

(মহাভারত পালা)

চিতান।—ব্যূহ চক্রেতে অভিমন্যু রণে পড়ে
বিপক্ষের বাণে প্রাণ যায়।
নাই উপায়, হায়, কেঁদে তায় কয় উচ্চৈঃস্বরে॥
হ'য়ে অস্ত্রশূন্য রণস্থলে
অভিমন্যু তখন কেঁদে বলে
পিতা ধনঞ্জয় তুমি রহিলে কোথায়।
কোথায় সুভদ্রা মাতা
বন্ধু-বান্ধব আমার রহিলে কোথায়॥
প্রাণপ্রিয়ে উত্তরা কোথায়
আমি জন্মের মত হই বিদায়।
মাতুল গোবিন্দ রইলে কোথায় বিপদকালে।
তোমার নামে হয় শমন দমন শুনি বেদে বলে॥
মুখ।—ত্রাণ কর হে কৃপাসিন্ধু,
হরি হে দীনবন্ধু,
দেখা দাও হে নিদানকালে।

আমায় ঘিরেছে বিপক্ষদল এসে সপ্তরথী,
আমার দেহরথে এসে কৃষ্ণ হও সারথি।
সাধ্য নাই যুদ্ধ করি, কই হে কই বংশীধারী,
আমার এ দেহ পরিহরি হরি, হরি বলে॥

খোঁজ।—হবে অকালমরণ এই ছিল কপালে।

পরফুকর।—যেমন রাবণ রাজার মৃত্যুকালে,
দশ দিকে রাম এসে দেখা দিলে।
রণস্থলেতে আমার মরণ কালেতে
তাই বলি হে কমলাক্ষি
ত্রিভঙ্গরূপ একবার দেখাও দেখি!
জীবনমাত্র আছে বাকি,
আমি পড়েছি কালের হাতে!
আমায় এ বিপদে রক্ষা কর হে মধুসূদন।
আমায় অসময়ে ল'য়ে যেতে চায় ঐ কালাকালে।

অন্তরা।—আমার প্রাণ যায়
ঐ রূপ দেখতে চায় এই দুই আঁখি।
দাঁড়াও ব্রজের সাজে রণমাঝে
ত্রিভঙ্গরূপ দেখি॥
পড়েছি বিপক্ষের হাতে,
রক্ষা নাই আর কোনমতে,
এ বিপদ হ'তে
কাল পেয়ে ধরে কালেতে,
ঐ ভয়েতে ডাকি॥

॥ ৪ ॥

প্রভাবতীর খেদ

(মহাভারত পালা)

চিতান।—আমি হংসধ্বজের পুত্রবধূ হই নাম প্রভাবতী।

পড়তা।—শুনেছি পতিতপাবন গোলকবিহারী
তুমি হও অগতির গতি॥

১ ফুকর।—নামের গুণেতে শিলা ভাসে সিন্ধুজলেতে (মরি হায় রে)!

দয়াময় নামটি ধর, যা কর করতে পার,

তুমি জগতের মন হরণ কর শুনি বেদেতে।

আমি রাজকুলেতে কুলবধূ ওহে ভগবান,

বল আচম্বিতে কি জন্যেতে

আমার বক্ষেতে শেল বিঁধেছে।

মুখ।—বল তাই এখন মধুসূদন

বিবরণ কও আমার কাছে।

পেঁজ।—আর তুমি হরি জগতের পতি,

সেই সুধন্বা হয় আমার পতি,

আমি হই সাধ্বী যুবতী,

তোমার ঐ শ্রীপদে ওহে শ্রীকৃষ্ণ করি মিনতি

কার কাটা মুণ্ড ধূলায় পড়ে

কৃষ্ণ বলে কাঁদিতেছে॥

খোঁজ।—চাঁদমুখেতে শুনতে তাই বাঞ্ছা হ'য়েছে।

২ ফুকর।—প্রাণপতি যখন তোমার সনে করতে এলেন রণ (মরি হায় রে)!

আমাকে এলেন বলে, আমি যাই রণস্থলে,

আছে রামনাম আমার হৃৎকমলে,

হব না নিধন॥

শুনি বেদপুরাণে হরিভক্তে প্রাণে মরে না।

আমি শুন্‌তে পেলাম তোমার ভক্ত তোমার বাণে মরেছে।

অন্তরা।—সে যে তোমার ভক্ত ছিল,

কি জন্য রণস্থলে প্রাণে মারা গেল।

শুনি ত্রেতাযুগে তরণীসেন লঙ্কাপুরে ছিল॥

রণেতে ভক্ত মারা অভ্যাস তোমার ভাল।

পরচিতান।—আমি পতি শোকে হই অনাথিনী ওহে ভগবান।

পরপড়তা।—শুনেছি সতী নারীর পতি মরে না

সেই জন্য কাঁদছে আমার প্রাণ॥

পরফুকর।—আমার কথা লও

একবার তুমি যমের বাড়ী যাও (মরি হায় রে)!

গুরুপুত্র বাঁচালে আপনার বাহু বলে
তুমি তেমনি আজ আমারে পতি এনে দাও,
বল সতী নারীর পতি বিনে অন্য কি আছে।
তোমার অকলঙ্ক নামে আজি কলঙ্ক রটেছে ॥

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ লীলা

(শ্রীদামের উক্তি)

চিতান।—প্রভাতে গোচরণে উপনীত হলেন কৃষ্ণধন।
পড়তা।—রাখাল সঙ্গে পরমরঙ্গে মনের হর্ষেতে
করলেন বনভ্রমণ ॥
১ ফুকর।—এমন কালে কৃষ্ণ বলে এল কয়েকজন
কেউ বা বৃষভে করলে গমন দিলেন দরশন,
কেউ বা হংস পরে বিরাজ করেন
কেউ বা এসেছেন এই হস্তী পরে
কেউ বা এসেছেন মূষিক পরে
কেউ বা কাক বাহনে করলেন আগমন ॥
করি এরূপ নিরীক্ষণ তখন
শ্রীদাম সখা অমনি গৃহেতে গিয়ে বললেন
নন্দরাণীর কাছে।
মুখ।—ও মা নন্দরাণী, তোমার নীলমণি এমন মণি
আর কি আছে ॥
পড়তা।—আমরা গোষ্ঠেতে গিয়ে যত সব রাখালে
খেলি নূতন খেলা গিয়ে সেই যমুনার কূলে
গোপাল তোর নয় সামান্য
রাখালের অগ্রগণ্য

এসে পঞ্চানন গোপালের পায়
নীলোৎপল দিতেছে।
খোঁজ।—কত আনন্দ সেই গোষ্ঠে হয়েছে॥
২ ফুকর।—যত রাখালগণে ঘোর কাননে নীলমণি
কেউ বা দিতেছে হরিধ্বনি লয়ে নীলমণি
এলো দশভুজা এক রমণী
রূপেতে যেমন সৌদামিনী॥
কোলে ল'য়ে গুণমণি
অম্নি খাওয়ায় ক্ষীরনবনী
অম্নি গোপালের পানে চেয়ে বলে
এ ধনকে ধন্য মানি যে গর্ভে ধরেছে॥
অন্তরা।—গোষ্ঠে কি শোভা হয়েছে!
দেখে শুনে জ্ঞান হয় যেন
মোক্ষধাম রয়েছে।
মূষিক বাহনেতে একজন করে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
গজমুণ্ড তার,
ময়ূর-বাহন এক ব্যাটা করতাল দিতেছে॥

হরিহর সরকার

॥ ১ ॥

মাথুর (বসন্ত)

(বৃন্দার উক্তি)

চিতান।—মধুর বসন্তে বৃন্দে গিয়ে কৃষ্ণের সভায়
পড়্তা।—ধারা বহে দু'চক্ষে
অতি মনোদুঃখে
বিনয়বাক্যে কৃষ্ণে কয়॥

১ ফুকর।—বঁধু, সরোবরে শোভা যেমন বিকশিত কমলে হয়!
শোভা হয় কি না হয় হায় হায় হায় রে!
দিবাভাগে সূর্য্যের প্রভা!
নিশিতে হয় চাঁদের শোভা!
তেম্নি শোভা ব্রজের শোভা!
ছিলে বাঁকা শ্যামরায়।
এখন সে শোভা নাই,
আভা নাই হে, এখন সে শোভা নাই!
কেবল গোপীগণ কেঁদে বেড়ায় প্রেম অভাবে।
মুখ।—কৃষ্ণ হে বসন্তকালে
যুগল মিলন দেখবো বলে
এলাম গোপীসবে॥
পেঁজ।—মাধব এসেছি তোমায় নিতে এ মাধবে।
এখন মধুর ভাবে রবে কি ব্রজে যাবে॥
মথুরায় কুব্জা দাসী, গোকুলে রাই রূপসী
মধুর বসন্তে কোন প্রেয়সী প্রাণ জুড়াবে॥
২ ফুকর।—পেলে ভক্তিভাবে কুব্জা তোমায় মধুরভাবে পেলে রাই
হে ত্রিভঙ্গ কানাই
হায় হায় গো ধড়াচূড়া ব্রজের ভূষণ
মধুপুরে রাজসিংহাসন
কোন বেশেতে রবে এখন বল তাই!
উভয় কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনা গো
উভয় কৃষ্ণপ্রাণা
কেবল হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বলে কাঁদে সবে।
অন্তরা।—ব্রজের ধন বিনোদবিহারী
তোমা বিনে প্রাণে মরে সেই রাধে রাজকুমারী
মথুরায় পড়েছ ফাঁদে
ধরা দিয়ে কুব্জা চাঁদে
চাঁদে চাঁদ মিলন কমলিনীর
বিচ্ছেদ, গ্রহণ তার উপায় কি করি॥

গোবিন্দচন্দ্র তন্ত্রধর

॥ ১ ॥

প্রভাতী

চিতান।—শ্যাম আসার আশা পেয়ে গিয়ে রাই কুঞ্জকাননে।

পড়তা।—সখী সকলে বনফুল তুলে মালা গাঁথিলেন অতি সযতনে

১ম ফুকর।—আনন্দে জয় গোবিন্দ বলে যত সখীগণ।

করে বাসর সজ্জার আয়োজন

তুলিয়া পদ্ম রাধাপদ্ম

পূজব বলে শ্যাম নীলপদ্ম

চেষ্টা করে যথাসাধ্য,

যদি পদ্মে পদ্মে হয় মিলন॥

বিনে শ্যামশশী সুখের নিশি প্রভাত হ'ল।

কত কাঁদব আর প্রেমের কান্না রান্নার সময় হ'ল॥

মুখ।—আমায় ধর গো ধর বিনে জলধর জীবন

জীবন আমার জলে গেলো॥

পেঁজ।—সেই শ্যামের আশাতে কুঞ্জবনে

কুল মান সকল গেলো

কালার বাঁশীর গানে।

আমারে দিয়ে ফাঁকি

লুকালেন কমল আঁখি

আর কেন কুঞ্জে থাকি গৃহে চল, চল॥

খোঁজ।—কৃষ্ণ পিরীতের কষ্ট এ অদৃষ্টে ছিল!

২য় ফুকর।—প্রাণ সই আমার প্রাণবঁধু কুঞ্জে এল কৈ?

মিছে কুল দিয়ে কলঙ্কী হই!

ভালবাসার আশা গেছে

পিপাসার শাস্তি হ'য়েছে

আর কি শ্যামের আশা আছে

বসে কেন বা এ কুঞ্জে রই

ও সে যে দুঃখ দিল আমার
তাপিত প্রাণে নিশি জাগরণে আবার
ও সে যে দুঃখ দিল আমার
তাপিত প্রাণে সাজিয়ে সুখের বাসর
আমার বিফল হ'ল ॥

অন্তরা।—সখির আর কি শ্যামের আশা আছে,
কালোর কালো স্বভাব গেছে,
সে ভাব স্বভাবে জানা গিয়াছে।
তোলা ফুল সব হ'ল বাসি
চল যাই ভাসিয়া আসি
যমুনার জলে ত্বরায় চল গৃহে যাই।
বিলম্বে কাজ নাই
ননদীর বুঝি ঘুম ভেঙেছে ॥

মনোহর মণ্ডল

॥ ২ ॥

ধরণ গান

চিতান।—হরি বল তরী খোল আমার মন ব্যাপারী
দেখ তরী চলে কি না চলে ॥
এই যে হরি নামের তরী শ্রীগুরু কাণ্ডারী
চলবে তরী হরি নামের বলে ॥
মাতৃরজে পিতৃবীজে গুরু দিলেন তরী সেজে
বোঝাই আছে তরীর মাঝে
পঞ্চতত্ত্ব মালে
এই গুরুদত্ত মাল
তাই রাখি সামাল
ডুবাসনে যেন মাল ঘোলা জলে ॥

এই যে নৌকার দাঁড়ি, মাঝি
মল্লা ছ'জন বড়ই পাজি
আপনা হ'তে হবে রাজি
সাধু সঙ্গ হ'লে।
তাই তারক ভেবে কয়
ইহাই যদি হয়
গুরু পদ ভাব হৃৎকমলে

অন্তরা।—কলিতে অন্য গতি নাই
গতি নাই নাই নাই।
এলেন জীব তরাতে নদীয়াতে
গৌর আর নিতাই॥
হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন মহাযজ্ঞ
প্রেমামৃত যজ্ঞের অর্ঘ্য
উক্তবর্গ প্যান করে সবাই।
দিয়ে নাম যজ্ঞে প্রাণাহুতি পারে চল যাই॥
সত্যযুগে মানবের লীলা।
বর্ত্তমান মানুষের খেলা॥
কেউ পাগল কেউ বৃক্ষতলায় ঠাঁই।
ভেবে মনোহর কয় স্বরূপেতে রূপদর্শন পাই॥

দুর্লভচন্দ্র মাল

॥ ১ ॥

রাম অভিষেক

চিতান।—পিতার সত্য পালিতে শ্রীরামের অরণ্যে গমন।

পড়তা।—ভরত সংবাদ পেয়ে
অমি চল্লেন ধেয়ে
অযোধ্যায় দিলেন দরশন॥

১ম ফুকর।—ভরত কেঁদে বলে সুখের কালে সুখের চিহ্ন কই!
রাজসভাতে বা সে শোভা কই?
কই মা কৌশল্যা কই, সুমিত্রা কই?
রাজেন্দ্রীয় আমার পিতা কই?
জগৎ-লক্ষ্মী জানকী কই?
আমার প্রাণের ভাই রাম-লক্ষ্মণ কই?
তখন অযোধ্যায় মুগ্ধ হয়ে পড়লেন ঢলে
তখন কৌশল্যা কেঁদে বলে অতি বিনয় বাক্যে—
মুখ।—দুঃখ কার কাছে কই ভরত তোর মা কৈকেয়ী,
এই দশা করলে আমাকে॥
পেজ।—ঐ দেখ যে হতে রামধন আমায় ছেড়ে গেছে,
ঐ দেখ সোনার পুরী দিনে অন্ধকার হয়েছে।
হয়েছি রামকে হারা
চক্ষে বহে শতধারা
হল তোর পিতা বাসি মড়া
পুত্র শোকে॥
খোজ।—আমার শ্রীরাম বিনে অযোধ্যায় রব কি সুখে।
২য় ফুকর।—রামকে রাজা করব অযোধ্যায় ছিল অভিলাষ,
তাইতে করেছিলাম অধিবাস।
তোর মা কৈকেয়ী ও সে শত্রু হয়ে
সোনার অঙ্গে বাকল পরায়ে
রাজ আভরণ কেড়ে লয়ে
আমার রামকে দিল বনবাস।
আমি কি করি
ভেবে মরি
কিছু না বুঝিতে পারি
দিতে প্রাণ বিসর্জন ইচ্ছা করি
বাধা দেয় কে॥
অন্তরা।—আমার রামনিধি নাই কোলে।
কে আর ডাকবে আর মা, মা বোলে॥

রাম বিহনে মরি প্রাণে
এ দুঃখ কি অন্যে জানে !
পুত্রধন বিনে,
হয়ে রামকে হারা শোকাতুরা ভাসি চক্ষের জলে

বিরিঞ্চি মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ

চিতান ।—প্রভাতে গোষ্ঠের সাজ সেজে
সব এল রাখালগণ ।
পড়তা ।—নিতে জলধর এলেন হলধর
শিঙার স্বর সুস্বর নাই
অবসর দেয় ঘনে ঘনে ।
১ ফুকর ।—বলরাম এলেন গোষ্ঠে নিতে গুণধাম ।
এল শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, মধুমঙ্গল
সেজে এল রাখাল সকল,
ধেনুবৎস হ'য়ে পাগল
ডাকে হাম্বা রবে অবিরাম ॥
তারা তো-বিনে তৃণ-পানি খায় না কখন ;
যত গাভীগণ রে
আপনি ফিরে আসে তোমার বংশী শুনে ।
মুখ ।—গুণের ভাই রে কানাই,
চল গোষ্ঠে যাই
বেলা হয়েছে রে দেখ নয়নে ॥
পেন্জ ।—আমরা নিতি আসিব
নিতি তবে যাবি

এমন নিকড়[১] চাকর আর কোথায় পাবি
কাল বনে গিয়েছিলে
নূতন খেলা খেলিলে
খেলাতে ঠকেছিলে নাই রে মনে ॥

২ ফুকর।—ও কানাই এল বর্হিদ্বারে যত বৎস-গাই
ডেকে রাখালগণে বলে তাই।
এসেছি সেই প্রভাতকালে
ঐ ডাকি কানাই-বলাই বলে
তুই রৈলি তোর মায়ের কোলে
বুঝি আমাদের আর মাতা নাই ॥
ও ভাই তো-বিনে আমরা গোঠে যাই কেমনে!
যত রাখালগণ বলে, ও ভাই তো-বিনে
আমরা গোঠে যাই কেমনে!
ও ভাই, তোর ধেনু তোর বিহনে
মোদের বাক্ না শুনে ॥

অন্তরা।—ও ভাই, আজ কেন তোর এ ভাব হ'ল
কেন করছ দেরী বংশীধারী
ত্বরা করি গোষ্ঠে চল।
তোরে লয়ে সঙ্গে যাব
স্কন্ধে করে দোলাব পদ
বক্ষে পরে তুলিবে ভাল ॥
মোরা ঠেকিছি কি দায়
ওরে নিরদয়
এত কি দায় মোদের হ'ল ॥

[১] বিনা পয়সার চাকুরে

কালিচরণ দাস

গোষ্ঠ

(শ্রীদাম উক্তি)

চিতেন।—নিশি অবসানে রাখালগণে
সুখ মনে গোচারণে যায়।
পড়তা।—বলে আয় রে কানু বাইজে বেনু ভাই রে
নইলে তোর ধেনু রাখা দায়।
১ ফুকর।—এলো শ্রীদাম সুদাম, দাম, বসুদাম
বলে শ্যাম আয় রে গোষ্ঠে যাই।
রাখাল প্রাণ ত্রিভঙ্গ কানাই॥
চেয়ে দেখ উঠল ভানু,
নফর কেউ নাই রে কানু,
নিত্য তোর এত ধেনু
কে রাখবে ভাই।
হরি করেতে পাচনী লয়ে
দৌড়াদৌড়ি যায়॥
স্নেহের শ্রীদাম ধরি কোলে করে
ডেকে কয়ে চেয়ে শ্যামের মুখপানে,
মুখ।—দেখি অধরে দশন চিহ্ন
কি জন্য কৃষ্ণধন বল আমার স্থানে?
পেঁজ।—আছে বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন
আর কমলে কলুষচিহ্ন
ধেনুপদ অষ্টাপদ আর ও ত্রিকোণ
আর আজানুলম্বিত ভুজা
কলান্ত চতুষ্কোণ ঊনবিংশতি হয় নিরূপণ
এ নূতন চিহ্ন দিল কোন জনে॥
২ ফুকর।—যেমন নিশিভোরে উজাগারে
দুচক্ষু হয়েছে তোর লাল।

সন্দ তাই হয় রে নন্দলাল,
ছারপোকার অত্যাচারে
কিংবা মশার কামড়ে
জাগলি তুই নিশি ভোরে
প্রাণের ভাই গোপাল।
ও তুই এক ঘরে এক ছেলে
মায়ের আহ্লাদে রতন!
বুঝি মা তোর করে না যতন,
যাতনা সহে না আমার প্রাণে॥
অন্তরা।—কানাই, কি স্বপ্ন দেখিছিলি
তুই কি না স্বপ্ন দেখিছিলি
বেহুঁশ ঘুমের ঘোরে!
কামড় মেরে ওষ্ঠ কেটে
দাগ বানালি।
নিশিভোরে মায়ের কোলে
দিলি বনমালি!
মায়ের কঙ্কণ যাতে শুয়েছিলি
তাইতে বুঝি দাগ লাগালি॥

অক্ষয়দাস বৈরাগী

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ

চিতেন।—নিশি প্রভাতে গোচারণে উপনীত হলেন কৃষ্ণধন
পড়তা।—গিয়ে রাখাল সঙ্গে
কৃষ্ণ পরম রঙ্গে
মনের সুখেতে করলেন বনভ্রমণ॥

১ম ফুকর।—দেখে রাধার বরণ চাঁপার ফুল
মনেতে হয়ে ব্যাকুল,
নীলকমল তায় মূর্চ্ছা যায়!
দেখে তাই রাখালগণে আকুল হয়
এই ভেবে কি বনমালি
সঙ্গে লয়ে গোষ্ঠে এলি
কি দোষে ভাই নিদয় হলি?
ওরে নিরদয় কেঁদে স্থবল সখা বলে,
এ কি সখা বলে ভাই ভাই ভাই
ভাসে দুটি চক্ষের জলে।
মুখ।—উঠ উঠ গোপাল ও ভাই নন্দলাল
আয় করি কোলে।
পেজ।—ও ভাই কি বলে সবার সনে গোষ্ঠে এলি?
চম্পকের কলি দেখি মূর্চ্ছা গেলি
আমরা যত রাখালে
কাঁদি ভাই কানাই বলে
ও ভাই, ভাই বলে
আয় রে একবার করি কোলে।
খোঁজ।—ও ভাই তোর কি হ'ল ভাব
দেখে ভাবি সকলে॥
২য় ফুকর।—একবার উঠ রে ভাই,
নীলরতন কর রে ভাই ফল ভক্ষণ
আমরা ত ফল খেয়েছি।
পেয়েছি বড় স্থমিষ্ট ফল পেয়েছি।
তুই রে মোদের নয়ন-তারা
ধরাই কেন অঙ্গধরা
তোর জন্য ভাই শোকাতুরা
আমরা হয়েছি॥
রাধাকুণ্ডের তীরে
ধরায় অঙ্গ ধরে

এসে তোর করে
চম্পক কলি কেবা দিলে ॥
অন্তরা।—কেন রে ভাই কালাবরণ
চাঁদ-বদন মলিন হ'ল ?
ওরে কানাইয়ের যেন কোটি চাঁদ খসে পল।
রাধাকুণ্ডের তীরে আসি
কুসুম কাননে বসি
দেখতে দেখতে কালশশী
বিদগ্ধ তোর মনটা হ'ল ॥
পরচিতান।—তোরে ভাই গোষ্ঠে রেখে
গৃহেতে যাব কেমনে।
শেষ পেজ।—ওরে কানাই, জীবন কানাই
বিনে প্রাণ কানাই
বাঁচি না প্রাণে।
শেষ ফুকর।—আমরা গৃহে গেলে নীলমণি,
আসরে রে তোর জননী
বলব কৈ রে
প্রাণগোপাল, প্রাণগোপাল
কোন প্রাণে প্রাণ ধরে বলব তখন।
আসে নাই তোর নীলরতন ॥
শুনে তার কি বান্ধবে জীবন
যাবে বুদ্ধি বল দেহের প্রাণ
কি রবে, আহার নিদ্রা যাবে
মায়ের বল বুদ্ধি সকল যাবে শোকানলে ॥

রাইচরণ মাল

ভবানী বন্দনা

চিতান।—তুমি সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাতা মুক্তিদায়িনী।
তুমি কখনও হও দশভুজা
কখনও হও চতুর্ভুজা
আবার কখন হও দ্বিভুজা জগজ্জননী ॥
মাত, তোর নামে আপদবিপদ খণ্ডে ব্রহ্মপদপরা,
হাদে গো দীনদয়াময়ী ব্রহ্মপরাৎপরা।
ব্রহ্মাদিদেবগণে মা তোমাকে পায় না ধ্যানে
যোগীগণে যোগসাধনে
সদাই ভাবে তারা।
ভেবে অনন্ত না পেল অন্ত
ও মা ভবদারা ॥
আমি ভজনবিহীন,
দীনের অধীন,
কোন গুণে ঐ চরণ পাই ॥

মুখ।—দে মা কাশীশ্বরি যে দিন এ প্রাণ পরিহরি
সে দিন যেন চরণ কাশী পাই ॥
আমি এ ভিক্ষা চাই তোর কাছেতে
যে দিন আসবে রবিসুতে
নিতে আমারে।
দিয়ে চরণতরী ও শঙ্করী রাখিস অধমেরে ॥
যেন দুর্গা নামটী স্মরণ করে
ডঙ্কা মেরে চলে যাই।

খোজ।—তোমা বিনে এ অধীনের গতিমুক্তি নাই ॥

২ ফুকর।—তুমি যা কর তাই করতে পার ব্রহ্মসনাতনি,
হাদে গো দীনদয়াময়ী ব্রহ্মসনাতনি!

বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ প্রাণে
বাঁচে দুর্গা নামের গুণে,
জয় হোল কালকূট প্রাণে।
আপনি ত্রিশূলস্বামী
যেমন শ্রীমস্তকে করলে রক্ষা
দক্ষিণ মশানে ॥
এবার তেমনি করে দীনহীনে
রাখিস দুর্গে তোর দুহাই ॥
অন্তরা।—আমি এই মিনতি করি
অন্তিম কালে পাই যেন অভয়চরণ তরী
তবে চিন্তা করলে
চিন্তা থাকে না তার ও শঙ্করী।
আমি কালকে ফাঁকি দিব কিসে
এই ভয়েতে মরি ॥
পরচিতান।—মাত, আর শ্রীদুর্গার নাম
করলে স্মরণ বিপদ থাকে না।
তুমি ভক্তকে রক্ষা করিতে
আপনি সাজলে যুদ্ধেতে,
তার সাক্ষী আছে লঙ্কাতে,
রাবণ মল না ॥
শেষ ফুকর।—ঠেকে রাবণ বধে
রঘুপতি করলে তোমার পূজা,
হাদে গো দীনদয়াময়ি করলে
তোমার পূজা শতাষ্ট নীলপদ্ম তুলে,
মা তোমাকে পূজা দিলে,
সেই দিন রামকে দেখা দিলে
হ'য়ে আপনি দশভুজা।
হয়ে রামের পক্ষে বধলে
রাবণ ব্যক্ত ত্রিসংসারে ॥

আনন্দ সরকার

॥ ১ ॥

প্রভাস মিলন

নারদ মুখে পেয়ে বার্তা করলেন যাত্রা
গোপ-গোপীগণ।
অষ্টনারী সকলে করে ধরাধরি
মধ্যে রাই-কিশোরী
যজ্ঞস্থলে দিলেন দরশন ॥
কৃষ্ণের বাম ভাগেতে বসেছেন রুক্মিণী।
তাই দেখে মনোদুঃখে কেঁদে উঠলেন ধনী ॥
তখন বৃন্দে দূতীর করে ধরে
বলছেন রাধে ধীরে ধীরে,
ব্রজে আর যাব না ফিরে,
প্রাণ তেজবে এক্ষুনি ॥
পূর্বের শ্রীদাম শাপের সেই যে আগুন
নিভিয়েছিল সখিরে, সে যে আগুন,
নিভে যে ছিল তিন আগুন
আজ উঠল জলে এসে প্রভাসের তীরে ॥
মুখ।—আমি কেন বা এলাম যজ্ঞ দেখতে
রসময় শ্যামের বামেতে
রসবতী কে বিরাজ করে।
পূর্বে যেমন অযোধ্যাতে
রামের বামে বসতে সীতে,
তেমি দেখতে পাই।
অষ্টসখি বল দেখি এখন
আমি কোন কূলেতে দাঁড়াই ॥
না দেখে সেও ছিলাম ভাল,
দেখে অঙ্গে জলে গেল,

এখন সখী মৃত্যু ভাল,
সহ্য হয় না শরীরে ॥
খোজ।—শোকের অনল উঠল জ্বলে আমার অন্তরে।
২ ফুকর।—কৃষ্ণের বিচ্ছেদানল নিভাব তাই বলে
এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যে এলাম যজ্ঞস্থলে।
সখি, সে আগুন নিভাব আর কি
এ যে নূতন আগুন দেখি,
বিধির লিখন আর বাকি,
আছে এই কপালে !
পূর্বে কাল কুটিলে বাধা দিলে যাত্রাকালেতে,
শতবার বাধা দিলে যাত্রাকালেতে,
এ কালরূপ ব্রজে ফিরে দেখাব কেমন করে ॥
অন্তরা।—নারদ গোস্বামীর মুখে শুনে
এলাম মিছেই যজ্ঞস্থলে ॥

পঞ্চানন দত্ত (যশোহর)

ননীচুরি

চিতান।—ননী চুরি বংশীধারী ব্রজপুরী করিলেন যখন।
পড়তা।—তাইতে চোরা বলে শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে
নন্দরাণী করিলেন বন্ধন ॥
১ ফুকর।—বন্ধন জ্বালায় কৃষ্ণ পেয়ে কষ্ট কেঁদে কেঁদে কয়
ও মা যশোদে তোর ধরি পায়,
মা আমারে আর বেঁধ না,
বন্ধন জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
ননীচুরি আর করব না,
যদি প্রাণ যায় ॥

কৃষ্ণের কষ্ট দেখে তখন যত রাখালগণ
মা যশোদার চরণ ধরে করে করুণা।

মুখ।—ও মা নন্দরাণি,
মা গো মা তোর নীলমণি
সামান্য দোষেতে বেঁধ না॥

পেঁজ।—তুচ্ছ ছার নবনীর তরে
শ্রীকৃষ্ণের যুগল করে
তুই করালি বন্ধন।
বন্ধন জ্বালায় কালশশীর ঝরে দু'নয়ন॥
এই রাগেতে ব্রজ হ'তে
কৃষ্ণ যাবেন মথুরাতে
কাঁদবি ব্রজের পথে পথে
আর ত পাবি না॥

২ ফুকর।—মা পর হৈল তোর কালশশী
ক্ষীর সর আপন।
তাইতে বাঁধলি ভবারাধ্যের ধন॥
যার জন্যে যোগি গণে
সদাই থাকে যোগসাধনে
সেই হরি আজ তোর বন্ধনে
করতেছে রোদন॥
দয়ামায়া নাই কি তোর পাসাণ শরীরে
মা হ'য়ে সন্তানের কষ্ট সইছে কেমনে।

অন্তরা।—বন্ধন খুলে দে মা পায়ে ধরি
দু'কড়া নবনীর তরে
বাঁধলি ব্রজের বংশীধারী
যার নামে যায় ভববন্ধন
তার করে কি শোভে বন্ধন
ভবকাণ্ডারী বন্ধন জ্বালায়
কৃষ্ণধন কাঁদে অনুক্ষণ!
আমরা কি তা' সইতে পারি॥

লাল মামুদ (ময়মনসিংহ)

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

চিতান।—সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই।
এমন কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,—
বংশীধ্বনি করিলেন কানাই॥

লহর।—শুনে সেই বাঁশরী, ধৈর্য্যহারা রাই কিশোরী,
পড়িলেন ঢলে, অম্নি ধেয়ে সখি সকলে,
কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে,
এমন হ'লে কি কারণে, বলগো মন্ খুলে॥

মিল।—ললিতার গলে ধরি কমলিনী কয়
নারীর প্রাণে কত সয়,
নিদারুণ বাঁশীর আকর্ষণ।

মহড়া।—আর যেন বাজায় না বাঁশী
শ্যামকে যেয়ে করগো বারণ॥

ধুয়া।—শুনলে শ্যামের মোহন বাঁশী,
আমি যে কি সুখে ভাসি,
তোরা জানিস্ নে,
দারুণ শ্যামের বাঁশী পশিয়া প্রাণে
কুলমান কলঙ্কের ভয়,
লজ্জা ধৈর্য্য আর যত হয়;
সকলি মোর কাড়িয়া লয়
আমি হই পাগলীর মতন॥

খাদ।—পরাধিনী নারী, আমি, ঘরে গুরুজন।

লহর।—যদি ননদিনী—কৃষ্ণ-প্রেমের বিবাদিনী,
শুনে এ সকল,—তবে হবে বড় অমঙ্গল,
আমায় দেখ্‌লে ধৈর্য্যহারা, অম্নি হাতে লবে খাড়া,
দায় হইবে রক্ষা করা জীবন কেবল॥

মিল ।—দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ,
কুলনারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন ।
ঝুমুর ।—সখি আর সহিতে নারি ।
শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী ॥
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে
বল না কি করি ?
শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি,
বুঝি না বাঁচি কি মরি ॥
পরচিতেন ।—সুধা বিষে, আছে মিশে, বাঁশরী রবে ।
আমার যে যন্ত্রণা, প্রাণ জানে
আর কেউ জানে না,—
বল সখি কি উপায় হবে ?
লহর ।—বাঁশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান
বিষে পুড়ে যায় এখন বল কি হবে উপায়
মনে কয় যে দিবানিশি শুনি শ্যামের মধুরবাঁশী
মধুর সঙ্গে বিষে আসি পরাণ জুড়ায় ॥[১]

॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গ বন্দনা

সোণার মানুষ নদে এলো রে
ভক্ত সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে ।
(ও তাঁর) সোণার বরণ রূপের কিরণ
দেখ্তে নয়ন ঝরে ॥
(গৌর) হরিনামের বন্যা আনি
ধন্য করছে ধরণী ।
বিরাম নাই আর দিন রজনী ॥
নামের স্রোত চলছে ধীরে ধীরে
কলির জীবকে ভাসাইয়া নিচ্ছে প্রেম-সাগরে

১ সৌরভ, ১৩২৩ চৈত্র, ৪র্থ সর্গ ।

সোণার মানুষ সোণার বরণ
সোণার নূপুর সোণার চরণ
চারিদিকে সোণার কিরণ
ছুটেছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোণা হৈল গৌর অবতারে॥
যাঁরে ভজে সোণার মানুষ
তাঁরাও সোণার মানুষ
লাল মামুদের হৈল না হুঁস
এখন আর দোষ দিব কারে ?
সে যে সারা জীবন কাটাইল
রাঙ্গের বাজারে॥[১]

মহেশ কানা

পুত্র প্রসবিয়ে, যশোদা চিত্ত অলস,
অবশ তায় কৃষ্ণের মায়া, নন্দজায়া,
তথ্য না জানেন নির্য্যাস।
কেন সখি, প্রভাত সময়,
বলে উঠ মা নন্দরাণি, পোহায়েছে রজনী
কোলে তোমার কালাচাঁদের উদয়।
হরে পূজি বিল্বদলে, পেয়েছ গোপালে সে ছেলে
এখন উচ্চস্বরে করিছে রোদন।
নন্দরাণী এ আনন্দে কেন হ'লে অচেতন।
একবার কর শুভ দরশন।[২]
(শেষ সংগ্রহ করা যায় নাই।)

১ সৌরভ, ১৩২৩ চৈত্র ৪র্থ বর্ষ
২ সমীরণ '৩য় খণ্ড' হইতে সংগৃহীত

কৈলাস ঘটক

বিরহ

বৃন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান।
কাজ নাই বেশভূষণে কৃষ্ণ বিনে এখনি ত্যজিব প্রাণ।
ব্রজেতে নাই বংশীধারী, নীরবেতে শুকসারী,
শূন্যময় হেরি ;
যত পশু পাখ মুদে আঁখি সকলে অমৃত সমান।
বিনে বাঁকা মদনমোহন, শূন্য দেখি বন উপবন,
ঝরে দু'নয়ন ;
আর কি দেখতে পাও সেই মাধব
কার কাছে করিব মান!

॥ ২ ॥

গোষ্ঠ

মায়ের কোলেতে বসি ছিলেন কানাই।
শ্রীদাম আসিয়ে কহে অতি বিনয় হয়ে
গোষ্ঠেতে চল ওরে ভাই॥
তখন শ্রীদামের বাক্য শুনি
নন্দরাণী করে বারণ, যাদু বাছাধন তোরা যারে বন।
আজ গোষ্ঠে যাবে না
আমার প্রাণ নীলরতন
কত হরগৌরী সাধনে পেয়েছি কৃষ্ণধনে
আমি আজ হ'তে গহন বনে।
পাঠাইতে পারব না
শ্রীদাম যারে যা, আজকার মতন তোরা সব যা
গোষ্ঠের কথা আজ বল না
কত সাধনের ধন আমার নীলরতন॥

জীবনের জীবন নয়নের নয়ন ॥
তোমাদের সনে গোচারণে নীলকান্ত যাবে না।
নয়নের আন্তর করি না
যদি আঙিনার বাহির হ'য়ে
খেলে গিয়ে অবোধ ছেলে
আসিবার কালে গোপাল পথ ভোলে
শিরে হাত দিয়ে কান্দে তখন মা মা বলে ॥
কাল ধবলী ল'য়ে এল চান্দবদন মলিন হ'ল
গোপাল অমনি ঘুমাল নবনী খেলে না ॥
আজকার সপনেতে দেখিলাম জঞ্জাল
যেন গোষ্ঠেতে ঘেরে দাবানলেতে
ঘেরে মোর গোপাল
একা রেখে আমার গোপালে,
সব রাখালে পালাইল সব।
ধেনুর হাম্বা রব দেখি অসম্ভব
অঞ্জলি ধরে অনল খেলে।
প্রাণের যাদব দেখ আমার এই ভাগ্যবলে।
নন্দঘোষের পুণ্যফলে বেঁচেছে দাবানলে ॥
আমার সপন রবে না ॥

॥ ৩ ॥

গোষ্ঠ

গগনে উঠেছে বেলা, দেখ ভাই চিকণকালা,
যত সব রাখাল ডাকে।
তুই বিনে ভাই কালিয়ে রতন, যত ধেনুগণ
চেয়ে আছে উৰ্দ্ধ মুখে ॥
তুমি কোন ঠাকুরের বেটা একি ঠাকুরাল,
নিতুই নিতুই তোমার কেবা চরাবে ধেনুর পাল ॥
এমন মিনিকড়ির নফর ॥
তোমার কোন্ রাখাল আছে কেনা।

আর বিলম্ব করো না, গোষ্ঠে এস কালিয়ে সোণা,
জানিরে ভাই নীলমণি, খেয়েছিলে নবনী,
তোমার যুগল করে বেঁধেছিল জননী,
আমি তাথেই বলি বনমালী মায়ের গরব করো না ॥
চল চল বিলম্বে কাজ নাই, ওরে ভাই কানাই,
আর তুমি বিনে যায় না বনে তোমার ধবলী সাঁওলী গাই
তুমি বিনে বিপিনে ধবলী যায় না,
শিঙ্গা পাঁচনী বাধা আমরা নিব ব'য়ে
আমরা ফিরাব ধেনু তোমার চাঁদমুখ চেয়ে,
তোমার মা দিয়েছে টাড় বালা আমরা কোথা পাব,
বনে গিয়ে বনফুলের মালা তোর গলাতে পরাব,
ঐ রাখাল-মণ্ডলের মাঝে তোরে নইলে সাজে না ॥
তুমি সব রাখালের শিরোমণি, বট নীলকান্তমণি,
তাই নিতুই আসি ভাই তোমায় নিতে,
তুমি না গেলে ভাই ওরে কৃষ্ণধন, যত রাখালগণ
বাঁচবে না মরবে প্রাণেতে ॥
আজকের মত গোষ্ঠে চল আসবো নাকো আর,
আমরা কাল হ'তে ভাই ধেনু চরাব আপনার আপনার ॥
কৈলাস কহে জোর করে, এত নফরালি ক'রে
তোমার মনের কথা ভাইরে পেলাম না ॥

চণ্ডীকালী ঘটক

॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্র

ওহে অবতীর্ণ হ'লে তুমি আসি সেই শচীর গর্ভেতে।
আর লীলা প্রকাশিলে, আসিয়া নবদ্বীপেতে ॥
কলিযুগে অবতরি হরি নাম বিলাবার তরে।

তুমি ত হও অবতার, পাপী করিতে উদ্ধার,
কে বুঝিতে পারে ॥
সত্যযুগে ছিলে ওহে তুমি নারায়ণ,
আবার ত্রেতাযুগে ধনুক ধরে বিনাসিলে ঐ রাবণ।
নদীয়াতে প্রকাশ হ'লে তুমি হে দূর্ব্বাদলশ্যাম।
তোমার নামের গুণে ত্রিভুবনে,
সকলে আছে হে আনন্দ মনে,
গৌরাঙ্গ স্মরণে।
ছিলে ধনুকধারী,
বনচারি,
কেন নিলে রাধার নাম ॥
সখাগণ আর সাঙ্গ পাঙ্গ ভক্তজন
ল'য়ে করছ সমাধান
বিলায়ে ঐ মধুর নাম ॥
নবদ্বীপে অধিষ্ঠান আছ গুণধাম।
তুমি যুগে যুগে অবতরি করিলে কৃপাদান।
গোপীগণের মন ভুলালে শুনাইয়ে বাঁশীর গান ॥
আমি কাতর হ'য়ে ডাকছি তোমায়
কোথা হে গৌর দয়াময় ॥
কত শত পাপী তরাইলে
তরাইতে হবে যে আমায়
পড়েছি বিষম ঘোরে তুমি হে আস রে
যেমন জগাই মাধাইকে,
তরাইলে দুটি ভাইকে,
তেমনি কৃপা করিয়ে তরাও আমারে ॥
দিনান্তে তোমার নাম নিলে
শমন ভয় পরিত্রাণ।
দ্বিজ চণ্ডীকালী কাতরেতে ডাকিছে
নাহিক অবিশ্রাম ॥[১]

---

[১] সংগৃহীত পুঁথি

হৃষ্টিধর

॥ ১ ॥

যশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

যশোদে গো রব না আর গোকুলে।
গোপীরা সব ধূলা দেয় কাল বলে ॥
তোমায় আমি জিজ্ঞাসিলাম,
রাণী গো কেন, আমি কাল হ'লাম,
জিজ্ঞাসিলাম গৌরী পূজে ছিলে তুমি কোন ফুলে।
গোকুল ছাড়িয়ে এলাম,
তোমার ঘরে বিকাইলাম,
তবে কেন অঙ্গে ধূলা দেয়
কেন কাল হ'লাম গো—
(ছোট) ক্ষীর সর নবনীর তরে
জনমিলাম তোমার ঘরে
তুমি কি দিয়েছিলে জবা বিল্বদল
সেই গৌরীপায় গো—দিয়েছিলে পাদমূলে ॥

॥ ২ ॥

অক্রূর-সংবাদ

মহড়া।—তোমায় ধরেছি চোর, ব্রজের কৃষ্ণধন চোর,
চোর ধরে ছেড়ে দিব না।
আন্‌লে রাধার ধন চুরি করে
ধন সহিতে ধল্লেম তোমারে,
আছে রাজার হুকুম বাঁধবো করে করে
করবো বিদিত দণ্ড তোমায় আর লাঞ্ছনা ॥
খাদ।—শিষ্ট বাক্যেতে আমরা ভুলবো না ॥
ফুঁকা।—অক্রূর হে তুমি চোরের শিরোমণি,
ব্যভারে জান্‌লেম তোমায়, পেলেম পরিচয় হে,

চোরে কল্লে সৎব্যবহার, পূর্ব্বের ভাব যায় না তার,
অপরের ধন দেখলে আবার সাধু-তত্ত্ব ভুলে যায় ॥
১ মেলতা ।—তুমি চোরের গণ্য চোরের মান্য হে ।
তোমার মত চোর আছে আর ক-জনা ॥
২ চিতেন ।—বল্লে অক্রূর মুনি ব্রজের চিন্তামণি এই রথে ॥
পাড়ন ।—তোমার কথা শুনে ব্যথা পেলেম প্রাণে ॥
ফুকা ।—আমরা বাঁচিনে আর দুঃখেতে ।
মথুরায় ধনু যজ্ঞ করবে কংস আমরা তায় অসুখী নই,
মনের কথা কই, ওহে ।
অগ্রেতে বল্‌তে যদি, দিতাম যজ্ঞে যেতে শ্যাম-নিধি,
হয়েছ চোর অপরাধী, মুনির ধর্ম্ম রাখলে কই ॥
২ মেলতা ।—তোমায় ধাম্মিক বলে মান্‌তেম সকলে হে,
বকের প্রায় এমন ধার্ম্মিক আর দেখবো না ॥
অন্তরা ।—চোরে ধরা পড়লে মিষ্ট কথা কয়, কয় হে ।
চোরকে ছাড়লে আর কি ধরা যায় ।
সিঁদেল চোরে নিদেল দিয়ে, গৃহীলোকের মন ভুলায়ে,
তুমি তদ্রূপ প্রায় হে চোর ।
প্রধান মাশুল চোর চুরি কল্লে এসে নন্দালয় ॥
২ চিতেন ।—কৃষ্ণ নবীন চোর, নারীর বসন-চোর গোকুলে ॥
পাড়ন ।—বাজিয়ে মোহনবাঁশী ঐ কালোশশী,
ব্রজবাসীদের মন হরিলে ॥
ফুকা ।—তুমি আজ এমন চোরকে কল্লে চুরি,
অসাধ্য আর কিছুই নাই, স্পষ্ট বলি তাই হায় গো,
লোকের মুখে শুন্‌তে পাই, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই,
দুই চোরেতে এক মনেতে রথে প্রণয় দেখতে পাই ॥
৩ মেলতা ।—চিরদিন যারে মন প্রাণ দান করে হে,
তবু তার ব্রজপুরে মন পেলেম না ॥[১]

১ প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ৩ ॥

বসন্ত

রাধাকান্তে
আনিতে যারে,
ভয় করিস না।
গিয়ে মধুপুরে,
মধু খেয়ে তুই যেনরে
নিতান্ত ভুলে থাকিস না ॥
রাধার হয়েছে এমনি দশা
দশম দশা তায় ঘটেছে,
গতি কি আছে,
দাঁড়ায় কার কাছে।
প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়াছি তারে,
কুহু কুহু কুহু স্বরে, তুই যেন সেই মধুপুরে
আজ ভুলে থাকিস না ॥
ভ্রমর যারে যা,
মথুরায় যা।
নিকুঞ্জে আর মিছে ঝঙ্কার করিস না।
মাধব এলে তবে আগুন নিভাবে,
ব্রজবাসী সবে
তনু জুড়াবে,
যুগল প্রেমের আজ মিলন হবে।
ব্রজে দুখ রবে না ॥—ধুয়া
সেথা নাই মধুর ভাবনা
ছিলাম সুখের ব্রজেতে সুখে
সে সব সুখের
বিষয় ত নাই,
আসি বলি তাই,
দুখে ডুবিল রাই,
জলে স্থলে আর ফলমূলে অসুখী সবাই ॥

কেন্দে বলে ঐ শুকসারী,
সুখে বঞ্চিত করলেন হরি,
এখন ভাসিছে সুখের তরি,
মথুরায় দেখ না ॥
ব্রজের কালিয়ে প্রাণ হরিয়ে
ল'য়ে গেছে,
মধুমালতী বন।
কত সাধের বন উপবন ॥
সকলি জলে গিয়েছে
কত সুখের বন পূর্ব্বে ছিল
ছিলেন যখন মদনমোহন,
তমাল ভাণ্ডির বন,
মধুর বৃন্দাবন।
বনমালীর বিরহে এখন হ'ল দাহন।
প্যারী বনে বসে এখন।
রাম-বিরহে সীতা যেমন ॥

॥ ৪ ॥

বসন্ত

বিচ্ছেদ-শেল হেনে গেছেন সেই বংশীধর।
তার উপরে পঞ্চম স্বরে কোকিল করে
সুমধুর স্বর ॥
শুনি কুহুরব যত সখী সজল আঁখি
সবে নীরব শবাকৃত সব।
ব্রজে নাই মাধব
কেন্দে কন, সেই কেশব বিনে শূন্য এ সব।
এলি হয়ে কৃষ্ণের পক্ষ
তুই রে কোকিল পক্ষ
রাধার পক্ষে কি দুর্দ্দশা
তা তো চক্ষে দেখিস না।

এখন যারে যা যারে বিহঙ্গ
বিহঙ্গ রাই-অঙ্গ দগ্ধ করিস না ॥
সোনার কমলিনী কৃষ্ণ-বিরহিনী
মণিহারা ফণী শ্যাম-কাঙ্গালিনী
কোকিল তুই কুহুরব যেন ডাকিস্ না।
দেখে দুখ দয়া হল না।
কোকিল পেয়ে মাধবী
পিয়ে মত্ত হয়ে পিয়ে সৌরভ
কর কুহুরব বেড়েছে গৌরব
আবার ভ্রমর তায় দ্বিগুণ জ্বালায়
করি গুণ গুণ রব
সাধের গোকুল শূন্য করি
মথুরায় গেছেন হরি
আকুল হ'য়ে কান্দছেন প্যারী
জেনে তুই জানিস না ॥
সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাই অধরা।
শুনে আকুল হ'য়ে
কমলিনীর চক্ষে বহে সহস্রধারা ॥
এখন দেখি না কোন আধার
শ্রীরাধিকার নাই অন্য বল
এই বিচ্ছেদ-অনলে তাই তাহে দুর্ব্বল
বলের মধ্যে আছে কৃষ্ণের নামটি সম্বল
বলে সঙ্কট প্রাণ রক্ষে
করহে, মাগি ভিক্ষে
আছে সৃষ্টিধর মনের দুঃখে
যা যা হেথা থাকিস না ॥

বিষ্ণু চট্টরাজ

॥ ১ ॥

প্রার্থনা

এই কর হে বাঁকা শ্যাম রায়।
ব'সে আধ গঙ্গাজলে হরি ব'লে প্রাণ যায়।
ব'সে নারায়ণ-ক্ষেত্রে হরিনাম লিখি গাত্রে;
যখন ঘেরবে ঐ কৃতান্তে রেখ হরি রাঙ্গা পায়।
পাপে ভারি তনুতরী জীর্ণ হলো ওহে হরি,
তোমার চরণ ধরে তরি যেন ভুল না আমায়।[১]

নিতাই

সখীসংবাদ

কিবা রাই কানু আছেন একাসনে রাসমণ্ডলে
সব সখীগণে ঘিরে আছেন
রাধাশ্যামে মন কুতূহলে॥
যেমন শ্যাম তেমনি রাধা
আহা মরি কিবা শোভা!
যত দেখে সখীগণ, হয়েছে অতি সুশোভন।
কি শোভা স্বর্ণলতা রাইকিশোরী
ওগো কিশোরীর এ কি হেরি
আমরা তা' বুঝিতে নারি
ওগো সখীগণে।

রাসের সময় সুখের সময়
সে রাধার মান হ'ল কেনে।
ছিলেন শ্যামের সঙ্গেতে এখনি।
আবার কি জন্যে গো প্যারী হ'ল মানিনী,
আমরা কিছু তা' নাহি জানি ॥
সদাই ভাবি মনে।
ধৈর্য্য না পাইগো এক্ষণে ॥
শ্যামের সঙ্গেতে রসরঙ্গে রাসমণ্ডলে
ছিলেন ধনী মোদের রাজনন্দিনী
কি জন্যে হ'ল এমন।
দুঃখেতে কয় গোপীগণ
হেরি নাই এ দারুণ মান
এ ভবমণ্ডলে।
দেখ মানময়ীর মান হয়েছে,
দেখ বদন ফিরায়ে আছে,
রাধা কিসের জন্যে।
ওগো এ মানের হেতু কি
তাই বল সুচিত্রে.
ওগো আমরা নারী বুঝিতে নারি,
ভেবে মরি কই তোমার সাক্ষাতে ॥
ছিলেন এখনি মনরঙ্গে শ্যামের সঙ্গে
কমলিনীর কেন এখন ধ্বনি বাক্য নাই চাঁদবদনে
এ ভাব হয়েছে কেনে
মগ্ন হয়েছেন রাধা মান-তরঙ্গে।
আমরা এ ভাব দেখতে নারি,
মনের দুঃখে মরি
হেরিয়ে নয়নে ॥
কেন মানে মগনা রাধামণ্ডলে
আমরা সখীগণে ভাবি মনে
এমন কেন হ'ল আজ ক্ষতি।

সুখের সময় মান হয়েছে এ কেমন মান।
ওগো সখি, রাধা অধোমুখী হয়েছেন কি নিমিত্তে।
বাক্য নাই চাঁদমুখে
মত্ত হ'য়ে মানেতে আছেন এখন
হবেন রাই কিসে মানে ক্ষান্ত।
আমায় বল গো সে হবে কিসে শান্ত
তোমায় বিনয় করি।
আমরা যে গো ভাবের ভাবি
এ বিচ্ছেদ ভাব দেখিতে নারি।
রাধা হ'য়েছেন মানে মগনা
তবে কি হবে গো ভাবে গোপাঙ্গনা।
আমরা ভেবে প্রাণ থাকে না,
উপায় কিবা করি, কি জন্যে এমন কিশোরী ॥
একবার দুর্জ্জয় মানের দিনে
হলেন মগ্ন রাধা মনে।
শ্যাম সে যে ছিলেন যোগীর বেশ
মানে পেয়েছেন কত ক্লেশ।
হ'য়ে গো অপমানের শেষ
ধরলেন রাই-চরণে।
আমরা তাই ভাবি সখীগণে
আবার এই সুখের দিনে
তাই কি ঘটাল প্যারী ॥
ওগো সুচিত্রে, তুমি রাধার জান সমুদয়
এই সুখের সময় এমন সময়
কেন রাধার এত মান উপজয়
আবার এই মানে অপমান কি শ্যামের হবে।
মরি ভেবে আমরা মরি ভবে
কিসে রাই হবেন ক্ষান্ত।
কও দেখি তার তদন্ত ;
কিরূপে রাধাশ্যামের মিলন হবে ॥

যখন রাধা করেন দারুণ মান,
শ্যামচাঁদের হয় অপমান।
তাতে চিন্তা কিরে ॥[১]

॥ ২ ॥

রস আবেশে সখি সঙ্গে ল'য়ে রাজকুমারী।
এই রাসস্থানেতে দাঁড়াইলেন শ্যামের বামেতে,
কি শোভা যে জগত-মাধুরী ॥
রাই-কাঞ্চনপুতুলকে আছেন কাল মেঘ ঢেকে
যত দিকে সখীগণে চাহে দুঁহার পানে
ভাসিতেছে প্রেমতুফানে অতি মনসুখে ॥
রাধাশ্যাম একাসনে রাসবিহারী রাসে মগ্ন মনে
যেমন তমালে সোনার লতা রাই তাই ঘিরেছে ॥
হেরে কালাচাঁদে, আবার হেরে রাইচাঁদ চাঁদে,
গগন চাঁদ লাজে লুকাইছে।
যেমন চাঁদের গাছে ধরে চাঁদ,
রাধা সেই চাঁদের চাঁদ,
অমন কোটে চাঁদরাজ কোথারে বল যে আছে।
চাঁদে চাঁদে শোভা পেয়েছে,
যেমন কাল মেঘের কোলে,
আসি সৌদামিনী খেলে।
চাঁদে চাঁদে উদয় হল,
অন্ধকার দূরে যে গেল।
যে চাঁদের উদয় হল আঁখির সাম্‌নে,
বিধি দিয়েছিল দুটী নয়ান,
কোন চাঁদ হেরিব কোন চাঁদ করিব ব্যাখ্যান।
রাসমণ্ডলে চাঁদের হাট এই বসে গেছে ;—
রাই চাঁদে আর পেরে চাঁদে চাঁদে কি তুলনা,
গগন চাঁদ এই চাঁদকে হেরে রহিতে পারে না ;—

১ পুঁথি হইতে সংগৃহীত

ও সে রাইচাঁদ ওই পেরে পরে আছেন নীলবসন।
তেমনি এই কালাচাঁদ পেতেছেন ওই প্রেমফাঁদ,
গোকুলচাঁদ মদনমোহন ॥
আমরা দুটা চাঁদ নেহারি,
চাঁদের তুলনা দিতে নারি,
যেমন রাইচাঁদ তেমনি শ্যামচাঁদ।
উভয় পক্ষে সমান দুটা চাঁদ ॥
নয়নেতে এই যুগলচাঁদ সখীগণে হেরি,
একি হল চাঁদের মণ্ডলে।
দুই চাঁদ হেরি সখি চাঁদমণ্ডলে ॥
চাঁদের চরণে দীন হীন নিতাই বিকাইছে ॥

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

প্রভাতে উঠিয়ে নন্দরাণী ল'য়ে যাদুমণি
বসিলেন নিজ প্রাঙ্গণে।
আর ক্ষীর ননী যতন করি আনি
দিচ্ছেন রাণী কৃষ্ণের বদনে ॥
বলে নাচত দেখিরে নন্দলাল
ওরে আমার রতনমণি আবার দিব নবনী
কই রে জীবনধন গোপাল
আর কারু বাড়ীতে যেও না বাপ
খেল এই আঙিনাতে।
একবার নাচত দেখিরে ইন্দ্রনীলমণি
বাপ আমার সাক্ষাতে।
কটিতে তোর কিঙ্কিণী রুণুঝুণু রব শুনি।
তোর নৃত্য দেখে, আমার বাছা ওরে জুড়াক পরাণি ॥
আবা আবা ধ্বনি খানি
শুনি তোমার মুখেতে
ডাকে আয় গো দিদি রোহিণি,
গোপালের নাচুন দেখিতে।

গোপাল আমার নেচে নেচে যায়
রুণুঝুণু নূপুরধ্বনি কি ধ্বনি
পাছে বা বাজে যাদুর পায় ॥
আবার শুনলে ধ্বনি সব গোপিনী
আসিবে নাচুন দেখিতে।
একবার নাচরে যাদুধন
বাছা আমার গোপালধন
তোমাকে পেয়েছি অনেক স্তব করে,
মা দিয়াছেন কৃপা করে।
আর অন্তরে অন্তর করিতে না পারি।
থাক আমার নয়ন গোচরে
নীলমণিরে কোথায় যেও না
আমার কোলে ব'সে থাক
মা বলিয়ে ডাক
আর দিবানিশি বিরাম কর
নিতাই দাস হৃদেতে ॥[১]

॥ ৫ ॥

কাল অঙ্গে ধূলা কে দিলে বাপধন।
কেন কেন্দে এলি বনমালী
মলিন তোমার চাঁদবদন ॥
ছল ছল যুগল আঁখি
বুক-মাঝে ধারা দেখি কি দুঃখের দুঃখী
আমার প্রাণ বিদীর্ণ জীবন শূন্য,
এখনি তেজিব জীবন।
মা হ'য়ে কি দেখতে পারি
ধূলা ঝাড়ি কোলে করি আ মরি মরি
কার গৃহে গেলে কে কাঁদালে
তোর হিয়ে বটে কেমন ॥

১ পদটী পুঁথি হইতে সংগৃহীত

রাজারাম

॥ ১ ॥

(ভক্তের প্রশ্ন)

ওমা দুর্গমে দুর্গতি ভয়হারিণী তারিণী শোন নিবেদন।
তুমি ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মসনাতনী ব্রহ্ম-আরাধিতা ধন॥
যন্ত্ররূপিণী, তুমি ত্রিতাপহারিণী
ওমা দিবা নিশি থাকি আমি তব চরণ ধরে।
বল গো জননি, আমি জিজ্ঞাসি তোরে
মা তুমি হরসুন্দরী,
কল্যাণী কিরীটেশ্বরী,
গণেশজননী
তুমি দশটি মুণ্ড চল্লিশ বাহু হ'য়েছিলে কার ঘরে॥
রণবেশ নয় তোমার জানে সংসারে।
রাজরাজেশ্বরী ও মা জিজ্ঞাসা করি
তুমি ঐরূপ ধরে
ব্রহ্মময়ী দরশন দিলে কারে॥
শরৎকালেতে ওমা ভবানী আপনি হ'লে দশভুজা।
সেই সাগর পারে পূর্ণব্রহ্ম রাম তোমারে করেছেন পূজা
মা অষ্টবাহু চতুর্বাহু ছয়বাহু দুইবাহু আছে নিরূপণ।
হ'ল অষ্টাদশ ষোড়শভুজ অসুর বধের কারণ॥
বল কোন দেবের কারণ।
চল্লিশ হাত করেছ সৃজন॥
ওমা দশটি বদন হ'লে,
কেন কও দেখি কিসের তরে॥

॥ ২ ॥

এই পদ্মা বলে শুন ওমা পার্ব্বতি,
মিনতি রাখবে আমার

তুমি ভবের কর্ত্তা, জগন্মাতা দুর্গে
তার গো শঙ্করীশিবে
তরায় গো বাক্যবাণে ভবে
আমি তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা
যা কর নিজ গুণে ॥
কয় গো মা জগদম্বে ধরি চরণে
মা কর না সুবঞ্চনা, ওগো হররঙ্গণা,
তুমি নিবিড় নিতম্বিনী রূপ হ'য়েছিলে কোনখানে ॥
মা জিজ্ঞাসি এই কথা অতি গোপনে
ওগো যত রূপ হ'ল জানি মা
তোর চরণ বলে
তবে নিতম্বিনীর পেতো রক্ষে
কল্যে কোন জনে ॥
তোমার সহস্ররূপের মাধুরী।
এ কুনখানেতে হয়েছ তুমি,
ঐ নিবিড় নিতম্বিনী।
ওগো আমারে তাই বল,
ওমা তারিণী।
তাই শুনি তোমার মুখেতে।
এই সহস্ররূপের মধ্যে নয়ক,
বুঝ নাম ভাবেতে ॥
মা দাও গো পরিচয়,
জানি মা,
আর অসুর বিনাশিতে নয়ক জানে গো জগজনে।[১]

কি অপরূপ হেরি ও বাপ নয়নে।
থাকতে ক্ষীর ননী ও নীলমণি,
মৃত্তিকা খাও বদনে।

১ সংগৃহীত পুঁথি

কোলে আয় বাপ রতনমণি,
নিরখি তোর বদনখানি, দিব নবনী,
তুমি সর্ব্বস্ব ধন কালরতন
পেলাম অনেক সাধনে ॥
ছিদাম বলে মাটি খেলে
গোলক ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলে বদনকমলে
দেখি কোটি ইন্দ্র কোটি চন্দ্র
অধৈর্য্য হ'লাম প্রাণে ॥[১]

রামানন্দ

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ

যত রাখালে ডাকে কাতর হ'য়ে
কোথা গেলি কৃষ্ণ, তুই ব্রজ ত্যজিয়ে
ব্রজের সে ভাব তোমার কিছু মনে নাই।
গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল ভাই
কোথারে ও ভাই কৃষ্ণের বলাই।
এ সময় কোথা রইলে প্রাণের কানাই,
আয় ভাই তোরে ল'য়ে মোরা গোচারণে যাই
তোমা বিনে কৃষ্ণ মোরা গোষ্ঠে যাব না।
ত্যজব ভাই বৃন্দাবন, ব্রজে রব না।
ব্রজের যে ধেনুসব তৃণ ত্যজিয়ে
হাম্বা রবে ডাকিছে কৃষ্ণ বলিয়ে
কোথা গেলি কৃষ্ণ তোর দরশন না পাই ॥
এতদিন গোষ্ঠে মোরা যত রাখাল দল,
সেখানেতে পেতাম মোরা যত বনফল।

১ সংগৃহীত পুঁথি

আগে মোরা মুখে দিয়ে চেখে দেখিতাম,
মিষ্টফল হ'লে তোর বদনে দিতাম।
সে ফল এখন পেলে কারে বা খাওয়াই ॥
তোমা বিনে কৃষ্ণ মোরা গোষ্ঠে যাব না,
ত্যজব ভাই বৃন্দাবন ব্রজে রব না ॥
কে আমাদের মুখ চেয়ে দয়া করিবে,
মুনিপত্নী স্থানে অন্ন কেবা খাওয়াবে ॥
রামানন্দ আশা-ধারী আছে হে সদাই ॥[১]

॥ ২ ॥

বলরামরে, একি দেখি রঙ্গ।
গোচারণে ল'য়ে গেলি নীলরতনে।
এনে দিলি ধূলায় ধূসর অঙ্গ ॥
শুখায়েছে মুখ-ইন্দু, অঙ্গে সকল ঘর্ম্ম-বিন্দু
কুশাঙ্কুরে ক্ষত পদারবিন্দ,
আমার গোপাল দুধের ছাওয়াল
দিয়েছিলাম তোমার সঙ্গ ॥[২]

চাকর যুগী

॥ ১ ॥

চাঁদ নিব মা চন্দ্র চাই।
কপালেতে চিত্রা দিতে হাতছানিতে
ডাকছিলে যে বল্‌ছি ভাই ॥
মণিময় অঙ্গনতলে, সমুজ্জ্বলো ঐ যে জলে

১ সংগৃহীত পুঁথি

২ বীরভূম বিবরণ—৩য় খণ্ড, গ্রন্থের 'বরুল ও অন্যান্য গ্রামের কবিওয়ালাগণ' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত রামানন্দ, চাকর যুগী, বনয়ারী চক্রবর্ত্তী, রাধানাথ ও রাজারাম প্রভৃতি কবিওয়ালার পদগুলি গৃহীত হইয়াছে।

আমি মাখবো কজ্জলে ,
ভাল করে ডাকলে
ভালে দিবে এসে চিত্ত পরাই ।
ভাল করে ডাকো মাগো,
চাঁদ বিনে আজ মানবো নাকো,
শুধু কাঁদবো গো,
না পেলে চাঁদ তেজবো জীবন
ঝাঁপ দিব যমুনায় যাই ॥[১]

বনয়ারী চক্র৲

চন্দ্রবদন চন্দ্র চায় কি হলো দায় ।
চাঁদ নিব বলে দুধের ছেলে
ধূলায় গড়াগড়ি যায় ॥
চেয়ে দেখ তোর অঙ্গ পানে
কত চাঁদ তোর নখের কোণে
চাঁদ কাঁদেরে কেনে ;
এ চাঁদ কোথা পাব
এনে দিব
ঘরে আসুক নন্দরায় ।
চাঁদ হয়ে চাঁদ চাইলি নিতে,
চাদ কোথা মোর প্রাঙ্গনেতে,
দিব যে হাতে ;
ওতো বৃকভানু-রাজনন্দিনী
চন্দ্র নয় রে যাদব রায় ॥[২]

---

১ বীরভূম বিবরণ ২ বীরভূম বিবরণ

রাধানাথ

ওমা নন্দরাণি,
এই নাও তোমার গৌরী-আরাধিত ধন
গোষ্ঠে যাবার কালে
প্রাণ-গোপালে
কয়েছিলে দুঃস্বপন।
আমরা যত রাখাল মেলি
মাঝে লয়ে বনমালী, ফিরাই ধবলী॥
আমরা ছিদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম
গোপালে করি যতন।
গোপালে কি চিন্তে পারে,
বনে গিয়ে গিরি ধরে, হেরি বাম করে;
কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে সুধা ক্ষরে,
আপনি ফেরে ধেনুগণ॥[১]

সারদা ভাণ্ডারী[২]

॥ ১ ॥

ভবানী-বন্দনা

তুমি ব্রহ্মাণী সেই ব্রহ্মলোকেতে
বৈকুণ্ঠেতে সর্ব্বমঙ্গলা, গয়াক্ষেত্রে নামটী গয়েশ্বরী
ইন্দ্রলোকে মা তুমি অমরাবতী।
দক্ষালয়ে সতী।
কৈলাস-পর্ব্বতে শিবের বামে মা দেবী পার্ব্বতী॥

---

১ বীরভূম বিবরণ

২ কবি সারদার সকল গীতি সংগৃহীত পুঁথি হইতে গৃহীত হইয়াছে

বিমলা নাম হল তোমার শুনি পুরুষোত্তমে
এই কথা বল জগদম্বে, কৃপা করে দীনহীনে।
তুমি সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, হ'লে গো ক্ষেমঙ্করী,
খট্বাঙ্গধারিণী রূপেতে হ'লে মা রাজেশ্বরী,
তবে বিশ্বেশ্বরী মূর্ত্তি তুমি হয়েছিলে বল কোন খানে ॥
কাত্যায়নী নাম হয় তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবনে,
হিমালয়ে ছিলে গিরিরাজার ঘরে।
মা ভোলাইলে তারে।
বিকটমূর্ত্তি দেখিয়েছিলে সেই সূতিকাগারে ॥
ওগো চণ্ডীরূপে তুমি ছিলে লঙ্কা-ভবনে
পাতালে ভুবনেশ্বরী তুমি হ'য়েছিলে মা শঙ্করী।
কখন কি রূপে থাক তুমি,
তোমার লীলে বুঝিতে নারি ॥
তুমি শুম্ভ আর নিশুম্ভ
কেমনে জয় করলে ওমা চণ্ডিকে।
দশভুজা মূর্ত্তি ধরে তুমি বধ করেছ মহিষাসুরকে ॥
শ্রীমস্তকে অপরূপ দেখিয়েছিলে ব'সে কমলদলে।
কমলেকামিনীরূপ হ'লে কালিদহের কূলে,
সারদা কয় গজ গিলে মা সেই পদ্মবনে ॥

॥ ২ ॥

নবমী

মেনকা কয় হে শুন,
ওহে গিরিরাজন ॥
এই রজনী গেলে প্রভাতকালে।
কাল সকালে আসিবেন ত্রিলোচন ॥
তবে লয়ে যাবে, উমাধনে
সেই কৈলাস-ভুবনে।
উপায় কি করি এখন,
বল হে গিরিরাজন,

আমার বাঁচবে না জীবন
গৌরী বিনে ॥
দেখ উমা আমার দুঃখ-পসরা ধন।
আমার অভয়া গেলে, না রব গৃহে থাকতে।
ওহে গিরিরাজ হে,
বল তবে কি হবে হে,
এই অভাগিনীর ভাগ্যেতে।
যখন শঙ্কর আসবে গিরিপুরে ;
আমার মহামায়াকে বিদায় দেব কোন প্রাণেতে ॥
ঐ চাঁদমুখ নারিব পাসরিতে ॥
উমার সঙ্গে আছে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
গাণ্ডীব বাণ করে ধারণ দেখ রহিছেন যড়ানন।
সপরিবারে এখন আছেন সতী ॥
আমার কি সৌভাগ্য হয়ে আছে গৃহেতে।
আমার গৌরী গেলে পারব না ধৈর্য্য ধরতে ॥
প্রভাত হ'লে শর্ব্বরী।
আসবেন দেখ, ত্রিপুরারি ॥
শিঙ্গায় ডাকবে দুর্গা বলে,
ল'য়ে যাবে হর-গৌরী।
যদি হিমালয় হ'তে গৌরী যায় সেই কৈলাসেতে।
আমার সাধনের ধন গেলে
এখন ত্যজিব জীবন আমি সাগরেতে ॥
আমার উমা যখন থাকবে কুলে
ডাকবে মা মা বলে
উমার সুধাবাক্যেতে
প্রাণ পাই মৃত দেহেতে।
থাক্‌তে নারিব গিরিতে উমা গেলে ॥
দেখ উমা আমার জীবনের জীবন।
সারদা কয় হে
নারিবে গৌরী রাখ্‌তে ॥

॥ ৩ ॥

নবমী

হেরে নবমীর রজনী, কহিছেন রাণী,
শুনরে সুখের শর্ব্বরি,
হৃদি বিদীর্ণ জীবন হয় শূন্য
ওরে রজনি মিনতি করি ॥
আমার উমা বছর পরে এলেন গৌরী
তুমি পোহাইলে শর্ব্বরী,
যাবে মরে প্রাণগৌরী,
কি করি রব পাসরি।
আমার পাঁচ নাই, সাত নাই,
মা বলতে আর কেউ নাই,
রজনী গেলে ঈশানী এ পাষাণী বাঁচবে না।
ওরে নিশি, বিনয় করি তোরে, যেন পোহাস না,
সপ্তমী, অষ্টমী সুখে ছিলাম আমি
নবমী রজনী কাল হবে তা জানি না
ওরে নিশি আমি এই ভিক্ষা চাই।
যদি উমা থাকে কুলে,
আমি বিনি ছলে,
রজনী তোর পায়ে বিকাই।
তুমি হয়ো না নির্দ্দয়,
আমাকে হও সদয় রজনী।
গেলে ভবানী গৃহে থাকতে পারব না।
শুন সুখের শর্ব্বরি,
তোমায় আমি আজ মিনতি করি
তুমি যেমন নিশি তেমনি থাক
তবেই আমার থাকবে গৌরী ॥
যেমন সরোবরেতে মীন
সুখে রয় চিরদিন,
বারিহীন হলে বাঁচে না।

গেলে উমাধন, জীবনের জীবন,
ওরে আমি ত প্রাণে বাঁচব না ॥
ওরে দেখেছে কবে কোন্‌জনা
অন্ন থাকতে মরে কেউ অনাহারে।
কঠোর তপস্যা ক'রে হয়েছি উমাধনের মা।
আমার কত সাধনের ধন উমা মোর প্রাণধন।
রজনী গেলে অভয়া গৃহে থাকতে পারব না ॥

॥ ৪ ॥

বিরহ

শিংশপার ডালে বসে ডাকিছে কোকিলে।
শুনে কোকিলের রব
সখীগণ সভ হ'য়ে নীরব
ভাসিছে নয়ন-জলে ॥
বলে কোকিল রে, মধুর স্বরে
আর তো ডাকিসনারে।
ব্রজভূমি ত্যজ্য করি
মথুরায় গেছেন হরি।
সেই হ'তে আছে প্যারী ধূলায় পড়ে ॥
একে শ্যামের বিরহে প্রাণ আর বাঁচে না।
আবার অঙ্গ দহিছে সদাই মদনশরে ॥
ওরে, কোকিল রে দুধ খাবি কি মধু খাবি।
বল দেখি ভাই প্রকাশ করে।
আছেন কমলিনী আকুল হয়ে,
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ভাসেন প্যারী দুটি নয়ন-নীরে
দুঃখ নাই আর এই ব্রজপুরে ॥
ওরে পিকবর রে, মধু পিয়ে আছিস মত্ত হয়ে
পিয়ে মাধবীর সৌরভ
তোর বেড়েছে গৌরব।

আবার গুণগুণ রব
ভ্রমর যেয়ে।
সাধের বৃন্দাবন শূন্য করে গেছেন শ্যাম।
কাতর হয়ে কান্দিছেন প্যারী উচ্চস্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে হয়েছে রাই অধীরা।
যেমন চাতকিনী হয়েছে ধনী
কমলিনীর চক্ষে বহে ধারা॥
সোনার কমলিনী রাজনন্দিনী
হয়েছেন বিরহিণী।
কৃষ্ণ বিনে রাই ধনী হয়েছেন কাঙ্গালিনী॥
যেমন হারায়ে মণি বিরাজে ফণী।
রাধার দশম দশা এখন ঘটেছে।
এই সারদা কয় প্যারী ধূলায় পড়ে,
আমা বিনে আছেন ওরে কোকিল রে,
কারণ এখন কহি তোরে,
ডাকিস না আর কুহুস্বরে॥

॥ ৫ ॥

মাথুর

ব্রজপুরী ত্যজ্য করি শ্যাম রাধায়
হ'য়ে বাম এসেছে এই যে মথুরায়।
তুমি রাখাল ছিলে রাজা হ'লে
এখন পেয়েছ রাণী কুব্জায়॥
তুমি চূড়া খুলে মাথায় পাগ বেন্ধেছ,
নতুন রাজা হয়েছ,
হরি পেলে কুব্জাসুন্দরী,
আমাদের রাইকে শ্যাম নিদয় হ'য়েছ।
ছিল দুঃখের ভাগী রাই।
সুখের ভাগী কুব্জা হয়॥

গোপীনাথ এই কথা আজ বল
আমার শুনতে মনে ইচ্ছা হয়।
যখন মহাপ্রলয়ের কালে
রাইকে বটপত্র ক'রে ভেসেছিলে,
হরি তুমি, সেই ক্ষীরোদের জলে।
তখন কুব্জারাণী কোথা ছিল
কও দেখি আজ দয়াময়।
পূর্ব্বেতে কে ছিল কুব্জারাণী
কার কণ্ঠে হয়॥
তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী বটে বংশীধারী,
আমরা হই অবলা নারী
কিছুই বুঝিতে নারি,
সুবিচার করে বল দেখি হরি।
সত্য কথা বল দেখি
কুব্জার পিতা কেবা হয়॥
তুমি বটে যেমন বাঁকা।
ওহে রাণী পেয়েছ বাঁকা॥
বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল
তোমায় সেজেছে ভাল সখা।
এই মধুপুরে রাজা হ'য়েছ রাজপাটেতে।
এখন সুখের সম্পদ বেড়ে গেছে
দেখতে পাই এই মথুরাতে॥
তুমি বৃন্দাবনে যত গোপীগণে
নিবেদ দিয়ে এলে হরি।
তোমার বিরহে প্যারীর অবিরত ধারা বহে নয়নে
সারদা কয় সকল ভুল্‌লে পেয়ে রাণী কুব্জায়॥

॥ ৬ ॥

কুব্জা আছিল কংসের দাসী,
ওহে কাল শ্যাম করেছ রাজপাটেশ্বরী।

কখন কার ভাগ্যেতে তুমি থাক,
কিছুই ত বুঝিতে নারি ॥
ওহে কুভা ছিল তোমার রাজমহিষী।
এমনি কুৎসিত নারী ছিল,
তিন ঠাই তার বাঁকা ছিল,
তাকে কল্লে তুমি পরমরূপসী ॥
এখন ব্রজে তোমার রাইকিশোরীর
দশম দশা ঘটেছে।
এখন বংশীধারি আমি শুনব
আজ তোমার কাছে।
দেখলাম যমুনার কুলে
যত সব সখীগণ মিলে
রাইকে ল'য়ে কুলে
ভেসে যায় নয়ানের জলে।
তবে শ্রীরাধিকার নয়নজলে
কুলনদীর জোয়ার হ'য়েছে ॥
দেখিলাম যমুনায় এখন
সে প্লাবন হয়েছে ॥
সরস্বতী নদী ন'খ জানি,
বল দেখি শুনি চিন্তামণি
তোমার চান্দমুখে শুনি,
আমি জানি না গঙ্গা সুরধনী
ওহে এ নদীর কি নাম বটে,
শুনতে আমার ইচ্ছা হয়েছে ॥
কতই তরঙ্গে বহিছে ওহে
দেখে মনে ভয় হচ্ছে।
এ নদীর সামান্য নদী নয়।
যেমন রাম-বিরহে কেন্দেছেন সীতা ত্রেতাযুগেতে
দেখ সেই অশোকের বনে।
তেমনি দশা হয়েছে শ্রীমতীর দেখে এলাম বৃন্দাবনে।

তোমার বিরহে আর ত প্যারী বাঁচে না
নয়নজলে ভাসিতেছে।
ধূলাতে পড়ে আছে আকুল হ'য়ে
কান্দিছে ব্রজাঙ্গনা।
সারদা কয় নন্দের পরিচয়
তোমায় দিতে হইছে।

গোষ্ঠ

এই বলরামের চান্দবদন হেরে,
মিনতি করে কাতরে।
যশোমতী কয়,
আমার নীলকান্ত অশান্ত হয়।
সর্ব্বদা বলাইরে, কভু শান্ত নয়॥
হরগোরী পূজেছি দিয়ে বিল্বদল
দেখ সেই সব পুণ্যের ফলে
আমি অনেক যতনের ধন আমার নীলকমলে
আমি এ ধনে, আজ গোচারণে
বিদায় দিতে পারব না।
আজকের মতন তোরাই যা বলাই,
আমার গোপাল গোষ্ঠে যাবে না॥
আমি কুস্বপ্ন দেখলাম রেতে,
গোধূলের মধ্যেতে।
আমার নীলরতনে,
ঘেরেছে দাবানলেতে,
আমার সেই হ'তে প্রাণ কেঁদে উঠে মনে
ধৈরয মানে না॥
আমি শিবের মাথায় ঢেলেছিলাম মধু।
জেগে জেগে অনাহারে কঠোর তপস্যা করে,
অনেক সাধনে পেলাম সোনার যাদু॥

আমি সাগরে অঙ্গ ঢেলে করেছি কত কামনা
ও বাছা হলধর, এই গিরিধর,
গোষ্ঠে পাঠাব না আমি।
বনে কংসচর ফিরে দিবা রজনী,
তায় কি জান না বলাই তুমি ॥

রাইচরণ রায়

॥ ১ ॥

যশোদার উক্তি

দ্বারিকা ত্যজ্য করি রোহিণী-নন্দন।
রথে আরোহিয়ে সিঙ্গা লয়ে
ব্রজপুরে করিলেন গমন ॥
সেই ধ্বনি শুনিয়ে মা নন্দরাণী;
ব্যস্ত হয়ে, শশব্যস্ত হয়ে,
আলিরে হলধারি, কৈ আমার গিরিধারি,
কোথা আছেরে আমার রত্নমণি ॥
না হেরে গোপাল-ধনে, প্রাণ ধৈর্য্য আর না মানে,
উচ্চাগত হলো।
ইকাবলায় আলি ব্রজে গোপাল আমার কোথা রৈল
তোরা দু'জনায় গেলি মথুরা,
তরে কোথা হলিরে প্রাণের গোপাল হারা॥
আসবার কালেতে মাখন-চুরা সে কি বলেছিলো॥
নীলরতন কোনখানে রৈল।
দু'জনে গিয়েছিল মধুপুরে,
কংস যজ্ঞে নিমন্ত্রণের যজ্ঞে,
সে যজ্ঞ কল্যে সাধন, কংসকে কল্যে নিধন ॥

আবার গিয়েছিল দ্বারিকাপুরে,
এখন বল বলাই কুশল বাণী।
যখন রে এলে তোমি সে কি বলেছিল ॥
ব্রজপুরী শ্মশানপুরী প্রায় হয়ে রয়েছে।
গোপ গোপী কুল গোকুল আকুল নীরবে রয়েছে
আমার গোপাল ধন কোথা রেখে,
একা যে আলি।
আমার নীলমণির ভার তোমাই লাগে
সে সমাচার জানি সকলি ॥
তোমরা দুই সহোদররে কানাই বলাই।
নওরে ভিন্ন তোমরা একই তনু।
বিনে মোর কেলেসোনা,
একা যে গোষ্ঠে যেতো না,
আজ কেনে এমন হলো কারণ সুধাই ॥
আমি এ কারণ বুঝাতে নারি,
এতদিনে কি না বল কথা বুঝি ফুরাইল ॥[১]

উদয়চাঁদ

॥ ১ ॥

সপ্তমী

মহড়া।—উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোরে
আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম কোরে ॥

১ সংগৃহীত পুঁথি

একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী ডাক মা বোলে ॥

খাদ।—শোকের অনল ছিল প্রবল এসে নিভালে।

ফুঁকা।—আমি অচলা নারী অচলের নারী যেতে নারি,
কৈলাসপুরে আন্‌তে তোমারে।
আমার বন্ধু বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে দেখলেম না তোমারে।

মেলতা।—তুমি আসবে বোলে সঞ্জীব বিল্বমূলে,
কল্লেম বোধন তার সুফল আজ ফললো কপালে।

১ চিতেন।—সপ্তমী সুদিনে, গিরির ভবনে,
গৌরীর আগমন।
হোলো মঙ্গল উৎসব, মহা মহোৎসব,
দুর্গা-স্তব করে মহৎগণ।

ফুঁকা।—এলো এলো ঈশানী, শুনে পাষাণী,
গজ গমনে যায় ধেয়ে, দৈবাৎ দরিদ্র যেমন,
পায় অমূল্য ধন মেনকা পায় তেমন মেয়ে।

মেলতা।—লয়ে জবা বিল্বদল,
সচন্দন আর গঙ্গাজল,
উমার চরণকমল পূজে পাষাণী বলে।

অন্তরা।—শিবের কুশল আমায় বল শঙ্করি।
শিব না কি কৈলাসের রাজা
তুমি না কি রাজরাজেশ্বরী।
নারদ আমায় বোলে গেছে,
শিবের ঐশ্বর্য্য হোয়েছে বেড়েছে সম্পদ।
আছেন কুবের ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী,
হরি না কি আছেন দ্বারের দ্বারী।

পর চিতেন।—পূর্ব্বে ছিল যে ভাব, এখন নাই সে ভাব,
অভাব কিছুই নাই।
কত মণিময় হার, অভাব নাই তার,
দৈন্যতা গেছে শুনতে পাই।

ফুঁকা।—শিবের নিত্য ভিক্ষে নাই ভিক্ষের ঝুলি নাই,
ভস্মভূষণ নাই অঙ্গেতে।
কৈলাসধামেতে
এখন নাই অন্নের কষ্ট শুভ অদেষ্ট,
অন্নপূর্ণা তার গৃহেতে॥
মেলতা।—এখন শ্মশানে নাই বাস,
অট্টালিকায় করেন বাস,
সদাই গৃহেতে বাস করেন
উদয় বলে॥[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

রাই, তোমার ঐ চরণতলে
দেখ কালো মাণিক কেমন জ্বলে
সূর্য্যকান্তমণির কোলে
যেমন নীলকান্ত।
রক্তশতদলে
ভ্রমর যেমন খেলে
পায় তেমন মাণিক জ্বলে এইক্ষণে।[২]

॥ ৩ ॥

শ্লেষোক্তি

অঞ্জন-দলিত অঙ্গ খঞ্জন নয়ন
ললিত ত্রিভঙ্গ বাঁকা কে তুমি হে কদম্বমূলে।
সুখ্যাত যেমন শুনেছিলেম
সাক্ষাত জানলেম তাই।
গুণে বিখ্যাত ভদ্র তুমি
না হবে কেন বলভদ্রের ভাই।[২]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ
২ সাপ্তাহিক, ১২৮২-পৌষ, কবিগান, আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বেদান্তে সিদ্ধান্ত অতি
অষ্টম বৃহস্পতি সমপ্রণাম শুক্রাচার্য্য
দয়া গুণে দক্ষ ভূপতি
জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রের আকারে
তোমার গুণ বলিহারি যাই।

॥ ৪ ॥

গোষ্ঠ

মহড়া।—বলাই, ধর ধর সঁপে দেই করে,
অঞ্চলের ধন রতন-মণি।
পথশ্রমেতে কাতর হলে, দেখিস্ রে করিস্ কোলে,
বলরাম রে।
খেতে দিও ক্ষুধা পেলে, ধড়ার অঞ্চলে,
বেঁধে দিলাম ক্ষীর ননী॥
খাদ।—গোষ্ঠে পাঠাতে ভয়ে কম্পিত প্রাণী॥
ফুঁকা।—ওরে গোপাল আমার অবোধ ছেলে,
প্রবোধ মানে না বুঝালে,
বিপরীত ঘটায় বিপদ অভিপ্রায়,
ইন্দ্রযজ্ঞে ঘটিল দায়,
সপ্তাহ বৃষ্টি গোকুলে, গোকুল যায় রে রসাতলে,
গিরিগোবর্দ্ধন হ'তে শেষে রক্ষা পায়॥
মেলতা।—একদিন বকাসুর গোষ্ঠের পথে, ঘটায়,
ওরে বলাই রে ও ও।
সে দায়ে রক্ষা করলেন কাত্যায়নী॥
১ চিতেন।—রাখাল সব প্রভাতকালে গোষ্ঠে যায়
ত্বরান্বিত হয়ে॥
পাড়ন।—ডাকে কানাই কোথায়,
আয় ভাই গোষ্ঠে যাই আয়॥
ফুঁকা—গোধন সব আছে দাঁড়ায়ে।
শুনে রাখালের মুরলী ধ্বনি, ব্যস্ত হলেন চিন্তামণি,

শিঙ্গার ধ্বনি তায়।
ডাকে আয় রে আয়, শুনে বলে যশোদায়,
ডাকছে ঐ দাদা বলাই,
সাজিয়ে দে মা গোষ্ঠেতে যাই,
ঐ দেখ মা রাখাল সবাই, গোষ্ঠের পথে যায় ॥
মেলতা।—রাণী সাজায়ে প্রাণগোপালে গোষ্ঠের বেশে।
ভুবনমোহন বেশে গো গো।
বলাইয়ের করে ধরে বলে রাণী ॥
অন্তরা।—বলাই, গোপাল ছাড়া হ'ও না,
দেখ ভুল না, ভুল না।
দেখ যেন ক্ষুধা পেলে দাবানল পান করে না,
বলরাম রে ওরে।
অন্ন ভিক্ষা করে অবোধ গোপাল প্রবোধ মানে না ॥
পাড়ন।—কংসের অনুচরে, বেড়ায় ব্রজপুরে,
তাইতে রে মনে সন্দ হয়, বলাই রে ॥
ফুঁকা।—বুদ্ধি বিশিষ্ট, রাখাল মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠ,
জ্যেষ্ঠ সবাকার।
কারে বলিব আর, কে এখন আছে আমার,
বলি রে তোর করে ধরে,
যেও না কালিন্দীর তীরে,
দেখ, যেন যায় না জলে, দিব্য যশোদার ॥
মেলতা।—একবার কালিদহে গিয়ে গোপাল বিপদ ঘটায়,
খেদে প্রাণ যায়।
কালিয়ের মাথায় চড়ে কালো মণি ॥[১]

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

হরিমোহন আচার্য্য

॥ ১ ॥

বিরহ

পিত্তের সহিত রক্তবমন
রোগের লক্ষণ
তায় শ্লেষের কোপ।
রাধার তর্জ্জনীতে
অর্জ্জুন বায়ুর জন্যেতে
মোহনাদে জ্ঞানের নাড়ির লোপ ॥
রাধে একবার উঠে একবার বৈসে।
ক্ষণেকে মূর্চ্ছা যায়!
যেন বাতুল বাণ রোগের প্রায়
ক্ষণেকে ক্ষণেকে বিভীষিকা
চক্ষে দেখেন শ্রীরাধিকা
থেকে থেকে অনামিকা
তিন নাড়ী লুকায়!
আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব মুনি করে গণনা
এ রোগের পায় না ঠিকানা
রক্ষা পায় কিসে ॥

মুখ।—রাধার মৃত্যুযোগে।
চিত্রা গেলেন চিত্রার যোগে
এ দুর্য্যোগে আকাশ মিশে ॥
তিন তের বত্রিশের ঘরে
যোল ধরে পূরণ করে
যা থাকে বাকী সাতের সাত তাতে বাকী
তার বাঁচবার আশা কি
নশ্বর অনুস্বার বিসর্গ
তারাই প্রধান উপসর্গ

নাদবিন্দু আর তৈজসবর্গ
গেছে দ্বাদশে মিশে ॥
খোজ।—হৃদি কেবল জলে শ্রীগুরুর দোষে
২য় ফুকর।—রাধার অধ উর্দ্ধে পদ্মে-পদ্মে
ষট্‌চক্রপদ্মে
ভ্রমর নাই
ফুলে মধু নাই
সে সৌরভ নাই
হংসিনী নাই
সরোবরে মলে যে বাঁচতে পারে।
সে গিয়েছে অগ্রে সরে
দুঃখ কার কাছে জানাই।
পঞ্চত্বে পঞ্চত্ব নাই
তার বিরুদ্ধ কিরণ
চন্দ্রের সূর্য্যের নাইক জ্যোতি
গেছে আঁধারে মিশে ॥
অন্তরা।—দেখলাম আয়ুর সংখ্যা হিসাব করে
মৃত্যু রোগ জন্মিলে পরে
ঔষধে কি সে রোগ সারে ॥
একে চন্দ্র তিনে নেত্র
সাতে শূন্য বিন্দু মাত্র
তাহে তন্মাত্র
তাতে বিয়াল্লিশ আটে ছয়
ক্রমে হচ্ছে ক্ষয়
তেরয় তের পাই তার শূন্যের ঘরে।[১]

[১] কবির জন্মস্থান ঢাকা, এই পদটী শ্রীহৃদয়নাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

রসিকচন্দ্র আচার্য্য

॥ ১ ॥

উত্তর-গোষ্ঠ

প্রাণের ভাই কানাই,
গোচারণের সময় ত নাই,
চল চল গৃহে যাই।
নিশি হয়েছে,
বনে নানা ভয়
ভাবিয়ে তাই কত যে ভয় আমার মনে হয়।
কিন্তু জানি কি ঘটে পাছে সময় ভাল নয়॥
নিদারুণ কংসের চরে
সদা বৃন্দাবনে ফিরে
কখন কি সর্ব্বনাশ করে
তাই ভেবে প্রাণ কান্দেছে।
তুই বিনে আর ব্রজবাসীর কি ধন আছে॥
তোরে না হেরে মা যশোদায়
বৎসহারা গভীর প্রায়
পথ পানে চেয়ে আছে॥
ভাই, ভাই কানাই!
ভাইরে, তুই বিনে মা'র আর কেহ নাই।
নয়নের পলকে ভাইরে
মা যশোদা হারায় তোরে
এখন বুঝি তোরে বিনে প্রাণ বাঁচে নাই।
যত আমার মনেতে লয়
বলিতে বিদরে হৃদয়
ওরে ভাই কানাই!
নিশ্চয় তুই বিনে নন্দালয়ে বিষম বিপদ ঘটেছে॥[১]

১ কবিগান, বান্ধব, ১২৮২ পৌষ, কবির জন্মস্থান বিক্রমপুর।

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

মঙ্গলাচরণ[১]

মোড়া।—বাক্‌বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।
আমি অতি অভাজন, জানি না সাধন ভজন,
আমার কণ্ঠে এসে, নিজ দাসের পূরাও মনের বাসনা।
মাগো, পূজার চরণ সদা এই মন, পূরাও মনের বাসনা।
বাক্‌বাদিনী দীনতারিণী কাতরে কর করুণা।

(এই সঙ্গীতটিকে প্রারম্ভ গীতি বা মঙ্গলাচরণ বলা যাইতে পারে।)

মোড়া।—ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি।
আমি কোন গুণে পার হবো এবার ?
হাল ছেড়েছে মন-কাণ্ডারী।
ছয় জনা কুসঙ্গী জুটে, ভরা নাও নিল লুটে
উপায় কি করি ?
যদি নিজ গুণে তরাও গুরু
তবে পাড়ি দিতে পারি।
ভবনদীর তরঙ্গেতে আতঙ্কে মরি॥

॥ ২ ॥

মায়া সীতা

মোড়া।—কাটিল ইন্দ্রজিতে মায়াসীতে,
তাই দেখে বানরকুল, হ'য়ে অতি শোকাকুল
কেন্দে জানায় রামের সাক্ষাতে। (মরি হায় গো হায় !)
সীতা-হত্যার কথা শুনি, শোকেতে রাম রঘুমণি পড়িল ধরায়।
নয়ন-জলে বক্ষ ভেসে যায়, পড়িল ধরায়।
কেন্দে বলে কৈ গো সীতে, এনে গহন কাননেতে
লঙ্কাতে রাক্ষসের হাতে বিসর্জ্জন দিলাম তোমায়॥

১ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের কবিগান—দেশ, ৫ই আশ্বিন ১৩৪৭ সাল।

শুনি বিভীষণ শ্রীরামের কাতর বচন, বিনয় বাক্যেতে তখন
কয় বিভীষণে ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
যার নামে দূর হয় জীবের ভব-চিন্তে,
সেই তুমি করছ আজ সীতার চিন্তে ?
যে সীতার পাদপদ্ম, ব্রহ্মাদি দেবারাধ্য,
সে সীতা রাক্ষসবধ্য হয় কি কখন ?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে, বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
(মরি হায় গো) স্বয়ং লক্ষ্মী, মা জানকী
রাম তুমি তাই না জান কি ?
ইন্দ্রজিতের সাধ্য বা কি
করিতে তাঁর নিধন।
এনে ইন্দ্রজিতে, কাটিল মায়াসীতে,
সে জন্য কেন মিতে কর রোদন ?
ধরি শ্রীপদে, ভেব না বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
কেন মিতে ভাব বসি
রাম তোমার প্রেয়সী
বেঁচে আছে অশোক বনে।
পুরুষ তথা যেতে নারে
রক্ষা করে জানকীরে যত রাক্ষসী।
সরমা রূপসী, থাকি দিবানিশি
সেবে তার শ্রীচরণে।
কেন মিতে ভাব বসি ?

শ্রীরামচন্দ্রকে মহীরাবণের ছলনা

বিভীষণ রূপে এলে মহীরাবণ।
মায়ায় মোহিত ক'রে
যত ভাল্লুক বানরে ;
হরি নিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে
ডেকে বলে বিভীষণে পবনকুমার।

এ কি রামভক্তের ব্যবহার ?
ওরে দুষ্ট দুরাচার ;
শত্রু থেকে মিত্রভাবে
বিনাশিলে রাম রাঘবে,
এখনি তোর জীবন যাবে ;
রক্ষা করে সাধ্য কার ?
তখন বিভীষণ শুনি হনুমানের কটু বচন
রামের উদ্দেশে তখন কয় বিভীষণ—
এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয়,
রাম দয়াময় কোথায় র'লে ?
দেখ হে বিনা অপরাধে
হনুমান প্রাণ বধে,
মধুসূদন এ বিপদে, স্থান দাও রাঙাপদে বিপদভঞ্জন।
তুমি হও দুর্ব্বলের বল
নাই আমার অন্য সম্বল ,
দেখা দেও হে নীলকমল বিপদকালে।
ধরি শ্রীপদে এ বিপদ সময়,
দাসে হ'য়ে নিদয়
রাম দয়াময় কোথায় র'লে ॥
(মরি হায় গো হায়) থাকতেম যদি শত্রুভাবে
মনে প্রাণে কেন তবে,
ভাবি অনিবার কবে হবে রাবণ সংহার ? জানকী উদ্ধার ?
তবে কেন বলে সূত্র
বিনাশিলেম নিজ পুত্র ?
বধিলাম ইন্দ্রজিতে যেয়ে গুপ্ত যজ্ঞাগার ?
তোমায় হরিল মহীরাবণ মায়াবশে
সে দোষে প্রাণে বিনাশে পবনকুমার।
এ বিপদ সময় দাসে হ'য়ে নিদয় রাম দয়াময় র'লে ?
আমি জানি না শ্রীচরণ বিনে
সে চরণ সেবি ভবে পদে-পদে বিপদ কেন ?

যে চরণ পরশ পেয়ে
পাষাণ গেল মানুষ হ'য়ে ব্যক্ত ভুবনে।
সে চরণ সেবি বসে ভাবি অকূলে কূল পাইব কেমনে ?
জানি না শ্রীচরণ বিনে।

॥ ৪ ॥

রাম বনবাস

মোড়া।—ত্যজিয়ে রাজ-আভরণ, রাজবসন, বাকল পরি কটিদেশ,
রাম লক্ষ্মণ, সীতে রাজার অজ্ঞাতে গেলেন অযোধ্যা হইতে বনবাসে।
রাণী পুত্রশোকে শোকাতুরা
মণিহারা ফণাধরা ভুজঙ্গিনীর প্রায়।
(মরি হায় হায়) ধরায় পড়ি মূর্চ্ছা যায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে,
কেঁদে বলে উচ্চৈঃস্বরে
একবার এসে দেখা দেরে তোর অভাগিনী মায়।
শুনি জননী-রোদন ধ্বনি
এলেন ভরত স্নেহের খনি
কৌশল্যা রাণী ব'লে তখনি
(বাছা ভরতরে) আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে।
খোসা।—আমার শ্রীরাম পূর্ণশশী
উদয় হইল আসি অযোধ্যায়, বিরাজিত সর্বদায়।
দুঃখ অন্ধকার বিনাশি।
কৈকেয়ী রাহুর প্রায় সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে।
(বাছা ভরত রে) আমায় কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে।
ভরত তোর জননী চণ্ডালিনী
পাপিনী পতিঘাতিনী করলে এই কাজ
আমার মাথায় বাজ হেনেছে॥
ভরত রে কেড়ে নিল রাজবেশ,
গাছের বাকল পরাইয়ে শিরে জটা বেঁধে দিয়ে
সন্ন্যাসীবেশে সাজাইয়ে রামকে দিল বনবাসে।

এমন সাপিনী পাষাণবুকী বজ্রমুখী
কোন প্রাণে রামকে আমার বনে পাঠায়াছে ?
বাছা ভরত রে দুঃখের কথা কই তোর কাছে।
জীবন জ্বলে দারুণ শোকানলে কি দিয়ে শীতল হই ?
রাম গিয়াছে বনবাসে,
পতি গেছে স্বর্গবাসে ;
(আমি) রব কি আশে ?
একবার আয়রে তোরে কোলে নিয়ে জন্মের মত শীতল হই ?

পরচিতান।—কারে রামদাদা বলে ভাই সকলে ডাকিবি রে অযোধ্যা ভুবনে।
এ দুঃখীনীরে ফেলে দুঃখ নীরে
রাম আমার চলে গেছে জন্মের তরে।
বাছার চাঁদবদন আর দেখব না রে
'মা' কথা আর শুনব না রে অযোধ্যা ভুবনে।
(ভরত রে) শুনেছি জন্মের মতন।
একবার আমায় নিয়ে যা রে রামলক্ষ্মণ যথায় বিহারে
নয়ন ভরে বদন হেরে জুড়াই রে তাপিত জীবন ॥
এমন পাপিনী বজ্রমুখী কোন্ প্রাণে রামকে বনে পাঠায়াছে।
ভরত রে আমার কোলে আয় দুঃখের কথা কই তোর কাছে ॥

॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

ত্যজিয়ে শরাসন ও ভাই লক্ষ্মণ কেন ধরাতে শয়ন ?
দেখ হে মেলিয়া নয়ন !
উঠ, উঠ লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই,
আর যুদ্ধের কার্য্য নাই,
চল রে তোরে নিয়ে গৃহে যাই।
যেয়ে জুড়াই সুমিত্রা মায়ের জীবন।
বল্ দেখি ভাই কেমনে তখন
বলব মরেছে তোমার লক্ষ্মণ,
চাঁদবদনে মা বোল বলে আয় রে বাছা ধন।

এ কি ছিল আমার ভাগ্যেতে,
রাবণ হরিল সীতে,
তোরে হারা হ'লেম যুদ্ধেতে,
দেহেতে কেন রহিল জীবন ?
ভাই-হারা প্রাণ রাখিয়ে কি প্রয়োজন ?
অনুগামী ছিল অনুদিন
আজ বুঝি পেয়েছ সুদিন ?
একদিনে কি শুধিলি সব ঋণ ?
(ও ভাই) দয়াহীন হ'য়ে ত্যজলি জীবন ?
ভাই তাই ছায়ার মতন অবিরত ভ্রমিতিস বনে,
কখন রামদাদা বিনে মনোভ্রমে কোনক্রমে
অগ্রে চলিস নে ।
বল্ দেখি তবে কি কারণে
অগ্রগামী হইলি মরণে ?
মনোভ্রমে কোনক্রমে অগ্রে চলিস নে ॥
ভাই বিনে এ ছার জীবন,
আছে কিসের কারণ ?
চল জীবনে জীবন দিয়ে শীতল হই ॥

॥ ৬ ॥

ননীচুরি

গোপের ঘরে শ্যাম ননী খেল মনের সুখে ।
যত গোপী চায় ধেয়ে যায় নন্দালয়,
ক্রোধে কয় রাণীর সম্মুখে ॥
দেখ এসে নন্দরাণী, তোর নীলমণি ক্ষীরননী খেল সমুদয়
এত আহ্লাদ ভাল নয়, পরের প্রাণে বল কতই সয় ?
সাবধানে রেখ ছেলে, আবার ননী খেতে গেলে,
মানব না রাজপুত্র বলে তোমাকে বলিলাম নিশ্চয় ।
ক্রোধে রাণী কৃষ্ণের করে করিলেন বন্ধন ।

নিদারুণ বন্ধনের জ্বালায় কেঁদে বলে কেলে সোনা
যশোদে গো মা !
সহে না, প্রাণে সহে না বন্ধন যন্ত্রণা,
তোর কি দয়া নাই মা ?
আর আমাকে বাঁধিস নে মা কই শপথ করি।
মা তোর চরণে ধরি, আর ননী করিব না চুরি,
ননী খেয়ে হ'লেম দোষী, আমা হ'তে ননী বেশী
বেচে আভরণ মোহন বাঁশী, দিব সব ননীর কড়ি ॥
মা হ'য়ে বিমাতার মত দেখি আচরণ,
ছেড়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন, আর তোকে মা বলিব না।
যশোদে গো মা, সহে না প্রাণে সহে না বন্ধন্ যন্ত্রণা ॥
প্রতিবেশীর ননীর তরে, উদূখলে বাঁধিলি মোরে
ভাবিলি না মনে।
যদি আমার জীবন যায় গো এখন দারুণ বন্ধনে,
ধূলায় লুটে, মাথা কুটে কেঁদে আমায় পাবি না,
যশোদে গো মা !
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলাম আচরণে।
কে কোথায় এমন বন্ধন করে আপন সন্তানে।
সন্তানের মুখ দেখলে পরে আর কি তখন সইতে পারে ?
ব্যথা পায় প্রাণে।
আমাকে পরের ননীর তরে বাঁধিলি কোন্ প্রাণে (গো)
দয়া নাই হৃদয়ে মা যশোদে জানিলেম আচরণে ॥
পুত্রের প্রতি তোর নাই মমতা নন্দরাণী,
মা বলিয়ে ছেলে কাঁদিলে, মায়ের কোলে নিয়ে,
খেতে দেয় ক্ষীর-ননী
কত বিনয় ক'রে কাতরে তোর চরণ ধরে
করিলাম ক্রন্দন।
ছেড়ে দে করের বন্ধন, শুনিলি না মা তুই বা কেমন ?
মুনিগণের মুখে শুনি 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'
সে বাক্য হ'য়ে জননী কি জন্য করিলি লঙ্ঘন ?

মা হ'য়ে পুত্র ব'লে নাই গো তোর ব্যথা।
বুঝলি না মা তুই সে মমতা,
আর তোকে মা বলিব না।
(যশোদে গো মা) আর তোকে মা বলিব না।

॥ ৭ ॥

রাধার বাসরে অভিসারে যাবেন ব'লে
শ্রীনন্দের নন্দন,
চন্দ্রার প্রেমে হ'য়ে মগন,
করলেন যামিনী যাপন।
না হেরি নাগরে, বৃন্দেকে রাই কয় কাতরে, কি করি বল ?
নন্দের ভেরী বাজিল
বকুল বনে কোকিল ডাকিল,
তারা গণলাম সারা নিশি,
এল না ত কালশশী,
অস্তাচলে গেল শশী, ঐ দেখ নিশি ভোর হইল।
বৃথা নিশি কুঞ্জে বসি, কল্ল'াম নিশি জাগরণ।
আশা দিয়ে মদনমোহন দাসীরে করল বঞ্চনা।
বল্ বৃন্দে সখি কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।
প্রেমাবেশে কুঞ্জে এসে, শয্যা করি আছি ব'সে শ্যাম আসার আশে।
ঐ যে নিশির শেষে, কালভুজঙ্গে দংশিল এসে,
বিনা সখি, হৃষীকেশে, দারুণ বিষে প্রাণ বাঁচে না।
বল্ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না।
মনের বাসনা আমার পূর্ণ হ'লো না।
কত যতন করে সাজাইলাম স্তরে স্তরে
মনোহর সব ফুল।
যাতে মত্ত অলিকুল,
জাতী, যূঁথী, মালতী, বকুল, চম্পক, বেল, মল্লিকে,
সেঁউতি, গোলাপ, শেফালিকে, কেতকী, কৃষ্ণকালিকে,
সৌরভে হয় প্রাণ আকুল।

কত কষ্ট করে গেঁথেছি মালা,
(সই গো) দিব বলে বধূর গলায়,·দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না
বল বৃন্দে সখি, কেন আমার কমল-আঁখি কুঞ্জে এল না ॥

ঝুমুর।—ছি ছি একি লজ্জা, ফুলের সজ্জা নিয়ে আয় গো জলে।
তুলেছি ফুল রাশি-রাশি
সে সকল ফুল হল বাসি,
দুঃখে প্রাণ জ্বলে।
বল্ সখি, বিনে কমল-আঁখি কাজ কি বাসি ফুলে ?
ছি, ছি এ কি লজ্জা, ফুলের সজ্জা দিয়ে আয় গো জলে ॥

পরচিতান।—সই, বনে বনে, ভ্রমণ করি গোপীর সনে ;
ঐ দেখ সেই সব ফুলে,
রইতে দিল না গোকুলে, কি করি উপায় ?
যেমন শক্তিশেলের প্রায়, গোকুলের ফুল হানিয়া বেড়ায় ॥
জাতির জন্য জাতি গেল,
অশোকেতে শোক বাড়িল, গোলাপ এসে
প্রলাপ হ'ল চাঁপায় হ'ল সর্ব্বনাশ।
কত কষ্ট করে সখি, তুলেছি সব ফুল, সাজাব আজ রসরাজে
দাসীর ভাগ্যে তাই হ'ল না।
বল্ বৃন্দে সখি, কেন আমার কমলআঁখি কুঞ্জে এল না ?

নিমাই সন্ন্যাস

মোড়া।—ত্যজি গৃহবাস, নিমাই সন্ন্যাস করিতে গ্রহণ,
ভারতীর সনে মিলিতে বাসনা মনে কাটোয়া করিলেন গমন।
শুনে শচীরাণী, পুত্রধনের কাঙ্গালিনী হ'য়ে নদীয়ায়,
যেন পাগলিনীর প্রায় কেঁদে-কেঁদে রাজপথে বেড়ায়।
বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে, কেঁদে বলে উচ্চরোলে
নিমাই আমার কোথায় র'লে ? একবার দেখা দে আমায়।
হৃদে জ্বলে পুত্রশোকে দারুণ হুতাশন।

ধীরে ধীরে রাণী তখন বলে নগরবাসীর কাছে,
বল নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্ পথে গেছে ?
ঘোষা।—নিমাই আমার পূর্ণশশী দুঃখ-অন্ধকার বিনাশি হইল উদয়।
বাক্য-সুধা বর্ষি জুড়াইত তাপিত হৃদয়।
ভারতী কালরাহু এসে সে চাঁদ আমার গ্রাস করেছে!
বল নগরবাসী অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্ পথে গেছে ?
নিমাই বিনে ত্রিভুবনে আমার আর কে আছে ?
যে দুঃখ অন্তরে জাগে ব্যথিত অন্তরে জানাব কারে ?
জানবে কি জন্মান্তরে ? বলতে দুঃখে হৃদয় বিদরে।
পুত্রশোকের কেমন বেদন, যাঁর হ'য়েছে সে জানে কেমন ?
দিবানিশি জ্বলে জীবন, না হেরে বাপ নিমাইরে।
নিমাই বিনে শূন্য ঘরে রুব কেমনে ?
জীবন ত্যজিব জীবনে, এ ছার জীবনে কাজ কি আছে ?
বল, নগরবাসী, অভাগিনীর নিমাইশশী কোন্ পথে গেছে ?

রামগতি

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে রইলেন রসময়,
তাঁরি আশাতে—বৃন্দে-চিত্রে-ললিতে
মন-সাধে নিকুঞ্জ সাজায়।
তুলে চাঁপার কলি,
গন্ধরাজ ফুল, সন্ধ্যা-মণি, মালতী, বকুল,
তুলে মনসাধে বনফুল,
টগর, বেলী, শেফালিকে,
কৃষ্ণচূড়া, কাঠমল্লিকে—
কৃষ্ণ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল

না পেয়ে সে কৃষ্ণের দেখা, কাতরা হইয়ে,
সখীগণের বদন চেয়ে, বল্‌তেছে ললিতের কাছে-
আর নিশি নাই, প্রাণ সই লো !
শ্যামের আসার আশা কি আছে ?
বধুঁ আসবে বইলে,
মনসাধে কুসুম তুলে গেঁথেছিলাম হার—
মনে বাসনা ছিল আমার—
বকুল, বেলী, শেফালিতে
হার গেঁথিছি বিনাসুতে ;
ভুলাইতে নন্দের সুতে, গলে দিতাম তাঁর ।
যাঁর আশাতে কুঞ্জে বসি,
জাগিয়ে পোহালেম নিশি
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই ।
আশাতরুর তলে বসে,
ছিলাম সখি, ফুলের আশে,
অভাগিনীর কর্ম্ম দোযে,
ডাল ভেঙ্গে সব ফল নিয়াছে,
আর নিশি নাই, প্রাণ সই গো !
শ্যামের আমার আশা কি আছে ?

মহেশ চক্রবর্ত্তী

॥ ১ ॥

প্রভাস

চিতেন ।—যজ্ঞপত্র পেয়ে চললেন ব্রজবাসিগণ,
যশোদা কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রভাসেতে
কর্‌লেন আগমন ।

অন্তরা।—গিয়ে যজ্ঞদ্বারে দ্বারীরে কয়
ওরে তোরে করি বিনয়।
দ্বার ছেড়ে দে যাই
যজ্ঞ দেখ্‌তে যাই
দেখতে চাই ওরে দ্বারিরে,
অন্য আশায় আসি নাই।
বলি দ্বারি, বিনয় করি
প্রভাসে যে যজ্ঞ করে
এলেম বড় বাঞ্ছা করে
(দ্বারি) একবার তারে দেখে যাই।
মিল।—কাঙ্গালিনী বলে দ্বারি করে তাড়না
কেন্দে বলে নন্দরাণী ধারা বহে নয়নে।
মহড়া।—ডাক রে গোপাল মা মা বলে
কার মায়াতে র'লি ভুলে
মা বলে কি নাই রে তোর নয়নে ?

রামু সরকার[১]

শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ

চিতান।—শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ করলেন প্যারী—
পারান।—কুঞ্জভঙ্গের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়
খুঁজলেন বাঁশরী।

১ রামু সরকারের কবিগানগুলি সৌরভ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ ১৩২১; হইতে সংগৃহীত।

লহর।—বাঁকা ত্রিভঙ্গ—সশঙ্কিত হইয়ে অতি,
সন্দেহ করলেন রাধার প্রতি ;
অমনি কৃষ্ণ সকাতরে, ধরে রাধার যুগল করে
কেঁদে বল্লেন ধীরে ধীরে,
(আমার) বাঁশী দাও রাই শ্রীমতী।

মিল।—রাই গো! বাঁশী মোর সর্ব্বস্ব ধন, তুমি জান
এ দাস এ ধনে বঞ্চিত হ'লে উপায় বল ?

মহড়া।—মোহন বাঁশী দাও রাই, এখন বিদায় চাই,
সুখের নিশি প্রভাত হোল।

ধুয়া।—প্যারি, জাগ্‌ল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে।
করে গুণ্ গুণ গুণ্ ভ্রমর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মনের সুখে হাসে, হেরে প্রাণেশে
তাই দেখে কুমুদিনী লজ্জায় মুদিত হোল।

খাদ।—লক্ষ্য সাধনের মুখ্যযন্ত্র বাঁশী ছিল।

লহর।—ওগো রাধে গো! বাঁশী বিনে ভাসি অকূলে,
বেঁচে কাজ কি আমার গোকুলে!
গোষ্ঠে গেলে গহন বনে,
কোকিল পঞ্চম তানে ডাকি তোমায়।
বাঁশীর গানে, আমি ভাসি সুখ সলিলে।

অন্তরা।—সাধনের ধন বংশী রতন, অযতনে গেল।
নিয়ে এই মুরলী, ঠাকুরালি গোকুলে মোর ছিল।
কত না সাধন করে, পেয়েছিলাম বাঁশরীরে,
হায় মরি কি হোল!
বাঁশী বিনে বৃন্দাবনে কি ধন আছে বল ?

লহর।—ওগো রাধে গো! বাঁশীর প্রতি কেন তোমার মন ?
কুলবধূর কিবা প্রয়োজন ?
একে তুমি পরাধীনা—ঘরে আছে ননদিনী ;
বাঁশী দেখ্‌লে রায়বাঘিনী করবে কত জ্বালাতন।

॥ ২ ॥

বসন্ত

চিতান ।—যুদ্ধবেশে, মদন এসে উদয় বৃন্দাবন ।

পারান ।—করে কুসুম-ধনু, কুসুম-শর,
কোকিল, ভ্রমর সহচর
সঙ্গে গতি ধীর মন্থর মলয় পবন ।

লহর ।—দেখে মদনের কুঞ্জ দ্বারে
সখি সবে পরস্পরে করে আলাপন ।
বলে উপায় কি এখন ? হায় ! এসেছে মদন,—
বিচ্ছেদ বাণে বিঁধা প্যারী
মদন এলো ধনুক ধরি
বল কিসে রক্ষা করি,
রাধিকা-জীবন ।

মিল ।—বিশাখা কয় ললিতাকে মনে পেয়ে ভয়,
ঘটিয়াছে কি অসময় রসময় বিনে ।

মহড়া ।—বল্ গো ! সখি ললিতে, বিধুমুখী রাইকে
প্রাণে রাখি কেমনে ॥

ধুয়া ।—মদন সেজে ফুলের সাজে,
প্রবেশিতে কুঞ্জ মাঝে, উদ্যত এখন ।
অতনুর তনু দেখে, চমকিত মন,—
আতঙ্কেতে কাঁপে অঙ্গ, দেখে অনঙ্গের রঙ্গ ।
কিসে মদন দিবে ভঙ্গ, কও আমার স্থানে ।

খাদ ।—বিচ্ছেদের দেশেতে মদন এলো কি জন্যে ?

লহর ।—আশা ছিল হৃদ্‌কমলে
শীতান্তে বসন্ত এলে,
আসিবে মাধব, করব বসন্ত উৎসব
হায় আমরা সখি সব,
সে সাধে বিষাদ ঘটিল,
কি ভাবিলাম কি হইল,
মদন এসে দেখা দিল, একি অসম্ভব ॥

মিল।—কি দিয়ে করব এখন মদনকে বারণ
বিনয়ে না হয় নিবারণ, প্রমত্ত রণে।

॥ ৩ ॥

কবির লহর

চিতান।—অর্জ্জুন আমার নামটি বটে,
আমি হই পাণ্ডু রাজার নন্দন।
পারান।—একটী তত্ত্ব পেয়ে,
সত্য জানতে উন্মত্তের প্রায়,—মরি হায়!
এসেছি দ্বারকা ভুবন॥
লহর।—হায় মরি হায়, কি সর্ব্বনাশ, ঘটালে এসে অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—হায়—হায় রে
বিধি শিব নারদ নরে, যে চরণ চিন্তা করে,
সে পদে তুই কোন্ বিচারে, করলে শরাঘাত।
মিল।—তোর অঙ্গ কালো, চক্ষু রাঙ্গা,
আমার যে দেখে করে ভয়
তুই কোথায় ছিলে, এথায় এলে
বল শুনি তুই কার তনয়?
মহড়া।—কেরে, তুই জংলী মস্তা,
নাইরে তোর ধর্ম্মে আস্থা
বুদ্ধি খাস্তার পেলেম্ পরিচয়।
ধুয়া।—যে কৃষ্ণ জগতের সার, তারে তুই করলে সংহার,
দুরাচার কেমন তোর অন্তর?
লক্ষ্মীসেব্য বিধি-ভাব্য, কৃষ্ণ কলেবর
তোর মত দেখি না বর্ব্বর,
জানলাম তোর পশু হৃদয়॥
খাদ।—তোর মত দেখি না এমন দুষ্ট দুরাশয়!
লহর।—তোর জংলীর প্রায় জংলী স্বভাব,—
সর্ব্বদা থাকিস্ জঙ্গলে,
তোরে মানুষ কে বলে?

হায় হায় রে, তীর ধনু হাতে রাখি
সর্ব্বদা মারিস্ পাখী, পরম ধন কমলাখি
(তাঁরে) মারলে কি বলে ?

মিল।—যে শরে প্রাণ কৃষ্ণ মরে,—
কে তোরে দিল এমন শর,
জান্‌তে চাই তোর্ আদত খবর,
ভেঙ্গে বল্‌রে সমুদয়।

অন্তরা।—মরি হায় কি উপায়,—
কুলনারী অকুলেতে ভেসে যায়।
কান্দেছে কৃষ্ণ শোকে সর্ব্বদায়।
জীবন-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকায়,
কৃষ্ণ সকলের উপায়,—
কেন সেই কৃষ্ণকে বধ করিয়ে
জগৎ করলে নিরুপায় ?

পরচিতান।—দয়ার সাগর, শ্যাম নটবর
কি তাঁহার ছিল অপরাধ ?

পারান।—তুই কি আক্রোশে, কিবা দোষে ঘটালে প্রমাদ,
তোর সঙ্গেতে কৃষ্ণের কি ছিল মনোবাদ ?

লহর।—দয়ার সাগর কৃষ্ণচন্দ্র,—
নিদয় কেন্ হলে তাঁর প্রতি ?
তোর একি কুমতি ? হায় ! হায় রে !
সাধে বিষাদ ঘটালে, পাপের তাপেতে জ্বলে,
ঘটবে রে ! তোর অন্তকালে
বিষম দুর্গতি।

॥ ৪ ॥

নহর কবি

চিতান।—রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম্ম অবতার।

পারান।—বড় বাঞ্ছা করে, এসেছি চরণ দেখবার তরে
বর্ণিবারে সাধ্য কি আমার ॥

লহর।—যেমন ইন্দ্রপুরী, তেমনি মহারাজের বাড়ী, অমরা সমান।
কত নৃত্য, গীত গান, হচ্ছে অবিরাম;
স্থাপিত আছেন দশভুজা, বাহির বাড়ী দুর্গাপূজা
ত্রেতায় যেমন শ্রীরাম পূজা
এমনি হয় মোর জ্ঞান।
মিল।—ধর্ম্মেতে যুধিষ্ঠির তুল্য, চন্দ্রতুল্য রূপ,
আমি মূঢ় কি বলিব রূপ গুণের নাই তুলনা।
মহড়া।—গোলকের নাথ গোলক ছেড়ে, রাজকুলেতে দুর্গাপুরে,
এক অংশে জন্মিলেন চারি জনা।
দানে বটেন মহাদানী, মানে বটেন মহামানী
এ জগতে নৃপমণি আমি আর এমন হেরি না।
খাদ।—পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে করেন মন্ত্রণা
মহড়া।—আছে নবত (নহবত) খানা,
আর দক্ষিণে নায়েবের থানা,
বাগানের কাছে, আনন্দ বাজার আছে।
বড় পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে, আমলা পট্টি শোভা করে,
বাঘের দালান পশ্চিম পারে, আজব কারখানা ॥[১]

তারাচাঁদ

॥ ১ ॥

ভবানী-বন্দনা

মাগো, আমারে আনিয়া ভবে
করলে আমার কি সর্বনাশ!
ভবের হাটে এ সঙ্কটে দিলে পাঠাইয়ে
করব বলে সুখের গৃহবাস।

১ সৌরভ, মাঘ-১৩২১; এই পদটিতে সুসঙ্গাধিপতির রাজবাটীর বর্ণনা বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে মহারাজারা চারি ভাই,—রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন।

তাতে অন্ধ হ'য়ে বদ্ধ থাকায়
চিন্তা হইয়াছে
ধরায় সুহৃৎ কে আছে, মা আমার গো
কেবল নামে মাত্র হই তারাচান্,
দিবারাত্র রাখছ সমান্,
তা'তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান
মাগো, প্রাণ কেমন বাঁচে ?
দিবানিশি থাকি বসি, কর্ম জানি না
নাই সুহৃৎ একজন, বাঁচায় এ জীবন
ঐ চিন্তায় নিদ্রা হয় না।
দুর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ
আমার দুঃখ যে মা চক্ষু দিলে না !

॥ ২ ॥

লক্ষ টাকা কর্জ্জ কইরে ভবের হাটে আই,
হায় গো !
পরের হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মাগো
আসলে নব্বই হাজার নাই।
আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে
দেনা হ'তে মুক্তি পাই ?
তারিণী, দীনতারিণী গো, অধীনের গতি
কেমনে পাই ?
হ'ল না আমার হাটবাজার
আসতে পথে দিন কাবার
আমার বিকিকিনি নাই ?
আমি বদ্ধ হ'য়ে অন্ধকারে পথ দেখনের
চক্ষু পাই ![1]

[1] কবি ১৬।১৭ বৎসর বয়সে দারুণ বসন্তরোগে অমূল্যরত্ন চক্ষু দুইটী হারাইয়াছিলেন, কবি তাই দুঃখে এই গান গাহিয়াছিলেন। (সৌরভ)

মনোমোহন বসু

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

মহড়া।—যোগী বেশে আ'জ্ কোথায় চ'লেছ ?

বল শ্যাম্, গুণধাম্, মনের রাগে কি বিরাগে, কিবা কার সোহাগে
বিবাগী গৃহত্যাগী হ'য়েছ ?
বিভূতি অঙ্গে মেখেছ !
যেতে যেতে, শ্যাম্, কেন শঙ্কা পাও ?
যেন কারে দেখে, দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রাদাসীর দিকে, একবার ফিরে চাও !
কত সুহাসে, সুভাষে, সুরসে, সন্তোষে, বিলাসে দাসীরে কাল্ তুষেছ !

চিতেন।—অমল শ্যামল তব কমলবদন্,

আহা ! মলিন হ'য়েছ হরি বল কি কারণ্,
একি ভাব, আ'জ তব, দেখি শ্যাম্ ?
অঙ্গ থর থর, কাঁপে নিরন্তর,
আঁখি ! নীরধার, ঝুরে অবিশ্রাম,
নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, একি হে রহস্য ?
কেন হে ঔদাস্য ভাব্ ধ'রেছ ?

॥ ২ ॥

মহড়া।—বিনয় করি শ্যাম্, গৃহে ফিরে যাও।

ব্রজরাজ্, পাবে লাজ্,
একবার ভাঙতে গে রাধার্ মান, ভেঙেছ আপনার মান্
আবার্ কি সেই হতমান্ হ'তে চাও ?
যেয়ো না আমার্ মাথা খাও।
আহা মরি ! আর্ হরি, কেঁদো না !
থাক সুদিন স'য়ে, যাবে সেধে নিয়ে,
রাগের মাথায় গিয়ে, এখন সেধো না !

বঁধু, একবার্ তো গিয়েছ, পায়ে, ধ'রে সেধেছ,
বারেবার্ পদাঘাত্ আর্ কেন খাও ?
চিতেন।—চতুরালি বনমালি খা'ট্‌বে না এবার্।
রাধা জেনেছে কপট প্রেম্ যেমন্ হে তোমার্!
ভেবেছ কি, ছাই মেখে ভুলাবে ?
তোমার বাঁকা নয়ন্, বাঁকা ভঙ্গী-চরণ্, ভৃগু-চিহ্ন ধারণ্, কিসে লুকাবে?
হেরে তোমারে সমক্ষে, চিন্‌বে রাই কটাক্ষে,
পরীক্ষে ক'রে কেন লোক্ হাসাও ?

মহড়া।—তোমায়্ নিয়ে শ্যাম্ বড় হ'লো দায়্।
কেশব, কি কব,
দেখি স্বভাবে অভাব, প্রলাপ যে তব, মাধব
এ বিকারে কি উপায় ?
দেখিলে বিদরে হৃদয়।
সেধে কেঁদে, আর তোমার্ শক্তি নাই।
এবার্ তোমার্ হ'য়ে, না হয়্
আমি গিয়ে, দুটো ব'লে ক'য়ে, রাধারে বুঝাই।
যদি কথায়্ না ফিরে চায়, সাধ্‌বো তার ধ'রে পায়্,
আর তোমার্ এ দশা কি দেখা যায় ?
চিতেন।—এত সাধা, এত কাঁদা, এত ভয় যদি ;
তবে মজিলে মজালে কেন, হে গুণনিধি ?
আমি মরি, তায়্, ক্ষতি নাই হরি।
ব্রজের বংশীধারী, হ'লো জটাধারী, ওরূপ্ সইতে নারি, বল কি করি ?
তোমার্ বিভূতি বিভব, এ নহে সম্ভব, এ সব শব সাধনেরি প্রায়।[১]

১ 'মনোমোহন গীতাবলী' হইতে তাঁহার সকল সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১ ॥

সখীসংবাদ

ওহে কৃষ্ণ মধুকর হে, আর কেঁদ না ফুলে ফুলে।
তুমি যেমন বেড়াও ফুলে-ফুলে,
তেম্‌নি দায় হে ঘট্‌ল গোকুলে ;—
কেঁদ না রাধা বলে সে রস রঙ্গস্থলে,
যাও চ'লে, বঁধু, বনে যথা ব'সেছিল, নূতন ফুলে,
কুঞ্জে শ্রীরাধার ধরে পদে, পদে-পদে রসময়
হ'য়ে অপমান তায়, কেঁদে শ্যামরায়,
রাজপথে প্রভাত সময়।
দে'খে তখন বৃন্দা কয় অমনি,
বলেছিলাম তখনি রাই ধনী মানে উচাটন—
কৃষ্ণধন, শুনলে না সে নিবারণ ;
কুঞ্জে গেল হাসতে হাসতে
প্রেম-সাগরে ভাসতে ভাসতে
আবার বঁধু কাঁদতে কাঁদতে, এলে কি কারণ।
বুঝি পায়-পায় পায় হে বঁধু অনুপায়,
কি উপায় হে !—ফুলে বস্‌বে কি,
বিচ্ছেদের ঘা দে'ছ মূলে !
ভেস না হে বঁধু অকূলে।
ওহে কৃষ্ণ ! এ কি প্রেমের সান্নিপাত।
কোথায় গিয়ে পাত্‌লে পাত ?
মান নিপাত, চক্ষে অশ্রুপাত,
কি উৎপাত শিরে যেন উল্কাপাত ;—
রাধাপদ্ম ত্যজে হেলায়
হেলায় গিয়ে বসলে হেলায়,
এখন কেন প্রভাত বেলায় কাঁদতে এলে নাথ।

মরি হায়! হায়! হায় হে!
এ কি হ'ল দায়; প্রেম দায় হে!
দেখে শ্যাম কান্না পায় সব নারীর কুলে ॥
বঁধু শুনলে না দুঃখিনীর কথা কুঞ্জে যেতে যেতে,
বলেছিলাম ওহে বঁধু রাই পদ্মে বাড়ন্ত মধু,
ওহে মধুকর! গিয়ে কি অপমান,
রৈল না মান, হাস্‌লে নারী জেতে ॥

॥ ২ ॥

তুই নাকি রসিক-নাগর, রসের সাগর,
ভাবের সাগর কৃষ্ণধন!
গুণের সাগর শ্যাম হে প্রেমসাগর হে,
ভবসাগরে কর তারণ।
ওহে কৃষ্ণ, প'ড়ে, মানের সাগরে,
এই ব্রজনগরে, নাগর হে!
কেঁদে বেড়াও শ্যাম! গুণধাম,
ব'লে রাধা রাধা নাম ;—
সজ্জা দেখি ছিন্ন-ভিন্ন, অঙ্গে রাধার পদচিহ্ন,
কৃষ্ণ হ'লে কৃষ্ণবর্ণ, কষ্ট অবিশ্রাম।
বঁধু, যাও যাও, যাও যাও হে বঁধু, এ সময়
রসময় হে, দেখ অসময়
সুধা দিলে কেউ না ভুলে ॥[১]

॥ ৩ ॥

সখি! এ দানী কে ও যমুনায় ॥
প্রাণসই রে, এমন দেখি নাই :—
দানীর শ্রীমুখ সরোজে, মুরলী গরজে,
গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায় ॥

১ বাঃ গাঃ

এ দানি এ দানী সই, কে গো ঐ,
আহা মরে যাই, অপরূপ রূপ অনূপ,
এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই।
নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার ;
দানী কিসের আশে, আমার কাছে আসে,
ক্ষণেক হাসে ভাষে নাশে অন্ধকার।
মরি কি রঙ্গ! ত্রিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ,
অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।
দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ ;
আমায় ছলে ছলে, প্রেমকথা বলে বলে
আবার বলে রাধা দেহ দান।
হ'ল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায় ॥[১]

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ, দেখে তোমার এ দুর্দ্দশা,
ভগ্ন দশা, প্রাণ দয় ;
এখন সে ভাব নাই হে, সে রস নাই হে,
রসে বিরস হে রসময়।
ওহে কৃষ্ণ, ছিল প্রেম সুধাময়,
আপনি করলে বিষময়, অসময় যাও হে বংশীধর,
বল্‌ব কি তা গুণধর!—
আমার কাছে দিলে ধন্না, অরণ্যেতে যেমন
জোর দিতে কি পারে পান্না ভগ্ন হলে পর,
এ সে নয়, ও নয় হে, কারো সাধ্য নয়, দয়াময় হে,
কান্না, তুমি অসাধ্য প্রেম ভেঙ্গেছে কেন ভ্রমে।
কাঁদলে এখন কি হবে নাথ, ঘট্‌ল দশা কপালক্রমে ॥

---

১ বাঃ গাঃ

আগে ছিল তোমার রাধার সাধা,
সে রাধা হে শ্রীঅঙ্গের আধা।
সে রসের নাগরালি, গিয়েছে বনমালি।
তাই বলি তোমার কাল হ'ল চন্দ্রাবলী!
সাধের প্রেমে একি দায় হে বৃন্দাবন ধামে॥
শ্যাম হে, ব্রজে কি দায়ে রাইপ্রেম দায়।
অমনি কৃষ্ণপ্রেম দায়, এ কি দায় হে গোকুলে
অকূলে ভাসিলে আর ভাসিলে,—
সৃষ্টিছাড়া একি সৃষ্টি প্রেম হ'ল অনাবৃষ্টি
ঘটল চন্দ্রাবলীর দৃষ্টি, তোমার কপালে!
বিচ্ছেদ হয় ওহে বঁধু, এমন নয় সৃষ্টিময় হে।
বেঁচে থাকি ত দেখ্‌ব আরো কত ক্রমে ক্রমে॥
হয় হে ভাব্‌লে ভাবনা বৃদ্ধি, ভাবছ কেন হরি,
দশা মন্দ হ'লে পর, লোকে তীর্থ-যাত্রা করে,
তাই বলি হে শ্যাম,
মেখে ভস্মরাশি, যাও হে কাশী, কুঞ্জ পরিহরি।
ওহে, প্রিয়ে যায় বিবাস করে,
তার কি ঘরে প্রয়োজন।
হ'ল কি গ্রহেতে নিগ্রহ হে,
অকালেতে লাগিল গ্রহণ।
শ্যাম হে, এখন যোগী হয়ে তীর্থে যাও,
প্রেমে জলাঞ্জলি দাও,
ক্ষমা দাও হে কালশশি,
শ্যামশশি, সাজো নবীন সন্ন্যাসী।
রমণীর মান কেন বাড়াও,
আপনি সাধো পরকে সাধাও;
কেন হে আর কেঁদে কাঁদাও, চ'লে যাও কাশী।
এখন জয় জয় জয় দাও হে বঁধু, চন্দ্রার জয়; রসময় হে!
মিছে কাজ কি আর বিচ্ছেদ জ্বালার পরিশ্রমে॥[১]

১ বাঃ গাঃ

॥ ৫ ॥

সখীসংবাদ

চিতেন ।—দুর্জ্জয় মানেতে হয়ে হতমান,
কালাচাঁদ সেই মানের করতে শেষ—
ব্রজরাজ ত্যজে রাখাল সাজ
ধরলেন আজ যুবতীর বেশ ॥
কপালে আজ সিন্দূরবিন্দু সহাস্য বদন,
তাহে সজল নয়ন পরে,
কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা করে বিজলী যেমন ।
দেখে মনমোহিনী মনের সন্দে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখী বৃন্দাবন কি করতে এলি রসাতল ।
মহড়া ।—নবীন বিরহিনী বিদেশিনী কোথা যাস্ গো বল্ ।
কুঞ্জবনে ধীরে ধীরে কি জন্যে চাস্ ফিরে ফিরে,
নয়নেরি নীরে নীরে, ভাসে শতদল ॥
চঞ্চলা চপলার মত নিতান্ত চঞ্চল ;—
হরি ভয়ে করী যেমন পলাইয়ে যায় ।
সখি দেখি তোর তেমনি ধারা, ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা, কভু ভাল নয় ।
এলি কি ছলে এ বৃন্দাবনে, ভ্রমিতেছিস্ বনে বনে,
কি আছে তোর মনে মনে, মনের কথা খুলে বল ॥
অন্তরা ।—কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতি গো
গলায় গজমতি দুলছে ।
কবরী আ মরি কি শোভা পায়,
কনকচাঁপা তায় ঝুল্‌ছে ॥
অঙ্গে সোনা, কানে সোনা,
কিন্তু যে সোনা গোকুলের ধন,
প্যারী তায়, দুর্জ্জয় মানের দায়,
দছে মানকুণ্ডে বিসর্জ্জন ।

চিতেন।—সে অবধি কুঞ্জে কেহ সুখী নাই।
ভাসে শুকসারী নয়নজলে,
কোকিল কাঁদে তমালডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে, কুঞ্জে কাঁদেন রাই।
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,
কেউ কারো কথা শোনে না,
বিরহেতে প্রাণ বাঁচে না, দুঃখ বহে চক্ষে জল ॥
অন্তরা।—দেখে তোর ভঙ্গী রঙ্গিণী গো,
যেন চেনো চেনো জ্ঞান করি।
সদা সন্দ মনে, তাইতে ধ্যানে,
কিছু বলি বলি বোল্‌তে নারি ॥
চিতেন।—ক্ষীরোদ মথনে যেমন নীরদবরণ।
দেবাসুরে করে ছলা মন্‌মোহিনী চিকন কালা,
যোলকলা দেখে কালার ভুলে গেল মন।
অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই, এলো-থেলো দেখ্‌তে পাই,
চলে যেতে রাজপথে,
ধূলাতে লুটায় অঞ্চল ॥[১]

বিরহ

॥ ৬ ॥

১ চিতান।—সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয়।
১ পরচিতান।—হেরি পদ্মের উপর পদ্ম আবার
তাতে বারি রয়।

---

১ "আড়িয়াদহনিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নিম্নলিখিত 'সখীসংবাদটী' পাঠান ও এমন সুন্দর গীতের রচয়িতার নাম না পাওয়ায় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি বহু অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের রচিত, কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। গদাধর মুখোপাধ্যায়েরও এই ভাবের একটী গীত পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" —কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—গুপ্তঃ। বাঃ গাঃ-তে সাতু রায়ের নামে প্রচালিত, 'প্রীঃ গীঃ' গ্রন্থে ইহা অজ্ঞাত কবির রচনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১ ফুকা।—মুখপদ্মে নীলপদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মে বহে জল, মুখ শতদল,
ভাসিছে দেখ গো সখী।
১ মেল্‌তা।—আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই;
কমলের জলে কমল ভেসে যায়।
মহড়া।—তোরা দেখে যা গো সখী হল এ কি দায়
তোরা দেখ্‌ ওই প্রাণসই, এ ত বারি নয় অনল
শ্রীমুখ-কমল শুখাল বল করি কি উপায়।
২ ফুকা।—রাধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী।
অতি শীর্ণ হেমকায়, সখী একি দায়, দুখে মনেতে দুখী
২ মেল্‌তা।—এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে সখি গো কি জন্যে
একা রাই্‌ কাঁদেন কোথায় শ্যামরায়?[১]

॥ ৭ ॥

১ চিতান।—যতনে মন প্রাণ তোমায় দান, করেছি লো প্রাণ,
২ পরচিতান।—নিয়ত তব আশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণ।
১ ফুকা।—ভুলে ধর্ম্ম পানেও চেয়ে দেখ না।
নিশি দিন তুমি মন তোষ না তবু মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।
১ মেল্‌তা।—উচিত নয় বিধুমুখী অনুগতে করা দুখী
হান কি দোষে নির্দ্দোষীরে বাক্যবাণ।
মহড়া।—বুঝলাম প্রেয়সী, আমায় করে দোষী,
অন্যজনে দিবে প্রাণ।
আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়াও মান-অভিমান।[১]

॥ ৮ ॥

মাথুর

১ চিতান।—শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশা
এই দশা ঘটেছে আমার।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

১ পরচিতান।—পূর্ব্বভাবে তাই ভাবান্তর,
মনেতে যন্ত্রণা অপার ॥
১ ফুকা।—ব্রজে আন্‌ব বলে ব্রজের জীবন-ধন,
গেলাম করিয়া মন সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ,
বিষাদে মগ্না তাই এখন।
১ মেল্‌তা।—মাধব এল না ব্রজেতে,
মজে কুব্‌জার প্রেমেতে ;
এখন বল্‌ গো সই, কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।
মহড়া।—জান্‌লাম নিশ্চিত গো প্রাণসই,
ব্রজে আসবে না শ্যামরায়।
প্রাণসই, শুন কই,
কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব,
আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায় ?
খাদ।—এই দশা ঘটে থাকে সখি গো,
সুখের দশা যখন যায়।
২ ফুকা।—মিছে ভাবলে হবে সখি কি এখন,
রাধার কপালে সে সুখ আর,
এখন গো হওয়া ভার,
গোপিকার জুড়াবে না মন।
২ মেল্‌তা।—সুখ হবে না ব্রজের আর,
মনে বুঝেছি আমি সার,
এখন অকূলে বুঝি দুকূল ভেসে যায়।[১]

॥ ৯ ॥

গোষ্ঠ

ত্বরায় উঠ রে ও ভাই প্রাণের বংশীধর।
গোষ্ঠেতে যাবি যদি বংশীধর ॥
একবার চেয়ে দেখ্‌ নাই রজনী,
মুদিল কুমুদিনী, নীলমণি,

১ গুপ্তঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

প্রভাতে কুহুস্বরে, গান করে পিকবরে,
গগনে প্রভা করে প্রভাকর ॥
নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ, ঐ নন্দালয়ে
হ'য়ে উপস্থিত শ্রীদাম সুললিত,
বচনে ডেকে কৃষ্ণ কয়।
গোপাল, উঠ রে, জাগিল গোকুল,
ল'য়ে যাই গোকুল, আর কেন ভাই নিদ্রাকুল।
পূর্ব্বদিক্ ঐ প্রকাশিত, পশুপক্ষী উল্লাসিত,
পতঙ্গকুল হরষিত, বিকশিত ফুল।
তরু-পল্লবে নিরখি, করে ডাকাডাকি, সব পাখী,
হ'ল অবনী আলোময় কি মনোহর।
গোপাল ভাই রে, গোষ্ঠে যাবি আয়,
সময় ব'য়ে যায়, নিশির শিশির ঐ শুকায় ;—
আমরা যত ব্রজগোপাল,
গো-পাল ল'য়ে এলেম গোপাল,
প্রাণের গোপাল বিনে
গো-পাল, গোষ্ঠে নাহি যায়।
আমরা সব গোপাল চেয়ে রই গোপাল
গোপাল রে গোপাল কৈ! কৈ রে কৈ?—
চেয়ে দেখ ভাই অস্ত যায় ঐ শশধর ॥
গোষ্ঠে কখন্ যাবি, কখন যাবি, বেণু বাজাবি?
কখন গাভী ল'য়ে রে ভাই,
বেণুস্বরে গান গা'বি!
ভাই রে, ক'রে শয়ন,
মুদে নয়ন, কতক্ষণ আর ঘুমাবি?
বেলা হ'ল উঠরে কানু ভাই।
সুবর্ণ বরণ, দিনকর কিরণ,
তরু পল্লবে দেখতে পাই।
কানাই ভাই রে ব্রজেতে, নিশি প্রভাতে,
প্রতি বনে বনেতে তরুলতায় ঐ দেদীপ্যমান,

পতঙ্গকুল দোদুল্যমান,
পক্ষী সকল উড্ডীয়মান, ঐ গগন পথে।
হ'য়ে গোকুলে জনরব, কর্‌ছে মা মা রব শিশু সব,
কর্ণে শুন্‌তে কি পাস্‌নে এ সব গিরিধর ॥[১]

॥ ১ ॥

গোষ্ঠ

ভানু উদয়ে, নন্দালয়ে, শ্রীদাম যায়;
বলে উঠ রে গোপাল, ত্বরায় ল'য়ে গো-পাল,
ভাই গোপাল, গোষ্ঠে যাবি আয়।
তাই শুনে নিদ্রাভঙ্গে, কয় নীলমণি,
সাজিয়ে দে মা নন্দরাণি,
উদয় হয় ভানু; করে দাও বেণু;
নন্দরাণী মোহন সাজে,
সাজিয়ে দিলেন রাখাল সাজে
ব্রজের মদনমোহন সাজে, নব নীলতনু।
সাজায়ে শীঘ্রগতি, শিশুমতিকে;
কহিছে যশোমতী কাতরে।
ধর ধর শ্রীদাম, আমি তোর করে,
সপে দিলাম মাখন-চোরে ॥
দেখিস্ দেখিস্ রে গিরিধরে, যেন না গিরি ধরে,
আর যেন অনল খায় না ব্রজপুরে;—
কহিতে জীবন জ্বলে, আর যেন যায় না জলে,
জল, অনল অবোধ ছেলের বোধ নাই রে ॥
ভাবিলে ভয়ে অঙ্গ শিহরে।
কার ছেলে অনল কোথায় আহার করে
কাল-ভুজঙ্গের ফণা ধরে।
ধরে গোবর্দ্ধন; অবোধ কৃষ্ণধন;
বিবেক বোধহীন আমার গোপাল,
ওরে, চরাতে কি জানে গো-পাল?

---
[১] বাঃ গাঃ

করিস তোরা দ্বাদশ গোপাল, গোপালকে যতন।
গোপাল গেলে গোষ্ঠে জীবন যায় কষ্টে
তিলেক না হেরে প্রাণে মরি রে॥
কেমন গোপাল সাজে, গোপাল রাজে
গো-পাল মাঝে, বিদায় দিই বা কি ক'রে?
পাষাণে বাঁধিয়ে জীবন, বিদায় দিই জীবনের জীবন,
দেখিস্ শ্রীদাম, রাখিস জীবন, জীবন তোর করে;
কালরতনে গহন বনে, যাস্ নিয়ে তায়;
দুর্জ্জয় ভানুর তাতে, ছত্র ধরিস্ তাতে,
তা'তে না তাতে যেন কয়।
বাপ শ্রীদাম! অঞ্চলেতে ক্ষীরননী
বেঁধে দিলাম যাদুমণি!
ক্ষুধা হ'লে পর; দিওরে তৎপর;
প্রাণগোপাল ভুল নারে।
ওরে গোপালের নাই তুলনা রে!
মনে কিছু তুল না রে! ভেব না রে পর।
আমার সর্ব্বস্ব ধন, কালরতন রে।
সাধনে এ ধন ধরি জঠরে॥[১]

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরহ

১ চিতান।—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় সখিগো কভু ছাড়া নয়।
১ পরচিতান।—রাধা কৃষ্ণ একই অঙ্গ জানি সই
পুরাণেও এই কথা কয়।

---

১ বাঃ পাঃ

১ ফুকা।—রসবৃন্দাবন, নিত্যধাম্;
রাধে স্বর্ণলতা, ব্রজে বিরাজিতা,
বাঁধা রাধার প্রেমে আছেন শ্যাম।

১ মেল্‌তা।—আমি কুহুরবে রাধায় জ্বালাই না,
কেবল করি রাই-চরণকমল দরশন।

মহড়া।—আমার কুহুরবে, কেন দগ্ধ হবে, রাধার মন,
ইচ্ছাময়ী রাই কমলিনী,
ইচ্ছাময় চিন্তামণি,
সকলি ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণ-বিরহ রাধার নাই,
জানিয়া ডাকি তাই,
রাধা ছাড়া কি থাকেন সাধের কৃষ্ণধন।

খাদ।—ভক্তের বাসনা জন্য শূন্য বৃন্দাবন।

২ ফুকা।—আছে শ্রীদামের অভিশাপ;
কৃষ্ণবিরহিণী, হবেন কমলিনী
পাবেন কৃষ্ণ বিনে মনস্তাপ,

২ মেল্‌তা।—হবে সময়ে সই জেন দুখের শেষ,
পাবে অনাশে কৃষ্ণের কমল-চরণ। [১]

॥ ২ ॥

১ চিতান।—কথাতে প্রবোধ না মানি, হয়েছি অধৈর্য্য সবাই

১ পরচিতান।—এলো ব্রজেতে ঋতুরাজ, এ সময় ব্রজরাজ,
সুখের ব্রজধামে নাই।

১ ফুকা।—তুমি ত সেই শ্যামের শ্রীচরণচিহ্ন,
জানত সব গোপীর অনন্যগতি কৃষ্ণ ভিন্ন।

১ মেল্‌তা।—পড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ বলে
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

মহড়া।—আশা-বাক্যে পদাঙ্ক বাঁচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ ;
করে গুন্ গুন্ স্বর মধুকর,
কোকিলের কুহুস্বর,
হানে আবার তায় পঞ্চশর পঞ্চবাণ।
খাদ।—এ জ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নির্ব্বাণ।
২ ফুকা।—যদি হও রাধার স্বপক্ষ হে তুমি,
এনে দাও গোকুলে, সাধের গোকুলস্বামী।
২ মেল্‌তা।—গেছেলো অনেক বার,
অনেক জন, আনতে সেই কৃষ্ণধন
কৃষ্ণধনে সকলে হয়ে এল অপমান ॥ [১]

চিতান।—নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা,
১ পরচিতান।—বিপক্ষে হাসিবে সখী হ'লে চঞ্চলা।
১ ফুকা।—ষড় ঋতু সৃষ্টি বিধাতার,
নিয়মে উদয় হয়, বাধ্য কার নয়,
দোষ দাও মিছে সখী তার।
১ মেলতা। কি আর স্বভাব বসন্তে, এ দুখ-অন্তে,
কান্ত পাবে ধৈর্য্য ধরে রও।
মহড়া।—পর হবে না নাথ প্রবাসে, অল্প দিন দুখ সও,
তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধীনী, সই রে,
কেন ঢেউ দেখে তরি ডুবাইতে কও।
খাদ।—নব বালিকা নিতান্ত তুমি নও।
২ ফুকা।—ঋতুপতি দিবে পতির সংবাদ,—
বল সই কেমনে, ভেবেছ কি মনে,
ঘট্‌ল কি বিরহপ্রমাদ।
২ মেলতা।—পতি বিচ্ছেদে এমনি হয়, সখী মিছে নয়,
তা বলে আশাত্যাগী কেন হও।[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ ২ প্রাঃ কঃ সঃ, গুপ্তঃ

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

সপ্তমী

(উমার প্রতি মেনকার উক্তি)

১ চিতান।—ভবনে ভবানী, পাইয়া পাষাণী,
পুলকে হ'য়ে মগনা।
১ পরচিতান।—ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় করে করুণা।
১ ফুকা।—মা তোমায় নয়ন্‌পথে হারিয়ে ত্রিনয়না
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।
১ মেলতা।—আজি সেদিন ঘুচিল,
সুদিন হইল,
এ দিন হবে মনে না জানি।
মহড়া।—একবার আয় মা করি কোলে দুখ্‌পাসরা নন্দিনী।
চারুচন্দ্রাস্যে প্রাণ উমা ডাক মা বলে মা
শুনে মা জুড়াই তাপিত প্রাণী।
খাদ।—সুধাই তাই ওগো ঈশানি,
২ ফুকা।—যার উমা জগতের মা,
তার কি মা এমন হয়;
হাঁগো প্রাণের তারা,
সেও কি উমা-হারা রয়।
২ মেলতা।—মা তোর শ্রীমুখ না হেরে,
যে দুখ অন্তরে
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা যামিনী।
অন্তরা।—ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী তুই ত জগৎ-জননী
ভাল তা বলে মা একবার মায়ে তোমার
মনে কর কৈগো তারিণী।
২ পরচিতান।—কৈলাসশিখরে, শঙ্করের ঘরে
গিয়ে মা ভুলে থাক মায়।

৩ পরচিতান।—মা বলে করিস্ না মা মনেতে,
এ দুঃখ বলি গো মা কায়।
৩ ফুকা।—বালিকা কালিকায়,
না হেরে মা নয়নে
গেছে অশ্রুজলে দিন ওমা হর-অঙ্গনে।
৩ মেল্‌তা।—আমি একে মা অবলা,
তাতে গো অচলা
শক্তিহীন শক্তিতত্ত্বে ঈশানী।[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

১ চিতান।—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জবিহারী
১ পরচিতান।—কোথা রাই কোথা রাই বলে
রাধার কুঞ্জে উদয় মুরারি।
১ ফুকা।—দেখেন মৌনাবলম্বিনী কমলিনী মানিনী।
হেরে অধৈর্য্য মুরারি,
চক্ষে বহে বারি
ভাসেন চিন্তার্ণবে সাধের চিন্তামণি।
১ মেল্‌তা—সাধেন বিধি মতে
মানভঙ্গনার্থে—ধরে চরণে
হেরে গোবিন্দে, বৃন্দে সুধায় ইঙ্গিতে।
মহড়া।—মাধব! একি হে ভাব রাধার ভাবেতে,
নটভূপ, একি অপরূপ
তোমার অনন্ত ভাবে ভাব বোঝা দায়,
কেন নীলকমল, ধরে কমলপদেতে?
খাদ।—হেরে কত ভাব উদয় হয় মনেতে।

২ ফুকা।—যাঁর অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয়;
সে আজ রাধার পদে ধরি,
সাধেন মরি মরি,
দেখে হৃদয় দুঃখে দগ্ধ হয়।
২ মেল্‌তা।—ধর কি দুঃখে রাধার পায়,
একি শ্যাম শোভা পায়,
পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে।[১]

॥ ৩ ॥

সখীসংবাদ

১ চিতান।—যদি মাধব রাধার, মাধব, হতেছে নিশ্চয়,
১ পরচিতান।—ত্রিভঙ্গ, রাধার শ্রীঅঙ্গ,
কিহে তবে অনঙ্গেতে দয়।
১ ফুকা।—দেখ স্বর্ণলতা রাধার শীর্ণ বেশ হৃষীকেশ,
যে জন শ্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়,
তার কি এই দশা কর অবশেষে,
ওহে—শ্যামহে,
১ মেল্‌তা।—যারে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে,
কেন পায় ধরে' তারে সাধিতে এলে?
মহড়া।—মাধব, আর সাধায় কাঁদায় রাই ভুলে,
কালাচাঁদ, ঘটেছে প্রমাদ,
তোমার বিচ্ছেদরূপ-রাহু আসি নিশিতে
দেখ ঘেরেছে শশিমুখমণ্ডলে।
খাদ।—এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে।
২ ফুকা।—প্যারীর মুখচন্দ্র—রাহুগ্রস্ত হবে সত্বরে—
ক্রোধ দাতা সজ্জন, রাধা অঙ্গ-আভরণ,
দান করিছে দ্বিজবরে,
২ মেল্‌তা।—ওহে কালশশী, নয়নযুগল ঋষি,
দেখ স্নান করিছেন দুঃখসলিলে!

---

১ সাঃ পাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

অন্তরা।—দেখ, কুঞ্জ ঘেরে সারি-শুকে শ্যাম,
করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্য করে কর যন্ত্রী, কপাল-যন্ত্রে,
হরি! শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ।
২ চিতান। গগন চাঁদে, গ্রহণ হ'লে, স্থিতির নিয়ম হয়।
২ পরচিতান।—এ কেশব! দেখি অসম্ভব,
নাহি স্থিতির নির্ণয়।
৩ ফুকা।—রাধার দুঃখ দেখে, খেদে ঝুরে আঁখি, করি কি?
আমরা তাই ভাবি অন্তরে, কি প্রকারে,
এ দায়মুক্ত হবেন চন্দ্রমুখী।
ওহে—শ্যাম হে।
৩ মেল্‌তা।—যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক'র হে ভাব,
নইলে কি হবে অভাবে ভাব মিশালে।[১]

॥ ২ ॥

১ চিতান।—শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যা জগদ্ধন্যা
মান্যা শ্রীমতী,
১ পরচিতান।—করি পরিহার, তোমা ভিন্ন আর,
নাই আমার অন্য যে গতি।
১ ফুকা।—বদসি যদি কিঞ্চিদপি মধুরং অধরং
কিবা দন্তরুচি কৌমুদী বিনোদী,
তাহে হরতি তিমিরঘোরং—রসময়ী গো,
১ মেল্‌তা।—তোমার মানের বাণে,
জলে ম'লাম প্রাণে,
এ মান সম্বরণ করে কর পরিত্রাণ।
মহড়া।—ও গো মানময়ী রাই, ত্যজ দুর্জ্জয় মান,
নিজ জন, প্রতি কি কারণ,
এত মানিনী, কেন গো কমলিনি,
তোল চন্দ্রানন হেরে জুড়াক চকোর প্রাণ।

১ বাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

খাদ।—করি মিনতি কর এ মান সমাধান।
২ ফুকা।—ও রাই চন্দ্রমুখী সদয় কটাক্ষে এপক্ষে
একবার চাও ব্রজকিশোরী
কৃপা করি কর প্রেমপক্ষের সম্মান রক্ষে।
২ মেল্‌তা।—তব পদাশ্রিত, আমি যে নিশ্চিত,
আমায় বধো না হানি দারুণ মানের বাণ।
অন্তরা।—রাধে গো এ কি আজ দেখি গো রঙ্গ।
তব মান-দাবানল, প্রত্যক্ষে হেরে প্রবল,
জলে ম'ল এ মন-মাতঙ্গ।
২ চিতান।—কটাক্ষে কৃপা কর রাধে,
এ বিষাদে দহিল জীবন।
২ পরচিতান।—ক্ষম অপরাধ, পুরাও মন-সাধ,
ধরি রাই কমলচরণ।
৩ ফুকা।—দারুণ অপরাধী, হয়ে থাকি যদি, রাঙ্গাপায়,
সে দোষ ক্ষম কমলিনি, ও মানিনি,
তোমার মানের দায় বুঝি প্রাণ যায়।
৩ মেল্‌তা।—মান-দাবানল, কর সুশীতল,
রাধে, স্বগুণে কৃপাবারি করি দান।[১]

॥ ৫ ॥

সখীসংবাদ

১ চিতান।—আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল।
১ পরচিতান।—পেয়ে বাক্য জল, হল সুশীতল,
অতঃপর মানের অনল।
১ ফুকা।—তোমার কথা শুনে আমার পুরিল পণ—
সে কেমন, ভীষ্ম কল্পান্তরে, বাণযুদ্ধ করে,
চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন।
১ মেল্‌তা।—ওগো কমলিনি, তোমায় তেমনি,
কথা কহায়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে।

১ বাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

মহড়া।—মানের গর্ব্ব করে, খর্ব্ব করিলে।
রাগে মন, করে সমর্পণ,
করে বসিয়াছিলে ধনুক-ভাঙ্গা পণ ;
সেই ত প্রতিজ্ঞা ত্যজে কথা কহিলে।
খাদ।—প্যারী ! নিজ পণ পুরাইতে নারিলে।
২ ফুকা।—কথা কইলে বলে বলি গো তাই, ওগো রাই,
করা অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন,
অতি শব্দ গো মন্দ বলে সবাই।
২ মেল্‌তা।—করে অতি মান, বলি পাতালে যান,
হলে অতিশয় শেষ থাকে না শেষ কালে।[১]

॥ ৬ ॥

কালিয়দমন

১ চিতান।—আমি হে যেই জন বিবরণ করহে শ্রবণ,
১ পরচিতান।—বেদে কয় আমায় জগন্ময় হর্ত্তা কর্ত্তা শ্রীমধুসূদন,
১ ফুকা।—কাল বিষধর, তোমার প্রাণেশ্বর,
তার বিষপানে, ব্রজ-বালকগণে
সবে হয়েছে শব-কলেবর।
২ মেল্‌তা।—তাই বিষাদে তাপিত মন হয়েছে আমার,
প্রাণ জুড়াব করি কালিয়দমন।
মহড়া।—আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে,
ইচ্ছাময় আমি নারায়ণ।
আমার শ্রীপদ পরশে, ভুজঙ্গ অনাসে
নির্ব্বাণ হবে পাবে এ চরণ,
খাদ।—ইথে বিষাদ ভাব কেন অকারণ ?
২ ফুকা।—শিষ্টের পালন করি, দুষ্টের দমনকারী ;
আমি দর্পহারী, দর্প সইতে নারি,
দর্প হইলে খর্ব্ব তার করি।

---

১ বাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ

২ মেল্‌তা।—ইথে ভেব না অন্য ভাব কালিয়নারি
তোমার পতির অন্ত হবে না জীবন।[১]

কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন হৃদয়!
কব কি, ও প্রাণসখি!
তার হেথায় থাকা উচিত নয়।
দিলাম অভয়দান তোমার প্রাণধনে,
শিরে মম চরণ-চিহ্ন করে ধারণ;
সুখে রব গে জুড়ায়ে জীবনে।
উহায় এ জলে দিব না আর থাকিতে,
প্রাণসই, দিলাম অভয়দান,
খগেন্দ্রেরি ভয়েতে,
প্রাণে বধ্‌ব না তোমার প্রাণপতিরে,
ভেব না দুখ মনেতে।
যে পদ ব্রহ্মাদি দেবতায়
সাধনায় নাহি পায়,
দিয়াছি সে পদ উহার শিরেতে।[২]

॥ ৮ ॥

বিরহ

১ চিতান।—কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে,
প্রাণসই কমল ভেসে যায়।
১ পরচিতান।—বলি শোন্ গো সে সব রসের পরিচয় প্রাণসই,
যে হেতু ঘটিল এ দায়।
১ ফুকা।—সাধে কমল ভাসে কমলের জলে,
কমলদলের পক্ষ, হইয়া বিপক্ষ,
প্রমাদ ঘটালে,

১ বাঃ গাঃ, প্রাঃ কঃ সঃ
২ বাঃ গাঃ

১ মেল্‌তা।—নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্রীরাধারে সঙ্গে এনে।
সই সইরে—প্রাণের কৃষ্ণ সখা হলেন অদর্শন।
মহড়া।—তাই গো প্রাণসই, কমলের জলে ওই,
ভাসছে কমল-বদন।
চিন্তারূপা যে জন সখী, সেই রাধা চন্দ্রমুখী, সই রে,
কাঁদেন একাকী হারা হয়ে কৃষ্ণধন।
খাদ।—দর্প-খর্ব্বকারী শ্রীমধুসূদন।
২ ফুকা।—রাধার দর্প খর্ব্ব করিতে হরি,
লীলা ছল করি, ও প্রাণ সহচরী,
ত্যজলেন কিশোরী
২ মেল্‌তা।—অনন্তের অনন্ত ভাব, কে করিবে অনুভব,
সইরে—আজ এই নব ভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ।[১]

॥ ৯ ॥

১ চিতান।—সহাস্য বদনে, অধীনীর ভবনে
প্রাণনাথ কি ভাবে উদয়?
১ পরচিতান।—কমনে যেতে কোথায় আইলে—
একি হে দেখি রসময়,
১ ফুকা।—মন প্রাণ যারে সঁপেছ রে প্রাণ
কেন সখা তারে, স্বতন্তরা করে, হেথা অধিষ্ঠান?
১ মেল্‌তা।—সে যদি হে হয় মানিনী, প্রমাদ হবে গুণমণি,
প্রাণ রে তবে তার জ্বালাতে হবে জ্বালাতন।
মহড়া।—কও হে পরের প্রাণ, আজ কেন ঘরে টান,
একলা রেখে প্রিয়জন
প্রাণের বাহির করে, দিয়াছ হে যে জনেরে,
কেন তারে আর্ প্রাণ বল হে প্রাণধন?
খাদ।—অকস্মাৎ সুপ্রভাত এ কেমন।
২ ফুকা—জন্ম সেধে কেঁদে পেলেম না যাহায়
সে কেন আসিয়ে, আপনি সাধিয়ে, দেখা দেয় আমায়

১ প্রাঃ কঃ সঃ, বাঃ গাঃ

২ মেল্‌তা।—কেন বিনা আবাহনে, দেখা পেলাম সেই জনে,
নারি বুঝ্‌তে এসব ভাবের ভাব কেমন।
অন্তরা।—সখা হে, সে যে তোমায় ছেড়ে দেছে ;
হেন অনুমান, হতেছে রে প্রাণ,
বুঝি তার হে আমার দশা ঘটেছে।
২ চিতান—তুমিত রসিক প্রাণ, কহিতে কাঁদে প্রাণ,
আ মরি যে বা তব মন !
২ পরচিতান—ব্যক্ত আছে তোমার গুণাগুণ,
অবলার মন যোগাও যেমন।
ফুকা।—যেমন ভাল তুমি বেসেছ আমায়
দেখ দেখ প্রাণ, এমন ভাল যেন, বেশ না কায়।
৩ মেল্‌তা।—প্রাণ জ্বালান স্বভাব তোমার,
জানিত হে সে রীত ব্যভার
প্রবোধ বাক্যে কতই হব নিবারণ॥[১]

॥ ১০ ॥

১ চিতান।—যে তব ত্যজ্য ধন, সে জনে প্রয়োজন,
অনিত্য করহে যতন।
১ পরচিতান।—সরল হলে এমন কবে হে,
মরি কি সরল সুজন।
১ ফুকা।—আমার প্রেমে যদি বিক্রীত হবে।
তবে পরের ঘরে, নাগরালি করে,
বল কে রবে॥
১ মেল্‌তা।—তেমন কপাল হত যদি, প্রাণ কাঁদে কি গুণনিধি,
তবে বিচ্ছেদ হয় কি আমার গলার হার।
মহড়া।—আজ কি ভাগ্যোদয়, আমার হে রসময়,
বল্লে আমি প্রাণ তোমার,
যার কাছে প্রাণ থাক যখন,
প্রাণ যোগাও প্রাণ তার তখন,
এমন পর-কাতরা মানুষ পাওয়া ভার।

---
১ প্রাঃ কঃ সঃ

খাদ।—জেনেছি সকল হে তোমার রীত ব্যভার।

২ ফকা।—দেখা হলে হেসে, তোষ আমায় প্রাণ,
কিন্তু সখা তুমি, পরের প্রেমের প্রেমী
আমারে কথায় ভুলান।

২ মেল্‌তা।—সে সব কথা থাকুক দূরে, ঘটবে কর্ম্ম অনুসারে,
হ'ল চক্ষের দেখা লক্ষ লাভ আমার॥[১]

॥ ১১ ॥

১ চিতান।—ভাল শুভদিনে ক্ষণে তোমায় প্রাণ, সঁপে প্রাণ,
মজেছি তোমার প্রেমেতে।

১ পরচিতান।—মলাম জন্ম জলে, বিচ্ছেদ অনলে,
তবু পারি না ভুলিতে।

১ ফুকা।—মনে করি তোমার মুখ হেরব না।
হের্‌লে ও চাঁদবয়ান, দূরে যায় অভিমান।
তখন আর সে মান থাকে না।

১ মেলতা।—ভাসি সুখসিন্ধুনীরে, আনন্দ অন্তরে।
যেন আকাশের চন্দ্র আমি পাই করে।

মহড়া।—এত যে জ্বালাও প্রাণে আমায় প্রাণ—
তবু প্রাণ চাহে তোমারে
মনে করি প্রণয় ভুলি, তোমায় দেখ্‌লে সকল ভুলি,
শুনি কও হে কি করেছ আমারে।

খাদ।—কি ক্ষণে তোমারি সনে, দেখা রে।

১ ফুকা।—কত সইব প্রাণ তোমার যন্ত্রণা।
যতনে মন প্রাণ, করিলাম তোমায় দান,
তথাচ আমার হলে না।

২ মেল্‌তা।—পরের প্রেমে বাঁধা তুমি,
তোমার প্রেমাধীনী আমি
তার কেন হই, যে না চাহে আমারে।[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ

২ প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ১২ ॥

১ চিতান।—আমার প্রেমে যদি সখা নিতান্ত, একান্ত বিক্রীত
তুমি রসময়।

১ পরচিতান।—তবে কি জন্ম অনঙ্গেতে প্রাণ আমার,
নিরন্তর হে দগ্ধ হয়।

১ ফুকা।—জানি পুরুষ সরল বটে প্রাণধন।
রমণী-নিধনে, কেন নারীর সনে, পুরুষে ত্যজে না জীবন।

১ মেল্‌তা।—নিধন হলে পুরুষের, নারী সঙ্গী হয় তার ;
কোথায় রমণী মলে পুরুষ সঙ্গে যায়।

মহড়া।—এমন মন রাখা কথা শিখলে কোথা হে,
ভাব দেখে কেবল হাসি পায়।
আমায় তোষ গুণনিধি, একথা সে শুনে যদি,
হবে জালাতন তবে হে তার জালায়।[১]

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

সপ্তমী

১ চিতান।—আনন্দে মগনা, শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।

১ পরচিতান।—করুণায় সম্ভাষেণ রাণী, গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে।

১ ফুকা।—শঙ্করি, শুভঙ্করি, আয় মা কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডলে, একবার মা বলে,
ডাক্ মা উমা গো আমায়।

১ মেল্‌তা।—তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহারা ফণী
হয়েছিলাম মা, মা, মা গো।
সে দুঃখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা।

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

মহড়া।—কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা।
শুনি লোকমুখে শিব, বিহীন-বৈভব,
ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছিছি সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে,
কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।
খাদ।—আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,
তত্ত্ব করতে পারি না।
২ ফুকা।—বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অন্নদায়।
২ মেল্‌তা।—কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়নী, ভবভাবিনী
মা মাগো এসব দুখ মা মেয়ের প্রাণে সহে না।[১]

॥ ২ ॥

সখীসংবাদ

১ চিতান।—কহিলে যে কথা রাধে দুখ ঘুচিল,
১ পরচিতান।—দারুণ মানের দায় মাধবের যা হক
রাই প্রাণ জুড়াল।
১ ফুকা।—কথা কবে না রাই, ক'রে বসে ছিলে দারুণ পণ,
সে পণ তেয়াগিলে প্যারী, কৃপা করি;
রইল মাধবের মান গো এখন।
ও গো রাই গো।—
১ মেল্‌তা।—যে পণ অসম্ভব শ্রীমতী, অনুচিত তা অতি,
মানের ত গর্ব্ব এখন ঘুচালে।
মহড়া।—ও রাই, অতিশয় মন্দ বলে সকলে।
গৌরব অতিশয়, করা উচিত নয়।
দেখ করিয়ে অতি দান, বলি পাতালে যান,
সেই অতি মান করে কথা কহিলে।

১ প্রাঃ কঃ সঃ

খাদ।—অতি মানে গো হত হয় কুরুকুলে।

২ ফুকা।—অতি দর্প করে, হত লঙ্কাপুরে দশানন ;

অতি সতী ব'লে সতী, পতির অতি

নিন্দা শ্রবণে ত্যজিলেন জীবন।

ও গো রাই গো—

২ মেল্‌তা।—অতি উচ্চ সেই বিন্ধ্যগিরি, হইয়ে ছিলেন প্যারী

অগস্ত্য নিম্ন করিলেন ছলে।[১]

১ চিতান।—ত্রিভঙ্গে নিরখি রঙ্গদেবী রাধায় কয়।

১ পরচিতান।—মান সম্বর গো কিশোরি,

আ মরি একি প্রাণে সয়।

১ ফুকা।—বলেন চিন্তামণি হও গো কমলিনী সদয়ং।

তব মান দাবানলে প্রাণ জ্বলে!

দেহি পদ পল্লব মুদারম্।—রসময়ি গো।

১ মেল্‌তা।—সাধেন কাতরে শ্রীহরি দেখ গো কিশোরি,

রাঙ্গা পায় পড়ে কমললোচন।

মহড়া।—একবার কথা কও রাধে, তুলে চন্দ্রানন।

দেখে কাঁদে প্রাণ পরিহর মান ;

প্যারী রাখ গো শ্যামের মান ক'র না অপমান,

মনের দায় কাতর শ্রীরাধারঞ্জন।

খাদ।—মান্যা যার মানে তার প্রতি মান এ কেমন ?

২ ফুকা।—উচিত নয় শ্রীমতী কালাচাঁদের প্রতি করা মান ;

জীবন যৌবন যারে দিয়ে দাসী হয়ে,

সঁপেছ কুল শীল মন প্রাণ।

২ মেল্‌তা।—এ নয় কথন সুবিধান ত্যজ রাই দুর্জ্জয় মান

মানের দায় কাঁদেন ভুবনমোহন॥[২]

১ প্রাঃ কঃ সঃ

২ প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ৪ ॥

মহড়া।—মানের গর্ব্ব করে খর্ব্ব তো করিলে॥

সওয়ারি।—রাগে মান সমাপন করে পণ হারিলে,
রাধে অতিশয় উচিত নহে, শেষে না রহে,
অতি দানে বলি গেলেন পাতালে॥

তেহরণ।—মানময়ী ভাল লোক হাসালে।

চিতেন।—কহিলে যে কথা তুমি রাই রাই গো তুলে চন্দ্রানন।

২ চিতেন।—তাতে জুড়ালো মনের অনল,
অতঃপর পুরিল মম পণ॥

ফুঁকা।—করে দক্ষ আগে বিষম পণ, পরেতে নারিলেন
রাখিতে পূজিলেন ত্রিলোচন, আজ রাধে গো,
তেমন জ্ঞান গুরু পণ হলো রাই মান নিবারণ॥

ডবল ঐ।—সেই তো মান ত্যজিলে, শ্রীমুখে কথা কহিলে,
নিজ মান রাই এখন পুরাতে নারিলে,
ঘুচিল বিষাদ রাধে হৃদয় জুড়ালো,
মানের অনল এখন নিভিলো॥

মেলতা।—মানের পর মান রাখতে নারিলে।[১]

॥ ৫ ॥

বিরহ

১ চিতান।—আমায় যদি তুমি হে প্রাণ! প্রাণ সঁপিবে।

১ পরচিতান।—তবে পরের ঘরে নাগরালি করে কে রবে॥

১ ফুকা।—যদি করতাম প্রাণ ভাগ্য হে তেমন
তবে কি প্রাণধন, বিচ্ছেদ অনুক্ষণ
দাহন করে আমার মন।

১ মেল্তা।—কথায় বল আমি তোমার, কাজে কেনা হয়েছ তার, প্রাণরে
আমি কথার প্রাণ কেবল সেই ত প্রাণ এখন

মহড়া।—জানি তুমি সরল সুজন।
ডাকিলে প্রাণ বলে, বল কোথা রাখিয়ে মন।

---

১ প্রাঃ ওঃ কঃ

খাদ।—সুপ্রভাত আজ আমার দেখি এ কেমন ?

২ ফুকা।—প্রাণপণ যায়, সেধে পাওয়া দায়
সে আজ সাধে আসি দেখে পায় হাসি
এই দুখে প্রাণ জলে যায়।

২ মেল্‌তা।—অন্তরের অন্তর করে, দিয়েছ হে তুমি যারে,
প্রাণ রে—
কেন প্রাণ বলে কর তারে আকিঞ্চন ॥[১]

মাথুর

১ চিতান।—নবজলধর রূপ শ্যাম দলিত-অঞ্জন।

১ পরচিতান।—রমণীরঞ্জন, মদনমোহন,
আজ অকস্মাৎ করি কি শ্রবণ!

১ ফুকা।—অতি দীনা ক্ষীণা উন্মাদিনীর প্রায়,
বিগলিত কেশ, অতি মলিন বেশ,
দুটি চক্ষে শতধার, বহিছে অনিবার,
ঘর্ম্মবিন্দু অঙ্গে তায়।

১ মেল্‌তা।—আবার চলে যায়, চলে যায়, পড়ে ধরায়,
বুঝিতে নারি নারীর অভিপ্রায়।

মহড়া।—সুধাই তাই হে তোমায়, বাঁকা শ্যামরায়।
সবিশেষ, বল হৃষীকেশ, কে সে দুঃখিনী রমণী,
কাহার সঙ্গিনী, কেন সে কাঁদে আসি মথুরায়।

খাদ।—তার দুঃখ নিরখিয়ে দীননাথ, দুখে প্রাণ যায়।

২ ফুকা।—শুনলেম সে নাকি এই কথা কয়,
করে প্রেমধার, তুমি শ্রীরাধার,
আসি মথুরায় ভূপতি, হয়েছ শ্রীপতি,
রাই তোমার রাজা দয়াময়।

২ মেল্‌তা।—হয়ে আমাদের রাজ্যেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর,
কি জন্য বাঁধা রাধার রাঙ্গাপায় ॥

১ প্রাঃ কঃ সঃ   ১ প্রাঃ কঃ সঃ

॥ ৭ ॥

১ চিতান।—যদি তুমি বাঁধা দয়াময়, রাধার রাঙ্গাপায়
১ পরচিতান।—তবে ত্রিভঙ্গ, কেন অনঙ্গ,
শ্যাম রাধার শ্রীঅঙ্গ জ্বালায়।
১ ফুকা।—তোমায় বেদে বলে শুনি দয়াময়,
তব পদাশ্রয়, কৃষ্ণ যে জন লয়
তার কি এই দশা হৃষীকেশ
কহরে অবশেষ কৃপালেশ নাহি নিরদয়।
১ মেল্‌তা।—তোমার চরণে মন প্রাণ করিয়ে দান
প্রাণেতে মরে ব্রজের কিশোরী,
মহড়া।—কেমন কৃপা তোমার বুঝিতে নারি
শ্রীচরণ লইয়া শরণ ভাঙ্গল
শ্রীমতীর আশার দু-কূল
নিরন্তর প্রাণে আকুল,
অকূলে ভাসে রাই রাসেশ্বরী।
খাদ।—দেখ দাসীরে প্রতিকূল হয়ো না এমনি করে শ্রীহরি।
২ ফুকা।—ছিলাম কংসের দাসী অতি কুৎসিতা।
করলে রূপসী ও কালশশী।
ছিল পূর্ব্বের কি পুণ্য ফল, তাই হে নীলকমল,
হইলাম ও পদ-আশ্রিতা।
২ মেল্‌তা।—মনে হতেছে আতঙ্ক, হে ত্রিভঙ্গ
আমারে ত্যজ পাছে মুরারি॥

॥ ৮ ॥

১ চিতান।—কটাক্ষে নাশিতে পার শ্যাম হে, জগতেরি ভার,
১ পরচিতান।—প্রাণে বাঁচাতে পারিলে না বিরজায়,
শাপেতে শ্রীরাধার।
১ ফুকা।—চরণ পরশে শুনেছি হে তোমারি,
দীননাথ, অনায়াসে হল হে পাষাণী, মানবী,

---

১ প্রাঃ কঃ সঃ

আমি করে সার সে শ্রীপদ, হইল এই বিপদ,
অবশেষ প্রাণে মলাম শ্রীহরি।
১ ডবল ফুকা।—কৃষ্ণ দোষ দিব কারে, সকলি কপালে করে
ভব-ভয় যে ঘুচায়, প্রাণ যায়, ভজে তাঁহারে।
মরিতে হে প্রাণে হরি কাতরা নহি ত,
১ মেল্‌তা।—কৃষ্ণ-হারা হ'লাম বিনা দোষেতে!
মহড়া।—রইল মনের দুঃখ এই মনেতে।
যে পদে, বিপদে প্রহ্লাদে, রেখেছ—
তোমার সে পদে প্রাণ সঁপে মনস্তাপে
মলাম রাধার শাপে এখন প্রাণেতে॥[১]

অজ্ঞাত

নিমাই সন্ন্যাস

কাঞ্চন নগরে গিয়ে চাঁচর কেশ মুড়াইয়ে
(কল্লেন) গৌরাঙ্গ করঙ্গ ধারণ।
শচী ব্যাকুল হ'য়ে, নিমাইয়ের কাছে গিয়ে
হইলেন ধরায় পতন॥
ওরে নিমাইরে,
তুইরে, আমার সাধের ধন,
নিমাই, সন্ন্যাসী তোরে কে সাজাইল
আমার সাধের ধন।
ও তোর চাঁচর কেশ কে মুড়াইল
ডোর, কৌপীন কে পরাইল।
ওহে দণ্ডধারি,
সন্ন্যাসে যাবে নিমাই আমায় ছাড়ি?

---
১ প্রাঃ কঃ সঃ

হইল দীনের সে,
দীনের অধীন আমায় ছেড়ে,
শোক-শক্তিশেল হেনে দিলে
নিমাই বক্ষঃস্থলে, এই ছিল আমার কপালে ?
আমার কে আছে
যাই আমি কার আছে
এমন লক্ষ্য নাই,
আমায় মা বল্‌তে কেউ নাই।
ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ে,
প্রবোধ দিব আমি কি ধন দিয়ে,
কি ধন লইয়ে থাকব ঘরে,
দেখব রে কার চাঁদবদন।[১]

॥ ২ ॥

(নিত্যানন্দের প্রতি গৌরাঙ্গের উক্তি)

চিতান।—গিয়ে সেই গোদাবরী শ্রীহরি স্বরূপে বলে।
পড়তা।—রামানন্দের কায় কাদম্বিনীর প্রায় দেখে তায়
শ্রীগৌরাঙ্গের অমনি প্রেম উথলে ॥
১ ফুকর।—তখনি নিতাই গৌরাঙ্গে কোলে করে
অমনি বলতেছে ধীরে ধীরে
কি ভাব তোমার প'ল মনে
ধূলায় অঙ্গ ধূসর কেনে
ধারা বহে দু' নয়নে
দেখে আমার প্রাণ কেমন করে !
শুনে সেই কথা শ্রীগৌরাঙ্গ থেকে থেকে বলেন নিতাইকে
ওরে আমার প্রাণ কাঁদে ব্রজ বলে, ভাসি নয়ন জলে ॥
মুখ।—গুণের ভাই রে নিতাই !
একবার চল যাই দু'ভাই
চল যাই ব্রজমণ্ডলে ॥

---
১ কবি-গান সংগ্রহ—উপেন্দ্রকিশোর সোম ; সৌরভ ১৩২১ সাল

খোঁজ।—রাধা-বিহনে সদাই আমার জীবন জলে॥
২য় ফুকর।—নিতাইরে আমি যখন ছিলাম বৃন্দাবনে
যেতাম রাখাল সনে বিপিনে
করতাম খেলা বংশীবটে যমুনার সন্নিকটে
রাখালগণে সবে জুটে
আমায় রাজা করত সেই কাননে।
ও ভাই সেই কথা আমার মনে পড়ল এখন
প্রাণে উচাটন রে
দিতেন ক্ষীরননী নন্দরাণী
ধড়ার অঞ্চলে।
অন্তরা।—ও ভাই, আর কি ব্রজে যাব
গিয়ে রাধাকুণ্ডের শীতল জলে
তাপিত অঙ্গ জুড়াব।
রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়ে
অধরে মুরলী ল'য়ে আর কি বাজাব।
আমি শ্যামকুণ্ডেতে ডুব দিয়ে ভাই
রাধাকুণ্ডে সাঁতার দিব॥[১]

ডাক মাল্‌সী

হে মা তারা গো, তুমি করলে শিবে
জীবের অবিচার।
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়ে
যমকে দিলে বিচারের ভার।
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
ব্রহ্মাণ্ড হয় তোমার প্রজা।
যম রাজা কি প্রজা নয় তোমার?[২]

১ পদটি কবিওয়ালা হৃদয়নাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত
২ সৌরভ, ১৩২৯-চৈত্র

॥ ৪ ॥

তারা বলে ডাকরে একবার,
ওরে আমার মন উড়ুপাখী
দেহ পিঞ্জিরার কত ভরসা দেখ, ঐ আছে, ঐ নাই
মায়া-ছিকল দিয়ে গলে, নিজ নামটী যাচ্ছ ভুলে হে,
গুরুর বাক্য হৃদে ঐক্য নাই।
সাধের পিঞ্জরা যখন, ভাঙ্গবে তখন, উপায় দেখি নাই

॥ ৫ ॥

ভবানী-বন্দনা

ওমা মুক্তকেশি খড়্গধরা নিশুম্ভনাশিনি।
পদতলে মহেশ্বর পড়িয়ে আপনি॥
ওমা যমভয় নাশ কর অট্টহাস।
পড়ি আছি তোমার নিজ দাস॥
মাগো, বারেক কটাক্ষে হের জগতজননি।
যা কর আপনি মাগো দক্ষরাজনন্দিনি।
চরণে মহেশ্বর পড়িয়া আপনি॥
এ কি চমৎকার হেরি শ্যামা সুন্দরী
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী!
ওমা শব-শিবে কি হরের ঘরণি।
ওমা রক্তবীজকে নাশ করিলে দিগম্বরী হ'য়ে
চতুর্ভুজা দক্ষিণা কালী।
হর-হৃদে পদ দিয়ে ওমা গলে মুণ্ডমালা দিয়ে
কার শোভা হল?
মা গো শিবের উপরে দাঁড়িয়ে
একাকী দেখ বিহরে
ওমা আদ্যাশক্তি মহামায়া পুরাণেতে শুনি॥[২]

---

১ সৌরভ, ১৩২১-চৈত্র, কবিগান সংগ্রহ—উপেন্দ্রকিশোর সোম।

২ সংগৃহীত পুঁথি

॥ ৬ ॥

আমি অশীতিলক্ষ বার মিছে বার বার
যাতায়াত করেছি ভবে জনম বিফল,
ওগো মা, গিয়েছে ভজনাভাবে
এবার এসে কর্ম্মভোগে
কাল নিবারণ কালীর পাশে তাই নিলাম দীক্ষে।
আয় গো মা, মা, মা তারা,
মাগো, দিলাম রাঙ্গাজবা রাঙ্গাপায়।
আর আমি ভয় করি কায়
দুর্গা বলে অন্তকালে তরিব কটাক্ষে॥
আমার পরমধন তুমি কালী
আর কি নাম মনেতে ভুলি
ভক্তি কালী দিয়ে কালী নাম হৃদয়ে লিখেছি।
শঙ্কা কি তার তারা নামে জোরে ডঙ্কা মেরেছি
শমনের দূত আসিবে যখন তুমি মা
তোমারে ডাকিব তখন বলে দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা,
দুর্গা নামের সম পতাকা মাথায়ও সয়েছি। ধুয়া॥
তারা নামের মহিমা যত সব তন্ত্রে শুনেছি।
সঙ্কটে কি রাজদ্বারে শ্মশানে ঘরে
মা বলে ডাকিলে পরে
ওগো মা, মা, মা তারা,
মাগো সেজন আহুতি হয় ও শ্রীপদে,
ত্বরায় তারে বিপদে সর্ব্বদা
রক্ষে কর সর্ব্বমঙ্গলে॥
অতি সামান্য শমন সংগ্রাম
একবার করে শ্রীদুর্গা নাম
লঙ্কাজয়ী হইলেন শ্রীরাম
শ্রীনাথের ঠাঁই শুনেছি।
তারার দর্পেতে দর্প, সর্ব্বদাই দর্প করি
তাই মা ভ্রান্তে না লও অন্তে

সত্যি মা একা ত্রাতা
মরণে রণে ত্রিভুবনে চিন্তা নাই।
সেই ব্রহ্মত্বে বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব পদ
ও তুচ্ছ পরিগ্রহ সব
পরমপদ সে সম্পদ ঐ পদ।
অতুল্য, অমূল্য বৈভব
ইহকালের ঐশ্বর্য্য বাস
পরকালের পথের সম্বল
ওগো মা, মা, মা তারা,
মাগো, তোমার নামে দুর্ব্বলের বল সবল হয়
পুরাণেতে নাস্তিক কয়
দুর্গা বলে ডাকিলে মেলে চতুর্ব্বর্গ ফল
ও নাম শুনে শ্রীগুরু মস্তকে
আছি মনের সুখে
জনমের মতো মা তোমারে
ভক্তি ডোরে বেঁধেছি ॥[১]

সখীসংবাদ

করব উত্তম পিরীত প্রাণরে,
সে প্রেম কি সামান্যেতে হয়?
তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নূতন ব্রতী,
পিরীত হবে কি, মন তোমার তেমন নয়।
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখ, ভগীরথ মত্ত, প্রেমের আশাতে।
করে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পাতন
আনিলেন গঙ্গা ভারতে ॥
দেখ, প্রহ্লাদের যন্ত্রণা হরিনাম তবু ছাড়লে না,
তার তাইতো হ'ল শেষে সুখোদয় ॥

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে
ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বৈরাগী
দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে
সদাশিব হয়েছেন যোগী ॥
তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই ?
একবার চাও পিরীতকে, আবার চাও বিচ্ছেদকে,
দ্বিধা মনে কর রসময়ি !
যে জন পিরীতে রত হয়, প্রেমধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখ প্রেমের দায়ে শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥

॥ ৮ ॥

রসালস

আলস্য ত্যজিয়ে প্রিয়ে উঠ একবার,
চেয়ে দেখ শশিমুখি, নিশি নাহি আর ॥
অরুণ নিদয় ভাবে,
এখনি উদয় হবে ॥
সুখ উপজিবে প্রাণে।
কেহ বিপক্ষেতে দেখিলে
আমি যাই প্রিয়ে, চাও বদন তুলে,
প্রাণ, হাসিয়ে বিদায় কর ডাক প্রাণ বলে,
গমন সময়ে ধনী শুনাও সুখের বাণী
সম্প্রতি আর দেখা না হবে।
এখন কি হ'বে আর ঘুমালে
ও নিদ্রাতে নিদ্রিত হ'য়ে আছ আপনি।
কটাক্ষে নয়ানে হের গেছে রজনী ॥
রহিতে না পারি আর তোমার আলয়।
সদা চিত্ত সশঙ্কিত কখন কি হয়
থাকিতে থাকিতে নিশি বিদায় করহো প্রেয়সি
উভয়ে হইব সুখী প্রাণ,
তোমার গুরুজন জানিলে

রহিতে না পারি আর বলিয়ে তোমায়
সদা প্রাণ সশঙ্কিত মন কলেবর
যদি কেহ দেখে তবে বড়ই প্রমাদ হবে
আমারে বিদায় করো প্রাণ ॥[১]

সখীসংবাদ—অভিসার

বৃকভানু-কন্যা কুঞ্জে করহ অভিসার।
সাজহ সজনি গো রজনী নাহি আর ॥
নিকুঞ্জে আসিবার সময় মনে হয়,
তাই শুনেছ নিশ্চয়!
আশা-দূতী আসতে আমায়
করে গেছে নিমন্ত্রণ।
যাই চল ভাই সব সখীগণ,
তবে সে পাইবে হরি-দরশন,
পর পর অলঙ্কার কেয়র কঙ্কণ ॥
রাত্রি গত তৃতীয় প্রহর,
শশধর প্রায় হত অবসর।
জটিলা জাগিবে যদি ঘটাবে কি বিঘটন।
মাধবে পাইবে রাধে এ বড় আহ্লাদ
প্রেয়সী চকোরী তুমি সব দিয়ে কালাচাঁদ
হইবে মিলন সবে নিরখিব তায়।
মন দুঃখ পাপ-তাপো যাবে সমুদায় ॥
কেহ দিব সচন্দন ফুল
কেউ জোগাব তাম্বুল।
হাস্য-রহস্য সহাস্য কর নিশি জাগরণ
ঝটিতে ঝাটিতে হবে বিলম্বে কাজ নাই
অবিলম্বে চল প্যারি গিয়ে যেন দেখা পাই।

১ সংগৃহীত পুঁথি

নীলাম্বর অম্বর সম্বর নিজকায়
পদব্রজে যেতে ব্রজে চেনে না তোমায়
সঙ্গোপনে নব রঙ্গবাস
এ প্রকাশ কেউ না পাবে আভাস।
চঞ্চল চরণে চল অঞ্চলে ঢেকে বদন।
গোপনে গোপিনীগণে সাজহ সত্বর,
প্রমাদ ঘটিবে তবে ননদী জাগিলে পর।
চন্দ্রাবলী গৃহে যদি ভুঞ্জ সুখ ভোগ,
ধনি তবে শুন গো, হইবে দুর্য্যোগ।
তাহার অসাধ্য কাজ নাই, শুন রাই
সেই হেতু শীঘ্র যেতে চাই
অপরে না পরশ ক'রে গোপীনাথের চরণ॥

দরতা।—ও কে বট হে, ও কে বনমালী!
এ বেশে কেন হে নৃপমণি॥
দেখিব সে বিরস বদন,
কেহ কহে মদনমোহন,
বল কি অভিপ্রায়ে ভাসায়েছ নয়ন জলে।
ছিন্নভিন্ন বেশ
দেখি তোমার হৃষীকেশ
বল দেখি কে হে এমন করিলে॥
শুনিয়ে শুনাও হে
আমি বলিতে চাই কিশোরী শুধায়ে
হইয়ে পূর্ণচন্দ্র তুমি হে কালাচান্দ,
রাধার শশী পড়ে কেন ভূতলে।
চিতান।—শ্রীরাধার পদপ্রান্ত আশু শ্যাম
হইয়ে ভাবোন্মাদ
হায়! রাধাকুঞ্জের ভিতরে গিয়ে
বিশ্রান্ত হ'য়ে বসিলে তখন

রাই বিচ্ছেদ হে
শ্যাম গুণমণি
রাধানাম অবিশ্রাম
আছ হইয়ে লুণ্ঠিত ধরণী
ধরাতে অধরা
চক্ষে বহিছে ধারা
তা দেখিয়ে এক দূতী ব'লে
কলি।—এ ভাবের কি হে ভাবান্ত
বল হে নিতান্ত শুধাই তোমায় শ্রীকান্ত
নবম রসের উদয় দেখাইয়ে
আজ কেন রাধাকান্ত
কখন ঊর্দ্ধমুখে দেখি শ্যাম
অধোমুখ হেরি কখন
তুমি কি লাগি কিসের জন্যতে
এ হেতু দৈন্যে বিরস বদন
বুঝি হয়ে নির্দ্দয়া হে
কেউ কিছু বলেছে ?
তাইতে কী মাধব
তোমার চন্দ্রানন মলিনো হয়েছে ?
ছি ছি ওহে রসময়, শুন হে দয়াময়
নাগরালি কেবা কিসে ভাঙ্গিলে ॥

॥ ১১ ॥

প্রভাতী

ও কি চন্দ্রালয়ে, চন্দ্রোদয়ে, শ্যামচন্দ্রোদয়।
বিভাবরীর শেষ ধরে, হৃষীকেশ অবশেষে রাইকুঞ্জে উদয়।
হেরে রাধার মান প্রভাতকালে।
সে মান রাখবার ছলে,
সই গো, ধুলায় অঙ্গ ঢেলে,
পড়িলেন গিয়ে শ্যাম রাধার চরণতলে।

দেখে ললিতে রে,
বৃন্দে গিয়ে কয়, সখি ত্বরায় যায়,
আয় গো দেখ সে আয়,
কুঞ্জে প্রমাদ ঘটেছে।
কিসে বাঁচবে জীবন,
রাধার প্রেমে ক্ষীরোদ মন্থন,
আজ হয়েছে।
হেরে মান ম্রিয়মাণ,
করে বিচ্ছেদবিষ পান,
হ'য়ে শিবের সমান,
ব্রজের প্রাণের প্রাণ,
কৃষ্ণ টলে পড়েছে।
এ দুঃখ বলব আর কার কাছে,
সই, যে দায় ঘটেছে।
চন্দ্রাবলী সই, যে দায় ঘটাল,
রাধার অভিমান তায়,
সই গো, বাসুকির প্রায়,
সেই গরলে গোকুল রসাতলে যায়।
হ'ল চন্দ্রার কুল অসুরকুল,
রাধার কুল সই, আমরা দেবতার কুল
কেন্দে হই আকুল,
গোকুল ধ্বংস হয় পাছে।
শিব যেমন সেই স্থলে,
সদা ডেকেছেন দুর্গা দুর্গা বলে
ততোধিক বিপদে পড়েছে বংশীধর,
বিচ্ছেদ বিষে অঙ্গ হ'য়ে জরজর,
অন্য কথা নাই।
ডাকতেছে কানাই রাধা, রাধা, রাধা, রাধা বলে
তবু চায় না রাধে কালাচান্দে,
ছার মানের দায়,

দেখে কান্দে প্রাণ,
রাখতে মানের মান
কৃষ্ণের প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায়।
মহৌষধি পান যেন সাবধান
হয়ে কম্পিত নয়ন,
সই গো, বলেন বংশীবয়ান,
দেহি রাধে পদপল্লভে স্থান।
বন্ধু কেন্দে হয় প্রাণান্ত,
তবু হয় না রাধার মানান্ত,
দেখে নীলকান্ত নীলকণ্ঠের প্রায় হয়েছে ॥[১]

॥ ১২ ॥

সখীসংবাদ—মান

গলে পীতাম্বর দিয়ে পীতাম্বর
সাধিলেন তোমার চরণ ধরে।
ও রাই, তবু চাইলি না ফিরে ॥
কালাচান্দ গেল ফিরে!
কমলিনি, কি ভাবে আছ মান করে।
ছন্দবাদ অপবাদে করলি ও তুই বিষম প্রমাদ!
কেন তুমি রাই গো মিছে অকারণে?
কেন্দে শ্যাম ফিরে যান
কেন গো চন্দ্রমুখী রাধে?
যার মানে তব মান
করলি তারে অপমান
শ্যাম-হারায়ে থাকিবি কি রাই মান করে।
পুষ্পপুঞ্জ কুঞ্জে গুঞ্জময়ী রাই
আছে হ'য়ে আশ্রয়
বৃন্দে শ্রীরাধার সন্নিকটে আসি
মিষ্টভাষী সবিনয়ে কয় একি কর রাই।

১ সংগৃহীত পুঁথি

ওগো হয়ে আতঙ্কাস্ত
নীলকান্ত সনে একান্ত কেন হও মতান্ত
কাম কেমনে জিনিয়ে,
অতি কোমল প্রাণ তায় কঠিন হ'য়ে
নীলকমল ত্যজিলে কি করে ॥
কিশোরি গো, বল্ল বিবরণ,
সেই রাধানাথে কান্দাইলি কি কারণ।
কালাচান্দের কালরূপ কিশোরী গো,
করিবি না আর নিরীক্ষণ।
শ্যাম যদি হয় দোষের দোষী
ত্বং হৃদি সরোজ যদি নাশি
যার হ'তে থাকে প্রাণ, যায় প্রাণ
সে প্রাণ করলি তুই বিরস
যে কৃষ্ণ লাগি গো শিব হ'য়েছেন যোগী
ভাবি তাই কেহে-রাই তারে অপমান
করলি কিসের লাগি।
ছি তোমার কি কঠিন হিয়া
কিছুই কি নাই দয়া মায়া!
কুঞ্জে হ'তে শ্যামকে কি বিদায়
দিলি কি করে ॥[১]

॥ ১৩ ॥

মান

চিতান।—শ্রীরাধিকার মান, ভাঙতে শ্রীনিবাস।
পাড়ন।—পায়ে ধরে, ধরায় পড়ে,—
তবু রাধার না পায় আশ্বাস।
লহর।—রাধানাথ, রাধার মানে
পেয়ে অপমান, হতজ্ঞান,
কিছুই না পেয়ে সন্ধান,

ভাসে দুটি চক্ষের জলে, চলিতে দু'পা পিছলে,
রাই বলে রাই-কুণ্ডের জলে, প্রাণ ত্যজিতে যান।

মিল।—(দেখে) কৃষ্ণ আকুল, সব শোকাকুল
গোকুলবাসী যত ;—
চন্দ্রাবলী আসি বলে, ও কি করেছ ?

মহড়া।—বিপদভঞ্জন, বল কি বিপদে পড়েছ ?

ধুয়া।— চন্দনের বিন্দু ভালে, ইন্দু যেমন সিন্ধু জলে,
তেমনি দেখ্তে পাই,
শশিমুখে কালো শশী,
সুধামাখা মধুর হাসি নাই ;
চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত, তেমনি মত দেখি ব্যস্ত
কি ভাবেতে এত ত্রস্ত, কোথায় চলেছ ?
বিপদভঞ্জন ! বল কি বিপদে পড়েছ ?

লহর।—কেন হে ! ঝর-ঝর ঝরে দুনয়ন,
মদনমোহন একি দেখি কুলক্ষণ
কৃষ্ণ তোমার কান্না দেখে, কোকিল কাঁদে তমাল বৃক্ষে
পশু-পাখী মনের দুঃখে ধরায় অচেতন।

মিল।—তোমার নয়নে না ধরে বারি,
উৎকণ্ঠিত মন, মধুসূদন।
বল কি ধন-হারা রয়েছ,
বিপদভঞ্জন, বল কি বিপদে পড়েছ ?

অন্তরা।—একি বিপরীত ! চিত্ত বিচলিত,
কেন, কেন বনমালী।
আমি তোমার দাসী চন্দ্রাবলী।
যোগী ঋষি যোগে জপে কৃষ্ণনাম,
অনায়াসে অন্তে পায় মোক্ষধাম,
বল বল শ্যাম, রাধা কা'র নাম,
উন্মত্ত হয়েছ যে বোল বলি।[১]

১ সৌরভ—১৩২৩ আষাঢ়, ময়মনসিংহের কবির গান।

॥ ১৪ ॥

বিরহ

আমি নারী অভাগী অবলা
হয়েছে সরল আমার প্রাণ।
সুখের আকিঞ্চনে রসিকজনে
সই, আমি যৌবন কল্যাম দান ॥
আমার সে পিরীত করা
সয়ে আর সইল না।
যেখানে যাই বিচ্ছেদ তুই সঙ্গ ছাড়িস না।
যখন করি যে প্রণয়
তাথে আর বিচ্ছেদ হয়
সদাই দুঃখে অঙ্গ দয়
পিরীত-ভাঙ্গা স্বভাব কি তুই একদিন ছাড়াতে পারিস না।
জুড়াইব কোথা আমি এমন আর জায়গা দেখি না,
আমার মরণ হলে বাঁচি আমি, সহে না যন্ত্রণা ॥
থাকি আমি মর্ম্মে মরে, বলব আর কারে,
এখন পথে বসে কাঁদতে হয়েছে ঐ সাধের পিরীত করে ॥
মিছা দোষে পরাণবঁধুয়া সেই আমারে ফেলে পালাল
এখন হাতে হাতে তোমারি হাতে আমায় সঁপে যে গেল।
আমার কোথা গেল প্রাণবঁধুয়া দেখতে আর পেলাম না ॥

॥ ১৫ ॥

কামিনীর প্রাণেতে বিচ্ছেদ জ্বালা দিলিরে
তুই পুড়া বিচ্ছেদ।
আমার সাধের পীরিত ভেঙ্গে যে গেল
মনে হ'ল বড় খেদ ॥
কেন তোমার হাতে পড়ে
আমি সুখের প্রাণ হারাব।
যে দেশেতে নাই বিচ্ছেদ সেই দেশে যাব ॥

গিয়েছে না যাবে প্রাণ
হ'ল হ'ল অপমান
পরকে দিয়েছিলাম প্রাণ
এবার আমি দেশান্তরি প্রেমের দায়ে হব ॥
সেই দেশে প্রেম করে আমি মনের বাসনা পুরাব।
নিতি প্রেমের কথা কয়ে আমি তাপিত প্রাণ জুড়াব ॥
নারীর সদা প্রাণে বিচ্ছেদ তুই দিলি কালি
বুকেতে শেল মেরেছিস আমার, আজন্ম কান্দালি
পরাধিনী আমি হ'লাম * *
আমার যৌবনকালে এ ছার কপালে
হ'ল বিধাতা বিমুখ,
এখন তোর দায়ে কি আমি নারী
সাধের মান খোয়াব ॥

॥ ১৬ ॥

(রাধা কর্তৃক কাত্যায়নী স্তব)

মহড়া।—জননি গো আজকের যামিনী যেন পোহায় না।
নিশি পোহালে ও মা দুর্গে, শ্যাম যাবেন কংস-যজ্ঞে
গেলে শ্যাম পুনঃ ব্রজে আসবেন না।
প্রসন্নপালিনি যোগিনি যোগললনা।
তোমায় পূজে কৃষ্ণ পেয়েছি।
ও মা মজাইয়ে জাতিকুল, গোকুল করেছি স্থূল
কালো জলে সোণার অঙ্গ ঢেলেছি।
এমন সে কালো হ'লো বাম,
কাল যাবে মা কংসধাম।
গেলে শ্যাম, রাধার প্রাণ আর বাঁচবে না।
চিতেন।—যাবেন মথুরায় কালাচাঁদ, শুনিয়ে সে সংবাদ,
উন্মত্তা হয়ে কিশোরী।
গিয়ে কাত্যায়নীর ঠাঁই, ভক্তিভাবে রাই,
বলে রক্ষা কর মা শঙ্করি।

দিয়ে বিল্বদল রাঙ্গাচরণে
রাধা কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কয় আমি অতি নিরাশ্রয়,
ওমা আমার মত অনাথিনী দেখি নাই ॥
দেখি বিলম্বের সময় নয়, রজনী প্রভাত হয়।
প্রসন্ন হওগো হর-অঙ্গনা।

অন্তরা।—ওমা তুমি সকল জান, শ্রীকৃষ্ণ-জীবন
তিলেক না দেখিলে মরি
আঁখির পলকে হারাই গো যাহাকে
তারে কি বিদায় দিয়ে থাক্‌তে পারি।

পরচিতেন।—তাহে বিপক্ষ দুর্জ্জন, সে কংস-রাজন
সমরে অতি বলবান্।
একবার পাঠায়ে পূতনা, করিয়ে ছলনা
ওমা শ্রীকৃষ্ণের বধিতে পরাণ।
তাও কি জান না, ওগো জননি।
হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষবল, তুমি শক্তি প্রবল,
সে বিপদে রক্ষা করলে আপনি।
এখন যদি মা দাসীকে, না বাঁচাও বিপাকে,
তবে আর দুর্গা নাম কেউ লবে না ॥

॥ ১৭ ॥

অক্রূর সংবাদ

(যখন) কৃষ্ণ ব্রজ ছাইরে, অক্রুর মুনির রথে চইরে
চল্লেন মথুরায় ;
(তখন) গোপীগণ সব চক্র কইরে, মুনির রথের চক্র ধইরে
চক্র ছাড়ে না ; তারা চক্রীর চক্র বুঝে না।
কেউ বলে রাই হওগো শান্ত, হয় ধরিগে' হবে ক্ষান্ত
ইথে হয় যদি সই জীবনান্ত :
তবু কান্ত যেতে দিবি না।
কৃষ্ণ গোপিকার জীবন, কৃষ্ণ গোপিকার জীবনের ধন হরি
অক্রূরে তুমি নিও না হে সেই ধন হরি।

ওহে অক্রুর মুনি, নিও না নীলকান্তমণি
এই বলে রাই ধল্লেন রথে।
গোপীর মন রথের ধন, মদনমোহন
কাষ্ঠ রথে কল্লেন গমন।
একি সর্ব্বনাশ, তোমার কি রীতি হে পীতবাস ;
রথীর ধর্ম্ম লোকে বলে
প্রাণান্তেও রথ যায় না ফেলে
তুমি (রাইর) যৌবন রথের কি দোষ পেলে ;
তাতে রথ দিয়ে যাও বনবাস।
চড়ে আজ কাষ্ঠ রথে, কোথায় যাও কষ্ট পেতে
ছি ছি বন্ধু ! এই রথ কি যৌবন রথের তুলনা।
এস মনোরথে, চড়ে বন্ধু মুনির রথে
কোথায় যাবে বল না ![১]

॥ ১৮ ॥

মাথুর

ব্রজপুর ত্যজ্য করি বংশীধর
সেই যে গেলেন নটবর।
রাজেশ্বর হ'লেন মথুরায়।
এখন রাধা বলে বেণু ভুলে ব্রজনাথ
এখন রাধানাথ পেলেন কুব্জারে
কাল বলে হরি ত ব্রজে এল না।
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাইলে না ॥
কৃষ্ণবিরহেতে প্রাণ ধৈর্য্য মানে না।
আশা-সিন্ধু তরী আমার তাপেতে শুকায়েছে।
বৃন্দাবনে সকলে নীরব হয়েছে ॥
এখন কুব্জা হ'ল রাজরাণী।
আসবে না চিন্তামণি
এখন দুঃখিনী ধূলায় পড়ে রাই কমলিনী ॥

১ কবিগান সংগ্রহ—উপেন্দ্রকিশোর সোম, সৌরভ, ১৩২১।

এখন বিরহিণী রাজনন্দিনী নয়ননীরে ভাসিতেছে।
হরি বিনে ওগো সজনি,
দিবসরজনী শুকায়ে আছে
ভেবে ভেবে অঙ্গ হ'য়েছে কালি
আসবেন না বনমালী।
শ্যাম বিনে কে বাজাবে মোহনমুরলী।
যত পশুপাখী মুদে আঁখি অসুখী হ'য়ে আছে।
কিছু উপায় দেখি না কি করি তা' বল না
আর ত প্রাণ নিষেধ মানে না
ওই কালরূপ অন্তরেতে জাগে
পাসরিতে পারি না ॥[১]

(অক্রূরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

ধরতা।—ওগো অক্রূরমুনি আমায় ব্রজেতে পুনর্ব্বার
লয়ে আর যেতে হ'বে না।
আমি এসে যমুনা পার কেবল এই কুব্জার
পুরাইলাম মনস্কাম
আমি ব্রজের ধন ব্রজে আছ জান না ॥
আমার মন বৃন্দাবন তিলার্দ্ধ ছাড়া থাকে না
আমার মন প্রাণ রাধার কাছে রেখে
আমা শূন্য দেহে এসেছি যমুনা পার
শুন অক্রূরমুনি বলি গো তোমাকে
আমার মন প্রাণ বাঁধা রেখেছেন শ্রীরাধা
রাধারূপ সদা করি সাধনা ॥
চিতান।—কহিলে অক্রূর মুনি ব্রজে চল আমার সঙ্গেতে।
এসে মথুরায় আছ শূন্যকায়, রেখে রাধায় ব্রজেতে

[১] সংগৃহীত পুঁথি

কেবল ব্রজে অদেখা হয়েছে।
আছে শ্রীদামের অভিশাপ,
তায়তে রাধার মনস্তাপ,
কিন্তু আমি ব্রজে ভিন্ন ভাবে আছি ॥
আমি স্বরূপে তোমায় কই।
বৃন্দাবন ছাড়া নই।
গোপনে পুরাই রাধার বাসনা ॥

কলি।—আমি ব্রজগোপীর মনের ধন।
সব কথা বলি অক্রুরমুনি তোমারে।
গোপনে নির্জ্জনেতে ব্রজেতে গো
করি নিয়ে আলাপন
তুমি কহিলে ধর্ম্মনষ্ট হয় না লইয়ে গেলে
তুমি জান না,
এ সব মন্ত্রণা,
এখন যাব না গোকুলে ॥
তোমার কেন ধর্ম্মনষ্ট হবে
যদি বৃন্দাবনের লোকে কয়,
কোথা কৃষ্ণ দয়াময়,
তুমি বল্লে মাধব কালকে ব্রজে আসিবে।
তুমি যখন ব্রজে যাবে
সকলকে বুঝাইবে
তোমায় কেহ মন্দ বলিতে পারিবে না ॥[১]

॥ ২০ ॥

(উদ্ধবের প্রতি ব্রজাঙ্গনার উক্তি)

মহড়া।—আমরা কার কাছে প্রাণ জুড়াবো।
ছিল জীবেরি জীবন, সে বংশীবদন,
হারালেম্, তারে হে উদ্ধবো ॥

---

১ সংগৃহীত পুঁথি

কুটিলো মাধবী লতা, এ সময়ে মাধব কোথা
গাঁথিয়ে হার কার গলায় [দেবো]।
চিতেন।—উদ্ধবেরে হেরে সব ব্রজাঙ্গনা কয়
আমরা এতদিনে কৃষ্ণ বিনে হলেম্ নিরাশ্রয়
এ সুখো বসন্তকালে, শ্যামকে কোথা রেখে এলে
সব শূন্য, বিহনে সেই মাধবো ॥[১]

॥ ২১ ॥

(উদ্ধবের উক্তি)

ধরতা।—এখন চল ব্রজে ওহে ব্রজনাথ,
ব্রজেতে রেখে আসি ব্রজের ধন
তোমায় কাল বলে এনেছি,
সত্যে বান্ধা আছি
এখন যার ধন তুমি
তারে করি সমর্পণ।
যদুরায় মথুরায়
বল তায় কিবে প্রয়োজন।
দেবকীর উদ্ধার তায় হে
যে মানুষ ছিল, হল সব
হে মাধব, এখন ব্রজনাথ ব্রজে গেলে ভাল
আছে তৃষিত চাতকী প্রায় ব্রজাঙ্গনা
চেয়ে তোমার নব ঘনশ্যাম বরণ॥
চিতান।—বিশ্রাম করেন মধুপুরে শ্যাম
বিশ্রাম বৃক্ষের আশ্রয়
অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে আসি
মৃদুভাষী সবিনয়ে কয়
আছে ব্রজনাথ হে
সব জানি আমি

১ 'এটির রচয়িতা রাম বসু নহে, কে ইহার রচয়িতা তাহা জানা যায় নাই।' ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদক, সংবাদ প্রভাকর।

শ্রীরাধার গলার হার
ব্রজ গোপীকার সর্ব্বস্ব ধন তুমি।
ছিল কংসবধ অনুরোধ এই মধুপুরে
সে সব কর্ম্ম হল ত হে সমাপন ॥

কলি।—স্বচক্ষেতে দেখিছি মাধব
সেই ব্রজবাসীর কৃষ্ণগত প্রাণ হে
পলকে বিচ্ছেদ হয়
কালাচান্দ হে
শব প্রায় গোপীসব
বিশেষে বৃকভানু কন্নে রাই
গোকুলে মান্নে গোপীকার
তার হৃদি সরোজের নিধি তুমি
আছি আমি ঋণগ্রস্ত তায়
রাইয়ের ধন রাই চায় হে
এই এখন যুক্তি।
গেলে শ্যাম ব্রজধাম
তবে আমি হে শক্তি ঋণে মুক্তি ॥
তোমায় তাই বলি, অশুভকাল কেন হরি কর হরি
শ্রীহরি শ্রীবৃন্দাবন ॥[1]

॥ ২২ ॥

বিরহ

(উদ্ধবের প্রতি সখীগণের উক্তি)

কথায় ভুলাবি জানি, শ্যাম আসবে না।
আসবার আশা থাকলে মদনমোহন গমন কালে
কখনো কেঁদে যেত না ॥
আমরা জানি সে কঠিন হৃদয়
কে দয়াময় তারে বলে, বিচ্ছেদ-অনলে আকুল সকলে,
দুঃখের সাগরে শ্রীরাধারে ভাসাইলে।

১ সংগৃহীত পুঁথি

এই আমাদের রাজনন্দিনী, ছিল যত আদরিণী
দেখ এই ব্রজের কাঙ্গালিনী, এখন করেছে।
উদ্ধব যারে যা ব্রজের দুর্দ্দশা দেখে যা।
বলিস সেই নিঠুরের কাছে আমরা মরি সবাই
কার কাছে ডরাই কিসে প্রাণ জুড়াই ॥
রাধায় রাধা নাই নন্দ রাম কানাই বলে
কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে।
দয়া হলে সবে বাঁচে দেখ
বিনে সেই মদনমোহন হয় না এখন গোষ্ঠলীলে,
কাঁদে কোকিলে আকুল সকলে ধেনুগণে যায় না বাথানে পুচ্ছ তুলে
কৃষ্ণের প্রেমে সখা সকল রোদন ক'রে
শ্রীদাম সুবল তারা সকলে
বিভোল হ'য়ে ধূলায় পড়ে আছে ॥
প্রফুল্ল কমল মুদিত হ'ল শ্যাম শোকেতে।
ত্যজে মধু পান কত সাধের ভ্রমরগণ, সকলে পড়ে ধূলাতে ॥
ছিল সুখময় এই ব্রজধাম গিয়েছে বামে,
যে দিন হ'তে মনের দুঃখেতে আছি কুঞ্জেতে।
দেখ রোদন সার হ'ল এখন এই ব্রজেতে ॥
ছিল তাল তমাল ভাণ্ডির বন কত সুখের এই বৃন্দাবন
দেখ কৃষ্ণের শোকেতে মলিন হ'য়ে আছে ॥

॥ ২৩ ॥

প্রভাস

যজ্ঞের পত্র নিয়ে নারদ গোকুলে উদয়
মনের কি ছলে নন্দালয়ে গোকুলে,
মা বলে বলে ডাকছে যশোদায়।
রাণী ভ্রান্তে ভুইলে[১] গোপাল বইলে,[২]
স্বর্ণ থালে নিয়ে নবনী ;
বলে খেয়ে যারে নীলমণি !

১ ভুইলে=ভুলে (প্রাদেশিক) ২ বইলে বা বুইলে=ব'লে (প্রাদেশিক)

না হেরে তোর চন্দ্রবদন, যে কষ্ট রেখেছি জীবন,
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন ও যাদুমণি।
না হেরে তোর মোহন বেণু ধেনুবৎস সব,
কেশব, ভেসে সে সব ধেনু মথুরার পথ চেয়ে আছে,
এতদিনে নীলমণি তোর মায়ের কথা মনে পড়েছে।
তোর শোকেতে কেঁদে কেঁদে নয়ন গিয়াছে।
(যে দিন) ব্রজ ছেড়ে, গেলিরে বাপ মধুপুরে,
সেই দিন অবধি তোর শোকেতে অকূলে ভাসি ;
না হেরে তোর চন্দ্রবদন, যে কষ্টে রেখেছি জীবন
চেয়ে দেখ বাপ জন্মের মতন, অস্থি-চর্ম্মসার হইয়াছে।
এতদিনে নীলমণি তোর, মায়ের কথা স্মরণ হইয়াছে ॥
যেদিন ব্রজ ছাড়ি, অক্রূর মুনির রথে চড়ি
গেলে প্রভাসে কেবল প্রাণ ছিল বাপ তোর আশে ;
যার ছেলে তার কোলে দেখি, প্রাণের গোপাল বলে ডাকি ;
মুখ পানে তার চেয়ে থাকি, মা বলে না সে।

ঝুমুর।—আয় গোপাল আয় কোলে একবার ডাক মা বলে।
(আমায়) ছেড়ে যেও না রে বাপ দিয়ে মনস্তাপ
(দিয়ে) দুঃখিনীরে বিসর্জ্জন জলে।[১]

॥ ২৪ ॥

প্রভাস

চিতান।—নারদ মুখে পেয়ে বার্ত্তা
করলেন যাত্রা
গোপগোপীগণ ॥

পড়তা।—অষ্ট নারী[২] সকলে করে ধরাধরি
মধ্যে রাইকিশোরী
যজ্ঞস্থলে দিলেন দরশন ॥

---

১ কবিগান-সংগ্রহ—উপেন্দ্রকিশোর সোম, সৌরভ, ১৩২১ ; এই গানটির ভূমিকা এইরূপ যে, প্রভাস যজ্ঞে নারদ যশোদার কাছে গেলে যশোদা নারদকে গোপালজ্ঞানে ধরিয়া কথা বলিতেছেন।

২ বৃন্দা, বিশাখা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, বিচিত্রা, সুচিত্রা, ললিতা ও চিত্ররেখা।

১ ফুকার।—কৃষ্ণের বামভাগে বসেছেন রুক্মিণী
তাই দেখে মনোদুঃখে
কেঁদে উঠলেন ধনী।
তখন বৃন্দেদূতীর করে ধরে
বলছেন রাধে বিনয় করে
ব্রজে আর যাব না ফিরে।
প্রাণ ত্যজবো এক্ষুণি ॥
পূর্ব্বে কাল কুটিলে বাধা দিলে যাত্রাকালেতে
শতবার বাধা দিলে যাত্রাকালেতে
এ কালোরূপ ব্রজে ফিরে দেখাব কেমন করে ॥

মুখ।— আমি কেন এলাম যজ্ঞ দেখতে
রসময় শ্যামের বামেতে
রসবতী কে বিরাজ করে ॥

পেজ।—পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যাতে
রামের বামে বসতেন সীতে,
তেমনি কি দেখতে পাই
অষ্ট সখী বল দেখি,
এখন আমি কোন কূলে দাঁড়াই !
না দেখে শ্যাম ছিলাম ভাল
দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল,
এখন সখী মৃত্যু ভাল,
সহ্য হয় না শরীরে ॥

খোজ।—শোকের অনল উঠল জ্বলে
আমার অন্তরে ॥

২য় ফুকর।—কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-অনল নিভাব তাই বলে,
সখিরে সেই উদ্দেশ্যে এলেম যজ্ঞস্থলে
সখি, সে আগুন আর নিভাব কি
এসে নূতন আগুন দেখি,
বিধির লিখন আর বাকি,
ঘটে এই কপালে !

পূর্ব্বে শ্রীদাম শাপের সেই আগুন
নিভে যে ছিল তিন আগুন
আজ উঠল জ্বলে
এসে প্রভাসের তীরে ॥

অন্তরা।—নারদ গোস্বামীর মুখে শুনে
এলাম এখানে।
আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে
কৃষ্ণ দরশনে ॥
যার জন্যে যোগী ঋষি
যোগে থাকে দিবানিশি
পায় নাক ধ্যানে,
যজ্ঞ করবেন যদুপতি
আমার প্রাণ আহুতি তৃপ্তি হবে
আজ এক্ষণে ॥[১]

॥ ২৫ ॥

(দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের খেদ)

ধরতা।—বলো আর কি আমায়
নিজ দাস বলে চন্দ্রমুখী রাই কি হবে সদয়।
ইন্দুমুখী রাই নিজের সুখের যে তরি
ছদ্মবেশে আমায় আছ কি হয়ে নির্দ্দয় ॥
এ অনন্ত সাযুজ্য, সালোক্য আদি
যত ভাব তায় রত নয় হে
কেবল মাধুর্য্য বলে রাই বলে রাই
বেজায় ভৎর্সনা করলেন সে ত সহ্য
ত্যজি রত্নময় সিংহাসন
এই কালরতন যতনের ধন
লুণ্ঠিত হয় ধূলায় ॥

---

১ কবিওয়ালা হৃদয়নাথ কর মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত

চিতান।—রাই-বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ মনে দ্বারকাতে শ্যাম
ত্যজে শ্যাম বিশ্রাম আশ্রয়
অগ্রে সে ভাব হেরিয়ে রুক্মিণী এ
কহে রাণী রমণী সভায়
কৃষ্ণ তুষ্টিধর হে,
তায় ভূধর হ'য়ে ভূধর,
তুষ্টিধর সে ধরাতে হইয়ে অধর
রাইয়ের ভাব মধুর ভাব
সে ভাব যেমনে করে
অতি কাতর হ'য়ে বলে শ্যাম হায়, হায়!

কলি।—হেমাঙ্গিনীর সে ভাব
সব হৃদয়ে ভাবি
ধূলাতে লুণ্ঠিত হ'য়ে মাধব
রাই ভাবেতে মগ্ন হ'য়ে
হে অচেতন হয় কেশব
কখনও ধ্যানেতে শ্যামরায়
শ্রীরাধায় অন্তরে দেখি
বলে প্রাণপ্রিয়ে তুমি এলে হে
কোথা ছিলে ও চন্দ্রমুখী
কখন সে ভাবছে
ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে হরি
হারায়ে সে প্যারী
অশ্রুজলে ভাসে মুরারি।
বলে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন
কোথায় যে হলে অদরশন
কহে কি রূপ
হে শ্যাম কেন হারাইলাম এরূপ হায়॥[১]

১ সংগৃহীত পুঁথি

॥ ২৬ ॥

ধরতা।—থেকে দ্বারিকাতে ওহে দ্বারিকানাথ
রাধা বলিয়ে কেন কান্দ্‌তেছ।
এ ভাবের কি ভাব বল হে কেশব।
দিবানিশি রাধা নাম জপ্‌তেছ॥
কি জানি কি ভাব আজ তোমায় উদিত দেখি।
রাই বলিয়ে ডাক উচ্চৈঃস্বরে
তোমার স্বর, মধুর স্বর
তার মধ্যএ রাধানাম স্বরে
ভাবি রূপ লাবণ্য বিচ্ছেদে বিশীর্ণ
তাইতে কী হে
নয়ননীরে ভাসতেছ॥

চিতান।—হেরিয়ে গগনচান্দ কালাচান্দ
রাইচন্দ্রকে করিয়ে মনে।
তেজিয়ে পর্য্যঙ্ক ত্রিভঙ্গ
হায় এ কি রঙ্গ
বিচ্ছেদ করিয়ে মনে
সে ভাব হেরিয়ে হে
রাজমহিষী যত
বলে শ্যাম গুণধাম
কেন সরসে বিরস শ্রীকান্ত
কৃষ্ণ তোমার নাকি কেউ কল্লে অপমান।
তায় তে কী হে খেদান্বিত হয়েছ।

কলি।—কৃষ্ণ আমরা অবোধ নারী
ঐ কি ভঙ্গী তোমার
কিছুই ত বুঝতে নারি
তোমার অন্ত কেবা পায় কালাচান্দ হে,
আমরা কি পাব হরি
অতি কাতরে তুমি রাই বলে
ডাকিছ ওহে দয়াময়!

ব্রজেতে রাই রাজকন্যে
এ তোমার মনে আছে রসময়
মনোলোভা হে !
সেই রাধে হেমাঙ্গিনী
একান্ত হে কান্ত
তাইতে চিন্তা করহে চিন্তামণি
অচিন্ত্য হবে কী এ চিন্তা করিলে
মিথ্যা কেন্দে কেন শ্যাম আকুল হচ্ছ ॥

॥ ২৭ ॥

গোষ্ঠ

(যশোদার উক্তি)

বলাই ডাকিস নারে ওরে,
গোষ্ঠে গোপাল আমার,
দিব নারে এ প্রাণ থাক্‌তে ।
তোরা কাল গোষ্ঠে গিয়াছিলি,
নিয়েছিলি আমার শশি-ভূষণ,
কালীদহের জলে দিয়েছিলি বিসর্জ্জন,
যাই আমার কপাল ভাল,
কোলের ধন কোলে এলো,
বিধাতা সদয় ছিল গোপাল পেলাম তাইতে ॥

॥ ২৮ ॥

ওহে নন্দ হে, দেখেছি কাল নিশিশেষে,
গোপাল আমায় বললে এসে,
ননী দে গো মা, ক্ষুধায় প্রাণ আর বাঁচে না,
আমি বল্লাম, নাই অবসর
(ওরে) কে তোরে দিবে ক্ষীরসর,
সর-সর বলে ফেলিলেম ঠেলে,
পুনঃ মধু স্বর আর শুনলেম না !

॥ ২৯ ॥

গোপাল আয়, আয়, আয়, আয়, আয়রে আয়,
আয়রে আয় আমার কোলেতে।
সদ্য দধি মন্থন ক'রে রেখেছি রে ঘরে ;—
ননী খেয়ে যা, খেয়ে যা,
গোঠে যা গোঠে যা নাচিতে, নাচিতে ॥

শব্দার্থ

[সঙ্কেতের অর্থ :—আঃ—আরবী, ইঃ—ইংরাজি, তুঃ—তুলনীয়, প্রাঃ বাঃ—প্রাচীন বাংলা, প্রাকৃঃ—প্রাকৃত, পাঃ—পালি, ফাঃ—ফারসী, বাঃ—বাঙ্গলা, মূঃ--মূল অর্থ, সং—সংস্কৃত, হিঃ—হিন্দী। শব্দার্থের শেষে উল্লিখিত সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।]

অপার্য্যে—অপারগতায় (গাম্ভীর্য, ঔদার্য প্রভৃতি শব্দের আনুরূপ্যে গঠিত শব্দ) ৩০৫

অষ্টাপদ—সোনা, ৪০৪

আখেরি—[আঃ আখির্] হাল বা শেষ, ৬, ৭৭

আগম-নিগম—সাধারণতঃ বেদ ও তন্ত্র বুঝায়, আবার বিশেষভাবে শাক্ততন্ত্রের দুই শ্রেণী। (১) আগম শিববক্ত্র হইতে পার্বতীর শ্রবণে গত, (২) নিগম পার্বতী বক্ত্র হইতে শিব-শ্রবণে গত গুহ্যোপদেশ, ৪১

আত্মাপঞ্চবিংশতিতত্ত্ব—সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও আত্মা (দ্রষ্টা পুরুষ), ৭৫

আড়—[<অন্তরাল ?] বাইরে, অন্তরালে, ২৬৪

আহিরিণী—[সং আভীর, তুঃ হিঃ আহীর] গোপজাতীয়া স্ত্রীলোক

উত্তরসাধক—তন্ত্রোক্ত শবসাধনায় প্রধান সাধকের সহকারী

এমাম—[আঃ ইমাম] যিনি অগ্রে অগ্রে গমন করেন, মুসলমান ধর্মগুরু, ২৬৯

উজাগর—[<উজ্জাগর<উৎ+জাগর] জাগিয়া রাত্রি যাপন করা

উধো—[<উধ্<উদ্ধব] (বাংলায় তির্যক্-অর্থে প্রযুক্ত) নির্বোধ, ২৭১

কপনী—[কপ্নী<সং কৌপীন] সংসারত্যাগী ভগবদুপাসকগণের পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড

কমলে কলুষচিহ্ন—কৃষ্ণের চরণকমলে যে অঙ্কুশচিহ্ন আছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে

করঙ্গ—[সং করাঙ্ক] কমণ্ডলু, ৫০৩

কল্প—ব্রহ্মার এক অহোরাত্র, অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর, ২৪৪

ক্ষীরোদশায়ী—ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টি সংহার করিয়া ক্ষীর-সমুদ্রে পদ্মপত্র-শয়নে অনন্তনাগের কুণ্ডলী-শয্যায় শায়িত, এইরূপ বিশ্রামরত বিষ্ণুর উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়।

কাণ্ডারী—[কাণ্ডার<প্রাকৃঃ কণডার<সং কর্ণধার] নৌকার কর্ণধার, ৬১২

কালিন্দী—যমুনা নদী, যমের ভগ্নী, ২১

কেলিকদম্ব—বৃক্ষবিশেষ, কদম্ব-বৃক্ষ সাধারণতঃ তিনপ্রকার,—(১) কেলিকদম্ব (২) নীপকদম্ব ও (৩) মহাকদম্ব; কেলিকদম্ব বৃক্ষকে কেলকদম্ব বা ধারাকদম্বও বলা হয়—ইহার ফুলের রঙ্ ঈষৎ হলুদবর্ণ, ২১

কুচনিয়া—মারিয়া দাম উঠাইয়া লয়, ৪০

কোটকেনা—প্রতিজ্ঞা, ৬৯

চটক—[তুঃ হিঃ চটক্] যাহা চট্ করিয়া লোকের মন হরণ করে, ৩৭০

চন্দনদান—পাদ্যার্ঘ্য দিয়া যে পূর্বকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সম্মান দেখানর রীতি ছিল, তাহার অর্ঘ্য অংশে কস্তুরী, চুয়া, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি দেওয়া হইত, ৩৪৬

চাঁচর—বাঃ √চাঁচ্ বা √চাঁছ্ হইতে আঁচর শব্দের আনুরূপ্যে গঠিত (চাঁচ+র) শব্দ—ইহার অর্থ আঁচড়ান বা পরিপাটি-করা বা সজ্জিত কেশ, ১৫

চিত্তা—[<চিত্র বা চিত্তক] তিলক, ৪৩৪

ছড়া-ঝাঁটি—ঝাঁট দেওয়া ও গোবরছড়া দেওয়া, ৬৯

ছাওয়াল—শাওয়াল<সাবাল (সং শাবক+আল) ৪৩৪

ছার—[<সং ক্ষার] ব্যঙ্গার্থে বা তাচ্ছিল্যার্থে প্রযুক্ত, ৬১২

ছুতোলতা—<সূত্র-নেত্র ? ২২১

জারি—[আঃ] আরম্ভ , ৪

জিগীর—[ফাঃ জিগর] নির্বন্ধ-সহকারে বলা, ২৬৯

টাট—তৈজস-বাচক শব্দ [<পাঃ তট্টক<তাম্র পাত্র ?], ১৬৯

টাড়—[<তাড়ঙ্ক] উপরের হাতের অলঙ্কারবিশেষ, ৪১৮

ডঙ্কা—[<ঢক্কা<ঢক্কা] সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য দুন্দভিধ্বনি, ৩৭০

ঢেম্না—[দেশী] চরিত্রহীন লোক, ৩১১

ঢেরা—দাগ, শেষ সীমা, ২৬৭

ঢেঁড়রা—[<দুন্দভি ?]

তপন-তনয়া—যমুনা

তারক-ব্রহ্ম—[তারক (ত্রাণকারক) যে ব্রহ্ম] রামনামযুক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্র,৩৯০

তুফান—মূল জাপানী শব্দ, বাংলায় ইহা ইংরাজী হইতে আসিয়াছে, [<তোফান<তওফন<তয়ফুন<তাইফুন ইঃ] জল-প্লাবন, ৪২৮

তুষানল—গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষাগ্নিতে প্রবেশের বিধান পুরাকালে ছিল, ৩১১

তেনা—ছেঁড়া ন্যাকড়া (দেশী), ৬৩

ত্রিকোণ—শ্রীকৃষ্ণচরণে পতাকা বা ধ্বজ-চিহ্ন যাহা আছে, তাহাকে ত্রিকোণ বলা হইয়াছে, ৪০৪

ত্রিভঙ্গরূপ—মস্তক হইতে গলদেশ পর্যন্ত, গলদেশ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত এবং কটিদেশ হইতে চরণ পর্যন্ত এই তিনটি ভঙ্গিমার দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ব্যক্ত করিতেন, ৩৯৩

দণ্ডী—দণ্ডধারী সন্ন্যাসী, ১৬৩

দাম্ভীর্য্য—(গাম্ভীর্যের আনুরূপ্যে গঠিত) দেমাকের ভাব, ৩৩০

দায়মালী কয়েদী—যে অপরাধী চিরকালের জন্য কারারুদ্ধ, ৬

দোসরী—[তুঃ হিঃ দুসরী] সখী বা সখীস্থানীয়, ৮৩

দোহাঈ—[<ফাঃ দুহাঈ] প্রার্থনা, ১৮৩

ধড়া—[<সং ধটী] পরিধেয় বসন, ৩২৮

ধেনুপদ—গোক্ষুর (একদা গোক্ষুরের জলে শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্রের প্রতিফলন দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক রটিয়াছিল), ৪০৪

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশের চিহ্ন ছিল, ৩২৮

নচ্ছারি—[<নষ্ট+আচার ?] লজ্জাহীনা নারী, ৪৬

নকরালি—[আঃ নফর+বাঃ প্রত্যয় আলি (বৃত্তি অর্থে)] ৪১৮

নারদ-সংবাদ—নারদের জন্ম-বৃত্তান্ত ও পূর্বজন্মের যে বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে আছে, ৪৭

নিকড়—[< নিকড্ড অ < নিকঅড্ডঅ < নিকবড্ডঅ < নীকপর্দক = নিঃ+কপর্দক] বিত্ত গ্রহণ করে না এরূপ ভৃত্য বা ক্রীতদাস, ৪০৩

নিছনি—[নিছন<ব্রজঃ প্রাঃ বাঃ নেঞোছন<সং নির্মছন] অর্ঘ্য, উপহার, ৫৮

নিদেল—নিদ্রালু, ৪২১

নিধুবন—উপবন বা কুঞ্জবন, ৩৫৩

পঞ্চপাতক—নাশি গো[১] ব্রাহ্মণ[২] হত্যা করি ভ্রূণ[৩]
সুরাপানাদি[৪] বিনাশী নারী[৫]—হিন্দুদের চক্ষে এই পঞ্চ অপরাধ পঞ্চমহাপাতক গণ্য হয়।

পঞ্চশর—কামদেব, কামদেবের পঞ্চশরের নাম সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পঞ্চ পুষ্পকে কামের শর বলিয়া অভিহিত করা হয়, ২৫০

পঞ্চামৃত—সংস্কারবিশেষ, গর্ভিণীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি দান করিতে হয়, ২৫০

পসরা—[পশার, পসার <পণশার, পণসার <পণ্যশালা] দোকান, পণ্য-সম্ভার, ৩১২

পাগ, পাগড়ী—[তুঃ হিঃ পাগ, পাগড়ী] শিরোবেষ্টন-বস্ত্র

পাজি—[ফাঃ পাজী] দুষ্ট, বদমাশ, ৪০০

পাটন—[<পট্টন] বন্দর, ১২৩

পাথার—[<পত্থার <প্রত্থার <প্রস্তার] সীমাহীন কলঙ্কের পাথার বলিলে সীমাহীন কলঙ্ক বুঝায়, ১৬

পাসরি—বিস্মৃত হইয়া, ৪৩৯

পাচনী—[প্পাজন <প্রাজন] গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জীবদের তাড়নের ছোট দণ্ড, ৪১৮

প্যারী—[হিঃ <প্রিয়কারিকা] প্রিয়া, ৩০৫

প্রভাস—দ্বারকার নিকটবর্তী প্রভাসে সত্যভামার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং এই যজ্ঞে বাসুদেব-দৈবকী, নন্দ-যশোদা এবং ব্রজগোপীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ২৫

ফতেমা বিবি—হজরত মহম্মদের স্ত্রী, ১৬৯

বংশী বট—বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন, ৩৩৩

বনমালা—কদম্ব, কেতকী, কেশর, চম্পক, কুন্দ, যূথী, জাতি, মল্লিকা, বেল বা টগর—এই নয়টি ফুলের সংযোগে যে মালা গাঁথা হয়

বঁধু—[<বন্ধু] নাগর, প্রণয়ী, ১০

বাথান—[<বাথান < বাসস্থান] গোশালা, ৩০৭

বাদী—আদালতে যে অভিযোগ করিতে যায়, ১৭

বার—[ফাঃ] রাজসভায় দর্শন দান, ১৫৩

বিজয়া—যে তিথিতে দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়, ৩১২

বিমলা—পুরুষোত্তম বা জগন্নাথের শক্তি। তন্ত্রমতে ৪৯ শাক্তপীঠের অন্যতম পুরুষোত্তম বা শ্রীক্ষেত্র। জগন্নাথের শক্তি লইয়া বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহা এই, বৈষ্ণব-মতে শ্রী=সুভদ্রা=শক্তি, তন্ত্রমতে "শ্রীক্ষেত্রে বিমলা শক্তি জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ" পীঠবর্ণন—বৃহৎ তন্ত্রসার।

মহাযান বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে আবার বিমলা, জম্ভলা প্রভৃতি শক্তির নাম পাওয়া যায়। ৩৯

বুধো—[<বুধু <বুদ্ধু <বুদ্ধ] নির্বোধ, তির্যক্-অর্থে প্রযুক্ত, যেমন ব্রহ্ম, রাম প্রভৃতি শব্দের বাংলায় তির্যক্-অর্থ হয়, ২৭১

বোম্বেটে—[<বোম্বাটিয়া, <বোম্বাট (Bombard)+ইআ বাঃ প্রত্যয়] জলদস্যু, ৯২

ব্যাওরা—[<বেওরা <বেওয়ার <ব্যাপার] মূলকথা, প্রকৃত তত্ত্ব, ৩৭০

ব্রজপুরী—বৃন্দাবনের নন্দালয়, ১৬

ব্রহ্মরন্ধ্র—প্রাণবায়ুর বহির্গমন-পথকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, ৩৬২

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী—যাঁহার উদরভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সৃষ্টি অবস্থিত, সেই শক্তি বা মূলা প্রকৃতি, ৪৫

ভাণ্ডির বন—ভাঁট গাছের বন, ৪২৩

ভাদ্র বৌ—<ভ্রাতৃবধূ, ২৬৮

ভাবগ্রাহী—মর্মজ্ঞ, ৩২৫

ভারতী—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল, এবং সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া এইখানেই বাস করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গদেব ইহার নিকট গিয়া সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ৪৬২

ভারিভূরি—['জারি-জুরীর' আনুরূপ্যে গঠিত শব্দ] ছল, চাতুরী, ৭০

ভৃগুচিহ্ন—(একবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের মধ্যে কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ, এই পরীক্ষা করিবার মানসে ভৃগুমুনি বিষ্ণুর নিকট গমন করেন, সে সময়ে বিষ্ণুকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া ভৃগুমুনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর বক্ষোদেশে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে বিষ্ণু জাগরিত হইয়া ভৃগুমুনিকে দেখিতে পান ; ভৃগুমুনির প্রতি ক্রোধান্বিত না হইয়া বিষ্ণু বরং তাঁহার পদসেবা করিতে প্রস্তুত হন।) বিষ্ণুর বক্ষোদেশের ভৃগুপদচিহ্ন, ৪০৪

ভেলা—[<ভেলঅ<ভেলক] কলাগাছের খণ্ড প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র তরী, ১৬৯

মধুপুরী—[<মথুরাপুরী<মথুরাপুরী], ১৭

মহাজন—মূলধনী, ২৩৭

মাল্লা—[ফাঃ] যাহারা নৌকার দড়ি-দড়ার কাজ করে, ৪০০

মাশুল—[আঃ মহসুল] যে কর আদায় করা হইয়াছে, ৪২১

মিনতি—অনুনয় করা, বিনতি ও মিনতি—এই দুই-রূপই বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে, [তুলঃ আঃ—মিন্নৎ, মিনতি<বিনতি<বিণত্তি<প্রাকৃঃ বিণ্ণত্তি <বিজ্ঞপ্তি], ১৪৯

মিনিকড়ি—[<বিনাকড়ি] নিঃশুল্ক, যার কোন মূল্য লাগে না, ৪১৭

মীন—[তামিল] মৎস্য, ৩৭৭

মেয়াদ—[ফাঃ] নির্ধারিত সময়, ৬

রবিসুত—যম, ৪০৮

রাজপাট—[<রাজপাট<রাজপট্ট] রাজসিংহাসন, ৪৪২

রাধাকুণ্ড—বৃন্দাবনে রাধার নামে প্রচলিত কুণ্ড, ৪০৭

রিষে—[<রীষ বা রিষ<সং ঈর্ষ্যা], ২৩৪

রেশালা—[আঃ রিশালা], অশ্বারোহী সৈন্যদলের অশ্বশালা

লবেজান—[<ফাঃ লফ-এ-জান] প্রশান্তকর, ৩১

লোটা—[হিঃ<সং লুণ্ঠক], ৬৫

লোটে—[<লুট্ট লুণ্ঠ<সং লুণ্ঠ্], ১৮৩

শঙ্খাসুর—শঙ্খচূড়, দীর্ঘকাল তপশ্চর্যার ফলে শঙ্খচূড় তুলসী দেবীকে স্ত্রীরূপে লাভ করেন এবং দেবগণের অজেয় হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন—ইহার ফলে দেবগণের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল বিবাদ চলিতে থাকে। অতঃপর দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বেশ ধারণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হন। স্বভাবতঃ তুলসী বিষ্ণুকে আত্মদান করেন এবং বিষ্ণু তুলসীর অমর্যাদা করেন। এই ভাবে তুলসীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ায় শঙ্খচূড় শিবের হস্তে পতিত হন। তুলসী বিষ্ণুর ছলনা বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। ২৬৬

শান্তিশতকম্—কবি শিহলন কর্তৃক রচিত গ্রন্থ, ২৪৪

শিন্নি—[ফাঃ শিরণি ও মিষ্টান্ন] দেবতার ভোগ

শিবের নাভিপদ্মবন—তন্ত্রে দেখা যায় যে, মহেশ্বরের নাভিপদ্ম অর্থাৎ ষট্চক্রের দ্বিতীয় চক্র হইতে (স্বাধিষ্ঠান) তৃতীয় মহাবিদ্যা ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরী বা রাজরাজেশ্বরী উদ্ভব হইয়াছিলেন, ৪১

শিয়ান—[<সৈঁয়ান<সঞ্ঞান <সং সজ্ঞান] চালাক, ২৯৮

শেল—[<শল্লঅ<সং শল্লক] ক্ষুদ্র ক্ষেপণাস্ত্র, ৪২৩

শ্রীমন্ত—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতি সদাগর ও তাহার পুত্র কর্তৃক বাণিজ্যার্থে সিংহল গমনকালে কালীদহের কমলবনে দেবী হৈমবতীর গজ-গ্রাস দৃশ্য দেখার উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে, ২৭৩

সংকল্প—যজমান কর্তৃক ধর্মকৃত্য করিবার প্রতিজ্ঞা

সনন্দ—হুকুমনামা, অধিকারের হুকুম, পরবর্তী কালে তাহা হইতে অধিকার অর্থও দাঁড়ায়, ২০০

সপ্ততাল—[<সপ্ততল] সাতটী ভাগ, ৪০

সপ্তরথী—মহাভারতের দ্রোণপর্বে আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষ হইতে সাতজন বীর যোদ্ধা কর্তৃক চক্রব্যূহ নির্মিত হইয়াছিল, এই চক্রব্যূহে যে সাতজন বীর যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা হইতেছে দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শল্য ; ৩৯৩

সভ—সব শব্দেরই আর একটি রূপ, সংস্কৃত সর্ব শব্দ হইতে ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া অর্থাৎ সাব না হইয়া 'সব' ও 'সভ' শব্দের প্রচলন ও প্রয়োগ দেখা যায়, ৫৭০

স'ঋতা—সহিষ্ণুতা, ৩২৭

স্যমন্ত পঞ্চক—তিথিবিশেষের নাম, ৩৪৮

সাট—[<সংক্ষেপ] ১৮০

সাঁওলী—[<শ্যামলী] শ্যামবর্ণ, ৪১৮

সিঁধেল—[<সিন্ধাইল< √সন্ধ+আ+ইল] ৯৩

সুধন্না—রাজা হংসধ্বজের পুত্র সুধন্বা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ; অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত দিগ্‌বিজয় কালে হংসধ্বজের রাজ্যে আসিলে, হংসধ্বজ সহজেই বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সুধন্বা এই পরাজয় মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন, ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে, কৃষ্ণভক্ত সুধন্বাকে পরাজয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছিল, অর্জুনের অক্ষমতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সুধন্নাকে বধ করেন। ৩৯৪

সুন্দ উপসুন্দ—নরকাসুরের সেনাপতিদ্বয়, ইহাদের পিতার নাম নিকুম্ভ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া এই বর লাভ করেন, যে পরস্পরের হস্তেই যেন তাহাদের মৃত্যু হয়। ইহারা সম্পূর্ণ অপরাজেয় হইয়া থাকিলে ব্রহ্মা কর্তৃক তিলোত্তমা ইহাদের নিকট প্রেরিত হন, তখন উভয়েই তাহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা করে, ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, এবং তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২৬৭

সুষষ্ঠী—শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠী, ৯

ষট্‌চক্রভেদ—যোগীরা ধারণা করেন যে মূল নির্ভর হইতেছে মেরুদণ্ড, সুতরাং এই মেরুদণ্ডকে তাঁহারা স্নায়ুকেন্দ্রের দিক্‌ দিয়া ৬টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন, এবং এই ৬টি ভাগকে তাহারা ৬টি বিভিন্ন পদ্মের অবস্থান স্থির করিয়াছেন। সুপ্তশক্তিস্বরূপা কুণ্ডলিনীকে তপশ্চর্যার দ্বারা জাগরিত করিয়া সকল চক্র ভেদ করাইয়া ষষ্ঠ চক্রে লইয়া যাওয়া যোগীদের প্রাথমিক কর্তব্য। ৭৬

হাজা—[ফাঃ] জলেতে নষ্ট হওয়া, ২১২

হাজা শুকো—জলপ্লাবন ও অনাবৃষ্টি, ২৪২

হাতে-নাতে—[হস্ত-লোপ্ত্র] হস্তে ন্যস্ত (?), ২৭২

হিত-নীত-প্রীত—ঔপনিষদিক প্রসিদ্ধ তিন নীতি-বচন বা ব্যবহার; হিতকর নীতিযুক্ত ও আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ২০

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

॥ অ ॥

॥ আ ॥

॥ ঐ ॥

॥ ও ॥

॥ ক ॥

॥ গ ॥

॥ ঘ ॥

চ ॥

ছ

॥ থ ॥

দ ॥

॥ ধ ॥

॥ ন ॥

॥ প ॥

॥ ফ ॥

॥ ব ॥

॥ ভ

॥ স ॥

॥ হ ॥

গ্রন্থ-পঞ্জী

কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ, রাম বসু, হরু ঠাকুর

কবির ঝঙ্কার—হরিচরণ আচার্য—১৩৩৬

গন্ধবণিক—১৩৩১ সাল ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ —ভবানী বণিক

গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ — কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত—১৩০১ সাল

জন্মভূমি—৫ম বর্ষ—১৩০১-২

নব্যভারত—১৩১২

প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান—মন্মথলাল মিশ্র

প্রাচীন কবি-গান সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৮৪ সাল

প্রীতিগীতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ—১৩০৫ সাল

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট.

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শিবরতন মিত্র

বঙ্গের কবিতা—অনাথকৃষ্ণ দেব— (পৃঃ ৩১৭-২৫)

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন

বাঙ্গালীর গান—১৩১২ সাল—দুর্গাদাস লাহিড়ী

বান্ধব—১২৮২ সাল পৌষ—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিশ্বকোষ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

বীরভূম বিবরণ—মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী—১৩২৩

ভারতবর্ষ—১৩২৫ (কাঃ) কবিওয়ালা—অমরেন্দ্রনাথ রায়

মাসিক বসুমতী—১৩৩৭

রসভাণ্ডার—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—১৩০৬

সংবাদ প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক—সম্পাদিত — ১২৬১ সালের ১লা আশ্বিন, ১লা কা, ১লা অ, ১লা পৌ, ১লা মা, ১লা ফা— গোজলা গুঁই, লালু-নন্দলাল, রাম বসু, হরু ঠাকুর রাসু-নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতি কবি-ওয়ালাদিগের কবি-গান ও জীবনী

সমীরণ—৩য় খণ্ড—মহেশ কানা

সারস্বত কুঞ্জ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ১২৯২

সাধনা—১৩০২—কবিসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩০২—প্রাচীন কবিসঙ্গীত

সৌরভ—১৩২২-২৩ সাল—ময়মনসিংহের কবিগান

হাফ-আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস—গঙ্গাচরণ বেদান্তরত্ন বিদ্যাসাগর—১৩২৬

History of Bengali Language & Literature—Dr. D. C. Sen, D. Litt.

History of Bengali Literature in the 19th Cent.—Dr. S. K. De